দুই হুজার

কাউন্টেস্ ম. ন. তলস্তয়ের করকমলে

উনিশ শতকের প্রথম দিক। তখন না ছিল রেলপথ, না বড় রাজপথ। গ্যাস্ বা চর্বির বাতি ছিল না। ছিল না স্প্রিং-এর নিচু সোফা বা বার্নিশ করা আসবাব। ছিল না মনোকল-পরা মোহমুক্ত যুবকেরা বা উদার-মত মহিলা দার্শনিক। সেই সরল যুগে মস্কো থেকে সেন্ট পিতার্সবুর্গে যেতে হলে সঙ্গে গাড়ি বোঝাই রান্না খাবার নিতে হোতো। ভাজা কাটলেট, গরম বুবলিকি, আর ভালদাই-এর গাড়ির ঘন্টার কাছে আত্মসমর্পণ করে নরম ধুলো বা কাদার রাস্তা দিয়ে চলতে হোতো আটটি দিন ও আটটি রাত। সে সময়ে শরতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় ধূমাচ্ছন্ন মোমবাতির আলো পড়ত বিশ-তিরিশ জনের পরিবারের ওপরে, বল-ঘরের ঝাড়ে থাকত মোম ও স্পার্মাসেটির বাতি, আসবাব সাজানো হোতো মুখোমুখি অতিরিক্ত শৃঙ্খলায়, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের যৌবন বোঝা যেত শুধু কুঞ্চিত চর্ম বা পক্ক কেশের অভাবে নয়, বোঝা যেত মেয়েদের জন্য তাদের ডুয়েল্ লড়াই দেখে কিংবা হঠাৎ বা অন্যভাবে পড়ে-যাওয়া মেয়েলি রুমাল তুলতে তড়াক করে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে দ্রুত যাওয়ার ভঙ্গি দেখে। তখন আমাদের মায়েরা পরতেন মস্ত হাতার উঁচু কোমর গাউন, আর বাড়ির সব সমস্যার সমাধান করতেন লটারি করে। সে যুগে আদরণীয় সুন্দরীরা দিনের আলো সইতে পারতেন না। ম্যাসনিক লজ, মার্তিনপন্থী ও তুগেনবান্দের সেই সরল আমলে, মিলবাদভিচ্, দাভিদভ ও পুশ্‌কিনের

সেই যুগে ধনী জমিদারদের এক সমাবেশ ঘটেছিল গুর্বেনিয়ার কেন্দ্র 'ক' শহরে। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন সবে শেষ হয়েছে।

১

'কুছ পরোয়া নেই, দরকার হলে বৈঠকখানা ঘরেই থাকব।' শ্লে থেকে নেমেই 'ক' শহরের সেরা হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে বললেন একটি তরুণ অফিসার। তাঁর, গায়ে ওভারকোট, মাথায় অশ্বারোহী সৈনিকের টুপি।

'পেল্লায় জমায়েত, হুজুর, এমন বড একটা দেখা যায় না।' বলল ছোকরা চাকরটি। অফিসারের ভৃত্যের কাছে সে এর মধ্যেই শুনেছে যে ইনি হলেন কাউন্ট তুরবিন তাই 'হুজুর' বলে ডাকছে। 'আফ্রেমভস্কায়া জমিদারীর মহলের কর্ত্রী ঠাকরুন কথা দিয়েছেন সন্ধ্যেবেলায় মেয়েদের নিয়ে চলে যাবেন। আপনি বললে এগারো নম্বর ঘর খালি হলে সেখানে তুলতে পারি।' সে বলল। করিডরে হালকা পায়ে সামনের দিকে যেতে যেতে বারবার ফিরে তাকাচ্ছিল সে।

বৈঠকখানায় জার আলেকজান্দারের কালো মলিন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি। তার নিচে ছোট টেবিলে কয়েক জন শ্যাম্পেন টানছে। তারা স্থানীয় বাবু গোছের লোক দেখেই মনে হয়। তাদের একটু দূরে ঘন নীল ক্লোক-পরা কয়েকজন ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ী।

কাউন্ট ঘরে ঢুকে ব্লুচার নামে প্রকাণ্ড ছাই রঙা কুকুরটিকে ডেকে, কলারে তখনো বরফ-কুচি লাগা কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ভোদকা আনতে বলে সাটিনের নীল সার্ট গায়ে টেবিলে বসে আলাপ জুড়ে দিলেন ভদ্রলোকদের সঙ্গে। তাঁর সুন্দর চেহারায় আর দিলদরাজ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে তারা শ্যাম্পেনের আমন্ত্রণ জানাল তাকে। কাউন্ট প্রথমে এক গেলাস ভোদকা এক চুমুকে শেষ করলেন তারপর একটি নতুন বোতল হুকুম করলেন নব-পরিচিতদের জন্য। ঠিক সেই সময় শ্লে-চালক ভেতরে এল মদ্যপানের পয়সা চাইতে।

'সাশা।' চেঁচিয়ে ডাকলেন কাউন্ট। 'ওকে পয়সা দে।'

শ্লে-চালক বেরিয়ে গিয়ে একটু বাদেই পয়সা হাতে ফিরে এল।

'এই দেখুন হুজুর। আপনার জন্যে কত ধকল সইলাম। আপনি বললেন, আধ রুবল দেবেন আর ও আমায় দিচ্ছে এক সিকি!'

'সাশা, ওকে এক রুবল দিয়ে দে।'

সাশা বেজারভাবে শ্লে-চালকের জুতোর দিকে তাকিয়ে রইল।

'ওর পক্ষে ওই ঢের।' সে বলল ভারী মোটা গলায়। 'তাছাড়া আমার কাছে আর টাকাকড়ি কিছু নেই।'

ব্যাগ থেকে শেষ সম্বল পাঁচ রুবলের দুটো নোট বার করে কাউন্ট তার একটা শ্লে-চালককে দিয়ে দিলেন। সে তার হস্তচুম্বন করে বেরিয়ে গেল।

'খারাপ দশা!' বললেন কাউন্ট, 'শেষ পাঁচটা রুবল।'

'এই তো আসল হুজার।' একটু হেসে বললেন এক ভদ্রলোক। তাঁর গোঁফ, গলা আর পায়ের শক্তিমান আলগা ভাব থেকে মনে হয় তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার।

'এখানে কি আপনার বেশিদিন থাকবার ইচ্ছে কাউন্ট?'

'কিছু টাকার দরকার। নইলে থাকবো না. হতভাগা হোটেলটায় ঘরও পাওয়া যাচ্ছে না। গোল্লায় যাক সব।'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি বললেন, 'অনুগ্রহ করে আমার ঘরে আসুন, কাউন্ট, সাত নম্বর ঘর আমার। আমার সঙ্গে থাকতে আপত্তি না থাকলে রাতটা কাটিয়ে যান। আজ রাতে মার্শালের ওখানে বলনাচ। আপনাকে দেখে তিনি খুব খুশী হবেন।'

'ঠিক ঠিক কাউন্ট থেকে যান।' সুন্দর একজন যুবক বলল। 'আপনার তাডা কিসের? তিন বছর পরে মাত্র একবার এই নির্বাচন হয়। তরুণীদের অন্তত একবার আপনার দেখা উচিত কাউন্ট।'

'সাশা জামাকাপড বার কব। আমি স্নানের ঘরে যাচ্ছি।' উঠতে উঠতে বললেন কাউন্ট, 'তারপরে দেখা যাবে—হয়তো একবাব সত্যি শেষটায় ঢুঁ মাবব মার্শালের ওখানে।'

একটি ওয়েটারকে ডেকে কী একটা বললেন তিনি। তাতে সে মৃদু হেসে বলল, 'সবই সম্ভব, হুজুর।' বলে বেরিয়ে গেল।

'আপনার ঘরে আমার স্যুটকেস্টা রাখতে বলছি।' দরজার বাইরে থেকে কাউন্ট বললেন।

'খুবই বাধিত হব।' দরজার কাছে ছুটে গিয়ে বললেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি। 'সাত নম্বর ঘর। ভুলবেন না।'

কাউন্টেব পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই অবসরপ্রাপ্ত অশ্বারোহী অফিসার

স্বস্থানে ফিরে কেরানার কাছে চেয়ারটা টেনে এনে সোজা তার চোখে চেয়ে হেসে বললেন, 'ইনিই তিনি।'

'কে? সত্যি!'

'সত্যিই তিনি। আমি বলছি। ডুয়েল লড়তে ওস্তাদ, নামকরা হুজার। নাম তুরবিন। সবাই চেনে। বাজি ধরে বলতে পারি আমায় চিনেছে। নির্ঘাৎ চিনেছে। লেবেদিয়ানে নতুন ঘোড়া যোগাড়ে একবার আমাকে পাঠায়—সে সময় তিন হপ্তা ধরে একটানা হুল্লোড় চালাই দুজনে। একটা খুদে ঘটনা ঘটেছিল—দায়ী ছিলাম আমরা দু'জনে, সেই জন্যেই আমায় না চেনার ভান করল, খাসা লোক, অ্যাঁ।'

'খাসা লোক। আদবকায়দা কী চমৎকার। ও যে এই ধাঁচের তা কেউ টেরটি পাবে না।' বলল সুন্দর যুবকটি। 'কী তাড়াতাড়ি বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা। পঁচিশের বেশি বয়স হবে না, নিশ্চয়ই?'

'বেশিই হবে। কিন্তু তা দেখায় না। ওকে বুঝতে হলে ভাল করে চেনা দরকার। মাদাম মিগুনভার সঙ্গে পালিয়েছিল কে? ইনিই। সাবলিনকে খতম করেছিল কে? ইনি। আর কে মাতনেভের পা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল জানলা থেকে? ডিউক নেস্তেরভের কাছে তিন লক্ষ রুবল জিতেছিল কে? ও কী বেপরোয়া লোক আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। জুয়াড়ি, ডুয়েল লড়িয়ে, মেয়ে ভোলানো লোক। কিন্তু প্রাণটা হুজারের, খাঁটি হুজারের। লোকে আমাদের কুৎসা গাইতে পছন্দ করে বটে, কিন্তু সাচ্ছা হুজার যে কী জিনিস তা বোঝে না। আঃ। কী সব দিন ছিল।'

তারপর তিনি বিশদ বলতে আরম্ভ করলেন লেবেদিয়ানে কাউন্টের সঙ্গে তাঁর বেলেল্লা-কাহিনী··· যে ব্যাপারটি ঘটে নি কোনো দিন, ঘটতে পারে না কখনো। ঘটতে পারে না, কারণ, প্রথমতঃ, তিনি কাউন্টকে চোখে দেখেন নি এর আগে কোনো দিন, কাউন্ট অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দেওয়ার দু'বছর আগে তিনি অবসর নেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অশ্বারোহী বাহিনীতে কোনো দিনই কাজ করেন নি। বেলেভস্কি রেজিমেন্টে সামান্য ক্যাডেট হিসাবে চার বছর কাটিয়ে অফিসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবসর নেন। কিন্তু বছর দশেক আগে বাপের সম্পত্তি পাওয়ার পর তিনি সত্যি একবার লেবেদিয়ানে গিয়েছিলেন, সেখানে নতুন ঘোড়া যোগাড়ে অফিসাদের সঙ্গে সাতশো রুবল উড়িয়ে দিয়ে নিজের জন্য নারাঙ্গি কফ

দেওয়া উলামি পোশাক অর্ডার দেন—ইচ্ছে ছিল ল্যান্সার বাহিনীতে যোগ দেবেন। অশ্বারোহী বাহিনীতে ঢোকবার ইচ্ছা তার এত বেশি ছিল যে লেবেদিয়ানের সেই তিনটি সপ্তাহ তাঁর জীবনে রয়ে গেল সবচেয়ে আনন্দময়। এই ইচ্ছাকে তিনি মনে মনে ক্রমে বাস্তবে রূপান্তরিত করে নিলেন, তারপর হোলো তা তাঁর স্মৃতি এবং অশ্বারোহী বাহিনীতে তিনি কাজ করেছিলেন এ বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হোলো। এতে অবশ্য সততা ও অমায়িকতার দিক দিয়ে সত্যিকার ভদ্রলোক হতে কোনো বাধা হয় নি তাঁর।

'সত্যি অশ্বারোহী বাহিনীর লোক ছাড়া আমাদের কদর কেউ বুঝতে পারে না।' চেয়ারে উঁচু হয়ে বসে থুতনিটা এগিয়ে মোটা ভারী গলায় বলে চললেন, 'এক সময় ছিল যখন স্কোয়াড্রনের আগে আগে যেতাম ঘোড়ায় চেপে—আর সেটা ঘোড়া নয় তো একটা আস্ত শয়তান। নিজেও কি আমি কম শয়তান! দু'পায়ের তলায় চেপে বসে থাকতাম। স্কোয়াড্রন কম্যাণ্ডার আসতেন পরিদর্শনে। বলতেন, 'অফিসার, এ বাহিনী তো তোমায় ছাড়া চলবে না। অনুগ্রহ করে স্কোয়াড্রনের প্যারেডে নেতৃত্ব দাও।' আমি বলতাম, 'যে আজ্ঞে', আর বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু। ঘুরে আমি গোঁফওয়ালা জওয়ানদের হেঁকে হুকুম দিতাম এবং দ্রুত সবাই বেরিয়ে যেতাম। আঃ! সে সব কী দিন ছিল।'

স্নানঘর থেকে কাউন্ট ফিরে এলেন। মুখটা লালচে, ভিজে চুল। সোজা সাত নম্বর ঘরে চলে গেলেন। সেখানে পাইপ মুখে ড্রেসিং গাউন পরে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার তখন ঈষৎ ত্রস্ত পুলকে নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবছিলেন। বিখ্যাত তুরবিনের সঙ্গে এক ঘরে থাকা! তিনি ভাবছিলেন, 'যদি হঠাৎ উনি আমায় বিবস্ত্র করে শহরের বাইরে বরফের মধ্যে বসিয়ে রাখেন, বা সমস্ত গায়ে মাখিয়ে দেন আলকাতরা, কিংবা শুধু······না, না, একজন সহকর্মীর সঙ্গে উনি এমন ব্যবহার করতে পারেন না।' সান্ত্বনা দিলেন তিনি নিজেকে।

'সাশা, ব্লুচারকে খেতে দে।' চেঁচিয়ে বললেন কাউন্ট।

সাশা এরই মধ্যে এক পাত্তর ভোদকা চড়িয়ে বেশ রঙীন। সে এসে দাঁড়ালো।

'আর দেরী সইল না। এরই মধ্যে মাতাল দেখছি, বদমাস কাঁহাকা! ব্লুচারকে খেতে দে।'

'না খেলে ও মরবে না। দেখুন না, সারা গায়ে স্বাস্থ্য কেমন. চকচক করছে।' কুকুরের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল সাশা।

'বাজে কথা থাক। খেতে দে ওকে।'

'আপনি শুধু কুকুর নিয়ে ভাবেন। আর আপনার চাকর এক পাত্তর ভোদকা খেলে ধমকান।'

'তবে রে! দেব এক ঘা!' কাউন্টের চেঁচানিতে জানলার সার্শিগুলো সশব্দে কেঁপে উঠল। আর অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারও একটু ভয় পেয়ে গেলেন।

'সাশার পেটে আজ কিছু পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তো পারতেন। মানুষের চেয়ে যদি কুকুরের ওপর আপনার দরদ বেশি হয়, তাহলে মারুন আমাকে।' বলল সাশা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নাকে একটা ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। দেওয়ালে ঠুকে গেল মাথাটা। পরের মুহূর্তেই হাতে নাক চেপে ছুটে বেরিয়ে গেল, আর বারান্দার একটা তোরঙ্গের ওপর ধপাস করে বসে পড়ল।

'আমার দাঁত গুঁড়িয়ে দিয়েছে।' বিড়বিড় করল সে। এক হাতে নাকের রক্ত মুছল। অন্য হাতে ব্লুচারের পিঠ চুলকে দিতে লাগল। ব্লুচার তখন নিজের গা চাটায় ব্যস্ত ছিল। 'দেখছিস, ব্লুচার, দাঁত উড়িয়ে দিয়েছেন, তবু উনি আমার প্রভু, আমার কাউন্ট, ওঁর জন্যে জলে বা আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি। হ্যাঁ, সত্যি কথা। কারণ, উনি আমার কাউন্ট। ব্লুচার, খিদে পেয়েছে?'

কিছুক্ষণ সে সেখানে শুয়ে রইল। তারপর উঠে কুকুরকে খাওয়ালো। তার নেশা ছুটে গেছে। কাউন্টকে তখন সে চা দিতে গেল।

খাটের থামে পা দিয়ে অশ্বারোহী অফিসারের বিছানায় শুয়ে কাউন্ট। সামনে নম্র ভাবে দাঁড়ানো অফিসার বলছেন, 'আমি অপমানিত বোধ করব। আমি একজন পুরানো সৈনিক—বন্ধু। আর কারো টাকা নেবেন আপনি—তার আগে আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাকে রুবল দেবো। দুশো রুবল। এখন আমার কাছে দুশো নেই। আছে একশো মাত্র। কিন্তু বাকিটা আজই যোগাড় করে দেবো। আমি কিন্তু নিজেকে সত্যি অপমানিত জ্ঞান করব কাউন্ট।'

'ধন্যবাদ, বন্ধু' কাউন্ট তার পিঠে মৃদু চাপড় মেরে বললেন। তিনি

তাঁদের ভাবী সম্পর্কটা মোটামুটি আঁচ করে ফেলেছেন এতক্ষণে। 'ধন্যবাদ তাই যদি হয়, তবে বলনাচে যাবো আমরা। কিন্তু এখন কী করা যায়? শহরে কী কী হচ্ছে? সুন্দরী মেয়ে-টেয়ে আছে? ফুর্তি-লুঠেরা কারা? তাসুড়ে আছে?'

অফিসার বললেন, অঢেল সুন্দরী মেয়ে দেখা যাবে বলনাচে। মজা-লুঠেরা এখন নবনির্বাচিত পুলিস ক্যাপ্টেন কলকভ্, হুজারদের মতো বেপরোয়া নয় সে, অবশ্য তবে লোকটা ভালো ধরনের। ইলিউশ্‌কার জিপসি কোরাস নির্বাচনের শুরু থেকে এখানে গান গাইছে, স্তেশকা সেখানে একক শিল্পী। আজ বলনাচের পর সবাই যাবে জিপসিদের কাছে।

'আর তাস খেলা খুব চলে এখানে। লুখনভ—টাকা আছে লোকটার—সে সারা দিন তাস খেলে। আট নম্বর ঘরের ইলিন—উলান রেজিমেন্টের কর্নেট—ও হেরে ঢোল হচ্ছে। ওর ওখানে এখনই খেলা শুরু হয়েছে। প্রতি সন্ধ্যেয় খেলে, আর ইলিন এত চমৎকার লোক, বললে আপনার বিশ্বাস হবে না কাউন্ট। লোকটা একদম কেপ্পন নয়। পরণের সার্টটা খুলে দিতে পারে।'

'তাহলে যাওয়া যাক। দেখি লোকটাকে, আর কে কে আছে তাও দেখা যাক।'

'হ্যাঁ, চলুন চলুন। আপনাকে দেখে ওরা দারুণ খুশী হবে।'

২

উলান রেজিমেন্টের কর্নেট ইলিনের সদ্য ঘুম ভাঙল। আগের সন্ধ্যেয় তাসে বসেছিল আটটায়, পরদিন বেলা এগারোটা পর্যন্ত পনেরো ঘণ্টা ধরে শুধুই হেরেছে। প্রচুর হেরেছে, কিন্তু নিজেই বলতে পারবে না কতটা। তিন হাজার রুবল তার নিজের ছিল। আর রেজিমেন্টের পনেরো হাজার। দু টাকা মিশে এক হয়েছে। গোনে না ভয়ে, পাছে দেখা যায় যে লোকসান রেজিমেন্টের টাকাকেও ধরেছে। বারোটা নাগাদ ঘুমিয়ে পড়ে সে। গভীর স্বপ্নহীন ঘুম—যা অল্পবয়সীদেরই সম্ভব, আর তাও সম্ভব শুধু তাসে হেরে ঢোল হবার পরে। সন্ধ্যে ছ'টায় জাগল। হোটেলে তখন কাউন্টের আসবার সময়। মেঝেতে তাস আর খড়ি ছড়ানো রয়েছে। ঘরের মাঝখানে দাগী কয়েকটা টেবিল। আতংকের সঙ্গে মনে পড়ে

গেল গত রাতের খেলার কথা, বিশেষতঃ শেষ তাসটা গোলাম, যাতে সে হারে পাঁচশো রুবল। কিন্তু এ অবস্থাটা মেনে নিতে চাইছে না মন। বালিশের তলা থেকে নিয়ে টাকা গুনতে বসল। 'কর্নার' আর 'ট্রান্‌স্‌পোর্টে' হাতে হাতে ঘোরা কয়েকটা চেনা নোট চোখে পড়তে গোটা খেলাটা মনে পড়ে গেল। তিন হাজার নিজের টাকা ভোঁ ভোঁ। আর রেজিমেন্টের আড়াই হাজার।

চার রাত এক নাগাড়ে খেলছে উলান।

এসেছে মস্কো থেকে, সেখানে রেজিমেন্টের টাকা দেওয়া হয়েছিল তাকে। ঘোড়া বদলানো যাবে না এই ছুতোয় যাত্রীবাহী ডাকগাড়ী স্টেশনের ম্যানেজার 'ক' শহরে আটকে রেখেছে তাকে। আসলে হোটেলওয়ালার সঙ্গে তার গোপন ষড় আছে—সব যাত্রীকে একদিন করে আটকে রাখে। বয়স কম, ফুর্তিবাজ আমুদে এই উলান। রেজিমেন্টে যোগ দিচ্ছে এই উপলক্ষে বাপ মা তাকে তিন হাজার রুবল দিয়েছে। নির্বাচনের সময় 'ক' শহরে কটা দিন কাটাতে পেরে খুব খুশী। ইচ্ছে ছিল, মনের সুখে মজা লুটবে। একটি ছোট জমিদার ছিল পরিচিত। গাড়ি হাঁকিয়ে তার বাড়ি গিয়ে তার মেয়েদের একটু খাতির দেখিয়ে আসবে—তৈরি হচ্ছে, অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার এসে হাজির। আলাপ করলেন তিনি। সেই সন্ধ্যেয়, বদ মতলবে নয়, বৈঠকখানায় আলাপ করিয়ে দিলেন বন্ধু লুখনভ ও আরো কয়েকজন তাসুড়েকে! তখন থেকে সে তাসের টেবিলে। পরিচিত জমিদারের কাছে সে যায় নি—ঘোড়া ডাকার কথাও তোলে নি। চার দিন ঘরের বাইরেই বেরোয় নি।

পোশাক পরে চা খেয়ে আস্তে জানলায় গিয়ে দাঁড়াল উলান। একটু হেঁটে ঘুরে এলে তাসের নাছোড় চিন্তা চলে যাবে—এই ভেবে সে আর্মিকোট পরে বেরোল! লাল-ছাদ সাদা বাড়িগুলোর পেছনে তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। গোধূলি। গরম দিনটা। রাস্তা নোংরা। তার ওপর তুলোর মত নরম তুষার। ঘুমিয়ে কাটিয়েছে এই দিনটা—যে-দিনটা প্রায় শেষ হয়ে গেল। ভাবতে ভাবতে কর্নেটের মন গভীর বিষাদে ছেয়ে গেল।

'এই দিন হারিয়ে গেল। এ আর কখনো ফিরে আসবে না।' ভাবল সে।

'যৌবনটা উড়িয়ে দিয়েছি।' বলল নিজেকে। সত্যি ভেবে বলল তা

নয়। আসলে ভাবে নি একদম। বলল, বলবার মত কথাটা মনে এল তাই।

'কী করি এখন? ধার করে চলে যাই? ভাবছিল সে, ফুটপাতে তাকে পেরিয়ে গেল একটি যুবতী, 'কী বোকা-বোকা দেখতে মেয়েটাকে।' অহেতুক মনে হোলো কথাটা 'ধার করার মত কেই বা আছে এখানে। কেউ নেই, উড়িয়ে দিয়েছি—আমার যৌবন।' গেল দোকানের কাছে। দরজায় দোকানদার দাঁড়িয়ে। গায়ে শেয়াল-লোমের কোট, খদ্দের ডাকছে। 'সেই আটা-টা না ছাড়লে লোকসানটা পুষিয়ে নিতে পারতাম।' পেছনে একটা ভিকিরি বুড়ী দুঃখের কথা বলতে বলতে চলেছে। 'ধার দেবার মত কেউ নেই।' ভালুক-লোমের কোট পরা এক ভদ্রলোক গেল গাড়ি হাঁকিয়ে। পাহারাদার দাঁড়িয়ে রাস্তায়। 'এদের মধ্যে গোলমাল লাগিয়ে দেবার মতো একটা কী করা যায়। গুলি চালাই। বড় একঘেয়ে ও ব্যাপারটা, যৌবন উড়িয়ে দিয়েছি। বেশ যোয়াল, লাগাম ঝুলছে। তিন ঘোড়ার গাড়ি চাপলে কেমন হয়! হায় বরং ফিরি হোটেলে, লুখনভ আসবে এখনি। তাস খেলি গে আবার।'

ফিরে টাকা গুনল আবার। না, আগের বারের গোনায় কোনো ভুল নেই। রেজিমেন্টের টাকায় আড়াই হাজার রুবল ঘাটতি। 'প্রথম তাসে ধরা পঁচিশ, পরেরটায় 'কর্নার'......তারপর পয়লা বাজির সাত গুণ, তারপর পনেরো, তিরিশ, ষাট গুণ, তিন হাজার রুবল পর্যন্ত। তারপর যোয়ালগুলো কিনে বিদায় নেব। কিন্তু ষেটা বদমাস আমায় জিততে দেবে না। যৌবনটা উড়িয়ে দিয়েছে।'

লুখনভ ঘরে ঢুকল।

'অনেকক্ষণ উঠেছেন নাকি মিখাইলো ভাসিলিচ?' অস্থিস্যার নাক থেকে সোনার চশমা নামিয়ে লাল সিল্কের রুমালে ধীরে সুস্থে মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল লুখনভ।

'না, এই উঠলাম। চমৎকার ঘুমিয়েছি।'

'এইমাত্র কে একজন হুজার এসেছে। আছে জাভালসেভস্কির সঙ্গে, শুনেছেন?'

'না, আর সব কোথায়?'

'ওরা বোধহয় গেছে প্রিয়াখিনের কাছে। এখুনি ফিরবে।'

সত্যি তাই। একটু বাদেই এল আর সব। লুখনভের নিত্য সহচর স্থানীয় সেনাদলের অফিসার একজন। গ্রীক ব্যবসায়ী একজন, মস্ত তামাটে বাঁকা নাক, কোটরগত কালো চোখ। মেদ-থলথলে এক জমিদার, মদের ভাঁটি চালায়, সারা রাত গেলে, হামেশা আধ রুবল বাজি ধরে পয়েন্ট পিছু।

সবাই শুরু করতে আগ্রহী, কিন্তু কেউ সে বিষয়ে কিছু বলছে না। এই পাঁড় তাসুড়েরা, বিশেষ করে লুখনভ—সে ধীরে সুস্থে মস্কোতে মগের মুলুকের কথা বলছে।

'ভেবে দেখুন। শ্রেষ্ঠ শহর, রাজধানী, আর সেখানে কিনা রাতে হুক হাতে গুণ্ডারা ভূতের মত সাজ করে ঘুরে বেড়ায়। বোকা লোকদের ভয় পাইয়ে দেয়, পথের লোকদের টাকাকড়ি কেড়ে নেয়। আর এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নেই। পুলিশ কী ভাবে? সেটা জানতে চাই আমি।'

উলান বে-কানুন মুলুকের বিবরণ মন দিয়ে শুনল। কিন্তু শেষে উঠে শান্ত স্বরে তাস আনতে বলল। প্রথমে মোটা জমিদারই কথাটা বলল, 'মশাইরা, দামী সময় মিছিমিছি নষ্ট করি কেন? কাজের কথা শুরু করা যাক।'

'কেন চাইছেন জানা আছে। আধ রুবল করে খেলে এক গাদা টাকা ঘরে তুলেছেন কাল রাতে।' বলল গ্রীক।

'সত্যি, শুরু করা যাক।' বলল স্থানীয় সৈনাদলের অফিসার।

লুখনভের দিকে তাকাল ইলিন। সোজা চোখের দিকে চেয়ে লুখনভ ভৌতিক পোশাক-পরা হুক্-হাতে গুণ্ডাদের গল্প বলে চলল ধীরে সুস্থে।

'তাস বাঁটব', জিজ্ঞেস করল উলান।

'বড় তাড়াতাড়ি হচ্ছে না?'

'বেলভ!' লাল হয়ে ডাকল উলান, 'মুখে গোঁজবার মত কিছু নিয়ে এসো, এক কণাও কিছু খাইনি আজ। শ্যাম্পেন নিয়ে এসো। আর তাস দাও।'

সেই সময় ঘরে ঢুকলেন কাউন্ট ও জাভাল্‌গেভস্কি। দেখা গেল তুরবিন ও ইলিন একই ডিভিশনের লোক। তক্ষুণি ভাব জমে গেল। গেলাস ঠুকে শ্যাম্পেনে চুমুক দেওয়া হোলো। পাঁচ মিনিট না যেতে সম্বোধন দাঁড়ালো 'তুমি'। দেখা গেল ইলিনকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে কাউন্টের। তার কম বয়স বলে কাউন্ট একটু হেসে তার পেছনে লাগলেন।

'একেই বলে উলান।' বললেন তিনি। 'গোঁফের কী চমৎকার বাহার। দারুণ গোঁফ।'

ইলিনের ঠোঁটের ওপর রোঁয়া একদম সাদা।

'তাসে বসবেন বুঝি?' বললেন কাউন্ট, 'বেশ আশা করছি তুমি জিতবে ইলিন। তুমি তো ওস্তাদ খেলোয়াড়, তাই না?' মৃদু হেসে বললেন।

তাসের প্যাকেট খুলতে খুলতে লুখনভ বলল, 'এই শুরু করছি। খেলবেন, কাউন্ট?'

'না, আজ নয়। আমি খেললে আপনাদের ভিটেমাটি খোয়াতে হবে। আমি বসলে ওদিকে ব্যাংক ফেল মারে। কিন্তু না খেলার কারণ তা নয়। ভলচকের কাছে যাত্রীবাহী ডাকগাড়ির স্টেশনে সব হারিয়েছি, আঙুলে এক সারি আংটি এক বেটা পদাতিক সেপাই একেবারে বসিয়ে দিয়েছে। লোকটা নিশ্চয়ই জোচ্চোর।'

'তোমাকে বুঝি যাত্রীবাহী ডাকগাড়ির স্টেশনে অনেকক্ষণ থাকতে হয়েছিল?' ইলিন জিজ্ঞেস করল।

'বাইশটি ঘন্টা। কক্‌খনো ভুলবো না অভিশপ্ত জায়গাটার কথা। আর ঐ ডাক-স্টেশনের মাস্টারও ভুলবে না আমায়।'

'তার মানে?'

'গাড়ি করে গিয়েছি। চতুর এক জোচ্চোরের মত দেখতে পোস্ট-মাস্টার এসে বলল, 'ঘোড়াটোড়া নেই।' আমি নিজের জন্যে একটা নিয়ম তৈরি করেছি, সেটা বলে নি। যখনি ঘোড়া নেই, তখনি আমি কোট না খুলেই সোজা চলে যাই ম্যানেজারের ঘরে। বৈঠকখানা নয়, একেবারে খাস-কামরা, হুকুম দিই সব জানালা-দরজা খুলে দাও। যেন ধোঁয়ায় ভরে গেছে জায়গাটা, এবারেও ঐ একই ব্যাপার করলাম, যা ঠাণ্ডা! গেল মাসে কী দারুণ শীত পড়েছিল মনে আছে তো? শূন্যের নিচে চার ডিগ্রি নেমে গেছে পারা। পোস্টমাস্টার আমার সঙ্গে তর্ক করতে এল। নাকে কষিয়ে দিলাম এক ঘা—তর্ক বন্ধ। একটা বুড়ী কয়েকটা ছুঁড়ী আর মেয়েলোক চেঁচামেচি করে নিজেদের ঘটিবাটি নিয়ে গাঁয়ে কাটাবার চেষ্টা দেখতে লাগল। পথ আগলে গলা হাঁকড়ে বললাম, ঘোড়া দিলে চলে যাব। নইলে ঠাণ্ডায় জমে মরতে হবে এখানে—কাউকে বেরোতে দেব না।'

'ওদের শব্দ করার ঐ পন্থা।' হেসে উঠল থলথলে জমিদার। 'ঠাণ্ডায়, গুবরে পোকাদের জমিয়ে বরফ করে দেওয়ার মতো।'

'কিন্তু ওদের পাহারায় রাখিনি। কোথায় যেন গিয়েছিলাম, পোস্ট-মাস্টার আর মেয়েগুলো পালিয়ে গেল। আমার জিম্মায় রয়ে গেল শুধু স্টোভের বাংকের ওপরে শোয়া বুড়ীটা। খালি হাঁচছে আর ভগবানকে ডাকছে। তখন আপসের কথা শুরু হলো। পোস্টমাস্টার দূর থেকে বলল বুড়ীটাকে ছেড়ে দিতে। কিন্তু আমি লেলিয়ে দিলাম ব্লুচারকে—পোস্টমাস্টার দেখলেই চটে যায় ও। কিন্তু তাও শয়তানটা ভোরের আগে ঘোড়া দিল না। পদাতিক বাহিনীর সেই হতচ্ছাড়া অফিসারটা এসে হাজির, পাশের ঘরে গিয়ে খেলা শুরু করলাম তার সঙ্গে। ব্লুচারকে দেখেছেন?··· ব্লুচার, এদিকে আয়।'

ব্লুচার এল। তাসুড়ের দল আগ্রহের ভানে তাকে দেখল। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল অন্য কিছুর জন্য তারা উৎকণ্ঠ।

'কিন্তু আপনারা খেলছেন না কেন? আমার জন্যে খেলা ফেলে রাখবেন না যেন। আমি মানে একটু বকবকিয়ে গোছের লোক।' বললেন তুরবিন। 'লভ মি লভ মি নট্—খাসা খেলা।'

৩

দুটো মোমবাতি সামনে টেনে লুখনভ টাকা বোঝাই বিশাল একটা বাদামী থলে বার করল। কোনো মন্ত্রানুষ্ঠানের মত আস্তে আস্তে খুলল। দুটো একশো রুবলের নোট তাসের নিচে রাখল।

'দুশো রুবলের ব্যাংক, ঠিক কালকের মতই।' বলল চশমাটা নাকে ঠিক মত বসিয়ে নতুন তাসের প্যাকেট খুলতে খুলতে।

'খুব ভাল।' তার দিকে না তাকিয়ে, তুরবিনের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই জানালো ইলিন।

খেলা শুরু হোলো। লুখনভের খেলায় কোনো ভুল নেই। যন্ত্রের মত নির্ভুল খেলা তার। মাঝে মাঝে থেমে একটা পয়েন্ট আস্তেসুস্থে টুকছে, বা চশমার ওপর দিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলছে, 'আপনার জিৎ।' সবচেয়ে বেশি শব্দ করছে থলথলে জমিদার। তার হিসেব চলে মুখে মুখে, মোটা আঙুলে তাস ধরে, আর তাসে থুথু লাগায়. স্থানীয় সেনাদলের

অফিসার চুপ করে পরিচ্ছন্নভাবে নিজের পয়েন্টগুলো টুকে রাখছে। তাসের কোণ একটু নিচু করে রাখছে টেবিলে! ব্যাংকারের পাশে কোটরস্থ কালো চোখে গ্রীকটি খেলা দেখছে মন দিয়ে, যেন একটা কিছু ঘটার প্রতীক্ষায় আছে সে। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জাভালৃশেভস্কি হঠাৎ খুব চঞ্চল হয়ে পড়লেন; পকেট থেকে লাল বা নীল ব্যাংক নোট বার করে তার ওপরে তাস চাপিয়ে জোরে সেটা চাপড়ে বরাত খোলার জন্যে চেঁচালেন, 'চলে এসো হে, সাতা!' গোঁফ কামড়ে এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর সরিয়ে লাল হয়ে উঠলেন। ভীষণ উত্তেজনা। তাস না আসা পর্যন্ত চলল সেই উত্তেজনা। ঘোড়ার লোমের সোফার পাশে রাখা একটা রেকাবি থেকে বাছুরের মাংস আর শশা খাচ্ছে ইলিন। ব্যস্ত হয়ে জ্যাকেটে আঙুল মুছে একের পর এক তাস ফেলছে। শুরুতে সোফায় বসেছিলেন তুরবিন, ব্যাপারটা তখুনি তাঁর কাছে ধরা পড়ল। উলানের দিকে লুখনভ একদম তাকাচ্ছে না, কোনো কথা বলছে না, মাঝে মাঝে চশমার ফাঁক দিয়ে দেখছে দানগুলো। উলানের তাস বেশির ভাগ হারের।

'ঐ তাসটা পেলে হোতো।' থলথলে জমিদারের তাসের দিকে ইঙ্গিত করে বলল লুখনভ। জমিদার আধ রুবল বাজি ধরে খেলছিল।

'ইলিনেরটা মারুন না—আমার তাস নিয়ে কী লাভ?' বলল জমিদার।

আর সত্যি, অন্যদের তুলনায় ইলিন বার বার হারছে। প্রত্যেক বার হারবার পর অস্থির ভাবে কাঁপা হাতে আর একটা তাস তুলছে সে। সোফা থেকে উঠে তুরবিন গ্রীককে বলে ব্যাংকারের পাশে এসে বসলেন। জায়গা বদলাল গ্রীক, কাউন্ট নতুন জায়গায় এসে লুখনভের হাতে নজর রাখবেন।

'ইলিন!' হঠাৎ ডাকলেন। গলার আওয়াজ স্বাভাবিক হলেও তাতে ঢাকা পড়ল অন্য আওয়াজ। 'ও তাসটা ধরে রাখছ কেন? খেলতে জান না দেখছি।'

'যাই খেলি, সব সমান।'

'ওরকম করলে হারবে। দাও, তোমার হাতে খেলি।'

'না। মাফ কর। আমার হাত কাউকে দিই না। খেলতে ইচ্ছে হলে নিজে বসো।'

'বলেছি তো, নিজে খেলতে চাই না। তোমার হয়ে খেলতাম। এখন হারছো দেখে খারাপ লাগছে।'

'পোড়া কপাল'।

কাউন্ট চুপ করলেন। টেবিলে কনুই রেখে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন লুখনভের হাতের দিকে।

'খুব খারাপ।' হঠাৎ বললেন তিনি।

ফিরে তাকাল লুখনভ।

'অতি—অতি খারাপ।' জোর গলায় বললেন তিনি, লুখনভের চোখে সোজা চেয়ে।

খেলা চলতে লাগল।

'ভাল নয়।' ইলিনের একটা বড় তাস লুখনভ নেওয়ায় তুরবিন বললেন।

'কিসে আপনি এত অসন্তুষ্ট, কাউন্ট?' আলগা গোছের শিষ্ট প্রশ্ন লুখনভের।

'ইলিনের তাসগুলো যেভাবে মারছেন, তাতে। সেটাই খারাপ লাগছে।'

কাঁধ ও ভুরু নড়ল লুখনভের, যার মানে—নিজের বরাত মেনে নিতেই হয়! সে খেলে চলল।

'ব্লুচার, এদিকে আয়।' দাঁড়াতে দাঁড়াতে চেঁচালেন কাউন্ট, 'এই যে এদিকে।' তাড়াতাড়ি যোগ করলেন।

সোফার তলা থেকে লাফিয়ে উঠে এল ব্লুচার প্রভুর কাছে। তার ধাক্কায় আর একটু হলে পড়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় সেনাদলের অফিসার। কুকুরটা লেজ নাচিয়ে গড়গড় করতে লাগল, আর দলটার দিকে এমন ভাবে তাকাতে লাগল, মানে—'কই, কার দোষ?'

তাস নামিয়ে চেয়ার পেছনে ঠেলে দিল লুখনভ। বলল, 'না, এ ভাবে খেলা অসম্ভব। কুকুর একেবারে সইতে পারি না, ঘর-ভর্তি কুত্তা নিয়ে খেলা যায়?'

'বিশেষ এই জাতের কুকুর। ছিনে জোঁকের মতো।' গলা মেলাল স্থানীয় সেনাদলের অফিসার।

'কি, খেলা হবে? না হবে না? মিখাইল ভ্যাসিলিচ?' শুধোল লুখনভ।

'দয়া করে বাগড়া দিয়ো না, কাউন্ট।' অনুরোধ করল ইলিন।

'এদিকে একবার এসো তো।' ইলিনের হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন তুরবিন।

সেখানে কাউন্টের প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শোনা গেল। গলা তুলেই কথা বলা তাঁর অভ্যেস। আর তাঁর গলাটি এমন যে তিন কামরা ছাড়িয়ে শোনা যায়।

'তোমার কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। চশমাওয়ালা ভদ্রলোকটি ঘোড়েল তাস-পাচারে, দেখছ না?'

'আঃ থামো। কী বলছ তুমি?'

'খেলা বন্ধ কর আমি বলছি। আমার কী? অন্য সময় তোমার টাকা আমিই হাতিয়ে নিতাম, কিন্তু তুমি ঠকছ দেখে কেন যেন খারাপ লাগছে। রেজিমেন্টের টাকা সঙ্গে আছে নাকি? খেলার সব টাকা তোমার নিজের, তুমি ঠিক নিশ্চিত তো?'

"হ্যাঁ—ই-য়ে—কেন? তুমি কী ভাবছ?'

'একই রাস্তায় চলনেওয়ালা, তাই জোচ্চোরদের সব কসরৎ আমি জানি। তোমায় বলছি—চশমাওয়ালা লোকটা তাস-পাচারে জোচ্চোর। খেলা বন্ধ কর। সত্যি বলছি। বন্ধু হিসেবে বলছি।'

'আর এক হাত খেলব।'

'আর এক হাতের মানে আমার জানা। বেশ, দেখা যাক।'

ঘরে এল দু'জনে। সেই দানে ইলিন প্রচুর টাকা বাজি ধরল, আর এত বেশি হারল যে অনেক টাকা তার গলে গেল।

টেবিলের মধ্যেখানে হাত রাখল তুরবিন।

'অনেক খেলছ। এখন চলো।'

'এখন যেতে পারি না। আমায় অনুগ্রহ করে ছেড়ে দাও।' বিরক্ত সুরে বলল ইলিন। তুরবিনের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তাস ভাঁজতে লাগল।

'জাহান্নামে যাও তাহলে। হারার যদি এত মজা, তবে হারো। আমায় যেতে হবে। জাভাল্‌শেভস্কি, চলুন মার্শালের ওখানে।'

দুজনে বেরিয়ে গেল। বাকীরা কেউ কোনো কথা বলল না। পায়ের শব্দ আর ব্লুচারের নখের আওয়াজ বারান্দায় মুছে না যাওয়া পর্যন্ত তাস বিলি স্থগিত রাখল লুখনভ।

'কী লোক!' হেসে বলল জমিদার।

'যাক, এখন আর বাগড়া দিতে পারবে না।' দ্রুত ফিসফিস স্বরে বলল স্থানীয় সেনাদলের অফিসার।

খেলা চলতে লাগল।

৪

ভাঁড়ার ঘরটা এই দিনের জন্য পরিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে বাজনাদার, মার্শালের* বাড়ির চাকরবাকর কোটের কফ্ তুলে নির্দিষ্ট সংকেতে বাজাতে শুরু করেছে সাবেকী 'আলেকজান্দ্র, এলিজাভেতা, পলোনেজটি, আর মোমবাতির কোমল স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় জোড়ায় জোড়ায় লোকে বড় হলের পার্কেট-বসানো মেঝেতে হাল্কা হাল্কা পায়ে আসতে আরম্ভ করেছে মার্শালের ক্ষীণদেহী স্ত্রীর হাত ধরে প্রথমে গভর্নর জেনারেল. বুকে ক্যাথরিনের দরবারের তারা-চিহ্ন। তারপরে গভর্নরের স্ত্রী ও মার্শাল। তারপরে বাকী সবাই। নানা দলে গুবের্নিয়ার শাসকদের পরিবারের লোকেরা।

ঠিক সেই সময় কাঁধে পাফ্-বসানো প্রকাণ্ড কলারওয়ালা নীল ফ্রককোট গায়ে, লম্বা মোজা ও নাচের জুতো পায়ে করে ঢুকলেন জাভাল্‌শেভস্কি। গোঁফে, কোটের বুকের ভাঁজে আর রুমালে প্রচুর যুঁইফুলের সেন্ট—ঘরে সেই গন্ধ ছড়িয়ে গেল। সঙ্গে একজন সুদর্শন হুজার। আঁট নীল ব্রিচেস্ পরা। ভ্লাদিমির ক্রুশ ও ১৮১২ সালের মেডেলে অলংকৃত সোনালী কাজ করা লাল টিউনিক তার গায়ে। কাউন্ট তেমন লম্বা নয়। কিন্তু দেহের গড়ন খুব ভাল। নীল চোখ, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল। গাঢ় কটা চুল, কুঞ্চিত, ঘন, গুচ্ছ গুচ্ছ। এ সবে তার চেহারা বিশিষ্ট। বল-ঘরে তাঁর আগমন অপ্রত্যাশিত নয়। হোটেলে তাঁকে দেখে সেই সুন্দর যুবকটি মার্শালকে তার খবর জানিয়েছিল। খবরটা নানা লোকে নানা ভাবে নিয়েছে, প্রতিক্রিয়াটা তেমন ভালো নয়। 'আমাদের নিয়ে হয়তো ঠাট্টা-মস্করা করবে ছোঁড়াটা।'—ভাবলেন মাঝ বয়সের পুরুষ ও মহিলারা। 'যদি আমায় নিয়ে লোপাট হন?' যুবতী ও কিশোরীদের বেশির ভাগেরই মনে হোলো কথাটা।

বালোনেজ শেষ হতেই নৃত্য সঙ্গীরা মাথা ঝুঁকিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে

---

* বিপ্লবের আগের রাশিয়ায় জেলা বা প্রদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের নির্বাচিত নেতা।

বিদায় নিয়ে মেয়েরা মেয়েদের ও পুরুষরা পুরুষদের কাছে পৌঁছতেই গর্বিত ও খুশী জাভাল্‌শেভস্কি কাউন্টকে গৃহ-কর্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল। মার্শাল পত্নীর ভয় পাছে কাউন্ট সবার সামনে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেন। মুখ ফিরিয়ে গর্বিত অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'খুব আনন্দ হোলো। আশা করি নাচবেন।' কথাটা বলেই তাকালেন সন্দিগ্ধভাবে, যেন বলার ইচ্ছে, 'এর পরে কোনো মহিলাকে অপমান করাটা সত্যি ইতরজনোচিত হবে।' কিন্তু কাউন্ট সদয়, মনোযোগী, হাসিখুশি, এবং সুদর্শন—তাতে খুব তাড়াতাড়ি সব সন্দেহের অবসান ঘটল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গিন্নির মুখের ভাব সন্নিহিত জনদের জানিয়ে দিল, 'এ ধরনের ভদ্রলোকদের কী করে বাগে আনতে হয় তা আমার জানা। কার সঙ্গে বাক্যালাপ করছে বুঝে ফেলেছে। দেখবেন, সারা সন্ধ্যে আমার প্রতি মনোযোগ দেবে।'

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গভর্নর, যিনি কাউন্টের বাবার সঙ্গে পূর্ব-পরিচিত ছিলেন তাঁর কাছে এসে সাদরে এক ধারে নিয়ে গেলেন কথাবার্তা বলার জন্য। এতে স্থানীয় ভদ্রলোকদের উদ্বেগ আরো কমল। কাউন্টের কদর বাড়ল তাদের কাছে। একটু বাদে জাভাল্‌শেভস্কি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল বোনের। ঘরে কাউন্ট ঢোকার সময় থেকে নিমেষের জন্যেও তাঁর দিক থেকে বড় কালো চোখ ফেরায়নি গোলগাল এই তরুণী বিধবাটি। অর্কেস্ট্রায় তখন বাজছে ওয়ালজ। তাকে নাচতে অনুরোধ করলেন কাউন্ট। আর তাঁকে নিয়ে যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটা একেবারে উবে গেল তাঁর নাচের গুণে।

'সত্যি দারুণ নাচে।' অশ্বারোহণের উপযুক্ত ব্রিচেস, নীল রং—এতে ঢাকা পা দুটো দেখতে দেখতে বলল এক স্থূলাঙ্গী জমিদার গিন্নি, আর নিজেই গুনতে লাগল, 'এক, দুই, তিন······দারুণ।'

'দারুণ নাচিয়ে! তুখোড় নাচিয়ে!' বলল আর একজন মহিলা। শহরে বেড়াতে আসা এই মহিলাকে ওখানকার সমাজ ঠিক ভব্য মনে করে না। 'জুতোয় কাঁটার ছোঁয়া পর্যন্ত কাউকে লাগছে না, তাজ্জব! চমৎকার কী হাল্কা পা-চালানো!'

গুবের্নিয়ার শ্রেষ্ঠ তিন নাচিয়ে রাহুগ্রস্ত হয়ে গেল কাউন্টের নাচে। এদের একজন হলেন গভর্ণরের শনের মত চুল ঢ্যাঙা অ্যাডজুটান্ট, নাচের ক্ষিপ্রতা ও নৃত্যসঙ্গিনীকে ঘনিষ্ঠভাবে ধরবার জন্যে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। দ্বিতীয় হল

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার। ওয়াল্‌জ্‌ নাচের সময় বিশেষ একটা মোহন ভঙ্গিতে দেহ দোলাতেন তিনি, আর খুব লঘুভাবে দ্রুত পা ঠুকতেন মেঝেতে। তৃতীয়, এক বেসামরিক ভদ্রলোক। নিপুণ নাচিয়ে বলত সবাই তাকে। যে কোনো বল্‌নাচের প্রাণ। বুদ্ধিটা তাঁর তেমন শানানো হয়তো নয়। আর ভদ্রলোক শুরু থেকে শেষ অবধি নেচে যেতেন। পর পর নাচে যোগ দিতে ডাকতেন প্রত্যেকটি মহিলাকে। কদাচিৎ শুধু একবার দাঁড়িয়ে ভিজে রুমালে শ্রান্ত ও খুশিতে উজ্জ্বল মুখ মুছে নিতেন। এঁরা তিনজনই সেদিন নিষ্প্রভ কাউন্টের কাছে। সেদিনকার বল্‌-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী তিনজন মহিলার সঙ্গে কাউন্ট নাচলেন। তাদের একজন সুবৃহৎ ধনী, সুন্দরী, এবং বোকা। আর একজন মাঝারি আকারের—রোগা, তেমন সুন্দরী নয়, পোশাকে মহিমা আছে। আর তিন নম্বরটি ছোটখাটো-চেহারা সাদাসিধে কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

অন্য মেয়েদের সঙ্গেও নাচলেন কাউন্ট অর্থাৎ যাদের দেখতে ভাল তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে। আর সেদিন বল্‌নাচে সুন্দরীর অভাব ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে তাঁর ভাল লাগল জাভাল্‌শেভস্কির বিধবা বোনটিকে। তার সঙ্গে নাচলেন কোয়াড্রিল একৃসেস্‌, আর মাজুরকা। গোড়াতেই কোয়াড্রিলের সময় তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করলেন ; ভেনাস, ডায়না, গোলাপ এবং অন্য কী একটা ফুলের সঙ্গে তুলনা দিলেন। বিধবা মহিলা এসব সৌজন্যে তার সুন্দর শুভ্র গ্রীবা বেঁকিয়ে চোখ নামিয়ে নিজের সাদা মসলিনের ফ্রকের দিকে দৃষ্টি-পাত করল বা হাতপাখাটা এক হাত থেকে অন্য হাতে আনল। 'যান, আপনি ঠাট্টা করছেন, কাউন্ট' এই কথা এবং এই ধরনের অন্য দু'একটি-কথা' বলবার সময় তার ঈষৎ ভাঙা গলায় এমন একটা সরল অকপট ও কৌতুকের সহজ ভাব প্রকাশিত হল যে, তার দিকে চেয়ে চেয়ে কাউন্ট না ভেবে পারলেন না, সত্যি এ যেন মেয়ে নয়, কোনো ফুল। আর গোলাপ নয়, যেন কোন দূর দেশে বরফের আদিম স্তূপে নিঃসঙ্গ বিকশিত রক্তিম শুভ্র গন্ধহীন বনজ ফুল।

এই মেয়েটির অকৃত্রিম সরলতা তার সপ্রাণ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে কাউন্টের মনে এমন অদ্ভুত একটা ছায়া বিস্তার করল যে, কথার ফাঁকে তার চোখে বা হাত ও গলার কোমল রেখার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করবার তীব্র ইচ্ছা কয়েক বার অনেক চেষ্টায় সংযত

করলেন তিনি। কাউন্টের মনে ছাপ ফেলতে পেরেছে বলে বিধবাটি খুশি, কিন্তু কাউন্টের ব্যবহারে এমন কিছু ছিল যাতে সে বিচলিত ও ভীত হল, যদিও কাউন্ট যে শুধু তাকে প্রায় খোশামোদ করার মত মনোযোগ দিচ্ছিলেন তা নয়, প্রচলিত ভব্যতার মাপকাঠিতে অতি ভক্তি দেখাচ্ছিলেন। ছুটে তার জন্যে নিয়ে এলেন ফলের রস, রুমাল তুলে দিলেন, বিধবাকে খুশী করতে আগ্রহী গলগণ্ড-প্রতিম একটি ছোকরা প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে বিধবাটির চেয়ার প্রায় ছিনিয়ে নিলেন, ছোটোখাটো আরো অসংখ্য সেবাকর্ম করলেন।

এ সব চেষ্টা মেয়েটির মনে কোন দাগ কাটছে না দেখে তিনি কৌতুক-কাহিনী দ্বারা তাকে আনন্দ দানের চেষ্টা করলেন। নিশ্চয়তা দিলেন যে তার কথায় তিনি শীর্ষাসন করতে প্রস্তুত বা মোরগের মত ডাকতে, জানলা দিয়ে লাফাতে, অথবা নদীর বরফের ফাটলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। এবার তিনি পূরো সফল হলেন। খুদে বিধবাটি ফূর্তিতে খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে গেল। তার সুন্দর সাদা দাঁত ঝিকিয়ে উঠল। এই রসিক পুরুষটিকে বেশ মনে ধরল মেয়েটির। প্রতিটি মুহূর্তেই আরো বেশি মুগ্ধ হতে লাগলেন কাউন্ট এবং কোয়াড্রিলের শেষে তিনি দস্তুরমত প্রেমে পড়ে গেলেন।

গলগণ্ড-প্রতিম যে ছোকরাটির কাছ থেকে তিনি চেয়ার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, সে এ অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী জমিদারের আঠারো বছর বয়স্ক নিষ্কর্মা ছেলে—মহিলাটির বহুদিনের ভক্ত। যখন নাচ শেষে সে মেয়েটির কাছে এল, তখন নিরাসক্ত ভাব দেখাল সে। কাউন্টের সঙ্গে তার উচ্ছ্বসিত ভাবের এক শতাংশ দেখা গেল না তার মধ্যে।

'বেশ লোক আপনি', বলল মেয়েটি। তার দৃষ্টি কিন্তু কাউন্টের পিঠে, মনে মনে হিসেব করছে তাঁর কোটটা বানাতে ক'গজ সোনালি জরি লেগেছে। 'বেশ লোক! কথা দিয়েছিলেন আমাকে স্লে-তে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, আর কিছু চকোলেট আনবেন।'

'কিন্তু আমি তো এসেছিলাম, আন্না ফিওদরভনা, আপনি বাড়ি ছিলেন না। বাজারের সবচেয়ে ভাল এক বাক্সো চকলেট রেখে গিয়েছিলাম।' বলল ছোকরাটি। তার চেহারাটি লম্বা, কিন্তু গলাটি নিচু ও তীক্ষ্ণ।

'সর্বদা অজুহাত আছে আপনার একটা না একটা। চাই না আপনার চকোলেট। এটা মনে করবেন না যে......'

'আমার সম্পর্কে আপনার মন কিছু বদলেছে দেখছি, আন্না ফিওদরভনা, আর সেটা কেন তাও জানি। এটা কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়।' ছোকরাটির আরো কিছু বোধহয় বলবার ছিল, কিন্তু মানসিক আন্দোলনে তার ঠোঁট এমনভাবে কাঁপতে লাগল যে মুখে কথা যোগাল না।

তার কথা আন্না শুনছিল না। সে তুরবিনকে দেখছিল।

গৃহকর্তা মার্শাল শক্ত-সমর্থ ও দন্তহীন, রাজকীয় দর্শন, বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি কাউন্টের কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, ইচ্ছে করলে তিনি পড়ার ঘরে গিয়ে ধূম ও মদ্য পান করতে পারেন।

তুরবিন বেরিয়ে গেল। আর আন্নার মনে হোলো হল্-ঘরটা একদম শূন্য। তখন একজন রোগা গোছের বয়স্কা কুমারী বান্ধবীর হাত ধরে সে চলে গেল সাজ-ঘরে।

'ওকে পছন্দ হয়েছে?' শুধোল আইবুড়ো মেয়েটি।

'কী ভাবে যে পেছনে লেগে আছে, মাগো!' আয়নার কাছে গিয়ে সেদিকে দেখতে দেখতে বলল আন্না।

তার মুখ উজ্জ্বল, এমন কি আরক্তিম, চোখে হাসি। নির্বাচনের সময় দেখা ব্যালে-নাচিয়েদের অনুকরণে পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খেল একটা। তারপর গভীর ভরাট গলায় মধুর ভাবে হেসে গোড়ালি ঠুকে লাফ দিল একটা।

'আর কী ভাবছিস? আমার কাছে একটা অভিজ্ঞান চেয়েছে। কিন্তু ও পাবে না একটা জিনিসও।' কনুই অবধি লম্বা নরম চামড়ার দস্তানায় ঢাকা একটা আঙুল তুলে শেষ দুটো কথা বলল একটু সুর করে।

পাঠ-ঘরে মার্শাল নিয়ে গেলেন তুরবিনকে। সেখানে বহু রকমের মদ— ভোদকা, লিকিওর, শ্যাম্পেন এবং পিরিচ ভর্তি চাট জাতীয় অনুষঙ্গ। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর ঝাপসা। স্থানীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা বসে বা পায়চারি করে নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা করছে।

নব-নির্বাচিত পুলিশ ক্যাপ্টেন এর মধ্যেই বেশ মাতাল। সে বলছিল, 'আমাদের উয়েজদের অভিজাতরা ওকে নির্বাচিত করে সম্মান দেখিয়েছে বলে সবায়ের সামনে কাজে ফাঁকি দেওয়ার অধিকার নেই ওর, কখনো ছিল না......'

কাউন্ট আসতে কথায় বাধা পড়ল। আলাপ করতে সবাই দাঁড়াল।

পুলিশ ক্যাপ্টেন বিশেষ হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করে বার বার অনুরোধ করল যেন কাউন্ট বলনাচের পর নতুন হোটেলে তার দেওয়া সাপার পার্টিতে আসেন। সেখানে গাইবে জিপসি কোরাস। নিশ্চয়ই যাবেন—এই সম্মতি জানিয়ে কাউন্ট কয়েক গেলাস শ্যাম্পেন শেষ করলেন তার সঙ্গে।

'কিন্তু আপনারা নাচছেন না কেন!' বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে কাউন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

পুলিশ ক্যাপ্টেন হেসে বলল, 'নাচিয়ে নই আমরা। বোতল আমাদের ভাল লাগে বেশি। আর ওরা সবাই, ঐ মেয়েরা আমার চোখের সামনে বড় হয়েছে, কাউন্ট। এক-আধ সময় একৃসেস নাচতে পা বাড়াই, কাউন্ট, ……এখনো সে ক্ষমতা আছে।'

'চলুন তাহলে, এখনি পা বাড়াই।' বললেন তুরবিন। 'জিপসিদের কাছে যাওয়ার আগে আমোদ একটু জমিয়ে নেওয়া যাক।'

'চলুন। গৃহকর্তাকে খুশি করা যাক।'

তিনটি লাল মুখো জমিদার পাঠঘরে বসে বলনাচের শুরু থেকে মদ খাচ্ছিল। তারা নরম কালো চামড়ার বা সিল্কের যার যার দস্তানা পরে কাউন্টের সঙ্গে বল-ঘরে যেতে পা বাড়িয়েছে, আর সেই সময় বাধা দিল গলগণ্ড-প্রতিম ছোকরাটি। ফ্যাকাশে ঠোঁট। কোনোক্রমে চোখের জল চেপে সে এগিয়ে এল তুরবিনের কাছে।

'ভেবেছেন কি? কাউন্ট বলে লোকজনকে ঠেলা মেরে হাঁটবেন, যেন এটা একটা বাজার পেয়েছেন।' কষ্টে নিশ্বাস নিয়ে সে বলল। 'অভদ্র ব্যবহার…আর…আর……'

আবার ঠোঁট কেঁপে উঠল! কথায় বাধা পড়ল আপনা থেকেই।

'কী!' ভুরু কুঁচকে চেঁচিয়ে উঠলেন কাউন্ট। 'কী বলছ হে ছোকরা?' তার হাত দুটো চেপে হেঁকে বললেন তিনি। মোচড় দিলেন হাতে। অপমানে ততটা নয়, যতটা আতঙ্কে লাল হয়ে উঠল ছোকরার মুখ। 'ডুয়েল লড়বার ইচ্ছে? তাহলে আমি তৈরি।'

তুরবিন ওর হাত ছেড়ে দিতেই দুটি ভদ্রলোক ছোকরার হাত ধরে নিয়ে গেল পেছনের দরজায়।

'আপনার মাথা বিগড়ে গেছে নাকি? খুব টেনেছেন নিশ্চয়ই। বলে দেবো আপনার বাবাকে, কী হয়েছে আপনার?' তারা জিজ্ঞেস করল।

'মোটেই নেশার কথা নয়। কিন্তু ও লোকজনকে ঠেলে ঠেলে চলে। মাফ পর্যন্ত চায় না। লোকটা শূয়োর, একদম শূয়োর।' সবার সামনে কেঁদে ফেলল ছোকরা।

ওরা কথায় কর্ণপাত না করে ওকে বাড়ি নিয়ে গেল।

'কাউন্ট, যেতে দিন, যেতে দিন।' পুলিশ ক্যাপ্টেন ও জাভাল্‌শেভস্কি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করল। 'ও তো একরত্তি ছোঁড়া। এখনও বাপের ঠেঙানি খায়। বয়স ষোলো। কী জানি কী হয়েছে ওর! খেপা কুকুরে কামড়েছে নিশ্চয়ই। ওর বাবা খুবই সম্মানী লোক—আমাদের ক্যাণ্ডিডেট।'

'অপমানের প্রতিশোধ চায় না। বেশ, তাহলে জাহান্নামে যাক্।'

ঠিক আগের ফুর্তিতেই তিনি বল-ঘরে গিয়ে সুন্দরী বিধবার সঙ্গে নাচলেন একসেস। পাঠঘর থেকে যে ভদ্রলোকেরা এসে নাচলেন, তাদের নাচ দেখে হাসলেন প্রাণ খুলে। জোড়া জোড়া নাচিয়েদের মধ্যে পা পিছলে পুলিশ ক্যাপ্টেন যখন পপাত হলেন, তখন তিনি এমন গর্জন করে উঠলেন যে সারা বল-ঘর কেঁপে উঠল।

৫

কাউন্ট যখন পাঠঘরে তখন তাঁর প্রতি উদাসীন হওয়া উচিত এই বিবেচনায় আন্না ভাইয়ের কাছে নিরাসক্তভাবে শুধোল, 'দাদা, যে হুজারটি আমার সঙ্গে নাচলেন, তিনি কে?'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন এইটে বোঝাতে যে তুরবিন একজন কী মহান হুজার। সে যোগ করল যে শুধু পথে টাকা চুরি গেছে বলে শহরে থেকে গিয়ে ও এসেছে এই বলনাচে এবং সে কাউন্টকে একশো রুবল ধার দিয়েছে। তবে এ টাকাটা সামান্য। বোন কি দুশো রুবল ধার দিতে পারে? একথা যেন বোন কাউকে না বলে। বিশেষত কাউন্টকে। আন্না সন্ধ্যায় দাদাকে টাকা পাঠিয়ে দিতে স্বীকৃত হল। আর ব্যাপারটা গোপন রাখবে এ কথাও দিল। কিন্তু একসেস নাচের সময় কাউন্টের যত টাকা দরকার তত টাকা দেওয়ার এক অদম্য বাসনা তাকে ভীষণ ভাবে পেয়ে বসল। বলার ইচ্ছে হল। কিন্তু বলার সাহস আনতে সময় বয়ে গেল। সে লজ্জায় লাল হল এবং দোনামনা করতে লাগল। কিন্তু অবশেষে প্রবল চেষ্টায় বিষয়টা তুলল।

'দাদার কাছে শুনলাম, পথে আপনার মুস্কিল হয়েছে কাউণ্ট এবং এখন আপনি নিঃস্ব। টাকার দরকার হলে, আমার কাছ থেকে অবশ্যই নেবেন ? নিলে বড় খুশি হব।'

কথাগুলো বলেই থাবড়িয়ে লাল হয়ে গেল আন্না। কাউণ্টের মুখ থেকে আনন্দের দীপ্তি দপ করে নিবে গেল।

'আপনার দাদা একটা নিরেট বোকা।' রূঢ়ভাবে বললেন কাউণ্ট। 'জানেন নিশ্চয়ই, পুরুষ পুরুষকে অপমান করলে ডুয়েল হয়। কিন্তু কোনো মেয়ে পুরুষকে অপমান করলে কী হয় জানেন ?'

আন্না বেচারী বুঝল, লজ্জায় তার কান ও গলা পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে। চোখ নামাল সে। আর একটিও কথা যোগালো না তার মুখে।

'সবার সামনে প্রকাশ্যে মেয়েটিকে চুমু খাওয়া হয়।' কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন কাউণ্ট। 'দেখি আপনার হাতে চুমু খাই।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন কোমল স্বরে, মহিলাটির মনের গোলমেলে অবস্থায় করুণা হোলো তাঁর।

'ওঃ। কিন্তু এখন নয়।' গভীর শ্বাস ফেলে বলল আন্না।

'কখন ? কাল তো সকাল-সকাল চলে যাব।...তাছাড়া ওটা তো আপনার কাছে আমার পাওনা।'

'কিন্তু এই অবস্থায় আমি পাওনাটা দিতে পারছি না।' হেসে বলল আন্না।

'আজ রাতে আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ দিন যাতে আমি আপনার হস্তচু ন করতে পারি। কিন্তু সুযোগটা আমি নিজেই করে নেব।'

'কী করে ?'

'সেটা আমি ভাবব'। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। আপনার আপত্তি নেই তো ?

'না।'

একসেস শেষ হলো। তারা আর একবার মাজুরক নাচল। এই নাচের মধ্যে কাউণ্ট অত্যাশ্চর্য কসরৎ দেখালেন। রুমাল ধরে, এক হাঁটুর ওপর বসে ওয়ারস-র সেই বিশেষ কায়দায় দুই পায়ের জুতোর কাঁটা ঠুকে কাউণ্ট সবাইকে এমন তাক লাগিয়ে দিলেন যে তাদের টেবিল ছেড়ে বুড়োরা এল নাচ দেখতে, হার মানলেন সেরা নাচিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি।

নৈশভোজ শেষ হোলো। 'ঠাকর্দা' নাচ নাচা হোলো। বিদায় নিতে শুরু করল অতিথিরা! সারাক্ষণ খুদে বিধবার দিকে চোখ ছিল কাউন্টের। বরফের ফাটলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত—তাঁর এই কথাটি মিথ্যে নয়। কোনো খেয়াল বা প্রেম বা একগুঁয়েমি যাই বলা যাক, তখন সেই সন্ধ্যায় তার মন একটিমাত্র বাসনায় সংহত—মহিলার সঙ্গে দেখা করা ও তাকে ভালবাসা। আন্না গৃহকর্ত্রীর কাছে বিদায় নিচ্ছে দেখে তিনি চাকরের ঘরে ছুটলেন। তারপর ওভারকোট না পরেই সেখান থেকে দৌড়লেন উঠোনে যেখানে গাড়িগুলো দাঁড়িয়েছিল।

'আন্না ফিওদরভনা জাইৎসেভার গাড়ি আনো।' হাঁক দিলেন তিনি। লণ্ঠন-বসানো চার সীটের একটা উঁচু গাড়ি এগিয়ে এলো।

'থামাও।' এক হাঁটু তুষারের মধ্যে দিয়ে ছুটে গেলেন তিনি কোচম্যানের দিকে।

'কী চাই?' ফিরে জিজ্ঞেস করল সে।

'ভেতরে ঢুকব।' চলতি গাড়ির দরজা খুলে ওঠবার চেষ্টা করছিল কাউন্ট। 'থামা বলছি, গর্দভ কোথাকার।'

সামনের দুই ঘোড়ার চালককে কোচম্যান হেঁকে বলল, 'ভাসকা, থাম।'

ঘোড়োগুলোর লাগামে টান পড়ল।

'অন্য লোকের গাড়িতে উঠবেন কেন? এ গাড়ি শ্রীমতী আন্না ফিওদরভনার, আপনার নয়, হুজুর।'

'চুপ কর, গাধা। একটা রুবল এই নে। নেমে দরজাটা বন্ধ করে দে তো।' বললেন কাউন্ট।

কোচম্যান নড়ল না। তখন তিনি নিজেই পাদানিটা তুলে জানালা খুলে কোনক্রমে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। ভেতরে পোড়া লোমের গন্ধ আর ছাতা-পড়া গন্ধ। অন্য সব পুরোনো গাড়ির মতই, বিশেষ, যেখানে গদিতে সোনালি জরির কাজ থাকে সেখানে এ গন্ধ থাকবেই। হালকা বুট আর ব্রিচেসে ঢাকা কাউন্টের পা দুটো হাঁটু পর্যন্ত ভিজে। তুষারে সিক্ত —ঠাণ্ডায় কনকন করছে। শরীর কাঁপছে ঠকঠক করে। ওপরে নিজের আসনে বসে কোচম্যান গজগজ করছে। বোধহয় নামার জোগাড় করছে। কিন্তু কাউন্টের কানে কিছু ঢুকছে না। মুখটা জ্বলছে, বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। হলদে চামড়ার পেটি চেপে ধরে পাশের জানলা দিয়ে

মাথা বার করলেন—একটি আশায় গোটা জীবনটা সংহত। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না। বারান্দায় কার যেন গলা শোনা গেল—'শ্রীমতী ভ্রাইৎসেভার গাড়ি নিয়ে এসো।' লাগামটা আস্তে আছড়ালো কোচম্যান। উঁচু স্প্রিং-এ গাড়িটা দুলে উঠল। বাড়ির আলোকিত জানালাগুলো একের পর এক গাড়ির জানালা পেরিয়ে গেল।

'আর্দালিকে বলিস না, বদমাস।' জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে কোচম্যানকে বললেন কাউন্ট। 'বললে চাবুক লাগাবো। না বললে—দশ রুবল।'

সশব্দে জানলাটা বন্ধ করতেই গাড়িটা একটা টাল খেয়ে থেমে গেল। এক কোণে গুটিয়ে গেলেন কাউন্ট, নিশ্বাস রুদ্ধ, প্রায় চোখ বুঁজলেন—আশাভঙ্গের ভয়টা প্রবল।

দরজা খুলে গেল। পাদানির ধাপ বসানোর শব্দ একের পর এক। মহিলার গাউনের খসখস শব্দ। ছাতা-গন্ধের গাড়িতে যুঁইফুলের গন্ধ। সিঁড়িতে খুদে পায়ের লঘু আওয়াজ—আন্না নিজের কোটের প্রান্তে কাউন্টের পা ঘষটে রুদ্ধশ্বাসে নিঃশব্দে বসল তাঁর পাশের সীটে।

তাঁকে আন্না দেখেছিল কিনা তা কেউ বলতে পারবে না—এমন কি আন্নাও নয়। কিন্তু যখন তিনি তার হাত ধরে বললেন, 'এবার তাহলে আপনার হাতে চুমু খাই', তখন বিশেষ ভয় দেখা গেল না, কোনো কথা বলল না সে, আর তক্ষুণি দস্তানার বেশ ওপরে তার বাহু চুমুতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল।

'কিছু বলুন। রেগে যান নি তো?' শুধোলেন কাউন্ট।

আন্না নিজের কোণে আরো একটু কুঁচকে গেল। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ আপাত কারণ বিনা কেঁদে ফেলল, আর তার মাথা ঝুঁকে পড়ল কাউন্টের বুকে।

৬

নবনির্বাচিত পুলিশ ক্যাপ্টেন, আর তার দলবল, অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার ও অন্য ভদ্রলোকেরা সবাই পান করছিলেন, আর নতুন সরাই-খানায় জিপসিদের গান শুনছিলেন। এমন সময় আন্নার বিগত স্বামীর

ভালুক-লোমের আস্তর দেওয়া নীল রঙের বনাতের ক্লোক গায়ে চাপিয়ে কাউণ্ট এসে যোগ দিলেন।

'এই যে হুজুর, আপনার আসার আশা আমরা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিলাম।' কালো-চুল টেরা-চোখ এক জিপসি বলল। সে প্রবেশপথে ছুটে এসে কাউণ্টকে অভ্যর্থনা করে তার ওভারকোট খুলতে সাহায্য করল। 'লেবেদিয়ানের পর আর আপনার দেখা পাই নি।...স্তেশা তো আপনার জন্যে শোক করছে......'

স্তেশাও ছুটে এল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সাবলীল তরুণী জিপসি মেয়ে। বাদামি গালে উষ্ণ লালিমা। গভীরে বসানো কালো চোখের ঔজ্জ্বল্য দীর্ঘ চোখের পাতার ছায়ায় কোমল।

'ওঃ! খুদে কাউণ্ট। পেয়ারের কাউণ্ট। কী মজা!' খুশিতে হেসে বিড বিড করল সে।

এমন কি ইলিউশ্‌কা খুশির ভান করে ছুটে এল দেখা করতে। বুড়ি আর মাঝবয়সী মেয়েরা, তরুণীরা, লাফিয়ে এসে ঘিরে ধরল তাঁকে। কারো কারো দাবী যে তাদের ছেলেদের ধর্মবাপ হয়েছে বলে তাদের সঙ্গে কাউণ্টের আত্মীয়তা আছে। আবার অনেকে ভাবে ক্রুশ বিনিময় করেছেন বলে তিনি তাদের নিকট জন।

সব যুবতী মেয়েদের ঠোঁটে চুমু খেল। জমিদারবাবুরাও তাঁকে দেখে খুশি হলো। আরো বেশি খুশি এই জন্য যে চরমে উঠে এখন ভাঁটার দিকে নামছে হৈ-হুল্লোড়। অতিরিক্ত পানভোজনের পর অরুচি বোধ শুরু হয়েছে সবার। স্নায়ুকে উত্তেজিত করবার শক্তি আর নেই মদের, পাকস্থলীর বিড়ম্বনা ঘটাচ্ছে শুধু। যতটা শক্তিতে কুলোয়, ততটা ফূর্তি করে নিয়ে এখন সবাই পরস্পরের কাছে একঘেয়ে। সব গান শেষ, সেগুলো এখন তালগোল পাকিয়ে আনছে বিশৃংখলা ও অপচয়ের চিহ্ন। কেরদানি যত নতুন বা দুঃসাহসীই হোক, সবাই জেনেছে যে এতে আর মজা পাওয়া শক্ত। একটা বুড়ীর পায়ের কাছে মেঝেতে বেয়াড়াভাবে শায়িত পুলিশ অফিসারটি।

'শ্যাম্পেন!' পা ছুঁড়ে চেঁচাল সে। 'কাউণ্ট এসেছেন, শ্যাম্পেন। উনি এসেছেন, শ্যাম্পেন আনো, এক চৌবাচ্চা শ্যাম্পেন চাই—তাতে আমি চান করব। অভিজাত ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের মত বাছাই-করা,

জেরা মানুষদের মধ্যে আমার কী ভাল লাগে। স্তেশা! "খোলা পথ" গানটা গাও তো।'

নেশা ঐ রকমই হয়েছে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের, কিন্তু তাঁর প্রকাশ ভিন্ন। সোফার একপাশে লিউভাশা নামের একটি লম্বা সুন্দরী জিপসি মেয়ের খুব কাছ ঘেঁসে বসে তিনি চোখ মিটমিট করছেন আর মাথা ঝাঁকুনি দিচ্ছেন—অর্থাৎ নেশাটা একটু কাটাতে চাইছেন। আর তার সঙ্গে পালাবার মতলব দিচ্ছেন ফিসফিস করে। হেসে লিউভাশা শুনছে তাঁর কথা, যেন তাঁর কথাটা মজার ও একটু করুণ, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সামনের চেয়ারের ওদিকে দাঁড়ানো তার স্বামী টেরা-চোখ সাশকার দিকে, প্রেম নিবেদনের জবাবে এবার সে অফিসারকে বলল যেন তিনি কিছু ফিতে আর সেন্ট কিনে দেন তাকে, কিন্তু কেউ যেন জানতে না পারে।

'হুররা।' কাউন্ট ঘরে ঢুকতেই চেঁচালেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার।

চোখে মুখে এখন একটা উৎকণ্ঠার ভাব সেই সুন্দর যুবকটির। সে এক অস্বাভাবিক দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারি করছে আর 'হারেম বিদ্রোহে'র একটা সুর ভাঁজছে।

বাড়ির কর্তাগোছের বয়স্ক ব্যক্তিটি অভিজাত ভদ্রলোকদের অনুরোধে জিপসিদের প্রতি লোভার্ত হয়ে এসেছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল, তিনি না গেলে একদম জমবে না ব্যাপারটা। তাহলে ওদেরও বরং থেকে যাওয়া ভালো। পৌঁছেই তিনি হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় শায়িত, কারুর নজর নেই তাঁর দিকে। একজন সরকারী কর্মচারী ফ্রককোট খুলে পা টেবিলে তুলে উপবিষ্ট। নিজে কী রকম হুল্লোড়বাজ এটা প্রমাণ করবার জন্য তিনি নিজের চুল খুব এলোমেলো করে দিয়েছেন। কাউন্ট ঘরে আসতেই তিনি শার্টের কলার খুলে টেবিলে আরো একটু উঁচু হয়ে চেপে বসলেন। কাউন্টের আবির্ভাবে সবাই যেন আগের চেয়ে আর একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল।

জিপসিরাও এতক্ষণ আলসে অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারা এখন আবার গোল হয়ে বসল। একক-গায়িকা স্তেশাকে কোলে বসিয়ে কাউন্ট হুকুম দিলেন আরো শ্যাম্পেনের।

ইলিউশকা গীটার হাতে স্তেশার সামনে বসল, এবং 'প্লিয়াসকা' শুরুর

ইঙ্গিত করল, অর্থাৎ একটা নিয়ম মেনে এই জাতীয় জিপসি গান হবে—'যখনই আমি রাস্তা দিয়ে যাই,' 'ওহে হুজার বাহাদুরেরা,' 'শোনো আর বোঝো'। স্তেশা চমৎকার গাইল। ওর গমকে আসা ভরাট মিহি নমনীয় গলা, মন-মাতানো হাসি, কামনাতীব্র সহাস্য কটাক্ষপাত, গানের তালে আপনিই তাল-ঠোকা ছোট ছোট পা, কোরাসের প্রারম্ভে ক্ষণস্থায়ী বন্য চীৎকার। সব মিলিয়ে মনের সেই তারে ঝংকার তোলে যা কদাচিৎ স্পষ্ট ও কম্পিত হয়, বোঝা যায় যে, যা কিছু ও গায় প্রাণ ঢেলে গায়। গিটারে সুর দিতে দিতে ইলিউশ্কা গানের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। সেটা বোঝা যাচ্ছে পিঠ ও পায়ের ছোটখাট আন্দোলনে, মৃদু হাসিতে, তার গোটা সত্তায়। গানের তালে তালে মাথা নেড়ে স্তেশার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনছে এত মনোযোগ আর এত উৎকণ্ঠায় যেন এর আগে কখনো শোনে নি গানটা। প্রত্যেকবার গানের ধুয়োয় সুর মিলিয়ে যেতে সোজা হয়ে বসে, পৃথিবীর সব কিছুর ঊর্ধ্বে মনে হচ্ছে নিজেকে এমনভাবে সগর্বে ও সজরে হাঁটু দিয়ে ধাক্কায় গিটারটা তুলে চট করে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল সে আর নিজে মাটিতে পা ঠুকে, চুল ঝাঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিল কোরাসের দিকে। শরীরের সমস্ত পেশীর প্রসারণে আবার নৃত্যের শুরু। বেজে ওঠে কুড়িটি বলিষ্ঠ গলা, সবার চেষ্টা সবচেয়ে অভিনব ও নিজস্ব ভঙ্গিতে সুর মিলিয়ে দেওয়ার। বুড়ীরা চেয়ারে বসেই লাফাচ্ছে, রুমাল নাড়াচ্ছে, গানের তালে তালে দাঁত বের করে চেঁচিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে অন্যের গলার আওয়াজ। চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে মাথা হেলিয়ে গলার শির ফুলিয়ে ভারি গলা ছেড়ে গাইছে পুরুষরা।

উঁচুতে কোনো সুর স্তেশা ধরলেই যেন তাকে সহায়তা করতে ইলিউশকা গিটারটা কাছে ধরছে তার, আর স্তেশার নিচু পর্দার গমক শুনে সুন্দর যুবকটি উচ্ছ্বাসে চেঁচাচ্ছে।

দুনিয়াটা এবার এগিয়ে এল—নাচের সুর গাইবে। তার কাঁধ কাঁপছে বুক কাঁপছে। কাউন্টের কাছে এসে ঘুরপাক খেল। তারপর ভেসে চলে গেল ঘরের মাঝে। তুরবিন লাফ মেরে উঠে গায়ের জ্যাকেট দিলেন ছুঁড়ে ফেলে। নাচ শুরু করলেন তার সঙ্গে। তাঁর পায়ের তুখোড় কসরতে জিপসিরা পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে তারিফের হাসি হাসতে লাগল।

তুর্কীসুলভ ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং রাখার ভঙ্গিতে পুলিশ ক্যাপ্টেন বুক ঠুকে চেঁচিয়ে বলল, 'সাবাস!' তারপর কাউন্টের পা টেনে গোপনে জানালেন যে তিনি দু'হাজার রুবল নিয়ে এখানে এসেছিলেন, এখন পকেটে আছে পাঁচ শো মাত্র। আর এখন সে যা খুশি তাই করবে—অবশ্য যদি কাউন্টের অনুমতি পায়।

কর্তা লোকটি জেগে বললেন, বাড়ি যাবেন। কিন্তু তাঁকে যেতে দেওয়া হল না। সুন্দর যুবকটি একটি জিপসি মেয়েকে মিনতি করতে লাগল তার সঙ্গে ওয়ালজ্ নাচবার জন্যে। কাউন্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব জানাবার জন্য অতি-আগ্রহী অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন কাউন্টকে।

বললেন, 'ওহে প্রিয় বন্ধু, কী কাজে আমাদের ছেড়ে গিয়েছিলে, অ্যাঁ?'

কাউন্ট জবাব দিলেন না। বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মন পড়ে আছে অন্য কোথাও।

'কোথায় গিয়েছিলে? চালাক লোক বাবা তুমি। আমি জানি তুমি কোথায় গিয়েছিলে।'

এই গায়ে-পড়া ভাবে তুরবিন বিরক্তিবোধ করছিল। না হেসে, কথা না বলে, তিনি ঐ অফিসারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, হঠাৎ খুব অভদ্র আর অপমানকর খিস্তি করলেন অফিসারকে। সে থতিয়ে গিয়ে প্রথমটা বুঝতেই পারল না এটাকে ঠাট্টা বা ফাজলামি হিসেবে ধরবে কিনা। অবশেষে তিনি হেসে তাঁর জিপসি মেয়েটির কাছে গেলেন এবং তাকে আশ্বস্ত করলেন যে আগামী ইস্টারের পরেই তাকে বিয়ে করবেন।

গোটা দলটা আর একটা গান গাইল, তারপরে আর একটা। আরো কিছু নাচ হোলো। একে অপরের সম্মানে গান গাইল এবং ধরে নিল যে একটা খাসা সময়ের মধ্যে আছে তারা। শ্যাম্পেনের স্রোতে ভাঁটা পড়ল না এক দণ্ড। কাউন্ট এক গাদা মদ গিললেন। চোখ ঝাপসা, কিন্তু পা টলছে না। আগের চেয়েও যেন ভালো নাচছেন। কথা বলছেন—স্খলিত-স্বরে মোটেই নয়। জিপসিদের গানেও তিনি গলা মেলাচ্ছেন। আর স্তেশা যখন গাইল 'প্রেমের পাখায় কোমল কাঁপন', তখন তিনি সুরের সামঞ্জস্য আনছেন।

গানের মধ্যেখানে সরাইখানার মালিক এসে হাজির। অতিথিদের

চলে যেতে অনুরোধ করল সে। কারণ, রাত ভোর প্রায়—তিনটে বেজে গেছে। কাউণ্ট তার গর্দান ধরে হুকুম দিলেন উবু হয়ে বসা আর ওঠার একটা নাচ নাচতে। সে রাজী হল না। কাউণ্ট একটি শ্যাম্পেনের বোতল এক ঝটকায় হাতে নিলেন, আর লোকটাকে উলটে দিলেন। তারপর সবাই আহ্লাদ করে চেপে ধরতেই কাউণ্ট গোটা বোতল তার গায়ে ঢেলে দিলেন।

ফর্সা হয়ে আসছে। কাউণ্ট ছাড়া বাকী সবাই ফ্যাকাশে ও ক্লান্ত।

হঠাৎ তিনি উঠে বললেন, 'আমার মস্কোয় যাওয়ার সময় হোলো। মশাইরা, আমার সঙ্গে হোটেলে আসুন—আমায় বিদায় জানাবেন। আর একসঙ্গে একটু চা খাওয়া যাবে।'

সবাই মত দিল—ঘুমন্ত কর্তা ব্যক্তিটি ছাড়া। তাঁকে ওখানে পরিত্যাগ করা হল। তিনটি স্লেজে সবাই ঠেসাঠেসি করে উঠে চলল হোটেলে।

৭

অতিথি ও জিপসিদের নিয়ে কাউণ্ট বৈঠকখানায় ঢুকতে ঢুকতেই হাঁক দিলেন, ঘোড়া জোতো।'......সাশা। জিপসি সাশা নয়। আমার সাশা। পোস্টমাস্টারকে বলিস খারাপ ঘোড়া দিলে ও ব্যাটার খাল খিঁচে নেব। আর চা নিয়ে আয়, জাভাল্‌শেভস্কি, তুমি চায়ের ব্যবস্থাটা দেখ, আমি একবার ইলিনের ঘরে গিয়ে দেখে আসি ওর হাল কী।'

তুরবিন বারান্দা দিয়ে উলানের ঘরের দিকে গেল।

ইলিন সবে খেলা শেষ করেছে। শেষ কপর্দক পর্যন্ত হেরে ঘোড়ার লোমের ছেঁড়া সোফায় উবুড় হয়ে শুয়ে একটা করে লোম টেনে বার করে মুখ দিয়ে কামড়ে থু থু করে ফেলে দিচ্ছে। টেবিলে—তাস ছড়ানো, দুটো মোমবাতি। একটা বাতি একেবারে নিচে জ্বলছে—কাগজ প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়। বাতির আলো অসহায়ভাবে পাল্লা দিচ্ছে জানলা দিয়ে আসা ভোরের আলোর সঙ্গে। উলানের মন থেকে সব চিন্তা চলে গেছে। জুয়ার ঘন আচ্ছন্নতায় চাপা পড়ে আছে মনের আর সব বৃত্তি। অনুশোচনাও নেই। একবার ভাববার চেষ্টা করলে—এবার? কানাকড়িও নেই, এ জায়গাটা ছেড়ে বেরোবে কী করে? রেজিমেণ্টের পনেরো হাজার রুবল ফেরত দেবে কী করে? কম্যাণ্ডার কি বলবেন? মা কী বলবেন?

বন্ধুরাই বা কী বলবে ? সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেল, বিতৃষ্ণা এল নিজের ওপর। সব কথা মন থেকে দূর করবার জন্য হঠাৎ উঠে পায়চারি শুরু করল। মেঝের তক্তার ফাটলগুলোতে কষ্ট করে পা ফেলতে লাগল। আর একবার খুঁটিয়ে ভাবল গোটা খেলার খুঁটিনাটি। মনে পড়ল, একবার প্রায় জিতেছিল আর একটু হলেই, হাতে এসেছিল নলা আর গোলাম। বাজি রেখেছিল দু' হাজার রুবল। ডানে—রানী। বাঁয়ে—টেক্কা। ডানে—রুইতনের রাজা, আর সব হার হয়ে গেল। ছক্কাটা ডানে রুইতনের রাজা বাঁয়ে থাকলে হারের টাকা সব উশুল হত, আর সবকিছু বাজি ধরে জিতে নিত আবো পনেরো হাজার রুবল। রেজিমেন্ট কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে কেনা যেত একটা পোশাকী ঘোড়া, তাছাডা আরো দুটো ঘোডা, আর একটা ফিটন। তারপর ? সত্যি চমৎকার হোতো তাহলে।

সোফায় আবার শুয়ে লোমের কুচি চিবোতে লাগল সে।

'সাত নম্বর ঘরে ওরা গান গাইছে কেন ?' ভাবল সে। 'তুরবিন নিশ্চয়ই আমোদ করছে। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মদ খেয়ে মন ভালো কবলে হয়।'

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন কাউন্ট।

সব খুইয়েছ তো ?'

'আমি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকব।' ভাবল ইলিন। 'নইলে কথা বলতে হবে। আর আমি বড ক্লান্ত।'

কিন্তু তুরবিন কাছে এসে ওর মাথায় মৃদু চাপড মারলেন।

'তাহলে ? সব খুইয়েছ তো, বন্ধু ? সব ? কথা বল।'

ইলিন কোন উত্তর দিল না।

কাউন্ট তার হাত ধরে টানলেন।

'হ্যাঁ, খুইয়েছি। তাতে তোমার কী।' বিডবিড করল ইলিন। তার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও ঔদাসীন্য। পাশও ফিরল না।

'সব ?'

'হ্যাঁ। তাতে কী ? সব। তাতে তেমার কী ?'

'শোন। বন্ধু হিসাবে আমায় সব খুলে বল।' বললেন কাউন্ট। মদ তাঁর ভেতরকার কোমল ভাবকে জাগিয়ে দিয়েছে। তিনি ইলিনের মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। 'আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি। সত্যি কথা

বল,—রেজিমেন্টের টাকাও খুইয়েছ? তোমার কিছু উপকার করতে পারি। খুব দেরী হয়ে যাওয়ার আগে বলে ফেল। রেজিমেন্টের টাকা ছিল?'

ইলিন লাফ মেরে সোফা থেকে উঠল।

'যদি সত্যি শুনতে চাও, তাহলে বোলো না......যেন......যেন...... বোলো না—একটিও কথা বোলো না আমার সঙ্গে। একটা জিনিসই আমার জীবনে আর বাকী আছে—মাথায় গুলি চালানো। সত্যিকার হতাশায় সে কেঁদে উঠল। দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। যদিও একটু আগে সে পোশাকী ঘোড়ার কথা ভাবছিল।

'ওঠো, তুমি মেয়েদের মত করছ। এ রকম বিপদের মধ্যে আমরা সবাই পড়েছি। তেমন কোনো চোট খাই নি। সব মেরামত করে নেওয়া যাবে মনে হয়। এখানে একটু অপেক্ষা কর।'

কাউন্ট বেরিয়ে গেলেন।

ছোকরা চাকরকে শুধোলেন, 'জমিদার লুখনভ কোন্ ঘরে থাকেন?'

ছোকরা তাঁকে ঘর দেখিয়ে দিল। লুখনভের খাস চাকর ঘরে ঢুকতে দিতে আপত্তি করছিল, কারণ তার প্রভু এইমাত্র ফিরেছেন ঘরে এবং পোশাক ছাড়ছেন। কিন্তু কাউন্ট নিষেধ সত্ত্বেও ঢুকে গেলেন। লুখনভ ড্রেসিং গাউন পরে একটা টেবিলে বসে গাদা-করা নোট গুনছিল। টেবিলে তাঁর প্রিয় মদ রাইনের একটি বোতল। তাসে জেতার ফলে নিজেকে খুশী করছে সে। চশমার ফাঁক দিয়ে কঠিন উদাসীন চোখে কাউন্টরে দিকে তাকাল লুখনভ, যেন অচেনা কেউ।

সাহসিক পদক্ষেপে টেবিলের কাছে গিয়ে কাউন্ট বললেন, 'আমায় চিনতে পারছেন না মনে হচ্ছে।'

'আপনার জন্যে কী করতে পারি?' চিনতে পারল লুখনভ।

'আপনার সঙ্গে তাস খেলতে চাই।' সোফায় বসলেন কাউন্ট।

'এখনি?'

'হ্যাঁ।'

'অন্য কোন সময় হলে অত্যন্ত আনন্দিত হব, কাউন্ট, কিন্তু এখন বড় ক্লান্ত, শুতে যাচ্ছি। একটু পানীয় চলবে? খুব ভাল মদ রয়েছে।'

'আমি এখনি একটু খেলতে চাই।'

'আজ রাতে আর খেলার ইচ্ছে নেই। অন্য সব ভদ্রলোক রয়েছেন।

তাদের কেউ কেউ হয়তো খেলতে বসতে পারেন। আমি খেলব না, কাউন্ট। মাফ করবেন।'

'আপনি তাহলে খেলবেন না?'

কাউন্টের ইচ্ছে অনুযায়ী খেলতে পারছে না বলে দুঃখিত—এটা বোঝাতে কাঁধ ঝাঁকালো লুখনভ।

'কোনমতেই খেলবেন না?'

আবার কাঁধের মৃদু ঝাঁকুনি।

'আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। খেলবেন, না খেলবেন না?'

জবাব নেই।

'খেলবেন?' আবার বললেন কাউন্ট। 'দেখুন।'

তবু চুপ করে রইল লুখনভ। দ্রুত একবার তাকালো কাউন্টের মুখে—যেখানে ক্রমেই কালো মেঘ জমছিল।

'খেলবেন? চেঁচিয়ে উঠে কাউন্ট টেবিলে এত জোরে একটা ঘুঁষি মারলেন যে রাইন মদের বোতল পড়ে গেল এবং মদ উপছে বেরিয়ে এল। 'আপনি তো জোচ্চুরি করে জিতেছেন। খেলবেন? এই নিয়ে তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করছি।'

'খেলব না তো বলছি। আপনার ব্যবহার অদ্ভুত, কাউন্ট? বাড়ি চড়াও হয়ে গলাকাটার ভয় দেখানো মাননীয় ব্যক্তিদের কাজ নয়।' চোখ না তুলে বলল লুখনভ।

একটুক্ষণ চুপ। ক্রমশঃ বেশি সাদা হয়ে যেতে লাগল কাউন্টের মুখ। হঠাৎ মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাতে বিহ্বল হয়ে গেল লুখনভ। টাকাগুলো প্রাণপণে চেপে ধরার চেষ্টায় সোফায় পড়ে গিয়ে এমন বন্য ও তীক্ষ্ণ চীৎকার করে উঠল যেটা তার মত ঠাণ্ডা সভ্যভব্য মানুষের কাছে একদম অপ্রত্যাশিত। টেবিলের বাকি সব টাকা তুরবিন তুলে নিলেন। প্রভুর চীৎকার শুনে খাস চাকর ছুটে এসেছিল, কিন্তু তুরবিন তাকে এক ধাক্কায় হটিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

'অপমানের বদলা নিতে হলে আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার ঘরে আসবেন। আমি আরো আধ ঘণ্টা থাকব। তৈরি থাকব।'

'চোর! বদমাস!' ঘরের ভেতর থেকে লুখনভ বলল। 'আদালতে ফয়শালা হবে এর।'

কাউন্টের সব ঠিক করে দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে নি ইলিন। সোফায় পড়ে ছিল সে। হতাশায় কান্নায় নিশ্বাস তার রুদ্ধপ্রায়। মনে নানা অদ্ভুত চিন্তার ভীড়। আর সে সবের মধ্যে বার বার কাউন্টের সস্নেহ দরদের কথা তার মনে পড়ছিল। তাতে তার নিজের দুরবস্থার অনুভূতিটা বাড়ছিলই। কত আশা ছিল। যৌবন, আত্মসম্মান, বন্ধুদের ভালবাসা ও খাতির—সব মিলিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। চোখের জলও আর বেরোতে চায় না, উৎস শুষ্কপ্রায় বুঝি। ধীরে কিন্তু কঠিন দৃঢ়তায় একটা গভীর হতাশা তাকে আচ্ছন্ন করছে। আত্মহত্যার চিন্তা বারবার ঘুরে আসছে—সে চিন্তায় ভয় বা বিতৃষ্ণা নেই। এমন সময় কাউন্টের পায়ের শব্দ শোনা গেল।

তুরবিনের মুখে তখনও ক্রুদ্ধ ভাবের ছায়াটা রয়েছে। হাত অল্প কাঁপছে। কিন্তু চোখে সদয় প্রসন্নতা ও সন্তোষের আভা।

'এই যে, জিতে এলাম।' এক তাড়া নোট টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন কাউন্ট। 'গুনে দেখ সব নোট আছে কিনা। তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় এসো। আমি যাচ্ছি।' উলানের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা যেন চোখে পড়ে নি —এমন ভান করলেন, একটা জিপসি সুরে শিস্ দিতে দিতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

৮

কোমরে কোমরবন্ধটা এঁটে সাশা ঘোষণা করল যে ঘোড়া তৈরি। কিন্তু দাবী করল যে কাউন্টের ওভারকোটটা ফেরত আনতে হবে—যার দাম তিন শো রুবল। মার্শালের বাড়ীতে যে বদমাসটা এর বদলে হতচ্ছাড়া নীল কোটটা পরিয়েছে কাউন্টকে তার ওভারকোটটা ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তুরবিন বললেন যে তার দরকার নেই। তিনি নিজের ঘরে পোশাক পরতে গেলেন।

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার অবিরাম হিক্কা তুলে যাচ্ছে—তার নিজের জিপসি মেয়েটি পাশে বসে। পুলিশ-ক্যাপ্টেন ভোদকার অর্ডার দিল, আর সবাই তার বাড়িতে প্রাতঃভোজের আমন্ত্রণ জানাল। কথা দিলেন যে তার বউ নেমে এসে জিপসিদের সঙ্গে নাচবে। সুন্দর যুবকটি ইলিউশকাকে ক্রমাগত বুঝিয়ে চলেছে যে পিয়ানোফোর্টে অনেক বেশি প্রাণ আছে এবং

গিটারে 'এ ফ্ল্যাট' তোলা যায় না। সরকারী কর্মচারী এক কোণে বসে চা খাচ্ছিল, আর সকালের আলো ফোটায় এখন তার বেলেল্লাপনায় লজ্জা পাচ্ছেন। স্ব-ভাষায় জিপসিরা তর্ক করছে। একদল বলছে, ভদ্রলোকদের সম্মানে আর একটা গান গাইবে। কিন্তু স্তেশা আপত্তি করছে, বলছে যে 'বারোরাই' (অর্থাৎ কাউন্ট বা রাজপুত্র, সঠিকভাবে বলতে গেলে, মহাশয় ব্যক্তি) রেগে যাবেন। এক কথায়, আমোদের শেষ স্ফুলিঙ্গ নিবে যাচ্ছে।

'আচ্ছা, একটা বিদায়কালীন গান, তারপর সবাই বাড়ি যাবে।' কাউন্ট নতুন পোশাক পরে এসে বললেন। এখন তাঁকে আরো তাজা, আরো সুন্দর ও আরো ফুর্তিবাজ লাগছিল।

জিপসিরা শেষ গানের জন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় ইলিন এক বাণ্ডিল নোট হাতে ঘরে ঢুকে কাউন্টকে এক পাশে ডাকল।

'আমার রেজিমেন্টের পনের হাজার রুবল ছিল। কিন্তু তুমি দিয়েছ ষোলো হাজার তিন শো। বাড়তিটা তোমার।'

'বহুৎ আচ্ছা। দাও।'

টাকা দেওয়ার সময় একটু সলজ্জভাবে কাউন্টের দিকে তাকাল ইলিন। কী যেন বলতে মুখ খুলল, কিন্তু কিছু বলল না। মুখটা লাল হয়ে গেল, চোখে জল এল, কাউন্টের হাত ধরে জোরে চাপ দিল।

'ভাগো। ইলিউশকা......শোনো! এই টাকা নাও। শহরের ফটক অবধি গাইতে গাইতে যাবে আমার সঙ্গে—ওখানে আমায় বিদায়-দেবে।'

এই বলে ইলিনের হাত থেকে এক হাজার তিন শো রুবল নিয়ে তিনি ছুঁড়ে দিলেন জিপসিদের গিটারের ওপর। কিন্তু আগের রাতে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের কাছে নেওয়া এক শো রুবল ধার শোধ দিতে তাঁর মনে রইল না।

সকাল তখন দশটা। বাড়ির ছাদের অনেক ওপরে সূর্য। রাস্তা লোকে ভর্তি। দোকানীরা অনেকক্ষণ তাদের দরজা খুলেছে। অভিজাত ও সরকারী কর্মচারীরা চলেছে ঘোড়ায় চেপে। আর্কেডে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে গজেন্দ্রগমনে চলেছেন মহিলারা। তখন সিঁড়ি বেয়ে বাইরে এল জিপসিরা, পুলিশ ক্যাপ্টেন, অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, সুন্দর যুবকটি, ইলিন আর কাউন্ট—তাঁর গায়ে ভালুক-লোমের আস্তরণ দেওয়া সেই নীল ক্লোকটি। দিনটা ছিল চমৎকার রৌদ্রালোকিত। তুষার

গলছিল। তিনটি স্লে—প্রতিটিই তিন ঘোড়ায় টানছে। ঘোড়াগুলোর ল্যাজ ছোট করে বাঁধা। হোটেলের সামনে এসে স্লে তিনটে থামলে গোটা দলটা বিপুল হট্টগোল করতে করতে উঠল তাতে। প্রথমটিতে কাউন্ট, ইলিন, স্তেশা, ইলিউশকা, আর কাউন্টের খাস চাকর সাশা। ভীষণ উত্তেজিত ভাবে ব্লুচার ল্যাজ নাড়ছে আর মধ্যবর্তী ঘোড়াটার উদ্দেশে ঘেউ ঘেউ করছে। বাকী ভদ্রলোক ও জিপসিরা চাপল অন্য স্লে দুটিতে। হোটেল ছাড়ার পরই স্লেগুলো পাশাপাশি এল। জিপসিরা দল বেঁধে গান শুরু করল।

এইভাবে গান আর ছোট ছোট ঘণ্টার শব্দ তুলে তারা শহরটা পেরিয়ে শহরের ফটকের কাছে এল। রাস্তার অন্য গাড়ি সব ফুটপাতে উঠে পথ ছাড়ল।

দোকানী আর পথচারীরা তাজ্জব বনে গেল। প্রকাশ্য দিবালোকে শহরের রাস্তায় গান গেয়ে মাতাল জিপসি স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে চলেছে মাননীয় ভদ্রলোকরা। যারা এই ভদ্রলোকদের চিনত, তারা আশ্চর্য হোলো আরো বেশি।

ফটক পেরিয়ে স্লে থামল। কাউন্টের কাছে সবাই বিদায় নিল।

যাত্রার পূর্বে পান করেছিল ইলিন। ঘোড়াও চালিয়েছে সে নিজে। হঠাৎ এখন ভীষণ বিষণ্ণ হয়ে বার বার কাউন্টকে একদিন থেকে যেতে অনুরোধ করল। কিন্তু সেটা অসম্ভব—তা বুঝে তখন হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে জল-ভরা চোখে নতুন বন্ধুকে চুমু খেয়ে শপথ করল যে রেজিমেণ্টে ফিরে গিয়েই সে তুরবিনের রেজিমেণ্টে বদলির আবেদন করবে। খুবই খুশী তখন কাউন্ট। সকালে অশ্বারোহী বাহিনীর যে অফিসার তাঁকে শেষবারের মত তুমি বলে ডেকেছিল, তাঁকে তুষারস্তূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন। ব্লুচারকে লেলিয়ে দিলেন পুলিশের ক্যাপটেনের দিকে, স্তেশাকে ছিনিয়ে নিলেন ও তাকে জড়িয়ে ধরে ভয় দেখালেন যে তাকে মস্কোতে নিয়ে যাবেন। শেষে স্লেতে লাফিয়ে উঠে পাশে নিলেন ব্লুচারকে। সাশা অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারকে কাউন্টের ওভারকোট খুঁজে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য তাগাদা দিয়ে টক করে লাফিয়ে উঠে চালকের পাশে এসে বসল।

‘চলি।’ চেঁচিয়ে বললেন কাউন্ট। দ্রুত টুপিটা খুলে মাথার উপরে

দোলালেন। স্লে চালকদের মতো ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে শিস দিলেন। তিনটি স্লে তিন দিকে চলতে শুরু করল।

বহুদূর পর্যন্ত তুষারাচ্ছন্ন সমতলের বিস্তার। তার মধ্যে আঁকাবাঁকা পথের ময়লা হলদে ফিতেটা। বরফ গলছে। তার ওপরকার শক্ত স্বচ্ছ আচ্ছাদনে উজ্জ্বল রোদ চিকমিক করছে। মুখে ও পিঠে চমৎকার একটা মিষ্টি উষ্ণ স্পর্শ। ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোর গা থেকে একটা ভাপ উঠছে। স্লের ছোট ঘণ্টা বাজছে ঠুনঠুন। বোঝাই স্লেজের পাশে ছুটছিল একটা চাষী। সে কাউন্টের রাস্তা করে দিতে গিয়ে তাড়াতাড়ি লাগামের মতো দড়িতে দিল টান, আর পথের পাশের তুষার-গলা কাদায় ভিজে গেল বাকলের জুতো। আর একটি স্লেজে বসে লাগামের কোণ দিয়ে সাদা বেতো ঘোড়ার পিঠে আছড়াচ্ছিল একটি মোটা লালমুখো চাষী-মেয়ে। তার ভেড়ার লোমের কোটের ভেতরে বুকের মধ্যে ঠাসা আছে একটি শিশু। হঠাৎ আন্না ফিওদরভনাকে মনে পড়ল কাউন্টের।

'গাড়ি ঘোরাও।' হাঁকলেন তিনি।

গাড়োয়ান বুঝতে পারল না কিছু।

'ঘোরাও। আবার শহরে চল। জলদি।'

আবার উলটো দিকে ফটক পেরোল স্লে; এবং মাদাম জাইৎসেভার বাড়ির কাঠের তৈরি প্রবেশ পথে। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে কাউন্ট সামনের হল ও ড্রইং-রুম পেরিয়ে গেলেন। সেখানে ঘুমন্ত বিধবাকে পেলেন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে তুললেন, নিদ্রাচ্ছন্ন তার চোখে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেলেন ছুটে। সদ্যজাগ্রত তখনো ঘুম-জড়ানো আন্না ঠোঁট চেটে শুধু শুধোতে পারল, 'কী হয়েছে?'

কাউন্ট এক লাফে স্লে-তে উঠলেন। কাল বিলম্ব না করে গাড়োয়ানকে চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন। লুখনভ বা খুদে বিধবা বা স্তেশার কথা আর এক বারটিও না ভেবে 'ক' শহর ত্যাগ করলেন চিরদিনের জন্য। মস্কোয় তাঁর জন্যে কী অপেক্ষা করে আছে—এই তাঁর তখনকার একমাত্র চিন্তা।

৯

কুড়িটি বছর কেটে গেল। সেতুর তলা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। বহু লোক মরেছে, আরো অনেক জন্মেছে। অনেকে বড় হয়েছে, অনেকে হয়েছে বুড়ো। লোকের চেয়েও অনেক বেশি জন্মেছে নতুন নানা চিন্তা-ভাবনা এবং মরেছেও। অতীতের অনেক ভাল এবং অনেক মন্দ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। নতুন অনেক ভাল জিনিস অংকুর থেকে পরিণত হয়েছে, অনেক নতুন খারাপ জিনিস দেখা দিয়েছে।

কাউন্ট ফিওদর তুরবিন বেশ কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। রাস্তায় একটি বিদেশীকে ঘোড়ার চাবুক মারাতে তার সঙ্গে ডুয়েল লড়ে তিনি মারা যান। তাঁর ছেলে বাপের অবিকল চেহারাটি পেয়েছে। এখন তেইশ বছরের আকর্ষণীয় যুবক, অশ্বারোহী দলের অফিসার। কিন্তু বাপের স্বভাবের একটি বিন্দুও পায় নি ছেলে। আগের আমলের বেপরোয়া উদ্দাম, সিধে ভাষায়, বেলেল্লাপনার সামান্য ছায়াটুকুও নেই তার মধ্যে। বুদ্ধি, সুশিক্ষা ও নানা গুণ সে বংশক্রমেই পেয়েছিল। আর আছে তার সৌজন্য ও আরামপ্রিয়তা, লোক ও পরিস্থিতি বিচারে একটি বাস্তবদৃষ্টি এবং জীবনের প্রতি সতর্ক বিচক্ষণতা। সেনাবাহিনীর কাজে খুব দ্রুত উন্নতি করেছে নবীন কাউন্ট। তেইশ বছর বয়সেই সে লেফটেনাণ্ট···

সামরিক তৎপরতা শুরু হলে সে ঠিক করল সক্রিয় জঙ্গী বাহিনীতে যোগ দিলে দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা বেশি। তাই বদলি হল একটা হুজার রেজিমেণ্টে, ক্যাপটেনের পদে, আর অল্প সময়ের মধ্যেই একটি স্কোয়াড্রনের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হল।

১৯৪৮ সালের মে মাসে হুজারের 'স' রেজিমেণ্টটা 'ক' গুবের্নিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। নবীন কাউণ্ট তুরবিনের স্কোয়াড্রনের রাত কাটাবার কথা ছিল আন্না ফিওদরভনার মরজভকা গ্রামে। আন্না ফিওদরভনা তখনো জীবিত, কিন্তু বয়স হয়েছে যথেষ্ট—নিজেকে আর যুবতী মনে করেন না। নারীর পক্ষে এটা মনে না করাটা দুঃসাধ্য। খুবই মুটিয়ে গেছেন আন্না। লোকে বলে তাতে নাকি স্ত্রীলোকদের বয়স কম দেখায়। কিন্তু তাঁর কোমল শুভ্র মেদে গভীর বলিরেখার আক্রমণ ঘটেছে। শহরে গাড়ি করে আর যান না। বস্তুত, গাড়িতে ওঠাই তাঁর পক্ষে এখন খুব শক্ত।

তবে লোকটা রয়ে গেছে আগের মতই ভালমানুষ গোছের এবং বোকা-বোকা। একথা এখন আমরা স্বীকার করতে পারি, কারণ আমাদের অন্ধ করে দেওয়ার মত রূপ আর তাঁর নেই। তাঁর মেয়ে, তেইশ বছরের লিজা কৃশী গ্রাম্য সুন্দরী, থাকে তাঁর সঙ্গে। আর থাকেন দাদা, সেই আমাদের পরিচিত অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার। লোকটা ছিল আলসে, বাপের সব সম্পত্তি ভেঙ্গে খেয়েছে, এখন বুড়ো বয়সে বোনের সংসারে পরগাছা। চুল সব সাদা হয়ে গেছে। ওপরের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। গোঁফ কলপের সযত্ন ব্যবহারে কালো। গাল আর কপালে অগণ্য রেখা তো বটেই। নাক ও গলাতেও তাই। কুঁজো হয়ে গেছেন। তবে দুব্লা বেঁকা পায়ে রয়ে গেছে অশ্বারোহী বাহিনীর পুরানো অফিসারের ধ্বংসাবশেষ।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ির সবাইকে নিয়ে পুরনো বাড়ির ছোট ড্রইং-রুমে বসে ছিলেন আন্না ফিওদরভনা। বারান্দার সম্মুখে তারকাকৃতি পুরানো ধরনের একটা বাগান—লাইম্ গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ। পাকা-চুলো আন্না তুলো-ভরা নীল রঙের একটি জ্যাকেট পরে গোল মেহগনি টেবিলের সামনে সোফায় বসে টেবিলে তাস সাজাচ্ছেন। বৃদ্ধ ভাই পরিষ্কার সাদা প্যাণ্ট ও নীল কোট পরে জানলায় বসে সাদা তুলোর সূতোয় কাঁটা দিয়ে-কী একটা বানাচ্ছেন। এটা উনি শিখেছেন ভাগ্নীর কাছে। ক্রমে কাজটা খুব ভালো লেগে গেছে, কারণ যথার্থ কোন কাজ করতে তিনি অক্ষম। তাঁর পুরানো সখ খবর-কাগজ পড়া এখন দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্যে প্রায় অসম্ভব।

পিমচকা নামের একটি ছোট মেয়েকে আন্না পুষ্যি নিয়েছেন। মেয়েটি বৃদ্ধের পাশে বসে লিজার তত্ত্বাবধানে পড়াশুনো করছে। লিজা শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে মামার জন্যে ছাগলের লোমের মোজা বুনে চলেছে। দিনের এ সময়টায় বরাবরকার মতো আজও অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো লাইম গাছের মধ্য দিয়ে তেরছাভাবে পড়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে ওদিকে জানালাটাকে আর পাশের বই-স্ট্যাণ্ডকে। ঘর আর বাগান এত নীরব যে স্পষ্ট শোনা যায় জানালার বাইরে সোয়ালোর পাখার দ্রুত ঝটপট, ঘরে আন্নার হালকা দীর্ঘশ্বাস এবং পায়ের ওপর পা রাখতে গিয়ে বৃদ্ধের শ্রান্তি-জনিত শব্দ।

'এই তাসটা কোথায় বসবে? লিজা, দেখিয়ে দে তো আমায়। সব ভুলে যাই আজকাল।' খেলা থামিয়ে আন্না বললেন।

বোনা না থামিয়ে লিজা মায়ের কাছে গিয়ে তাস দেখতে লাগল।

'আঃ! মা! তুমি সব মিশিয়ে ফেলেছ।' তাস গুছিয়ে দিতে লাগল সে। 'থাকা উচিত এরকম। তবু, হাতটা আসবে। তোমার অনুমানটা ঠিক।' মাকে না দেখিয়ে একটা তাস দ্রুত সরিয়ে দিয়ে বলল লিজা।

'তুই তো সব সময় আমায় বোকা বানাচ্ছিস। সব সময়ই বলছিস—ঠিক তাসটা আসবে।'

'সত্যিই আসবে। দেখ। এই তো এসেছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা! খুদে শেয়াল ঠাকরুন। আমাদের কি চা খাওয়ার সময় হয়নি ?'

'ওদের সামোভার গরম করতে বলে দিয়েছি। এখানে নিয়ে আসব ? পিমচকা, তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করে ফেল্, আমরা একবার বেড়াতে বেরোব।'

লিজা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'লিজা! লিজচ্কা!' কাঁটা থেকে চোখ না সরিয়ে ডাকলেন মামা। 'আর একটা সূতো পড়ে গেল মনে হচ্ছে। একটু তুলে দিবি ? লক্ষ্মী মেয়ে।

'এক মিনিট! এক মিনিট দাঁড়াও। চিনির এই ডেলাটা ওদের ভাঙতে দিয়ে এখুনি আসছি।'

সত্যিই তিন মিনিটের মধ্যে সে ঘুরে এল। মামার কাছে গিয়ে তাঁর কান ধরল।

'সূতো ফেলে দেওয়ার এই হচ্ছে শাস্তি।' হেসে বলল লিজা। 'আজকে পড়াটা পর্যন্ত তুমি শেখোনি, মামা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক করে দে এটা। কোথাও একটা গেরো পড়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

লিজা কাঁটাটা নিয়ে পিনটা রুমাল থেকে টেনে বার করে ফোঁড়টা পিন দিয়ে ধরে দু-তিন বার ফাঁস দিয়ে ফেরত দিল মামাকে। আলপিন খোলাতে জানালা থেকে আসা হাওয়ায় রুমালটা খুলে গেল।

'এইখানে—একটা চুমু চাই। অনেক খেটেছি, শুধু শুধু খাটা যায় না।' লিজা মামার রুমাল পিন দিয়ে আটকে ঠিক করতে করতে গোলাপি গাল এগিয়ে দিল। 'আজ, মামা, তুমি চায়ের সঙ্গে রাম পাবে। আজ শুক্রবার, মনে আছে নিশ্চয়ই।'

আবার সে চায়ের ঘরে চলে গেল।

'এসো, মামা শীগগির দেখে যাও। হুজারা আসছে।' স্পষ্ট উঁচু গলায় চেঁচাল সে।

আন্না ও তাঁর ভাই দুজনেই চা-ঘরে গেলেন। এ ঘরের জানলার গ্রামের দিকে মুখ। এখান থেকে হুজারদের যেতে দেখা যাচ্ছে। জানলা দিয়ে অল্পই দেখা গেল। ধূলোর মেঘের মধ্য দিয়ে অনেক লোক চলেছে—শুধু এই চোখে পড়ল।

মামা আন্নাকে বললেন, 'কী দুঃখের কথা, বোন! আমাদের বাড়িটাও ছোট, আর নতুন অংশটা শেষ হয়নি এখনও। নয়তো কয়েকজন অফিসারকে ডাকা যেত। হুজারদের অফিসাররা এত ফুর্তিবাজ হয়। ওদের দেখতে বড় ইচ্ছে হয়।'

'ওদের সঙ্গে দেখা হলে আমারও খুব ভাল লাগত। কিন্তু জানো ওদের ঠাঁই দেওয়ার মত জায়গা নেই। শুধু রয়েছে আমার শোওয়ার ঘর, লিজার ঘর, ড্রইং-রুম, এই তো। কোথায় জায়গা দেব? ভেবে দেখ নিজেই, গাঁয়ে বুড়ো কর্তার বাড়িটা ব্যবস্থা করে রেখেছে মিখাইলো মাতভেয়েভ।

মামা বললেন, 'ঐ বাহাদুর হুজারদের মধ্য থেকে তোর জন্য একটা বর দেখা যাক, লিজচ্‌কা।'

'আমি হুজার চাই না। আমি চাই উলান। তুমি তো উলানদের দলে কাজ করেছিলে, মামা। ঐ হুজারদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। শুনেছি, ওরা ভীষণ বেপরোয়া হয়।'

লিজার গাল একটু লাল হয়ে এলেও আবার সে হাসল তার সেই হাসি—যা বেজে ওঠে ও ছড়িয়ে যায়। সে বলল, 'এই তো উস্‌তিউশ্‌কা দৌড়তে দৌড়তে আসছে। ও কী দেখল জিজ্ঞেস করতে হবে।'

আন্না উস্‌তিউশ্‌কাকে ডেকে পাঠালেন।

'ঘরে কোন কাজ নেই বুঝি তোর! সেপাই দেখতে ছুটেছিস। শোন্, অফিসারদের কোথায় রাখা হয়েছে রে?' শুধোলেন আন্না।

'ইয়েরমকিনদের বাড়িতে, গিন্নী-মা। ওরা দুজন। আর এত সুন্দর চেহারা! সবাই বলল, ওদের একজন নাকি কাউণ্ট।'

'কী নাম তার?'

'কাজারভ না তুয়বিন—ঐ রকম একটা। ঠিক মনে নেই, মাফ করবেন।'

'তুই একটা গাধা। কিছু বলতে পারিস না। অন্তত নামটা জেনে নিবি তো!'

'বলেন তো ছুটে গিয়ে জেনে আসি।'

'তুই ও কাজে খুব সেয়ানা, সে আর আমি জানি না! না, দানিলো যাক; দাদা ওকে গিয়ে শুধোতে বল তো অফিসারদের কোনো কিছু চাই কিনা। ওদের একটু আদর-যত্ন করা দরকার। আর দানিলো যেন বলে যে ওকে গিন্নীমা পাঠিয়েছেন।'

চায়ের ঘরে বুড়ো আর বুড়ী বসলেন। আর লিজা চিনি সরিয়ে রাখতে ঝিদের ঘরে গেল। গিয়ে দেখল, উস্‌তিউশ কা সেখানে হুজারদের নিয়ে গল্প জমিয়েছে।

'দিদিমণি, সত্যি কী চেহারা! যদি তুমি একবার দেখতে! অমন যদি তোমার একটি বর হোতো, তাহলে তোমাদের দুটিতে বেশ মানাতো, তাই না! একেবারে সগ্‌গের দেব্‌তা যেন, দুটো ভুরু কালো কুচকুচে।'

অন্য ঝি চাকরেরা সায় দিয়ে একটু হাসল। জানলার কাছে বসে মোজা রিপু করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতুন শ্বাস টানবার সময় মৃদু স্বরে একটা প্রার্থনার মন্ত্র বিড়বিড় করল বুড়ী আয়া।

লিজা বলল, 'হুজাররা তাহলে এই ছাপ ফেলেছে তোর মনে। এই সব কথাই তো তোর সবচেয়ে পছন্দ। উসতিউশ্‌কা, ফলের সরবৎ নিয়ে আয় তো, টক দেখে একটা কিছু আন—হুজারদের খাতির-যত্ন করবার জন্যে।

লিজা হেসে চিনির পাত্র নিয়ে চলে গেল।

ভাবল লিজা, 'ঐ হুজারটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ওর চুল কি সোনালি, না কালো? আমাদের সঙ্গে আলাপ হলে ও খুশীই হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হয়তো সে এমনিই চলে যাবে—জানবেই না যে আমি এখানে ছিলাম, ওর কথা ভেবেছিলাম। আরও কত লোক চলে গেছে। আমাকে আর দেখে কে! শুধু মামা আর ইসতিউশকা। কী রকম ভাবে চুল বাঁধি বা কী রকম হাতার জামা পরি, তাতে কার কী এসে যায়। ভাল বলবার কেউ নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিজা তার পুষ্ট শুভ্র বাহুর

দিকে চেয়ে 'আমার মনে হয় ঐ হুজার নিশ্চয়ই লম্বা, বড় বড় চোখ এবং খুব সম্ভবত ছোট কালো একটা গোঁফও আছে। একবার ভেবে দেখ, বয়স হয়ে গেল তেইশ, কেউ এখনও আমার প্রেমে পড়ল না—ঐ বসন্তের-দাগওয়ালা ইভান ইপাতিচ ছাড়া। চার বছর আগে আমি এখনকার চেয়েও সুন্দরী ছিলাম। কুমারীর বয়স বলতে গেলে পেরিয়েছি, অথচ এ বয়সে আনন্দের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত পেল না কেউ। কী দুর্ভাগ্য আমার! অভাগিনী গাঁয়ের মেয়ে।

গাঁয়ের মেয়ে স্বপ্ন স্রোতের মধ্য থেকে জেগে উঠল—চা ঢেলে দেওয়ার জন্য মা ডাকছেন। মাথাটা ঝাঁকালো, তারপর চা-ঘরে গেল।

হঠাৎ যা ঘটে তাই ভাল। খুব চেষ্টা করা হল—পাওয়া গেল একটা বাজে ফল। গাঁয়ে শিশু-শিক্ষার জন্য কেউ মাথা ঘামায় না। লিজার বেলাতেও তাই হয়েছে। আন্নার মনের জগৎ খুব সীমাবদ্ধ, আর স্বভাবটা তাঁর আলসে, তাই লিজার শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই তিনি করেন নি। তিনি তাকে গানও শেখান নি, অপরিহার্য ফরাসীও নয়, শুধু বিগত স্বামীকে দৈবক্রমে উপহার দিয়েছেন একটি খুব সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী শিশুকন্যা, তারপর তাকে ছেড়ে দিয়েছেন স্তন্যদাত্রী ধাইমা আর আয়ার হেপাজতে। তিনি তাকে খাওয়াতেন, সুতোর ফ্রক আর ছাগল-চামড়ার জুতো পরাতেন, বাইরে পাঠাতেন বেরী আর ব্যাঙের ছাতা কুড়িয়ে আনবার জন্যে, লেখা পড়া আর অঙ্ক শেখানোর জন্য একটি অল্পবয়সী ছাত্রকে নিযুক্ত করেছিলেন, আর ষোলো বছর বয়সের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে লিজা তাঁর বেশ ভাল বন্ধু এবং হাসিখুশি সদয়-মন, খাটিয়ে, খুদে এক গৃহকর্ত্রী। আন্না নিজেই এত সদয় প্রকৃতির যে তিনি সব সময়েই কোন ভূমিদাসের শিশুকে বা কুড়িয়ে-পাওয়া কোনো বাচ্চাকে পুষ্যি রাখতেন। দশ বছর বয়স থেকে লিজা তার মায়ের এই পুষ্যিদের দেখাশুনা করে আসছে। সে তাদের লেখাপড়া শেখাত, জামা-কাপড় পরাতো, গীর্জায় নিয়ে যেত। বেশি দুষ্টুমি করলে বকত।

তারপরে এলেন তার দুর্বল ভাল-মানুষ মামা—যাকে শিশুর মত লালন করতে হোতো। ঘরের ঝি-চাকরেরা এবং গাঁয়ের ভূমিদাসেরা তাদের সব জ্বালা যন্ত্রণার কথা এই নবীনা গৃহকর্ত্রীর কাছে নিয়ে আসত। এল্ডার ফুলের রস, পেপারমিন্ট ও কর্পূরের সার দিয়ে সে তাদের চিকিৎসা

করত। তারপর গোটা বাড়ির দেখাশুনোর ভারও ঘটনাক্রমে তার ওপর এসেই বর্তেছিল। এর ওপর ছিল তার ভালবাসার ব্যর্থ আকুলতা—যা শেষ পর্যন্ত মুক্তিপথ পেত প্রকৃতি প্রেম ও ধর্মে। তাই সম্পূর্ণ দৈবক্রমে লিজা হয়ে দাঁড়াল ব্যস্ত, হাসিখুশি, অমায়িক, স্বাধীনচেতা, নিষ্পাপ এবং খুবই ধর্মপ্রাণ একটি মেয়ে। সত্যি কথা, 'ক' শহর থেকে আনা ফ্যাশনের টুপি পরা পড়শিনীদের গীর্জায় দেখে তার একটু-আধটু হিংসে হোতো। খিটখিটে মায়ের নানা খেয়ালে মাঝে মাঝে তার প্রায় কান্না পেয়ে যেত। প্রেমের স্বপ্নগুলো হয়ে দাঁড়াত অসম্ভব ও অসংলগ্ন, এমন কি কখনো কখনো স্থূল। কিন্তু এ সমস্ত ঠিক দাঁড়াতে পারত না তার প্রয়োজনীয় কাজের স্রোতে, যে কাজ বাদ দিয়ে সে থাকতে পারত না। আর এই তেইশ বছর বয়সে শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্যসম্পন্ন এই বাড়ন্ত মেয়েটির স্বচ্ছ শান্ত অন্তরে দাগ বা অনুশোচনা রেখে যাওয়ার মতো কিছু ছিল না, মাঝারি গোছের লম্বা; অস্থিপ্রধান নয়, বরং গোলগাল। চোখের রং বাদামী। খুব বড় নয় তার চোখ। নিচের পাতার ছায়া ঈষৎ ঘন। তার চুল লম্বা ও সোনালী। হাঁটায় আছে উদার সহজ দুলুনি। মনে যখন তার কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কাজে ব্যস্ত, তখন তার মুখের ভাবে যেন লেখা থাকত—জীবন সুন্দর, জীবন আনন্দময়, তাদের কাছে যাদের বিবেক পরিষ্কার ও ভালবাসার জন আছে যাদের। এমন কি, বিরক্তি, রাগ, উৎকণ্ঠা বা দুঃখের মুহূর্তেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জলে-ভরে-যাওয়া চোখে, বাঁ দিকের কুঁচকেওঠা ভুরুতে, গালের টোলে, ঠোঁটের কোণে দীপ্ত দৃষ্টিতে দেখা যেত দয়াকোমল ও সৎ হৃদয়ের একটি আভা—যে-হৃদয় কোনো কৃত্রিমতায় নষ্ট হয়নি।

১০

সূর্য অস্ত গেলেও তখনও গরম আছে; স্কোয়াড্রন মরোজভ্ কার ঢুকল। সামনে গাঁয়ের ধূলিময় রাস্তায় দল-ছাড়া একটা ছিটছিটে রঙের গোরু দৌড়চ্ছে। ভীত দৃষ্টিতে বার বার পেছনে তাকাচ্ছে আর থেমে পড়ছে; বুঝতে পারে নি, ঘোড়ার জন্যে রাস্তা ছেড়ে দেওয়াই এখন তার কর্তব্য। বুড়ো চাষী, গ্রামের বৌ-বাচ্চা আর বাড়ির চাকরবাকররা হুজারদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল পথের দুধারে ভীড় করে। ছোট রাশ

বাঁধা কালো ঘোড়ায় চেপে তারা এগিয়ে আসছে ধুলোর ঘন মেঘের মধ্য দিয়ে। ঘোড়াগুলো নাক দিয়ে মাঝে মাঝে আওয়াজ করছে। স্কোয়াড্রনের ডান দিকে আলগাভাবে জিনে বসে আছে অফিসার দুটি। একজন দলের কম্যাণ্ডার, কাউন্ট তুরবিন, আর একজন হল পলজভ, সে সদ্য অফিসার হয়েছে।

গাঁয়ের শ্রেষ্ঠ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সাদা টিউনিক পরা একজন হুজার। ফৌজী টুপি খুলে অফিসারদের কাছে গেল।

'আমাদের থাকার ব্যবস্থা কী হয়েছে?' কাউন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার জন্যে, হুজুর?' শক্তভাবে খাড়া থেকে কোয়ার্টার মাস্টার বলল, 'এই বাড়িটা—গাঁয়ের বুড়ো কর্তার। আপনার জন্যে এটা পরিষ্কার করেছি। জমিদারণীর কাছারি-বাড়িতে একটা ঘর চেয়েছিলাম, কিন্তু দেয়নি। জমিদারণী বড় ছোট অন্তঃকরণের।'

'বেশ, ভাল।' ঘোড়া থেকে নামলো ও পায়ের আড় ভেঙে গাঁয়ের বুড়ো কর্তার বাড়ির দিকে এগোল—বলল, 'আমার গাড়িটা এসেছে?'

'এসেছে, হুজুর।' ফটকের গাড়িটার দিকে টুপি দিয়ে দেখিয়ে জবাব দিল কোয়ার্টার মাস্টার। তারপর আগে আগে ছুটে গেল বাড়িটার প্রবেশ-ঘরে। সেখানে অফিসারদের দেখার জন্য জড় হয়েছিল একটি চাষী পরিবার। সদ্য ধোয়া-মোছা পরিষ্কার বাড়িটার দরজা দ্রুত খুলে কাউন্টকে ভেতরে যাওয়ার জন্যে সরে দাঁড়াতে গিয়ে একটা বুড়ীকে এক ধাক্কায় প্রায় ফেলে দিয়েছিল আর কি।

বেশ বড় বাড়ি। প্রচুর জায়গা। কিন্তু পুরো পরিষ্কার নয়। একটি জার্মান খাস-চাকর বাবুদের মত সাজ করেছে। সে লোহার খাট পেতে স্যুটকেস থেকে বিছানার চাদর বার করছে।

'অ্যাঃ! কি বিশ্রী বাড়ি।' বিরক্ত হয়ে বলল কাউন্ট। 'দিয়াদেঙ্কো, জমিদারণীর ওখানে কোথাও এর চেয়ে ভাল গোছের কোনো জায়গা পেলে না?'

'হুজুর যদি বলেন তো একজন কাউকে ওখানে পাঠাই।' বলল দিয়াদেঙ্কো। 'কিন্তু কাছারি বাড়িটা তেমন সুবিধের নয়। এ বাড়ির চেয়ে বোধহয় ভাল নয়।'

'না, এখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। থাক।'

মাথার নিচে হাত দিয়ে কাউন্ট শুয়ে পড়ল।

'জোহান!' খাস চাকরকে ডাকল কাউন্ট। 'মধ্যেখানে আবার ডেলা পাকিয়েছ! এখনো বিছানাটা পাততে শিখলে না?'

জোহান তাড়াতাড়ি ডেলাটা সরাতে যাচ্ছিল।

'না, এখন থাক, অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।' কাউন্ট খিটখিট করে বলল। 'আমার ড্রেসিং গাউনটা কোথায়?'

খাস-চাকর তাকে ড্রেসিং গাউন দিল।

কাউন্ট সেটি পরবার আগে ঝুলটা পরীক্ষা করল।

'যা ভেবেছিলাম। সে দাগটা তোলো নি। তোমার চেয়ে খারাপ কাজ আর কী করে করা যায় আমি জানি না,' লোকটির হাত থেকে গাউনটা ছিনিয়ে নিল কাউন্ট। পরে বলল, 'এসব কি ইচ্ছে করে কর, না কি? চা হয়েছে?

'সময় পাই নি হুজুর।'

'গাধা।'

কাউন্ট এই সময়টার জন্যে একটি ফরাসী উপন্যাস এনেছে। সেটি নীরবে পড়তে বসল। জোহান প্রবেশপথের দিকে বেরিয়ে গেল—সামোভার গরম করার জন্য। কাউন্টের মেজাজটা এখন বড়ই বে-খোশ—বেশ বোঝা যাচ্ছে, তার কারণ নিঃসন্দেহে ক্লান্তি, অপরিচ্ছন্ন মুখ, আঁটপোশাক এবং শূন্য উদর।

'জোহান!' আবার ডাকল সে। 'তখন দশ রুবল নিয়েছিলে। তার হিসেব দাও। শহরে কী কিনেছ?'

জোহান হিসেবটা দিতে কাউন্ট এক পলক সেটা দেখে নিয়ে কয়েকটি জিনিসের বেশি দাম হয়েছে বলে অসন্তোষ প্রকাশ করল।

'চা-র সঙ্গে রাম্ দিয়ো।'

'রাম্ তো কিনি নি।' বলল জোহান।

'চমৎকার! কতবার বলেছি কাছে খানিকটা রাম নেবে?'

'অত টাকা ছিল না।'

'পলজভ কেনে নি কেন? তার চাকরের কাছ থেকে নিতে পারতে।'

'কর্নেট পলজভ? জানি না, উনি শুধু চা আর চিনি কিনেছেন।'

'যা ব্যাটা, ভাগ। আর কেউ আমার ধৈর্যের ওপর এত অত্যাচার

করে না। তুমি খুব ভাল করেই জানো বাইরে বেরোলে আমি চা-র সঙ্গে রাম খাই।'

'স্টাফ হেডকোয়ার্টার থেকে আপনার দুটো চিঠি এসেছে।'

বিছানায় শুয়ে খাম দুটো ছিঁড়ে চিঠি পড়তে আরম্ভ করল কাউন্ট। ঠিক সেই সময় খুশিমুখে ঘরে ঢুকল কর্নেট, সে এতক্ষণ স্কোয়াড্রনের লোকদের তাদের থাকার জায়গায় নিয়ে গিয়েছে।

'তাহলে, তুরবিন? জায়গাটা মন্দ নয়, মনে হচ্ছে। কিন্তু ভয়ানক ক্লান্ত, বলতেই হবে। দিনটা গরম।'

'মন্দ নয়, নোংরা, বদ-গন্ধ-ভরা বাড়ি, আর তোমাকে ধন্যবাদ, চায়ের সঙ্গে রাম্ নেই, তোমার সেই বোকাটা কিনতে ভুলে গেছে। আমার চাকরটাও তাই। তুমি বললে পারতে।'

আবার চিঠি পড়া চলল। প্রথমটা শেষ করে দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ইতিমধ্যে বাইরে প্রবেশপথে কর্নেট চাকরের কানে ফিসফিস করে বলছিল 'কিছুটা রাম কেননি কেন? কাছেতো টাকা ছিল তোমার, তাই না?'

'আমরাই সব কেনাকাটা করব কেন? সব খরচ তো আমিই দিই। ওঁর জার্মানটা তো খালি পাইপ টানে।'

দ্বিতীয় চিঠিটা বোঝা গেল অপ্রীতিকর নয়। কারণ কাউন্ট পড়তে পড়তে মৃদু হাসলেন।

'কে লিখেছে?' পলজভ জিজ্ঞেস করল। সে ঘরে ফিরে চুল্লীর পাশে কয়েকটা তক্তার ওপর নিজের জন্য একটা বিছানা পাতছিল।

'মিনা।' খুশি কাউন্টের স্বরে। চিঠিটা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দিল কাউন্ট। 'পড়বে? কী সুন্দর মেয়ে! আমাদের মেয়েদের চেয়ে অনেক ভাল। চিঠিতে কী সরল বুদ্ধি, কী আবেগ, পড়ে দেখ। একটা ব্যাপারেই তার খারাপ—টাকা চায়।'

'হ্যাঁ, ওটা খারাপ।' মন্তব্য করল কর্নেট।

'সত্যি কথা বলতে কী, আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম। তারপরেই তো আমাদের এই মার্চ শুরু হল। আর......আচ্ছা......কিন্তু আরো তিন মাস স্কোয়াড্রনের কম্যাণ্ডে থাকলে টাকাটা ওকে পাঠিয়ে দেব। গজগজ

করব না দিতে। বেশ মোহিনী মেয়ে, তাই না?' পত্রপাঠরত পলজভের মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে কাউণ্ট মৃদু হাসল।

'ভয়ংকর রকমের মূর্খ, কিন্তু মিষ্টি, আর সত্যিই তোমাকে ভালবাসে।' কর্নেট বলল।

'তা সত্যি বাসে। যদি ভালবাসায় পড়ে তবে এই ধরনের মেয়েরাই সত্যি ভালবাসে।'

'আর একটা চিঠি কার?' শেষ করা চিঠিটা হস্তান্তর করে শুধোল কর্নেট।

'এটা? একটা লোক। নোংরা গোছের। তাসে টাকা হেরেছি এর কাছে। এই নিয়ে তিনবার সে কথাটা মনে করলো। এখন ওকে টাকাটা শোধ দিতে পারছি না। বোকার মতো একটা চিঠি! স্পষ্ট বোঝা গেল তাগাদায় কাউণ্ট বিরক্ত।

এরপর উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ। কাউণ্টের মেজাজের প্রভাবে কর্নেট নীরবে চা খেল, কথা বলতে ভরসা হচ্ছে না, কারণ তুরবিন জানালা দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়েছিল—গভীর চিন্তায় সে মগ্ন। কর্নেট মাঝে মাঝে কাউণ্টের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল ব্যাপারটা।

'সব কিছু শেষ পর্যন্ত ভাল হয়েই দেখা দেবে মনে হয়। পলজভের দিকে ফিরে মাথাটা অল্প বাঁকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল কাউণ্ট। 'এ বছর রেজিমেণ্টে সব প্রোমোশন যদি ঠিক ঠিক মত হয়, আর যদি আমরা খাস যুদ্ধে নামি, তাহলে রক্ষী-বাহিনীতে আমার কাপ্টেন বন্ধুদের হয়তো আমি পেরিয়ে যাব।'

দ্বিতীয় কাপ চায়ের সঙ্গে উভয়ের এই বিষয়েরই আলোচনাটা চলছিল। এমন সময় আন্নার চিঠি নিয়ে বুড়ো দানিলো এসে হাজির।

'আর মা-ঠাকরুন হুজুরকে শুধোতে বলেছেন যে হুজুর কি কাউণ্ট ফিওদর ইভানভিচ তুরবিনের ছেলে?' প্রশ্নটি দানিলো নিজ থেকেই করল। অফিসারটির নাম শুনে আগের কাউণ্টের 'ক' শহরে আসার কথা তার মনে পড়ে গিয়েছিল। 'আমাদের মা-ঠাকরুন তাঁকে খুব ভালভাবে চিনতেন।'

'হ্যাঁ, তিনি আমার পিতা। তোমার মা-ঠাকরুনকে বোলো আমাদের প্রতি তাঁর এই মনোযোগে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। তবে আমাদের কিছু

দরকার নেই। একটা পরিষ্কার ঘর পেলে হোতো—জমিদার-বাড়িতে বা অন্য কোথাও।'

'ওকথা বললে কেন?' দানিলো চলে যাওয়ার পর পলজভ বলল। 'আলাদা কী হবে? এক রাত্তির তো মাত্র থাকব, ওঁদের অসুবিধা করে কী লাভ।'

'হুঃ। তুমি আর তোমার এই সৎ বুদ্ধি। মুরগীর খুপরিতে অনেক ঘুমানো হয়েছে। তুমি মোটেই কেজো বুদ্ধির লোক নও, বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। হলেই বা এক রাত্তির। মানুষের মতো থাকার সুযোগটা ছাড়তে যাব কোন্ দুঃখে। ওঁরাও খুব খুশী হবেন। একটি জিনিস শুধু পছন্দ হচ্ছে না আমার। আমার বাবাকে চেনার ঐ ব্যাপারটা।' মৃদু ধীর হাসিতে উজ্জ্বল দাঁতের সার দেখা যাচ্ছিল কাউন্টের। সে বলছিল, 'বাবার কথা মনে পড়লেই কেমন একটা হয়। হয় কোনো কুৎসা, নয়তো ধার। তাই তাঁর চেনা লোকেদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা অসহ্য ঠেকে। তবে যুগটার রীতি-ই ছিল ঐ।' গম্ভীরভাবে সে যোগ করল।

পলজভ বলল, 'একটা কথা বলতে ভুলেছি। একবার এক উলান ব্রিগেডের কমাণ্ডারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁর নাম ইলিন। তোমাকে দেখার জন্য তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তোমার বাবার খুব ভক্ত লোক তিনি।'

'এ ইলিন লোকটা মনে হচ্ছে একটা অপদার্থ লোক। আর সত্যি বলতে কী, বাবার পরিচিত বলে যাঁরাই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চান, তাঁরাই বাবার বিষয়ে লজ্জাকর গল্প বলেন, যদিও সেগুলো তাঁরা বলেন মজাদার ইতিবৃত্ত হিসেবে। অস্বীকার করি না, আমি সর্বদাই সব ব্যাপারের একটা নিরাসক্ত বস্তুগত তাৎপর্য নিয়ে থাকি। বাবা ছিলেন খুবই মাথা-গরম লোক। অনেক সময় অনেক অনুচিত কাজও করেছেন। কিন্তু এ সবই সেই যুগের কল্যাণে। এ যুগে জন্মালেও তিনি সফল হতেন, কারণ সঠিক বিচারে তাঁর গুণকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।'

মিনিট পনেরো পরে দানিলো ফিরে এসে জানালো, তার মা-ঠাকরুনের বাড়িতে রাত্রিবাসের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ঠাকরুন স্বয়ং।

তরুণ হুজার অফিসারটি কাউন্ট ফিওদর তুরবিনের ছেলে—এ কথা শুনে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আন্না ফিওদরভনা।

'হায় ভগবান! তোমার ভালো হোক, দানিলো! তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের বল্ যে মা-ঠাকরুন এ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।' প্রায় লাফ মেরে উঠে তাড়াহুড়ো করে ঝিয়েদের ঘরে যেতে যেতে, বললেন, 'লিজচ্‌কা! উস্তাতিউশ্‌কা! তোর ঘরটা আমরা ঠিক করে রাখব, লিজা। তুই দাদার ঘরে থাকিস। আর দাদা, তুমি······তোমাকে রাতটা থাকতে হবে ড্রয়িং-রুমে এক রাত্তিরের জন্য তোমার তেমন কিছু অসুবিধে হবে না।'

'না, কোন অসুবিধেই হবে না, বোন। আমি মেঝেতেই শোব।'

'ওকে নিশ্চয়ই দেখতে সুন্দর—বাপের মত যদি দেখতে হয়। একবার দেখব ওকে, মানিককে···তুই একটু সবুর কর, লিজা। ওর বাবাকে দেখতে কী সুন্দর ছিল!···ও টেবিলটা কোথায় নিয়ে চললি। ওটা ওখানেই থাক।' ব্যস্ত ভাবে এদিক-ওদিক যেতে যেতে হাঁকাহাঁকি করছিলেন আন্না ফিওদরভনা। 'দুটো খাট নিয়ে আয়—নায়েবের কাছ থেকে একটা। আর জন্মদিনে দাদা যে স্ফটিকের মোমদানিটা দিয়েছিল সেটা নিয়ে গিয়ে চর্বির বাতিটা বসিয়ে দে।'

শেষ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। মা-র হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও লিজা নিজের রুচি মত অফিসার দুজনের জন্যে ঘর সাজাল। সেন্ট-দেওয়া পরিষ্কার চাদর এনে বিছানায় পাতল। বিছানার পাশের টেবিলে রাখল এক জগ জল আর মোমবাতি, সুগন্ধি কাগজ পোড়াল ঝিয়েদের ঘরে, মামার ঘরে বিছানা করল নিজের। একটু শান্ত হয়ে আন্না নিজের জায়গায় বসে তাস তুলে নিলেন হাতে, কিন্তু সেগুলো সাজানো হল না। মেদস্ফীত কনুই টেবিলে রেখে স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন! সময় কী তাড়াতাড়ি চলে যায়! সত্যি কত তাড়াতাড়ি!' নিজেকেই তিনি ফিসফিস করে বলছিলেন। 'যেন কালকের কথা! তাকে এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কী বেপরোয়া ছিল লোকটা।' তাঁর চোখে জল এসে গেল। 'এখন লিজাংকার পালা। ওর বয়সে আমি যা ছিলাম ও তা নয়। বেশ ভাল মেয়ে, কিন্তু···আমার মতো নয়···'

'লিজচ্কা' আজ মসলিন ও লিনেনের পোশাকটা পরাই ভাল।'

'ওদের আপ্যায়ন করবে নাকি, মা? না ডাকাই ভাল।' অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ভেবে নিজের উত্তেজনা চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল লিজা। 'সত্যি বলছি মা, ডাকার দরকার নেই।'

সত্যি ওদের দেখবার ইচ্ছের চেয়ে আতঙ্ক তার বেশি। মনে হতে লাগল গোলমেলে একটা সুখের লগ্ন তার ঘনিয়ে এসেছে।

'ওরা নিজেরাই হয়তো আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইবে, লিজচ্কা।' আন্না বললেন মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন, 'ওর বয়সে আমার চুল এ রকম ছিল না...সত্যি লিজচ্কা তোকে নিয়ে আমার একটা আশা আছে...' সত্যি ওর জন্য আশা একটা করলেন। তরুণ কাউন্টের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের আশা তিনি করতে পারছেন না। আর স্বর্গত কাউন্টের সঙ্গে তাঁর মত সম্পর্ক লিজা করুক তরুণ কাউন্টের সঙ্গে সেটা তিনি চাইতে পারেন না। তবু মেয়ের জন্যে একটা কিছু চাইছেন খুবই আগ্রহের সঙ্গে। স্বর্গত কাউন্টের সঙ্গে তিনি যে আবেগ অনুভব করেছিলেন, সেটাই মেয়ের মাধ্যমে আবার বোধহয় তিনি জাগিয়ে তুলতে চাইছেন।

কাউন্টের আবির্ভাবে অশ্বারোহী বাহিনীর বৃদ্ধ অফিসারও অল্প উত্তেজিত। তিনি নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। মিনিট পনেরো পরে তিনি একটি মিলিটারী টিউনিক এবং ঘোড়ায় চড়ার নীল প্যান্ট পরে বেরিয়ে এলেন। বলনাচের গাউন পরে কুমারী মেয়ের মুখে আসে যেমন একটি খুশী ও আত্মসচেতন ভাব, তেমন মুখে গেলেন অতিথিদের জন্যে সাজানো ঘরে।

'এ আমলের হুজাররা কেমন দেখা যাক, বোন। খাঁটি হুজার ছিলেন স্বর্গত কাউন্ট। দেখা যাক, এদের দেখা যাক।'

পেছনের দরজা দিয়ে অফিসাররা তাদের নির্দিষ্ট ঘরে চলে গেল।

'কী বলেছিলাম?' সদ্য পাতা বিছানায় ধুলো-মাখা বুট পায়ে শুয়ে পড়ে কাউন্ট বলল। 'শুয়রে পোকার সেই ডেরার চাইতে এটা ভাল নয়?'

'নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু গৃহকর্তার কাছে একটা বাধ্যবাধকতায় পড়লাম।'

'আঃ! সব ব্যাপার একটা প্র্যাকটিক্যাল দিক থেকে দেখা দরকার।

তুমি নিশ্চিত থাকো, এঁরা ভীষণ খুশী হয়েছেন। বোর!' হাঁক দিল সে। 'জানলায় একটা কিছু টাঙিয়ে দিতে বল তো হে, নইলে রাত্তে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকবে।'

এই সময় বৃদ্ধ আলাপ করতে এলেন অফিসারদের সঙ্গে। স্বভাবতই তিনি না বলে পারলেন না—একটু লাল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও না বলে পারলেন না যে তিনি স্বর্গত কাউন্টের একজন বন্ধু ছিলেন, কাউন্ট তাঁকে বিশেষ প্রীতি-ভরে দেখতেন, এমন কি তাঁর কয়েকটা উপকার করে দিয়েছিলেন বলে তিনি ঋণী। 'উপকার' বলতে তিনি কোন্‌টা ভেবেছিলেন! একশো রুবল ধার শোধ না দেওয়া, বরফের স্তূপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেওয়া, অথবা তাঁকে অনর্গল খিস্তি করা—এর মধ্যে কোনটা তা বলা খুব কঠিন। বৃদ্ধ অবশ্য এটা বিশদ করলেন না। নবীন কাউন্ট বৃদ্ধকে খুবই সৌজন্য দেখালো এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবার জন্য ধন্যবাদ জানালো।

'তেমন ভাল ব্যবস্থা হয়নি বলে মাফ করবেন, কাউন্ট, (প্রায় 'হুজুর' বলে ফেলেছিলেন আর একটু হলে, পদস্থ লোকদের সম্বোধন করার ব্যাপারে এরই মধ্যে এত অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি), 'আমার বোনের বাড়িটা খুবই ছোট। জানলায় কিছু একটা টাঙিয়ে দেওয়া যাবে, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে'—পর্দার খোঁজে যাওয়ার অজুহাতে পা টানতে টানতে চলে গেলেন তিনি। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল অফিসারদের বিষয়ে অবিলম্বে একটা বর্ণনা দেওয়া।

মিষ্টি চেহারার ছোটোখাটো উসতিউশা জানলায় গৃহকর্ত্রীর শালটা টাঙাতে এলো। তাছাড়া অফিসাররা দয়া করে একটু চা খাবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন গৃহকর্ত্রী।

চমৎকার বাসস্থানে এসে কাউন্টের মেজাজ ভালো হয়েছে। তিনি মৃদু হেসে উসতিউশার সঙ্গে এমন ঠাট্টা শুরু করলেন যে সে তাকে 'ভারি, দুষ্টু আপনি' বলল। কাউন্ট জানতে চাইল তার দিদিমণিটি সুন্দরী কিনা। চা খাবেন কিনা, এর উত্তরে সে বলল, ঘরে নিয়ে আসতে পারে, তবে এখনও চাকর রাতের খাবার তৈরী করে নি বলে যেটা আরো বেশি দরকার সেটা হল কিছু ভোদকা, আর মুখে দেওয়ার মতো সামান্য কিছু, আর কিছুটা শেরী, অবশ্য যদি বাড়িতে থেকে থাকে।

তরুণ কাউন্টের আদবকায়দা ঘিরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন শিক্ষার

স্বামী। আজকালকার অফিসারদের শক্ত মুখে প্রশংসা করে বললেন, তারা তাদের বাপেদের চেয়ে অনেক ভাল, কোনো তুলনা হয় না।

আন্নার এতে মত হোলো না। স্বর্গত কাউন্টের চেয়ে আর কেউ ভালো হতে পারে না। শেষে সত্যি তিনি চটে উঠলেন ও ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'দাদা, তোমায় যে শেষবার আদর করে সেই শ্রেষ্ঠ লোক হয়ে যায়। অবশ্য এখনকার লোক আগের চেয়ে চালাক হচ্ছে সবাই জানে, তবু কাউন্ট ফিওদর ইভানভিচ এত অমায়িক ছিলেন, এত ভাল একসেস্ নাচতেন যে বলতে গেলে সবায়ের মাথা ঘুরে যেত, কিন্তু তিনি আমাকে ছাড়া আর কাউকে আমল দেন নি। তাহলে দেখছ তো আগেকার দিনেও ভালো লোকের অভাব ছিল না।'

সেই সময় ভোদকা, খাবার ও শেরী চাইবার কথা কানে এল।

'দেখলে তো, দাদা। ঠিক কাজটি তোমায় দিয়ে হয় না। রাতের খাবারের কথা বলা উচিত ছিল তোমার। লিজা, তুই ভার নে তো এ সবের, লক্ষ্মীটি।' বললেন আন্না।

লিজা তখনি ভাঁড়ার ঘরে ছুটল—জারানো ব্যাঙের ছাতা আর টাটকা মাখনের জন্য। রাঁধুনীকে বলল মাংসের টুকরো সেঁকতে।

'দাদা তোমার শেরী আছে?'

'না, বোন। শেরী কোন দিনই থাকে না আমার।'

'সে কি! তুমি চা-র সঙ্গে কী একটা খাও যে!'

'রাম্, আন্না ফিওদরভনা।'

'তফাৎ কী? ওদের ঐ দাও না। ঐ···ইয়ে···রাম্। তাতে কিছু এসে যাবে না। কিন্তু ওদের এখানে ডাকাই বোধহয় ভাল, তাই না? কী করা ঠিক হবে, তুমি জান; ওরা রাগবে না তো?'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার বললেন যে, তিনি নিশ্চিত যে কাউন্ট যথেষ্ট উদার, সে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে না। তিনি নিশ্চয়ই ওদের নিয়ে আসবেন। আন্না গেলেন তাঁর পোশাক পালটাতে আর নতুন টুপি পরতে। কিন্তু লিজা এত ব্যস্ত যে পরনের চওড়া-হাতা গোলাপী রঙের লিনেনের পোশাকটা বদলাবার সময় পেল না। তাছাড়া সে ভয়ংকর উত্তেজিত—যেন বিরাট একটা কিছু ঘটতে চলেছে, মাথার ওপর বুঝি একটা কালো মেঘ।

এই কাউন্টকে, সুন্দর, এই হুজারকে একটা অপূর্ব সৃষ্টি বলে সে ধরে নিল, অভিনব, অবোধ্য। তার হাবভাব, আদবকায়দা, কথা বলার ভঙ্গি—সবই নিশ্চয়ই এমন যা লিজা কোন দিন চোখেও দেখে নি। তার চিন্তা ও কথার সবই নিশ্চয়ই খুব সত্য ও বুদ্ধিসম্পন্ন। তার সব কাজ নিশ্চয়ই সাহসিক, দৃপ্ত। তার চেহারার প্রতিটি খুঁটিনাটিও ভাল হতে বাধ্য। এ সবে লিজার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কাউন্ট শুধু খাদ্য ও শেরী নয়, সুগন্ধি জলে স্নান করতে চাইলেও লিজা আশ্চর্য হত না এবং কোনো দোষ হয়েছে বলে মনে করত না। বরং মনে করত, এটাই ঠিক, এটাই যথাযোগ্য।

বৃদ্ধ আন্নার আমন্ত্রণ জানানো মাত্রই কাউন্ট তা গ্রহণ করল। সে তার চুল আঁচড়ালো, কোট চড়ালো গায়ে, সঙ্গে নিল সিগারেট-কেস্।

'এসো, যাওয়া যাক।' পলজভকে বলল।

'আমার মনে হয় না যাওয়া উচিত।' কর্ণেট জবাবে বলল—'আমাদের আপ্যায়ন করতে গিয়ে ওঁরা নিঃস্ব হয়ে যাবেন।' বৃদ্ধ যাতে না বোঝেন এই জন্যে শেষ কথাটি ফরাসী ভাষায় বলল।

'বাজে কথা! ওঁরা খুশী হবেন। আমি এর মধ্যেই খোঁজ নিয়েছি যে গিন্নীর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। এসো, এসো।' কাউন্টও ফরাসী ভাষায় উত্তর দিল।

বৃদ্ধ ফরাসী জানেন এবং তিনি যে সবই বুঝেছেন এটা জানাবার জন্যেই তিনি ফরাসী ভাষায় বললেন 'মশাইরা, আসুন আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

১২

লজ্জারক্তিম মুখ ও আনত চোখে লিজা ভান করছিল যেন সে চা ঢালতেই ভীষণ ব্যস্ত। অফিসাররা ঘরে ঢোকবার সময় সে তাদের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিল। অন্যদিকে আন্না আবার উলটো। তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন এবং ঈষৎ নত হয়ে অভিবাদন করলেন। কাউন্টের মুখ থেকে একবারও তাঁর চোখ সরল না। তিনি অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলেন। বললেন, তাকে দেখতে ঠিক তার বাপের মত। মেয়ের সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দিলেন। চা খেতে বললেন। জ্যাম ও গাঁয়ে তৈরি ফলের পেস্ট্ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কর্ণেট এত বিনীত যে তার দিকে কেউ বিশেষ

কোনো নজর দিল না। এর জন্য অবশ্য কর্ণেট কৃতজ্ঞই বোধ করল। কারণ এর ফলে সে অভব্যতা বাঁচিয়ে লিজার সৌন্দর্যের খুঁটিনাটি খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখবার সুযোগ পেল। তার সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হয়েছিল। বোনের কথা থামলে বৃদ্ধ কথা বলবে কাউণ্টের সঙ্গে এই জন্যে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। বৃদ্ধ নিজেকে সংযত রাখতে পারছিল না, কারণ তিনি তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর স্মৃতি বলবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কাউণ্ট একটা খুব কড়া সিগার ধরাল। এত কড়া যে লিজা অতি কষ্টে কাশি দমন করল। কাউণ্ট বেশ বলিয়ে-কইয়ে লোক এবং ভদ্র। প্রথমে আন্নার বাক্যস্রোতের মধ্যে মধ্যে দু' একটি কথা ছেড়ে পরে একাই একশো। একটা জিনিস খুব অদ্ভুত লাগল শ্রোতাদের কাছে। তার কথা-ব্যবহার নিজের দলে অশোভন বলে মনে না হলেও এখানে বিসদৃশ। তাতে একটু ভয় পেলেন আন্না, আর লিজার কর্ণমূল পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। কাউণ্ট কিন্তু এটা লক্ষ্য করল না। আগের মতই সে অবিচলিত ও অমায়িক। নিঃশব্দে গেলাস ভরে লিজা সেগুলো অতিথিদের হাতে না দিয়ে তাদের সহজ নাগালের মধ্যে নামিয়ে রাখল। তখনও তার উত্তেজনা রয়েছে। কাউণ্টের প্রতিটি কথা সে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। তার গল্পের তুচ্ছতায় এবং থেমে থেমে বলার ভঙ্গিতে লিজা নিজেকে সামলে নেবার একটু অবসর পেল।

তার প্রত্যাশিত কোনো জ্ঞানের কথা কাউকে বলল না। তার সব কিছুতে অভিজাত মার্জিত ভাব থাকবে বলে যে অস্পষ্ট প্রত্যাশা ছিল তাও দেখা গেল না। তৃতীয় গেলাস চা খাওয়ার সময়ে সলজ্জভাবে সে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে কাউণ্ট তার দিকে চেয়ে চেয়েই অবিচলিতভাবে কথা বলে চলল। চেয়ে থাকতে থাকতে মুখে এল অতি ক্ষীণ হাসি। তখন তার বিরুদ্ধে একটা বিরোধিতার ভাব অনুভব করল লিজা, অল্পক্ষণের মধ্যে তার কাছে ধরা পড়ল যে তার আর দশটা পরিচিত লোকেদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই ওর। ওকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ওর নখ লম্বা আর যত্নে পরিষ্কার করা বটে, তবু ওকে এমন কি বিশেষ সুন্দর পর্যন্ত বলা চলে না। আর হঠাৎ তার সব কল্পনা অবাস্তব বুঝতে পেরে শান্ত হয়ে উঠল লিজা। মনে রইল শুধু একটু অনুশোচনা। একটা জিনিসে শুধু সে বিচলিত। বুঝতে পারল চুপচাপ বসে কর্ণেট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'হয়তো ও নয়, এই আসল লোক।' ভাবল সে।

চায়ের পর বৃদ্ধা অতিথিদের অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলেন নিজের অভ্যস্ত জায়গায়।

'আপনি হয়তো একটু বিশ্রাম করবেন, কাউন্ট', বললেন তিনি, 'আপনাদের কী ভাবে যে খুশী করি, আমার প্রিয়-অতিথিরা। আপনি তাস খেলেন কাউন্ট? দাদা, এক হাত তাসের একটু ব্যবস্থা কর তো।'

ভাই বললেন, 'কিন্তু তুমি তো খেল প্রেফারেন্‌স্। আমরা কি গেম্ খেলতে বসব? কাউন্ট, খেলবেন? আর আপনি?'

অফিসাররা জানাল যে বাড়ীর লোকেরা যা করবে, তাইতেই তারা রাজী।

লিজা পুরানো তাসের একটা প্যাকেট নিয়ে এলো। এই তাস দিয়ে সে ভাগ্য গণনা করত—আন্নার দাঁতের ব্যথা চলে যাবে কিনা, মামা কখন শহর থেকে ফিরবে, পড়শী আজ কেউ তাদের বাড়ীতে আসবে কিনা, এই এই সব। দু'মাসের পুরানো হওয়া সত্ত্বেও তাসগুলো আন্নার ভাগ্যগণনার তাসের চেয়ে বেশি পরিষ্কার।

'অল্প বাজীতে খেলা বোধহয় আপনাদের পছন্দ হবে না।' শুধোলেন মামাবাবু। 'আন্না আর আমি পয়েন্ট পিছু আধ-কোপেক ধরে খেলি, তাহলে হয় কী, ও আমাদের সবাইকে পথে বসায়।'

'আপনাদের যাতে ইচ্ছে, তাতেই আনন্দ পাব।' বলল কাউন্ট।

'তাহলে এক কোপেক করে হোক—কাগজের টাকা। এরকম অসাধারণ অতিথিদের খাতিরে তা চলে। দিন বুড়ীটাকে ফতুর করে।' কেদারায় আরামে রাখলেন নিজেকে এবং শালের লেস্-এ হাত বোলাতে বোলাতে বললেন।' নিজের মনে মনে বললেন, 'হয়তো ওদের কাছ থেকে এক রুবল জিতব আমি।' বুড়ো বয়সে জুয়ার নেশা তাকে একটু ধরেছে মনে হয়।

কাউন্ট বলল, 'যদি রাজী থাকেন, "অনার্স" নিয়ে খেলাটা আপনাকে শিখিয়ে দিই, আর "মিজারি" নিয়ে খেলাটাও। খুব মজার খেলা।'

খেলার নতুন সেণ্ট পিতার্সবুর্গ পদ্ধতিতে সবাই খুশী। মামাবাবু বললেন, পদ্ধতিটা তিনি এক সময় জানতেন অনেকটা "বস্টন" খেলার মত। কিন্তু

এখনো মনে নেই। কিছুই বুঝল না আন্না। বেশিক্ষণ বুঝল না বলে মৃদু হেসে মাথা নেড়ে 'বুঝেছি, সব বুঝেছি' বলাটা উচিত মনে করছিলেন।

খেলার সময় টেক্কা ও রাজা হাতে থাকা সত্ত্বেও 'মিজারি' ডেকে ছ দান পেলেন; তখন ছোট একটা..হাসির ঢেউ বয়ে গেল। বিব্রত হয়ে ক্ষীণ হাসি হেসে তাড়াতাড়ি তিনি জোর দিয়ে বললেন খেলার নতুন নিয়মটা তাঁর এখনও সড়গড় হয়নি। তবু হারের অঙ্কটা বসল তাঁর নামে। অঙ্কটা বেশ। বিশেষ করে এই জন্য যে বড় বাজি রেখে খেলতে অভ্যস্ত কাউন্ট খেলছিল সাবধানে, হিসেব রাখছিল সঠিক। টেবিলের নিচে কর্ণেটের পায়ের ধাক্কা আর খেলায় তার তাজ্জব ভুলের অর্থটা ধরা পড়ল না তার কাছে।

লিজা নিয়ে এলো আরো ফলের পেস্ট, তিন রকমের জ্যাম এবং একটা বিশেষ ধরনে তৈরি আপেল। মা র পেছন থেকে সে খেলাটা দেখতে লাগল, মাঝে মাঝে অফিসারদের দেখে নিচ্ছিল। বিশেষত তাস ফেলে জিতের তাস-সুদ্ধ দক্ষতায় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে নেওয়ার সময় কাউন্টের সূক্ষ্ম সাদা লালচে নখ চোখে পড়ছিল তার।

আন্না আবার অস্থির হয়ে অন্যদের হারাবার বেপরোয়া চেষ্টায় মাথা গুলিয়ে সাত অবধি ডেকে নিলেন মাত্র চার এবং ভাইয়ের অনুরোধে হিসেবের কাগজে অবোধ্য সংখ্যার হিজিবিজি লিখলেন।

'সাহস করে খুশী মনে খেলে যাও, মা। সব আবার জিতে ফিরে পাবে।' মা যে হাস্যকর অবস্থায় পড়েছেন তা থেকে উদ্ধারের চেষ্টায় লিজা মৃদু হেসে বলল। 'তুমি মামার তাস নাও, তাহলে মামা মুস্কিলে পড়ে যাবে।'

আন্না মেয়ের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তুই আমায় একটু সাহায্য কর না, লিজচকা, জানি না কী করে......'

'এ নিয়মের খেলা আমিও জানি না।' মার ক্ষতির পরিমাণটা চট্ করে মনে মনে হিসেব করে নিয়ে লিজা বলল। 'কিন্তু এই হারে যদি হারো তাহলে সবই যাবে। পিমচকাকে একটা ফ্রক কিনে দেওয়ার পয়সা পর্যন্ত থাকবে না।' ঠাট্টার সুরে যোগ করল।

'ঠিক বলেছেন। এভাবে খেললে অন্তত দশটা রুপোর রুবল খুব সহজেই হারা যায়।' লিজার দিকে চোখ রেখে কর্ণেট বলল। লিজার সঙ্গে আলাপ শুরু করার ইচ্ছেয় এই সূত্রপাত।

'কেন? আমরা কাগজের টাকা দিয়ে খেলছি না?' খেলুড়েদের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে বললেন আন্না।

'হতে পারে।' কাউন্ট বলল। 'কিন্তু কাগজের টাকা কী করে হিসেব করতে হয় আমি জানি না। কী করে.........মানে কাগজের টাকা জিনিসটা কী?'

'আজকাল কেউ কাগজের টাকায় খেলে না।' মামা বললেন। তিনি তখন জিতছিলেন।

ফলের রস আনিয়ে বৃদ্ধা নিজেই দু গেলাস খেয়ে ফেললেন। মুখটা লাল হলো এবং যেন হতাশায় হাত দুটো ছুঁড়লেন মনে হলো। তাঁর টুপির তলা দিয়ে একগুচ্ছ পাকা চুল বেরিয়ে এসেছিল—তা ভেতরে গুঁজে দিতে তাঁর হুঁস হল না। সন্দেহ নেই, তাঁর মনে হচ্ছিল যে তিনি লাখ লাখ টাকা খুইয়েছেন এবং এখন সর্বস্বান্ত। টেবিলের তলায় কর্ণেট কাউন্টকে বার বার লাথি মারছিল। কাউন্ট বৃদ্ধার হারের অঙ্ক নিয়মিতভাবে লিখে গেল।

অবশেষে খেলা শেষ হল। বিবেকের বালাই না রেখে নিজের ভাগে কিছু যোগ করার এবং হিসেবে ভুল করেছেন আর সাধারণতঃ তিনি হিসেব করতে অপারগ এই ভান করার প্রবল চেষ্টা আর নিজেকে প্রচুর লোকসানের আতঙ্ক সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হিসেবে দেখা গেল যে তিনি ন' শো বিশ পয়েন্ট হেরেছেন? 'তার মানে কাগজের টাকায় ন' রুবল তো?' বার কয়েক তিনি সুধোলেন। নিজের হারের টাকা কতটা তা তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। তাঁর ভাই তাঁকে আঁতকে দিয়ে হিসেব বুঝিয়ে বললেন, আন্না কাগজের সাড়ে বত্রিশ রুবল হেরেছেন এবং টাকা দিতেই হবে।

খেলা-শেষে কত জিতেছেন সেই হিসেবের ভ্রূক্ষেপ না করে উঠে জানালার ধারে গেল কাউন্ট। তার কাছে লিজা রাতের খাওয়ার জন্য পানীয় ও ব্যাঙের ছাতা সাজাচ্ছিল। কর্ণেট সারা সন্ধ্যে চেষ্টা করেও যাতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই কাজটি কাউন্ট সরাসরি ও অনায়াসে করে ফেলল। সে লিজার সঙ্গে আবহাওয়া সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করে দিল।

সেই মুহূর্তটিতে কর্ণেটের অবস্থা অত্যন্ত করুণ, কাউন্ট চলে যেতে, আর যে লিজা তাঁকে এতক্ষণ সাহস যোগাচ্ছিল, সে তাঁর কাছ থেকে টেবিল সাজাতে চলে যাওয়ায় বৃদ্ধা আর নিজের আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না।

'আপনার টাকা জিতে নেওয়ায় আমি সত্যি খুবই দুঃখিত। কিছু একটা বলার জন্য বলল পলজভ। 'আমাদের দিক থেকে এটা ভদ্রতা হয় নি।'

'আপনাদের এই সব "অনার্স" আর "মিজারির" খেল্! ও রকম আমি খেলতে জানি না। কাগজের টাকায় কত যেন বললেন?' শুধোলেন বৃদ্ধা।

'বত্রিশ রুবল। সাড়ে বত্রিশ।' অশ্বারোহী বাহিনীর বৃদ্ধ অফিসার বললেন। জিতে এখন তিনি খুব খুশী মেজাজে আছেন। 'আমায় টাকাটা দাও, বোন। এসো, টাকাটা দিয়ে দাও।'

'এই শেষবার আমি টাকা দিচ্ছি। এর পর আর আমার কিছু থাকবে না। এত আমি কোন দিন জিততেও পারব না।'

আন্না তাঁর বিশিষ্ট দোলন-ভঙ্গিতে হেঁটে গিয়ে ন' রুবলের কাগজের টাকা নিয়ে এলেন। বৃদ্ধের জোরাজুরিতেই তিনি পুরো টাকাটা দিলেন।

এখন কথা বললে তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ বক্তৃতা শুরু করে দেবেন আন্না, এই রকম একটা আশঙ্কা পলজভের মনে দেখা দিয়েছিল। সেইজন্যে সে নিঃশব্দে গিয়ে ভিড়ল কাউণ্ট ও লিজার সঙ্গে। তারা তখন জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

খাওয়ার টেবিলে দুটি মোমবাতি। মে মাসের রাতের তাজা উষ্ণ হাওয়ায় তাদের শিখা দু'টি মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। জানালা দিয়ে আলো পড়েছে বাগানে। কিন্তু ঘরের ভেতরের আলোর চেয়ে বাইরের আলোটা দেখাচ্ছে একদম আলাদা। প্রায় পূর্ণচন্দ্র, কিন্তু এখন তার সোনালী আভা ঝরে গেছে। চাঁদ এখন লাইম গাছের চূড়ার ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে। বয়ে-যাওয়া স্বচ্ছ সাদা রোঁয়া-রোঁয়া মেঘগুলোকে ভাসিয়ে দিচ্ছে ক্রমশ জোরালো জ্যোৎস্নায়। পুকুরে ব্যাংগুলো সমস্বরে ডাকছে। গাছের ফাঁক দিয়ে পুকুরের একটুখানি জল দেখা যাচ্ছে সে জলটা জ্যোৎস্নায় রুপোর মত ঝকঝক করছে। জানলার নিচে হাওয়ায় দুলেছে সুগন্ধি ভিজে লাইলাক ফুলের গুচ্ছ। ঐ লাইলাক ঝোপের মধ্য থেকে শোনা যাচ্ছে কয়েকটা পাখির লাফালাফি ও পাখার ঝাপট।

'কী চমৎকার রাত!' লিজার কাছে গিয়ে জানলার নিচু ধাপে কাউণ্ট বলল।

'হ্যাঁ', লিজা বলল। কী এক অজ্ঞাত কারণে কাউণ্টের সঙ্গে কথা বলতে

তার এক বিন্দুও অস্বস্তি হল না। 'বাড়ির কাজকর্মের জন্যে সকাল সাতটায় উঠে বেরোই। পিঁচ কা, যে ছোট্ট মেয়েটিকে মা পুষ্যি নিয়েছেন, ঐ ওকে সঙ্গে নিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসি।'

'গাঁয়ে বাস করা সত্যি একটা আনন্দের ব্যাপার।' বলল কাউন্ট। সে মনোকল্‌টা চোখে বসিয়ে একবার বাগানের দিকে, একবার লিজার দিকে তাকাচ্ছিল। 'রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় কি আপনি বেড়াতে বেরোন?'

'এখন নয়। তিন বছর আগে আমি আর মামা প্রতিটি জ্যোৎস্না রাতে বেড়াতে যেতাম। কিন্তু তখন ওঁর একটা অদ্ভুত অসুখ হোতো—ওঁর ঘুম হোতো না। পূর্ণিমার রাতে ওঁর ঘুম আসত না। তাঁর ঘর—ঐ যে ওখানে—সরাসরি বাগানের ওপর আর জানালাটা নিচু। তাই চাঁদের আলো পুরো ওঁর ওপর পড়ে।'

'আশ্চর্য!' কাউন্ট বলল। 'আমি ভেবেছিলাম ওটা আপনার ঘর।'

'ওখানে আমি শুধু আজ রাতের জন্যে শুচ্ছি। আমার ঘরে আপনারা শুচ্ছেন।'

'সত্যি? আপনার অসুবিধে ঘটাচ্ছি বলে আমি নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।' এবং আন্তরিকতার চিহ্নস্বরূপ চোখ থেকে মনোকল্‌ খুলে রাখল। 'আমরা এসে পড়ে আপনাদের এমন অসুবিধেয় ফেলব জানলে—'

'কোনো অসুবিধে নেই। বরং আমি খুশী। মামার ঘরটা খুব চমৎকার খুব আলো, আর ভাল লাগে। জানালাটাও নিচু। ঘুমিয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত সেখানে আমি বসে থাকব। কিংবা হয়তো আমি শোয়ার আগে বাগানে বেরিয়ে একটু ঘুরেও আসতে পারি।'

'কী মিষ্টি মেয়েটি!' ভাবল কাউন্ট মনোকল্‌টি আবার চোখে পরল যাতে তাকে ভাল করে দেখা যায়। আর জানালার নিচু ধাপে বসার ছলে লিজার পা নিজের পায়ের আঙুল দিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করতে লাগল। 'আর কী চতুরভাবে জানাল যে আমি ইচ্ছে করলে রাতে ঐখানে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি!' বাস্তবিক মেয়েটিকে এত সহজে জয় করে ফেলেছে মনে হওয়াতে তার প্রতি আগেকার আকর্ষণ অনেক কমে গেল।

অন্ধকার বীথিপথের দিকে ভাবুকের মত তাকিয়ে কাউন্ট বলল 'সত্যি, মনের মানুষকে নিয়ে বাগানে আজকের রাতটা কাটানো কী আনন্দের।'

কথাটায়, আর যেন দৈবাৎ কাউন্টের পা নিজের পায়ে আর একবার ঠেকে যাওয়ায় বিব্রত বোধ করল লিজা। সেটা ঢাকার জন্যে কিছু না ভেবেই যা হোক একটা কথা তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করল। বলল, 'হ্যাঁ, জোৎস্নায় বেড়াতে খুবই ভালো লাগে।' অস্বস্তি বোধ করে ব্যাঙের ছাতার রোয়াম বন্ধ করে চলে যাওয়ার উপক্রম করছে, এমন সময় কর্ণেট এসে পড়ল, আর লোকটা কেমন তা দেখবার আকস্মিক ইচ্ছে হল তার।

'কী সুন্দর রাত!' কর্ণেট বলল।

'আবহাওয়া ছাড়া এদের কথার অন্য কোনো বিষয় নেই।' ভাবল লিজা।

'আর দৃশ্যটা কী চমৎকার!' কর্ণেট বলে চলল। 'তবে আমার ধারণা আপনি নিশ্চয়ই এ সব সম্পর্কে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন?' সে যোগ করল। যাদের সে খুবই পছন্দ করে তাদের পক্ষে অপ্রীতিকর কথা সর্বদা বলার একটা অদ্ভুত অভ্যেস তার আছে।

'তা কেন ভাবছেন? এক জিনিস খেতে বা এক ফ্রক পরতে মানুষের একঘেয়ে লাগে, কিন্তু সুন্দর বাগান কি কারো একঘেয়ে লাগে নাকি— বিশেষ করে যেখানে আকাশের অনেক উঁচুতে চাঁদ ওঠা দেখা যায়। মামার ঘর থেকে পুকুরটা পুরোই দেখা যায়। আজ রাতে সেটা দেখব।'

'এখানে বোধহয় নাইটিংগেল্ নেই, তাই না!' কাউন্ট শুধোল। খুবই বিরক্ত সে। পলজভ আর সময় পেল না, ঠিক সময়টাতে নাক গলাতে এসেছে এবং নৈশ সাক্ষাতের কথাটা পাকা হচ্ছে না।

'না। আগে ছিল। কিন্তু গেল বছর এক শিকারী একটিকে ধরেছিল, আর এ বছর—মানে গেল সপ্তাহে—একটিকে সুন্দর গান গাইতে শুনেছি। কিন্তু একজন কনস্টেবল গাড়ির ঘন্টা বাজিয়ে গেল, আর পাখিটা ভয় পেয়ে পালালো। গেল বছরের আগের বছর আমি আর মামা বাগানের পথে গাছের নিচে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ওদের গান শুনতাম।

মামা এসে বললেন, 'এই খুদে বকুনবুড়িটি কী বকবক করছে! কিছু খাওয়া-দাওয়া করবেন তো আপনারা, চলুন।'

খাওয়ার সময় কাউন্ট খাবারের প্রশংসা করল। আর খেল বেশ জোরদার ভাবে। এতে মামার মেজাজ একটু প্রসন্ন হল। খাওয়ার পর অফিসাররা বিদায় নিয়ে তাদের ঘরে চলে গেল। কাউন্ট মামার করমর্দন

করল এবং আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে তাঁর হাতে চুমু না খেয়ে করমর্দন করল। এমন কি লিজারও করমর্দনের সময় সোজা তার চোখে চোখ রেখে হাসল তার সেই মৃদু ও প্রসন্ন হাসি। তার এই দৃষ্টিতে লিজা অস্বস্তি বোধ করল।

'লোকটা দেখতে সুন্দর।' ভাবল লিজা। 'কিন্তু দেমাক বড্ডো বেশি।'

১৪

'লজ্জা করছে না তোমার! ঘরে গিয়ে পলজভ বলল। 'আমি নিজেদের হারাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি, টেবিলের তলায় তোমায় লাথিও মারছিলাম ঐ জন্যে। তোমার বিবেক বলে কোনো পদার্থ নেই। বৃদ্ধা রীতিমত কষ্টে পড়েছেন।'

কাউন্ট হাসিতে ফেটে পড়ল।

'কী অদ্ভুত বুড়ীটা। মনে বড় কষ্ট পেয়েছে!'

আর একটা দমকা হাসিতে সে এমন ভাবে ফেটে পড়ল যে জোহান পর্যন্ত চোখ নিচু করে একটু গোপনে মুচকি হাসি হেসে ফেলল। জোহান তাদের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

'বাড়ির পুরানো বন্ধুর ছেলে!...হাঃ, হাঃ হাঃ!' কাউন্ট হাসতে লাগল।

'কিন্তু সত্যি এটা ভালো হয়নি। আমার তো বৃদ্ধার জন্য দুঃখ হচ্ছিল।' কর্ণেট বলল।

'যন্টা! তুমি এখনও এত খোকাটি রয়ে গিয়েছ। তুমি কি আশা করেছিলে যে আমি বসে বসে হারব! কেন, হারতে যাব কেন? খেলাটা ভাল করে-শেখবার আগে আমিও অনেক হেরেছি। দশটা রুবল আমার বেশ কাজেই লাগবে, বন্ধু। খোকাদের দলে যদি নাম না লেখাতে চাও, তাহলে জীবন সম্পর্কে আর একটু প্র্যাকটিকাল হও হে।'

পলজভ চুপ করে রইল। নিজের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে সে লিজার কথা ভাবতে চাইছিল। লিজাকে তার আশ্চর্য পবিত্র ও সুন্দর বলে মনে হয়েছিল। কাপড়জামা ছেড়ে তার জন্য পাতা নরম পরিষ্কার বিছানায় সে শুয়ে পড়ল।

'ফৌজী জীবনের সম্মান আর গৌরব—যত সব বাজে!' শালে ঢাকা

জানালা দিয়ে চাঁদের ফিকে আলো আসছিল। সেই দিকে তাকিয়ে সে ভাবল। 'এই হলো সুখ। শান্তির এক কুটীরে সরল বুদ্ধিমতী ও মধুর একটি বৌকে নিয়ে থাকা। এই হল আসল আর স্থায়ী সুখ।'

কেন যেন মনের এই কথাটি বললে না বন্ধুকে। গাঁয়ের মেয়ের উল্লেখও করল না তার কাছে—যদিও সে নিশ্চিত ছিল যে কাউন্টও এখন লিজার কথা ভাবছে।

'কাপড়জামা ছাড়ছ না কেন?' কাউন্টকে সে জিজ্ঞেস করল। কাউন্ট মেজেতে পায়চারি করছিল।

'কেন যেন ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না।' তুমি ঘুমোতে চাইলে আলোটা নিবিয়ে দাও। আমার আলোর দরকার নেই।'

সে পায়চারি করতে লাগল।

'ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। পুনরাবৃত্তি করল পলজভ। সন্ধ্যার সব ঘটনায় নিজের ওপর কাউন্টের প্রভাবে তার বিরক্তি হচ্ছে। এত বিরক্তি আগে কখনো হয়নি। প্রভাবটা ঠেকানোর মত তার মনের অবস্থা এখন। 'অনুমান করা কিছু শক্ত নয়।' মনে মনে সে তুরবিনকে বলল। 'তোমার পরিচ্ছন্ন মাথাটার মধ্যে কোন চিন্তা বুড়বুড়ি কাটছে! লিজার দ্বারা কেমন মোহিত হয়েছিলে সে তো দেখলাম। কিন্তু এমন একটি সরল ও সৎ মেয়েকে বোঝা তোমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি ঐ মিনাদেরই চাও, আর চাও কর্ণেলের তারকাচিহ্ন। কিন্তু এখানে—লিজাকে কেমন লাগল জিজ্ঞেস করি।'

কিন্তু পাশ ফিরে কাউন্টকে বলতে যাবে এমন সময় হঠাৎ সে মত পালটালো। মনে হল লিজার বিষয়ে কাউন্টের যা ধারণা হয়েছে বলে সে ধরে নিয়েছে ঠিক যদি তাই হয় তাহলে শুধু যে আপত্তি জানাতে পারবে না তাই নয়, হয়তো দেখবে তার কথায় সায় পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে, কাউন্টের প্রভাব মেনে নেওয়াটা তার এমনি অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে—যদিও দিনের পর দিন প্রভাব আরো অযৌক্তিক ও আরও অসহ্য হয়ে পড়েছে।

'কোথায় যাচ্ছ?' কাউন্ট টুপি পরে দরজার দিকে যেতে সে শুধোল।

আস্তাবলে। সব কিছু ঠিক আছে এটা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাই।

'অদ্ভুত' ভাবল কর্ণেট। কিন্তু সে মোমবাতিটা নিবিয়ে পাশ ফিরে

গুলো। তার বন্ধু তাঁর মধ্যে যে সব ঈর্ষা ও বিরোধিতা চাগিয়ে তুলেছে—সেগুলি ভুলতে চাই। সে।

আন্না এদিকে নিয়ম মাফিক ভাই, মেয়ে ও পোস্তকে চুমু খেয়ে ও তাদের ওপর ক্রুশ চিহ্ন করে নিজের ঘরে শুতে গেছেন। এক দিনে এত সুতীব্র নানা অনুভূতি বহুকাল তাঁর হয়নি। শান্ত চিত্তে তিনি প্রার্থনা পর্যন্ত করতে পারলেন না। স্বর্গত কাউন্টের বিষণ্ণ ও সুস্পষ্ট স্মৃতি আর তাঁর কাছ থেকে নির্লজ্জভাবে টাকা-কেড়ে-নেওয়া এই ছোকরা ফুলবাবুটির কথা এত বিচলিত করছিল তাঁকে। তবু কাপড়জামা ছেড়ে বিছানার পাশে ছোট টেবিলে তাঁর জন্যে সর্বদা রাখা আধ গেলাস কৃভাস খেয়ে তিনি বরাবরের মত বিছানায় ঢুকলেন। আদরের বেড়ালটা গুড়ি মেরে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। তাকে কাছে ডেকে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে শুনতে লাগলেন তার গলার গরগর আওয়াজ, ঘুম আসছিল না তাঁর।

'বেড়ালটার জন্যেই জেগে থাকতে হচ্ছে' এই ভেবে ঠেলে সরিয়ে দিলেন সেটাকে। মেঝেতে আলতো ভাবে পড়ে বেড়ালটা ফোলাফাঁপা ল্যাজ বেঁকিয়ে চুল্লির তক্তার ওপর উঠল লাফিয়ে। ঠিক সেই সময় গিন্নির ঘরের মেঝেতে যে ঝি-টি শুতো সে এসে মাদুর এনে বিছিয়ে বাতিটা নিবিয়ে আইকন্‌বাতি জ্বালাল। নাসিকাধ্বনি করতেও তার বেশি সময় লাগল না। কিন্তু আন্নার বিক্ষুব্ধ মনে ঘুম শান্তি আনে না, চোখ বুঁজলেই দেখেন হুজারের মুখ. আর চোখ খুললে মনে হয় ঘরের সব কটা জিনিস বিচিত্রভাবে তারি প্রতিচ্ছবি—আইকন-দীপে অল্প-উদ্ভাসিত কমোড়, টেবিল, টাঙানো সাদা ফ্রকগুলো, সব কিছু। পালকের লেপে এই মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে, পরের মুহূর্তে আবার ঘড়ির ঘন্টা বা ঝি-র নাক ডাকার বিরক্তি ধরে যাচ্ছে। মেয়েটিকে জাগিয়ে হুকুম দিলেন যেন নাক না ডাকে। মনে অদ্ভুত ভাবে জট পাকিয়ে যাচ্ছে মেয়ের কথা, স্বর্গত কাউন্ট ও তরুণ কাউন্টের কথা, 'প্রেফারেন্‌স্' খেলার কথা। একবার দেখলেন ওয়াল্‌জ্ নাচছেন স্বর্গত কাউন্টের সঙ্গে। দেখলেন, নিজের পুষ্ট শুভ্র কাঁধে কার যেন ঠোঁটের ছোঁয়া। আবার দেখলেন তরুণ কাউন্টের বাহুর বন্ধনে মেয়েকে। উসতিউশকা আবার নাক ডাকতে আরম্ভ করেছে···

'না, না। লোকে আগে যা ছিল এখন আর তা নেই। আমার জন্যে তিনি আগুনে বা জলে ঝাঁপ দিতে পরোয়া করতেন না।– তার যথেষ্ট

কারণও ছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ঐ গাধাটা এখন ঘুম দিচ্ছে, জিতেছে বলে আনন্দে ডগমগ, প্রেম করতে ও গা তুলতে অনিচ্ছুক। কিন্তু হাঁটু গেড়ে বসে ওর বাবা কী না বলতেন আমাকে। 'আমি কী করলে তুমি খুশি হও? নিজেকে মেরে ফেলব? তোমার জন্য তা আমি হাসিমুখে করব।' আমি চাইলে তা নিশ্চয়ই করতেনও।

হঠাৎ হল্-ঘরে শোনা গেল খালি পায়ের মৃদু শব্দ। আর লিজা বিবর্ণ ও কম্পিত অবস্থায় তার ড্রেসিং-জ্যাকেটের ওপর শুধু শাল চাপিয়ে ছুটে ঘরে এসে পড়ে গেল মায়ের বিছানায়......

মাকে শুভরাত্রি জানিয়ে লিজা একা তার মামার ঘরে গিয়েছিল। সাদা ড্রেসিং-জ্যাকেট পরে, লম্বা চুল রুমালে বেঁধে সে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল। জানলাটা খুলে দিল। পা গুটিয়ে বসল একটা চেয়ারে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল পুকুরটির দিকে—যেখানটা এখন রূপোলি আলোয় চিকমিক করছে!

দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কাজ ও আগ্রহের বস্তু হঠাৎ সম্পূর্ণ একটা নতুন আলোয় তার কাছে দেখা দিল। বৃদ্ধা খামখেয়ালী মা, যার প্রতি প্রশ্নহীন ভালোবাসা তার সত্তার অংশ। তার সদয় অথচ দুর্বল মামা। তরুণী কর্ত্রীর অনুগত বাড়ির ভৃত্যরা। দুধলো গোরু আর বাছুর। এরা এবং তার স্বাভাবিক পরিবেশ, যেখানকার হেমন্তের শীর্ণতা ও বহু বসন্তের নবান্বিত সজীবতা, যার মধ্যে সে ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে সে এত বড়টা হয়েছে—এ সমস্ত এখন তার কাছে মনে হোলো কিছু না। মনে হল ক্লান্তিকর, অপ্রয়োজনীয় কে যেন তার কানে ফিস ফিস করে বলল, 'কী বোকা তুই! কী বোকা! সত্যিকার জীবন আর সুখ কাকে বলে তা জানলি না, বিশটা বছর শুধু অন্যের কাজে নষ্ট করেছিস! উজ্জ্বল শান্ত বাগানের গভীরে চেয়ে এ সব চিন্তা তার মাথায় প্রবল ভাবে এল, এত প্রবলভাবে আর কোন দিন আসে নি এর আগে। কী থেকে এ সব কথা মনে জাগল? কেউ কেউ ভাবতে পারেন এ বোধহয় কাউন্টের প্রতি আকস্মিক পূর্বরাগ। কিন্তু তা মোটেই সত্যি নয়। বরং তার কাউন্টকে ভাল লাগে নি। কর্ণেটের প্রেমে সে অনেক অনায়াসে পড়তে পারত। কিন্তু লোকটি সাদাসিধে, আর স্বল্পভাষী। লিজা এরই মধ্যে তাকে ভুলে গেছে। কিন্তু ক্রোধ ও বিরূপতার সঙ্গে কাউন্টকে মনে পড়ছে। 'না, এ সে লোক নয়।' মনে

মনে বলল সে। তার আদর্শ পুরুষ হল সর্বাঙ্গসুন্দর। এমন একজন, যাকে এই রকম একটি রাতে, এই রকম একটি পরিবেশে পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে ভালবাসা যায়। স্থূল বাস্তবের সঙ্গে মাপসই করবার জন্য একবারও খর্ব করা হয় নি সে আদর্শকে।

প্রেমের যে বিপুল শক্তি ঈশ্বর আমাদের সকলের অন্তরে সমানভাবে দান করেছেন, সেটি গোড়ার দিকে লিজার অন্তরে অটুট ও অব্যাহত ছিল তার নিঃসঙ্গতায় ও কৌতূহল জাগানো লোকের অভাবে। কিন্তু অনেক দিন নিজের মধ্যে এই কিছু একটার অস্তিত্বের বিষণ্ণ আনন্দপূর্ণ অনুভূতি নিয়ে সে থেকেছে (মাঝে মাঝে রহস্যময় অন্তরের ঢাকনা খুলে চুপিচুপি তাকিয়ে তার পরম সম্পদকে উপভোগ করত)—এত দীর্ঘদিন থেকেছে যে হঠাৎ আসা যে কোন আগন্তুককে সেটা উজাড় করে দেওয়া চলে না। ঈশ্বর করুন যেন জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত সে এই সামান্য সুখটুকু নিয়ে থাকতে পারে। এটাই যে শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম আনন্দ নয়, তা কে বলতে পারে ? কে বলতে পারে যে একমাত্র এটাই আসল ও সম্ভাব্য আনন্দ নয় ?

'হে আমার প্রিয় ঈশ্বর !' মৃদুস্বরে বলল লিজা, 'আমার যৌবন ও সুখ কি চলে গেছে, তারা কেমন তা কি আমি জানব না কখনো—এ কি সম্ভব ? এ কি সত্যি ?' চোখ তুলে তাকালো উচ্চ উজ্জ্বল আকাশে, যেখানে তুলোর মত সাদা মেঘ চাঁদের দিকে এগোচ্ছে, তারাগুলোকে মুছে দিচ্ছে। 'একদম ওপরের মেঘটা যদি চাঁদকে ছোঁয়, তাহলে এটা সত্যি।' বলল সে নিজের মনে। দীপ্ত চন্দ্রের নিচের দিকটা ছুঁয়ে পেরিয়ে গেল একটা কুয়াশা ভরা ধোঁয়াটে ফালি, আর আস্তে আস্তে ঘাস, লাইম গাছের ডগা, আর পুকুরের ওপরের ঝকঝকে আলো ঝাপসা হয়ে গেল, আবছা হয়ে গেল গাছের কালো ছায়া। আর যেন পৃথিবীকে আঁধার করা বিষণ্ণ ছায়াগুলোতে সাড়া দিয়ে পাতার ওপর দিয়ে বইল মৃদুমন্দ হাওয়া……জানলায় বয়ে আনল শিশির সিক্ত পাতা, ভেজা মাটি ও লাইলাক ফুলের গন্ধ।

'না, এ সত্যি নয়।' সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল। 'আর যদি একটা নাইটিংগেলের গান আজ শুনতে পাই, তাহলে এই সব বিষণ্ণ চিন্তা নিতান্ত বোকামি, হতাশার কোনো কারণ নেই।' ভাবল সে। অনেকক্ষণ সে একা চুপচাপ বসে রইল যেন কার প্রত্যাশায়। মাঝে মাঝে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসাতে আলো হয়ে যাচ্ছে সব দৃশ্যটা, আবার পৃথিবীতে

ছায়া ফেলে চলে যাচ্ছে মেঘের পেছনে। প্রায় ঘুম এসে গেছে, পুকুরের ধার থেকে কানে এল একটি নাইটিংগেলের স্পষ্ট সঙ্গীত। চোখ খুলল গাঁয়ের মেয়েটি। উজ্জ্বল ও প্রশান্ত এই প্রসারিত প্রকৃতির সঙ্গে আবার নতুন আবেগে একটা রহস্যময় সাযুজ্যে উজ্জীবিত হল তার হৃদয়। কনুই-এ ভর দিয়ে বসল সে। অন্তরে মধুর বিষাদের মৃদু ছাপ। চোখ ভরে গেল জলে। সে অশ্রু পরিপূর্ণতার আশায় উদ্বেল, বিপুল ও পূত প্রেমের অশ্রু। শুভ সান্ত্বনাদায়ক অশ্রু। জানালায় বাহু রেখে তাতে মাথা রাখল সে। তার প্রিয় একটি প্রার্থনা মন্ত্র আপনা থেকেই অন্তরে জাগ্রত হল। আর যেমন ছিল ঠিক সেই ভাবে তন্দ্রায় ঢলে পড়ল। চোখে তার তখনো জল।

একটা হাতের ছোঁয়ায় সে জেগে উঠল। স্পর্শটি হালকা ও মধুর। বাহুর ওপর সেই স্পর্শ দৃঢ়তর হয়ে বসল। হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে এল, বুঝল কোথায় সে। অস্ফুটভাবে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল। জানলায় দাঁড়ানো জ্যোৎস্নায় আলোকিত মানুষটি কাউন্ট হতে পারে না, নিজেকে কথা বলতে বলতে সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

১৫

লোকটা কিন্তু কাউন্টই। মেয়েটির চীৎকার ও বেড়ার ওদিক থেকে রাতের চৌকিদারের গলা খাঁকারি শুনে সে দ্রুত শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে বাগানের গভীরে গিয়ে ঢুকল। হাতে-নাতে ধরা পড়া চোরের মত অবস্থা। 'আমি কী বোকা!' নিজেকে বলল সে। 'আমি মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে দিলাম। আরো সতর্ক হওয়ার দরকার ছিল। ওর সঙ্গে আগে কথা বলে ওকে জাগানো উচিত ছিল। বুদ্ধিহীন একটা পশু আমি।'

দাঁড়িয়ে সে শুনল, ফটক দিয়ে চৌকিদার বাগানে ঢুকছে, আর বালির পথ দিয়ে তার ছড়ি টানতে টানতে চলেছে। তাকে লুকোতে হবে। সে ছুটল পুকুরের পারে। পায়ের তলা থেকে ভয়ে লাফ মেরে উঠেই ঝপাস করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ব্যাঙগুলো, আর চমকে দিচ্ছে তাকে। পা গেছে ভিজে, তবু উবু হয়ে বসে যা যা করেছে তাই ভাবতে লাগল। কী করে বেড়া ডিঙোল, জানালাটা খুঁজল, অবশেষে লিজার সাদা ছায়াটা দেখতে পেল। সামান্য শব্দে ভীত হয়ে সে বার কয়েক এগিয়ে ও পিছিয়ে এসেছে। তারপরে সে এক সময়ে কী করে যেন নিশ্চিত হল যে লিজা তারই জন্যে

অপেক্ষা করছে, তাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছে বলে লিজা বিরক্ত হচ্ছে নিশ্চয়ই, পর মুহূর্তেই মনে হয়েছে, এত দ্রুত অভিসারে সম্মতি সে দিতে পারে না। পরে মনে হয়েছে, গাঁয়ের মেয়ে লজ্জায় ঘুমের ভান করে রয়েছে। তখন কাছে গিয়ে দেখেছে যে সে সত্যিই ঘুমন্ত। কী জানি কেন তখনই সে ছুটে চলে গিয়েছিল। কিন্তু ভীরুতার লজ্জায় আবার তখনি সে ফিরে এল এবং সাহসীভাবে লিজার বাহু ধরল।

রাতের চৌকিদার আবার গলা খাঁকারি দিল। ফটকে তার বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। লিজার ঘরের জানালা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, এবং ভেতরকার খড়খড়ি টেনে দেওয়া হল। এ সব কাউন্টের বড়ই বিরক্তিকর লাগল। আবার নতুন করে শুরু করবার জন্য সে তার সব কিছু দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল। না, দ্বিতীয় বার আর এমন বোকামি করবে না। 'চমৎকার মেয়ে! এমন তাজা! সত্যি সুন্দর। আর আমি কিনা আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে দিলাম। কী গাধা আমি।' এতক্ষণে তার ঘুমের সব ইচ্ছা চলে গেছে। ভয়ংকর বিরক্ত হয়ে সে দৃঢ় পদক্ষেপে চলল লাইম্ গাছের মধ্যেকার পথ ধরে।

কিন্তু এমন কি তারও মনে আজকের এই রাত শান্তির দান হিসেবে আনল প্রশান্ত এক বিষাদ ও প্রেমের জন্য আকুলতা। এখানে-ওখানে ঘাসের টুকরো ও শুকনো ডাঁটা ঠেলে বেরিয়েছে মাটির পথটায়। লাইম গাছের ঘন শাটা-পাতা ভেদ করে সোজা এসে চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্না আলো-ছায়ার দাগ ফেলছে সেই পথে। বাঁকা ডালের এক পাশে পড়েছে জ্যোৎস্না —দেখে এক এক সময় মনে হয় ডালের এ পাশে সাদা শ্যাওলা জমেছে। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে উঠছে রূপোলি পাতা। বাড়ির আলো নিভে গেছে। সব শব্দ থেমে গেছে। নাইটিংগেলের গানে শুধু ভরে গেল এই উজ্জ্বল, নিঃশব্দ, অবারিত স্থান। 'কী রাত! কী গৌরবময় রাত!' বাগানের তাজা সুরভিত হাওয়া বুকে ভরে নিতে নিতে কাউন্ট ভাবল। 'কিন্তু কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। মনে হচ্ছে, আমি অখুশী। নিজেকে বা অপরকে নিয়ে কোন সুখ নেই আমার। এমন কি, জীবনকে নিয়েও সুখী নই আমি। কী সুন্দর মধুর ছিল মেয়েটি। হয়তো ও সত্যি কিছু মনে করেছে……' এখানে চিন্তা নতুন মোড় নিল। বাগানে গাঁয়ের মেয়েটির সঙ্গে নিজেকে দেখল অত্যন্ত উদ্ভট ও বিভিন্ন নানা অবস্থা, তারপর গাঁয়ের

মেয়েটির জায়গা নিল মিনা। 'কী বোকামি না করেছি! উচিত ছিল শুধু ওর কোমর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া।' এই অনুশোচনা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল কাউন্ট।

কর্ণেট তখনো ঘুমোয় নি। তখনি পাশ ফিরে কাউন্টের দিকে চাইল।

'ঘুমোও নি।' শুধোল কাউন্ট।

'না।'

'কী ঘটল বলব?'

'কী?'

'বলা হয়তো উচিত নয়। তবু বলি। একটু সরে শোও তো।'

ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া সুযোগের চিন্তা কাঁধের ঝাঁকুনিতে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বন্ধুর বিছানায় বসল সে সজীব একটু হাসি মুখে টেনে।

'বিশ্বাস হবে কথাটা? গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল মেয়েটি।'

'কী বলছ?' লাফিয়ে উঠে পলজভ বলল।

'তাহলে শোনো।'

'কেমন করে? কখন? আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমরা যখন "প্রেফারেনস" জিতের হিসেব করছিলে, ও বলল রাতে জানলায় বসে থাকবে আর জানলা দিয়ে ঘরে যাওয়া যায়। প্র্যাকটিক্যাল লোক তো আমি। সুবিধেটা বুঝলাম। তোমরা বুড়ীর সঙ্গে হিসেবে ব্যস্ত, আর আমি ব্যাপারটা গুছিয়ে তুলছি তখন। কেন, তুমি তো নিজের কানেই শুনলে, ও বলল রাতে জানলায় বসে থাকবে আর পুকুরের জল দেখবে।'

'কিন্তু এতে সে বিশেষ কিছু বোঝাতে চায় নি!'

'বুঝতে পারছি না এমনি বলেছিল, অথবা অন্য কিছু। ওর মনে এমন কিছু নাও থাকতে পারে, কিন্তু মনে হচ্ছিল অন্য রকম। ঘটনাটা শেষ হল বড় বেয়াড়া ভাবে। আমি একটা আস্ত গর্দভের মত কাণ্ড করে বসলাম।' ঘৃণার হাসি হেসে কাউন্ট বলল।

'কী করে? কোথায় গিয়েছিলে তুমি।'

যা ঘটেছিল কাউন্ট সব বলল। জানলার কাছে এগোবার সময় তার দ্বিধার প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে বাকী সব বলল।

'সুব আমি নিজেই নষ্ট করে ফেললাম, আমার আর একটু সাহস থাকা উচিত ছিল। মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠে পালিয়ে গেল।'

'চেঁচিয়ে উঠে পালিয়ে গেল।' কর্ণেট পুনরাবৃত্তি করল কথাটা। কাউন্টের হাসির উত্তরে সেও অস্বস্তির সঙ্গে একটু হাসল। সেই কাউন্ট যার প্রভাব তার ওপর এত জোরালো ও এত দীর্ঘ কাল ধরে ছিল।

'হ্যাঁ। যাক। ঘুমোবার সময় হয়েছে।'

আবার দরজার দিকে পেছন ফিরে সে মিনিট দশেক চুপচাপ শুয়ে রইল। এই সময়টাতে তার নিভৃততম অন্তরে কী চলছিল তা বলা শক্ত। কিন্তু যখন সে এদিকে আবার ফিরল তখন তার মুখে যন্ত্রণা ও দৃঢ় সংকল্পের স্বাক্ষর ছিল।

'কাউন্ট তুরবিন।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে।

'ঘুমের মধ্যে ভুল বকছ নাকি?' কাউন্ট শান্ত ভাবে বলল। 'কী. কর্ণেট পলজভ?'

'কাউন্ট তুরবিন, আপনি একটা বদমাইস।' বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পলজভ চেঁচিয়ে বলল।

১৬

পরের দিন স্কোয়াড্রন চলে গেল। অফিসাররা গৃহস্থদের সঙ্গে দেখা করল না। তাঁরা যে বাইরে এসে বিদায়-বাণীটি উচ্চারণ করবেন তার জন্য অফিসারদের ইচ্ছা বা কোনো আগ্রহ ছিল না। অফিসাররা পরস্পরের সঙ্গেও কেউ কথা বলল না। প্রথম যেখানে এর পরে তারা থামবে সেখানে তারা ডুয়েল লড়বে ঠিক করেছে। কিন্তু হিতৈষী বন্ধু, তুখোড় ঘোড়সওয়ার, হুজারদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ক্যাপ্টেন শুল্‌ৎস্—যাকে কাউন্ট নিজের প্রধান সহকারী হিসেবে বেছেছেন—সেই ক্যাপ্টেন শুধু ডুয়েল থেকে এঁদের নিবৃত্ত করলেন তাই নয়, রেজিমেন্টের একটি প্রাণীকেও তিনি কিছু জানতে দিলেন না। তুরবিন ও পলজভের পুরনো বন্ধুত্ব আর কোনদিনই ফিরল না, তবে ডিনার পার্টিতে দেখা হলে তারা পরস্পরকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করত।

১৮৫৬

গজকাঠি

(একটি ঘোড়ার গল্প)

ম. আ. তাখভিচের স্মৃতিতে

১

আলো ফুটে উঠেছে ক্রমেই উচ্চতর আকাশে। সূর্যোদয়ের রশ্মি ক্রমেই সব দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। অস্বচ্ছ রূপোলি শিশিরবিন্দু আরো শুভ্রতায় চকচক করছে। কাস্তের মত চাঁদ ফ্যাকাশে হয়ে এল। অরণ্যে সাড়া জেগেছে। লোকজন জেগে উঠতে শুরু করেছে। জমিদার বাড়ির আস্তাবলে ঘোড়ার নাকের ঘড়ঘড় আর খড়ে পায়ের খসখস আওয়াজ স্পষ্টই বেশি করে শোনা যাচ্ছে। এমন কি, তীক্ষ্ণ হ্রেষাও শোনা যাচ্ছে; ঘোড়াগুলো ক্রুদ্ধভাবে ধাক্কাধাক্কি করছে,—একটা কিছু নিয়ে ঝগড়া লেগেছে ওদের।

'হেই! হেই! অনেক সময় আছে। এরি মধ্যে খিদে লেগে গেল নাকি।' ক্যাঁচকেচে ফটকটা খুলতে খুলতে বলল বুড়ো অশ্বপালক। 'ফিরে আয় বলছি।' একটা ঘুড়ী ফটকের দিকে লাফিয়ে এগোতেই হাত দুলিয়ে সে চেঁচাল।

অশ্বপালক নেস্তের পরেছে চামড়ার বেল্ট দিয়ে আটকানো কসাক জ্যাকেট। বেল্টে ঝুলছে নানা যন্তরপাতি। তার চাবুকটা ঘাটের ওপর ফেলা। তোয়ালেতে মোড়া রুটি বেল্টে গোঁজা। হাতে জিন ও লাগাম।

অশ্বপালকের এই ঠাট্টার সুরে ঘোড়াগুলো ভয় পেল না, বা অসন্তুষ্টও হল না। তারা পরোয়া না করার ভান করল এবং ফটকের কাছ থেকে আস্তে-সুস্থে সরে গেল। শুধু একটা ঝাঁকড়া চুল খয়েরি রঙের বুড়ী ঘোড়া কান ঘুড়ে এক ঝটকায় তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। একটা জোয়ান ঘুড়ী তার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, তার এ ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও চলত কিন্তু সে হঠাৎ চিঁহিঁ রবে কাছে আসা প্রথম ঘোড়াটিকে পেছনের জোড়া পায়ের লাথি কষাল।

'হেই, হেই!' আস্তাবলের এক কোণে সরে যেতে যেতে আরো জোরে বেশি ভয় দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

আস্তাবলের খোঁয়াড়ের মধ্যে সব কটি ঘোড়ার মধ্যে (প্রায় এক শ) সবচেয়ে কম ধৈর্যহীনতা দেখাল একটা ডোরাকাটা আক্তা ঘোড়া, চালের নিচে একা দাঁড়িয়ে আধ বোজা চোখে আস্তাবলের একটা ওক কাঠের খুঁটি চাটছিল সে। খুঁটিটার স্বাদ ঠিক কেমন বলা মুস্কিল, কিন্তু চাটবার সময় ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটার ভাব গম্ভীর আর চিন্তান্বিত।

'আবার দুষ্টুমি?' কাছে এসে নাদার স্তূপের ওপর জিন আর ঘামে চকচকে জিনের কাপড় রাখতে রাখতে আগের মত গলায় বলল অশ্বপালক।

লেহন স্থগিত রেখে আক্তা ঘোড়াটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নেস্তেরের দিকে, একটিও পেশী তার নড়ল না। ঘোড়াটা হাসল না, ভ্রূকুটি করল না, মাথা গরম করল না, শুধু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পেটটা কেঁপে উঠল থরথর করে। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে অন্য দিকে তাকাল। অশ্বপালক তার কাঁধটা বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে লাগাম পরালো।

'দীর্ঘনিশ্বেস ফেলছিস কেন রে?' শুধোল নেস্তের।

ঝট করে ল্যাজ ঝাপটাল আক্তা ঘোড়াটা। যেন বলতে চায়, 'ও তেমন কিছু নয়, নেস্তের!'

অশ্বপালক জিন আর জিনের কাপড় পিঠে বসিয়ে দেওয়াতে অপছন্দ বোঝাবার জন্য আক্তা ঘোড়াটা কান ওলটাল কিন্তু তাতে নেস্তের শুধু বোকা বলে গাল দিল তাকে। পেটের দড়া শক্ত করে টানার সময় ঘোড়াটা পেট ফুলিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করল! কিন্তু মুখে একটা ঘুঁষি আর পেটে হাঁটুর গোঁত্তা খেয়ে দম বেরিয়ে গেল তার। তবু দাঁত দিয়ে নেস্তের দড়াটা টানার সময় আবার কান ঘুরাল সে, এমন কি ফিরেও তাকাল। জানত ভাল করেই, এতে কোন লাভ নেই, কিন্তু তার ইচ্ছে নেস্তেরকে জানিয়ে দেওয়া এটা তার অপছন্দ এবং অপছন্দটা সর্বদাই জানাবে। জিন বসানোর পর ফুলে ওঠা ডান পা-টা একটু আলগা করে খলীন চিবোতে শুরু করল সে, যদিও এতদিনে তার জানা উচিত ছিল যে খলীনে কোন স্বাদ থাকা সম্ভব নয়।

খাটো রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে নেস্তের চাবুকটা খুলে নিয়ে হাঁটুর নিচ থেকে কোটটা বার করে জিনে সেই বিশেষ কায়দায় বসল যেটা

কোচওয়ান, শিকারী ও অশ্বপালকদের নিজস্ব। তারপর দিল লাগামে টান। যে চুলোয় বল যেতে প্রস্তুত, এমন একটা ভাব করে মাথা তুলল বটে কিন্তু ঘোড়াটি নড়ল না। তার জানা ছিল যে রওনা হওয়ার আগে সওয়ারী গলা ফাটিয়ে অনেক হুকুম জারি করবে অন্য অশ্বপালক ভাস্কাকে আর ঘোড়াগুলোকে। আর সত্যি, হাঁক-ডাক আরম্ভ করে দিল নেস্তের।

'ভাস্কা!' চেঁচাল সে। 'এই ভাস্কা! ঘুড়ীগুলোকে কি ছেড়ে দিয়েছিস্? কোথায় তুই, ওরে বদমাইশ। ঘুমোলি নাকি? ফটক খুলে দে। ঘুড়ীগুলোকে আগে বেরোতে দে।' এই জাতীয় আরো নানা কথা তার মুখে শোনা গেল।

ফটকের ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা গেল। ভাস্কা তখন বিরক্ত আর তন্দ্রালু—ফটকের থামের কাছে দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে, আর বাকীগুলোকে ছেড়ে দিচ্ছে। ঘোড়াগুলো একের পর এক বেরোচ্ছে। খড়ের ওপর সতর্ক ভাবে পা ফেলছে, আর যাওয়ার সময় খড় শুঁকছে। জোয়ান ঘুড়ী, এক বছর বয়সের পালের ঘোড়া দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা, আর আসন্নপ্রসবা ঘুড়ী—তারা নিজেদের পেটের দায়ে সতর্ক;—এরা সবাই একে একে পার হচ্ছে ফটক একটা সার দিয়ে। কমবয়সী ঘুড়ীগুলো দুয়ে দুয়ে বা তিনে তিনে এ ওর পিঠের ওপর মাথা বাড়িয়ে ঠেলাঠেলি করে চলেছে, তাড়াহুড়োয় হোঁচট খাচ্ছে বলে খিস্তি করছে অশ্বপালকেরা। দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে অচেনা ঘুড়ীদের পায়ের ফাঁকে তড়্বড় করে ঢুকছে, বড়দের হ্রেষাধ্বনিতে সাড়া দিয়ে ডাকছে তীক্ষ্ণ চিঁহিঁ সুরে।

একটা বাচাল যোয়ান ঘুড়ী ফটক পেরিয়েই মাথা বেঁকিয়ে পেছনের জোড়া পা ছুঁড়ে অল্প চেঁচাতে লাগল, কিন্তু ছিটছিট দাগের বুড়ী জুলদিবাকে পেরিয়ে যাওয়ার সাহস হল না তার। জুলদিবা অন্য দিনের মতই চলেছে, সব ঘোড়ার আগে, মন্থর ভারী ও ভারিক্কি মর্যাদার চালে। তার বৃহৎ পেট এদিক-ওদিক দুলছে।

খোঁয়াড়টায় এইমাত্র এত জীবন্ত ভীড় ছিল, আর কয়েক মিনিট বাদেই হয়ে গেল শূন্য। চালের খুঁটিগুলোকে দেখাচ্ছে বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ। পদদলিত নাদায়-আচ্ছন্ন খড় ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই। ডোরাদার আস্তা ঘোড়াটা এ দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত। তবু যেন তার মুখেও একটু বিমর্ষ ভাব। সেলাম জানাবার মত করে ধীরে মাথা তুলে ও নামিয়ে, দড়ার চাপে যতটা

সম্ভব ততটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, আড়ষ্ট বেঁকা পা টেনে টেনে চলল পালের পেছনে। তার হাড়গিলে পিঠে বইছে বুড়ো নেস্তেরকে।

'রাস্তায় পৌঁছলেই লোকটা চকমকি জ্বালিয়ে পেতলের কাজ করা চেন লাগানো পাইপটা নির্ঘাৎ টানবে।' মনে মনে ভাবছিল সে। 'আমার আনন্দই হয়। এই সকালবেলায়, ঘাসে এখনও শিশির লেগে রয়েছে, এমন সময় পাইপের গন্ধটা বেশ লাগে। এই গন্ধটা আমার মনে অনেক আনন্দের কথা জাগায়। একটাই শুধু আপত্তি, দাঁতে পাইপটা গুঁজলেই লোকটার চাল বাড়ে, নিজেকে একটা কেউ-কেটা ভাবে। আবার পাশ করে বসা হয় —আর যে পাশটায় আমার লাগে ঠিক সেই পাশটিতেই বসতে হবে লোকটার! গোল্লায় যাক! অন্যের আনন্দের জন্যে আত্মত্যাগ আমি এই প্রথম করছি না। ঘোড়া বলে তাতে আমি একটু তৃপ্তি পেতে আরম্ভ করেছি। চাল দেখাক একটু, বেচারী! ও যখন একা থাকে, কেউ দেখে না ওকে, তখনই ও চালটা মারে। খুশী হলে বসুক, ও পাশ করেই বসুক।' দুর্বল পা সতর্কভাবে ফেলে রাস্তার মধ্যেখান দিতে যেয়ে যেতে ভাবল দামড়া ঘোড়াটা।

২

ঘোড়াগুলোর চরার জায়গা নদীর ধারে! সেখানে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে গিয়ে নেস্তের নামল এবং জিন তুলে দিল। ঘোড়াগুলো ধীর গতিতে শিশির-ভেজা সন্ত জোলো মাঠের দিকে এরই মধ্যে চলেছে! মাটি থেকে ওঠা কুয়াশায় জায়গাটা ঝাপসা আর নদী তার বঙ্কিম বাহু দিয়ে এ জায়গাটা ঘিরে আছে।

লাগাম খুলে নিতেই নেস্তের আক্তার গলার নিচের দিকটা চুলকে দিল, আর খুশী ও কৃতজ্ঞতা জানাতে ঘোড়াটা চোখ বুঁজল। 'বুড়ো কুত্তাটার এটা খুব ভাল লাগে দেখছি।' নেস্তের বিড়বিড় করল। কিন্তু আক্তাটার এটা মোটেই ভাল লাগত না। শুধু সৌজন্যের খাতিরে ভাল লাগার ভান করে ও মাথা নেড়ে মেনে নিত। কিন্তু হঠাৎ, আভাস না দিয়ে যুক্তি না দেখিয়ে (হয়তো নেস্তেরের মনে হয় বেশি পেয়ার দেখালে আক্তাটার চোখে তার গুরুত্ব কমে যাবে) ঘোড়াটার মাথা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে লাগাম চালিয়ে বক্‌লসটা দিয়ে বুড়ো তার শুকিয়ে-যাওয়া পায়ে লাগাল কষে এক ঘা...

তারপর রাক্কাবার না করে হেঁটে চলে গেল ঢিপির ওপরে সেই গাছের গুঁড়িটার কাছে। ঐ গুঁড়িটাতেই সাধারণত ও বসে।

এ রকম ব্যবহার আক্তাকে বিরক্ত না করে পারে না। কিন্তু সেটা সে বাইরে দেখাল না। সে শুধু ঘুরে নদীর দিকে হাঁটা ধরল। খড়খড়ে ল্যাজটা ধীরে ঢুলিয়ে, বাতাসের গন্ধ শুঁকে শুঁকে, আর উদাসভাবে ঘাস খেতে খেতে সে চলল। জোয়ান ঘুড়ী, এক বছর বয়সের বাচ্চা আর দুগ্ধপোষ্যগুলোর খুবই ফুর্তি এই সুন্দর সকালটাতে, চারদিকে তারা লম্ফঝম্প করছিল। কিন্তু তাদের দিকে মনোযোগ ছিল না আক্তার, সে জানে, স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হল, বিশেষ করে তার মত বয়সে, খালি পেটে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নেওয়া, তারপরে সকালের নাস্তা খাওয়া। তাই নদীর ধারের সবচেয়ে ঢালু আর চওড়া জায়গাটায় গিয়ে খুর আর পায়ের পেছনের লোম জলে ভিজিয়ে নিল। তারপর জলে মুখ চুবিয়ে কাটা ঠোঁটে পাঁজর ফুলিয়ে শুষে নিতে লাগল জল। ডোরাকাটা, সরু, মূলের দিকে রোমহীন ল্যাজটা নাড়াতে লাগল।

খয়েরী রঙের যে পাজী ঘুড়ীটা সর্বদা আক্তার পেছনে লাগত, আর বিরক্ত করত, সে জল ভেঙ্গে তার দিকে এল, যেন একটা কিছু কাজ আছে, কিন্তু আসলে সে এল ঐখানকার জলটাকে ঘুলিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আক্তা এরই মধ্যে পেট পুরে জল খেয়ে নিয়েছে। যেন ঘুড়ীটার বদ মতলব টের পায় নি এমন ভাবে সে পর পর পাগুলোকে কাদা থেকে তুলে নিল, একটু মাথা ঝাঁকিয়ে অল্পবয়সীদের কাছ থেকে অনেকটা সরে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে বেহানের নাস্তা খেতে আরম্ভ করল। মাথা প্রায় না তুলে, ঘাস যাতে বিশেষ পায়ে না চাপা পড়ে তার জন্যে উদ্ভট ভঙ্গিতে পা রেখে এক নাগাড়ে সে ঘন্টা তিনেক ঘাস খেয়ে চলল। এত খেল যে হাড়গিলে পাঁজর থেকে পেটটা ঝুলতে লাগল একটা ঠিক বোঝাই বস্তার মত। রুগ্ন পাগুলোর ওপর ভর দিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে যথা সম্ভব কম কষ্ট পায়, বিশেষত সামনের ডান পায়ে। ঐ ডান পা-টাই তার সবচেয়ে দুর্বল। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বার্ধক্য কখনো কখনো রাজকীয়, মহিমান্বিত, কখনো বিশ্রী, কখনো করুণ। এক একটা সময় একই সঙ্গে মহিমান্বিত ও বিশ্রী। ডোরাকাটা আক্তাটার বার্ধক্য এই রকম।

প্রকাণ্ড ঘোড়া সে। কমসে কম সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা। প্রায় কালো তার গায়ের রং—তার মধ্যে হলদে সাদা ছোপ। তার মানে, ও রং-টা আগে ছিল, এখন ছোপগুলো নোংরা বাদামী। তার গায়ে সব মিলিয়ে তিনটে ছোপ। একটা নাকের এক পাশ দিয়ে বেঁকা হয়ে উঠে মাথা আর গলার অর্ধেকটা ভরে দিয়েছে। পোকায় জট পাকানো লম্বা কেশর অনেক জায়গায় সাদা, অনেক জায়গায় বাদামী। দ্বিতীয় ছোপটা ডান দিকের পাঁজর বেয়ে ছড়িয়ে ঢেকেছে পেটের অর্ধেক। তৃতীয়টা পাছায় শুরু হয়ে ছড়িয়েছে ল্যাজের ওপর দিকটায় আর রাঙের অর্ধেকটায়। ল্যাজের বাকিটা ডোরা-কাটা, সাদাটে। তার বৃহৎ সবল মাথা ও চোখের কোটর গভীর। নিচের ঠোঁট কালো, একবার কী মারামারিতে কেটে ঝুলে পড়েছে। হাড় বার করা প্রকাণ্ড মাথাটা এমন ভাবে বসানো যে লম্বা হাড়-গিলে ঘাড়টায় সেটাকে কাঠ থেকে খোদা মনে হয়। নিচের লম্বিত ঠোঁটের ফাঁকে মাঝে মাঝে আভাস পাওয়া যায় কষে ঝুলন্ত কালচে জিভের আর ক্ষয়ে যাওয়া হলদে দাঁতের টুকরোর। একটা কানে কাটা দাগ। বেশির ভাগ সময় কান ঝাপটায় সে। কিন্তু মাঝে মাঝে নাছোড় মাছি তাড়াবার জন্যে আলস্য ভরে কাঁপায় কান দুটোকে। একটা কানের পিছনে সামনের ঝুঁটির ক্ষীণ আভাস। নেড়া কপাল বসা, শিরালা কাটা, গলকম্বল ঝুলে পড়েছে শূন্য থলির মত। মাছি বসা মাত্র মাথা আর ঘাড়ের গাঁট-গাঁট শিরগুলো থরথর করে কাঁপতে থাকে। মুখের ভাবটা কঠোর সহিষ্ণু, গভীর, অনেক দিনের ক্লেশে ভরা। সামনের পা দুটো হাঁটুর কাছে বেঁকে গেছে, খুরদুটো ফোলা, আর ছোপ-লাগা ডান পায়ে হাঁটুর কাছে হাতের মুঠোর মত বড় একটা ডেলা। পেছনের পা দুটো তবু ভাল, কিন্তু রাঙের চামড়া যে ঘষে উঠে গিয়েছিল আর ফিরে আসে নি। চর্মসার শরীরের জন্য পাগুলোকে অতিরিক্ত লম্বা দেখায়। পাঁজরের হাড়ের গঠন ভাল কিন্তু এত ঠেলে বেরিয়ে আসা যে মনে হয় হাড়ের ফাঁকে ফাঁকে চামড়া এঁটে বসেছে। কণ্ঠার ওপর দিকে আর পিঠে অনেক মারের দাগ, আর পাছায় একটা সদ্য পচ-ধরা ফোলা ঘা। মেরুদণ্ডে উদ্গত ল্যাজের কালো গোড়ার দিকটা বেশ খানিকটা উঁচিয়ে ওঠা—বলতে গেল রোমহীন। ল্যাজের কাছে খয়েরি পাছায় হাতের তালুর সমান কামড়ের মত ঘা। তাতে সাদা লোম গজিয়েছে। ঘাড়ের হাড়ে আর একটা ঘায়ের দাগ। দাবনা ও

ল্যাজ বেশী পেট্-খারাপের ফলে ময়লা। গায়ের লোম ছোট কিন্তু খাড়া।
কিন্তু এই বীভৎস সত্ত্বেও, বার্ধক্য সত্ত্বেও তাকে দেখে এ কথা না ভেবে পারা যায় না এবং অভিজ্ঞরা দেখা মাত্রই বলত,—বয়সকালে এ একটা চমৎকার ঘোড়া ছিল।

সত্যি, অভিজ্ঞতায় বলা যায়, সারা রাশিয়ায় মাত্র এক জাতের ঘোড়াই আছে, যাদের এমন চওড়া হাড়, বৃহৎ মালাইচাকি, এত সুন্দর খুর, সুঠাম পা, গ্রীবার সাবলীল শ্রী, আর সবচেয়ে বড় কথা, কালো বড় উজ্জ্বল চোখে, মুখে ও ঘাড়ে খানদানি শিরের গ্রন্থি ও কেশর সহ এত সুন্দর মাথা। ঘোড়াটা এখন বীভৎস অথর্ব—ডোরার জন্যে সেটা আরো বেশি মনে হয়। এর সঙ্গে মিশেছে চেহারা ও ভাবভঙ্গির প্রশান্ত আত্মবিশ্বাস। তার ফলেই যেন তাকে এতটা রাজকীয় লাগে। এই রাজকীয়তা তাদেরই বিশেষত্ব যারা নিজেদের শক্তি সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন।

শিশির সিক্ত মাঠে একা দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা—যেন একটা জীবন্ত ধ্বংসস্তূপ। একটু দূরেই শোনা যাচ্ছে ছড়ানো দলটার পা ঠোকা, নাকের আওয়াজ, হ্রেষাধ্বনি ও জোরালো চিঁহিঁ রব।

৩

অরণ্যের মাথার ওপরে উঠে এসেছে সূর্য। মাঠের ওপরে নদীর বাঁকে ছড়িয়ে দিচ্ছে উজ্জ্বলতা। শুকিয়ে যেতে যেতে বিন্দু আকারে সংকুচিত হয়েছে শিশির। জলা ও বনের ওপর এদিক-ওদিকে মিলিয়ে যেতে যেতে শেষ কুয়াশা ছড়িয়ে আছে পাতলা ধোঁয়ার মত। মেঘ উঠছে তরঙ্গে, কিন্তু একদম হাওয়া নেই।

নদীর ওপারের মাঠে রাই শস্য ছোট সবুজ নলের মত খোঁচা খোঁচা হয়ে দাঁড়িয়ে। হাওয়ায় গাছ ও ফুলের মদির গন্ধ। বনের বাইরে থেকে ফাটা ভাঙ্গা ডাকছে একটা কোকিল আর নেস্তের চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবছে, জীবনের আর কটা বছর বাকি। রাই ক্ষেত ও জোলো জমির ওপরে উড়ছে লার্ক পাখি। একটা পিছিয়ে-পড়া খরগোশ ঘোড়ার পালের মধ্যে এসে পড়ে দূরে একটা ঝোপের তলায় দৌড়ে গিয়ে কান খাড়া করে বসে রইল। ঘাসে মাথা ডুবিয়ে ঢুলছে ভাস্কা। তাকে বড় বড় চক্কর দিয়ে জোয়ান ঘুড়ীগুলো ঢালু জায়গার নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বয়স্ক যারা তারা

নাক দিয়ে শব্দ করে কেউ বিরক্ত করতে পারবে না এমন চরার জায়গা খুঁজে নিয়ে শুধু সরল ঘাস চিবোতে লাগল, পেছনে শিশিরে রেখে গেল ঝকঝকে পদচিহ্ন। কিছু না ভেবে সব দলটা এক দিকে চলল। আবার জুলদিবা আগে ভারিক্কি চালে গিয়ে সবার পথ দেখাচ্ছিল। জোয়ান কালো মুশকার এই প্রথম বাচ্চা হয়েছে, ল্যাজ তুলে চিঁহিঁ রব তুলে বারবার তার পাশে ঘেঁষে-আসা, হাঁটু থরথর-করে কাঁপা, বেগুনি রঙের বাচ্চাটার দিকে নাকের আওয়াজ করছে সে। সার্টিনের মত উজ্জ্বল মসৃণ গা সোয়ালো নামের বাদামী ঘুড়ীটার। তার এখনও বাচ্চা হয়নি। ঘাস নিয়ে খেলা করে চলে তার মাথাটা নোয়ানো। ফলে রেশমের মত মসৃণ কালো সামনের ঝুঁটিতে ঢাকা পড়ে গেছে কপাল আর চোখ। ঘাসের কুচি দাঁতে ছিঁড়ে শিশিরসিক্ত রোমশ পা দিয়ে ছুঁড়ে মারছে। একটা বড গোছের বাচ্চা, নিশ্চয় একটা খেলা ভেবে ছোট ঝোপালো ল্যাজ তুলে এই সময়ের মধ্যে ছাব্বিশ বার মা-র চার দিকে ঘুরেছে। আর এদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ধীরেসুস্থে তার মা ঘাস খেয়ে চলেছে। ছেলের ধরন-ধারণ তার অনেক দিনের জানা। এক একবার শুধু বড় কালো চোখ তুলে তাকাচ্ছে তার দিকে। কালো একটি খুব খুদে ঘোড়া—তার মাথাটা খুব বড়—সে কান খাড়া করে খুঁটির মত দাঁড়িয়ে ঠায় দেখছে খেলুড়েটিকে, তার একাগ্র দৃষ্টি হিংসের বা নিন্দের বলা শক্ত। তার সামনের ঝুঁটিটা তাজ্জব-ভাবে খাড়া হয়ে উঠেছে কান দুটোর মধ্যে, ল্যাজ তখনো মায়ের পেটে থাকার সময়কার মত একপাশে বেঁকা। কয়েকটা বাচ্চা বাঁটে মুখ দেবার ইচ্ছেয় অধীর। মায়েদের পেটে তারা গুঁতোচ্ছে। কয়েকটা আবার মায়েদের আহ্বানে কান না দিয়ে দৌড় দিচ্ছে ঠিক উলটো দিকে দ্রুত বেসামাল পদক্ষেপে। যেন কী একটা জিনিস খুঁজছে। তারপর অকারণে হঠাৎ থেমে পড়ছে, আর তারস্বরে চেল্লাচ্ছে। কেউ কেউ পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ঘাসে, বা ঘাস ছিঁড়তে শিখছে, কিংবা পেছনের পা দিয়ে কানের পেছনটা চুলকে নিচ্ছে। দুটো ঘুড়ীর তখনো বাচ্চা হয় নি, অন্যদের কাছ থেকে সরে গিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে এক সঙ্গে ঘাস খাচ্ছে। তাদের অবস্থা দেখে অন্যেরা সমীহ করে সন্দেহ নেই, কাছে গিয়ে বিরক্ত করার সাহস হচ্ছে না কোনো বাচ্চার। কোন খেলুড়ে সাহস করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালে কান বা ল্যাজের একটু কুঁচকে ওঠাতেই বুঝতে পারছে ব্যবহারটা কত অসঙ্গত।

এক-বছরে ঘোড়া আর যোয়ান ঘুড়ীগুলোর চালচলন বড়দের মত। তারা কদাচিৎ লাফাচ্ছে বা হুল্লোড়ে বাচ্চাদের সঙ্গে খুব কমই যোগ দিচ্ছে। ঘাস চিবোচ্ছে গাম্ভীর্যের সঙ্গে, রাজহাঁসের মত ঘাড় বেঁকিয়ে ছোট ঝাঁটার মত ল্যাজ দুলিয়ে চলেছে, যেন তারাও এক একটি পরিণত ল্যাজের অধিকারী। বড়দের মত মাঝে মাঝে গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছে তারা, বা এ ওর পিঠ চুলকে দিচ্ছে। সবচেয়ে ফুর্তি দু'তিন বছরের ঘুড়ী আর অনূঢ়াদের। সোমত্ত যুবতীরা ফুর্তিবাজ—আলাদা দল বেঁধে তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তাদের পা ঠোকার শব্দ, নাকের আওয়াজ, সরু ও মোটা সুরের হ্রেষাধ্বনি। কাছ ঘেঁষে এ ওর ঘাড়ে মাথা রেখে শুঁকছে পরস্পরকে। লাফ দিচ্ছে, মাঝে মাঝে নাকের শব্দ করছে। ল্যাজের বাহার দেখিয়ে এ ওর সামনে ছেনালির ভঙ্গিতে পুরো ও আধা কদমের মাঝামাঝি একটা চালে নিজেদের দর্শনীয় করে হাঁটছে।

খুশী কুমারী ঘুড়ীগুলোর মধ্যে ঐ বাদামি রঙেরটা হল সবচেয়ে সুন্দর দেখতে, আর দুষ্টুও বটে। সে যা করে, অন্যরাও দেখাদেখি তাই করে। সে যেখানেই যায় সুন্দরী কুমারীদের দল তার পেছন পেছন যায়। আজ সকালে সে বেশ একটা খেলার মেজাজে আছে। খুশী মেজাজটা এসেছে ঠিক মানুষের মেজাজেরই মত করে। নদীতে বুড়ো আক্তার সঙ্গে দুষ্টুমি করে জলের ধার ধরে ছুটেছে পাগলার মত, যেন কীসে একটা ভয় পেয়েছে এমন ছল করে। নাকের একটা আওয়াজ করল, আর তীরের বেগে ছুটে চলে গেল জোলো মাঠে। ফলে তাকে এবং তার পেছনে ছুটে-যাওয়া দঙ্গলটাকে ধরতে ভাস্কাকে ঘোড়া ছোটাতে হয়। তারপর কিছু ভোজন হল তার। মাটিতে চলল কিছুক্ষণ গড়াগড়ি। আবার বুড়ী ঘুড়ীগুলোর নাকের ডগায় জোরালো গতিতে ছোটাছুটি করে তাদের চটাতে লাগল। এর পর একটি ঘুড়ীর কাছ থেকে তার বাচ্চাকে ভাগিয়ে দিল—যেন বাচ্চাটাকে কামড়াবে এমন ভাবে তাকে তাড়া করে সে এই কাজটা সমাধান করল। বেধড়ক ঘাবড়ে গেল মা-টা। বাচ্চাটা কান্নার সুরে চেঁচাতে লাগল। কিন্তু তাকে ঘুড়ীটা স্পর্শও করল না। বান্ধবীদের খুশী করবার জন্য ওকে একটু ভয় পাইয়ে দিচ্ছিল। আর তারা তা আনন্দের সঙ্গে দেখছিল। নদীর ওদিকে রাই ক্ষেতে লাঙল দিয়ে ছাই রঙের ঘোড়া চালাচ্ছিল একটি চাষী। এবার তারা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মেজাজে মশগুল হল

ঘুড়ীটার। থেমে পড়ে বেশ ডাঁটে মাথাটা ঝাঁকিয়ে খাড়া করে, গা ঝেড়ে নরম মধুর একটানা সুরের চিঁহিঁ রব ছাড়ল। রবটায় দুষ্টুমি ছিল, আবেগ ছিল, এক ধরনের বিষাদও বোধ হয় ছিল। ছিল কামনা, ছিল ভালবাসার প্রতিশ্রুতি ও তৃষ্ণা।

নলখাগড়ার ঝাড়ে লাফাতে লাফাতে একটা সারস তার সঙ্গিনীকে ডাকছে তীব্র আবেগে। প্রেমের গান গাইছে কোকিল আর ভারুই পাখি। ফুলগুলো হাওয়ায় সুগন্ধি রেণু ছড়াচ্ছে পরস্পরের দিকে।

'আমি যৌনবতী, সুন্দরী, সবলা।' চিঁহিঁ রবে ঘুড়ীটা যেন বলল। 'তাও প্রেমের মাধুর্যের স্বাদ পাইনি এখনও। তার চেয়েও বড় কথা আছে। আমার ওপর আজ পর্যন্ত দৃষ্টি পড়েনি কোনো প্রেমিকের,—কারুরই পড়েনি।'

এই অর্থবহ ডাক বিষাদে ও যুবসুলভ উচ্ছলতায় ঢালু পেরিয়ে ক্ষেতের ওপর দিয়ে কানে পৌঁছল দূরের ছাই-রঙা ঘোড়াটার। কান খাড়া করে সে থেমে গেল। চাষী বাকলের জুতো দিয়ে লাথি মারল তাকে তবু রূপোলি শব্দে মোহমুগ্ধ হয়ে সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল ও সাড়া দিল। রেগে চাষী রাশ টেনে পেটে মারল আর একটা লাথি, এবার অ্যায়সা জোরে যে ডাকটা মধ্যেখানে হঠাৎ থামিয়ে চলতে শুরু করল ঘোড়াটা। কিন্তু তাকে ছেয়েচে মধুর এক বিষাদ। তার তীব্র কামনার ডাক আর চাষীর ক্রুদ্ধ বকুনি দূরের রাই-ক্ষেত থেকে এপারের ঘোড়ার দলটার কাছে এসে পৌঁছতে লাগল।

ঘুড়ীটার কণ্ঠস্বর শুনেই ঘোড়াটি এত মুগ্ধ হয়েছিল যে সে তার কাজ ভুলে গেল। তাহলে কান খাড়া করে বিস্ফোরিত নাসারন্ধ্রে হাওয়া টেনে, মাথা ঝুঁকিয়ে, নবীন সুন্দর শরীরের প্রতি অঙ্গে কেঁপে উঠে ডাকার সময় তার সমস্ত রূপ দেখলে ঘোড়াটার প্রাণে কী ভাবটা হোতো?

কিন্তু ঘুড়ীটা বেশিক্ষণ আবেগের হাতে নিজেকে ছেড়ে রাখল না। ছাই-রঙা ঘোড়ার ডাক যখন মিলিয়ে গেল, তখন সে আর একবার ডেকে মাথা নামিয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল, তারপর ছুটল ডোরাদার আক্রা ঘোড়াকে বিরক্ত করে জ্বালাতে। কম বয়সীদের সব ঠাট্টা ইয়ার্কির নিত্য শিকার সে। মানুষদের চেয়ে এদের হাতে তার দুর্ভোগ বেশি।

সে কিন্তু দু' জাতের কারুরই কোন ক্ষতি করে নি। মানুষের

এখনও তাকে দরকার আছে, কিন্তু কম বয়সী ঘোড়াগুলো তার ওপর অত্যাচার করে কেন?

৪

ও বুড়ো, ওদের বয়স কম। ও চর্মসার, ওদের চামড়া উজ্জ্বল। ও বিষণ্ণ, ওরা আমুদে। এক কথায়, ও পর, বিজাতীয়, একেবারে আলাদা ধরনের প্রাণী, তাই করুণার পাত্র হতে পারে না। ঘোড়ারা শুধু নিজেদেরই করুণা করে আর কচিৎ কখনো করে স্বজাতির তাদের প্রতি যাদের ওরা নিজেদের মত ভাবে। কিন্তু বুড়ো চর্মসার আর কুৎসিত হওয়ার জন্য আক্কাটাকে দোষ দেওয়া যায় না। না, তা যেন কেউ না ভাবে। কিন্তু অন্য ঘোড়াদের মতে, দোষ তারই। আর যারা কম বয়সী ও সুখী, তাদের কোনো দোষ নেই। যাদের সামনে জীবনের সব কিছু পড়ে আছে, যাদের পেশি অল্পে কম্পনক্ষম, ল্যাজ অল্পে খাড়া হয়ে যায়, তাদের কোনো দোষ নেই।

আক্কাটা হয়তো বুঝত এবং নিজের যৌক্তিক মুহূর্তে স্বীকারও করত যে সে বড় বেশি বছর বাঁচছে। এই দোষের শাস্তি তার প্রাপ্য। তবু সে তো সামান্য ঘোড়াই বটে, তাই জীবনের শেষে ওদের সবাইর বরাতে যা ঘটবে তাই নিয়ে শুধু তাকে জ্বালাতন করা,—ছোকরাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বিষণ্ণ ক্রুদ্ধ ও অপমানিত বোধ না করে পারত না। তবে ঘোড়াগুলোর হৃদয়হীনতার আড়ালে একটা অভিজাত মনোভাব আছে। এদের প্রত্যেকেব জন্ম বিখ্যাত সমেতাঙ্কার বংশে, আর আক্কারটার আবির্ভাব কোন বংশ থেকে তা কেউ জানে না। তিন বছর আগে এক ঘোড়ার বাজারে আট রুবলে কেনা সে এক না-খানদানি ঘোড়া।

স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে এগিয়ে এলো বাদামি রঙের ঘুড়ীটা, আর তাকে মারল একটা ধাক্কা। আক্কাটা এর চেয়ে ভাল কিছু আশাও করেনি। চোখটা বিশেষ না খুলে কান নামিয়ে দাঁত বার করল সে। ঘুড়ীটা পেছন ফিরে তাকে লাথি মারার মত করে দাঁড়াল। তখন সে চোখ খুলল, দূরে সরে গেল। আর ঘুম নেই এখন চোখে, পাতা খেতে শুরু করল সে। আবার ধীরে ধীরে কাছে এল ঘুড়ীটা আর তার দলবল, বছর দুয়েকের একটা বোকা কেশরহীন ঘুড়ী সর্বদা বাদামি ঘুড়ীটার নকল করত, সে

তার পাশে পাশে চলছিল। হঠাৎ নকল করতে গিয়ে সে তাড়াতাড়ি করে ফেলল—যা নকলনবীশরা সর্বদাই করে থাকে। বাদামি ঘুড়ীটা সাধারণত এমন ভাবে তার কাছে যেত যেন নিজের কাজেই চলেছে, তার দিকে চোখ না ফেলে তার নাকের সামনে দিয়ে যেত, ফলে ঘোড়াটা ঠিক করে উঠতে পারত না যে রাগটা উচিত হবে কি না, আর তার সে অবস্থাটা মজার।

এখনও ঠিক তাই করল ঘুড়ীটা। কিন্তু তার টেকো বান্ধবী ফুর্তির চোটে নিজের বুক দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল ঘোড়াটাকে। আবার সে দাঁত বার করল। একটা চেঁচানিও বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে। দৌড়ে কামড় বসাল রাগে। এতটা ক্ষিপ্রতা তার কাছে অপ্রত্যাশিত। পাছা দিয়ে ধাক্কা দিল তাকে টেকো ঘুড়ীটা, পাঁজরের শুকনো খোঁচা খোঁচা হাড়ে বাধাটা ঝনঝনিয়ে উঠল। বুড়ো ঘোড়া নাকের শব্দ করে ঘুড়ীটার পেছনে ছুটতে যাচ্ছিল। কিন্তু সুবুদ্ধির বশে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আর অন্য দিকে সরে গেল।

টেকো ঘুড়ীকে আঘাত করার দুঃসাহস দেখে দলের সব কটা কমবয়সী প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করেছে বলে মনে হল। সারা দিন তারা তাকে এমন জ্বালাতন করতে লাগল যে দুটো ঘাস খাওয়ারও আর কোন সুযোগ পেল না সে সেদিন। এক মুহূর্তের জন্যও শান্তিতে থাকতে দিল না তাকে। কয়েকবার তো অশ্বপালককে এগিয়ে এসে তার কাছ থেকে ওদের হটিয়ে দিতে হল। ওদের কী হয়েছে মাথায় ঢুকল না তার। ঘোড়টা এত ভীত ও দুঃখিত হয়েছিল যে সে বাড়ি ফেরার সময় হতে নিজেই গেল নেস্তেরের কাছে। জিন পরিয়ে নেস্তের পিঠে উঠতে সে অনেকটা খুশী ও বিপদমুক্ত বোধ করল।

বুড়ো অশ্বপালককে পিঠে চাপিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় আক্তাটার মনে কী ভাবনা আসছিল কে জানে। হয়তো সে কমবয়সীদের হৃদয়হীনতার কথা ভাবছিল, কিংবা হয়তো বুড়োদের চরিত্র অনুসারে অপমানকারীদের কসুর মাফ করে দিয়েছিল সে গর্বিত নিঃশব্দ ঔদাসীন্যে। তার চিন্তাভাবনা যাই হোক, আস্তাবলের উঠোনে না পৌঁছোনো পর্যন্ত তা সে গোপন রাখল।

সন্ধেবেলা কয়েকজন পড়শী দেখা করতে এল নেস্তেরের সঙ্গে। জমিদার বাড়ির চাকর-বাকরদের কুঁড়েঘরের কাছে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে, চোখে

পড়ল তার কুঁড়ের খুঁটিতে বাঁধা একটা ঘোড়া আর গাড়ি। বাড়ি পৌঁছতে এত তাড়া তার যে খোঁয়াড়ে ঘোড়াগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়েই আক্তাটাকে ছেড়ে চেঁচিয়ে ভাস্কাকে বলল ওর জিনটা খুলে নিতে। তারপরে ফটকে কুলুপ এঁটে গেল মেহমানদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে।

সমেতাঙ্কার দৌহিত্র-কন্যাকে বাজারে কেনা বেজন্মা 'খেয়ো ঘোড়াটা' অপমান করাতে (এবং তার মানে গোটা দলের আভিজাত্যের অপমান করাতে), হয়তো সওয়ারহীন সুউচ্চ জিনসাজে আক্তা ঘোড়াটার চেহারা অন্যদের অতিশয় তাজ্জব ঠেকাতে সে রাতে এক অসাধারণ ব্যাপার ঘটল খোঁয়াড়ে। বয়স নির্বিশেষে সব ঘোড়া দাঁত বার করে তাকে তাড়া করে ছোটাল এধারে-ওধারে। খুরের লাথি বেশ কয়েক ঘা কষাল তার ফাঁপা পাঁজরায়। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল সে। আর সহ্য হয় না যখন খোঁয়ারের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, মুখে এল অথব বার্ধক্যের অশক্ত ক্রোধ, তারপর হতাশার ভাব। কান ঝুলিয়ে সে হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করে বসল যে পিছু-ধাওয়া সব ঘোড়া হঠাৎ একদম থেমে পড়ল। সবচেয়ে বয়স্কা ভিজাপুরিখা কাছে এসে তাকে শুঁকে গভীর শ্বাস টানল একটা। আক্তাটাও একটা গভীর নিশ্বাস নিল।

৫

জ্যোৎস্নায় আলো হয়ে রয়েছে খোঁয়াড়টা। সেই খোঁয়াড়ের মধ্যেখানে ঘোড়াটার লম্বা দেহটা, পিঠে উঁচু জিনের সাজ। বাকি ঘোড়াগুলো তার চার দিকে তাকে ঘিরে নিশ্চল ও নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন এইমাত্র তার কাছে শোনা অভিনব কোনো কথায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে তারা। আর সত্যি আশ্চর্য একটা কিছু তারা জেনেছে।

সেই একটা কিছু হচ্ছে এই।

* * *

প্রথম রাত্রি

পয়লা বাজিবাহাদুর ও 'বাবা'র ছেলে আমি। বংশগত নাম আমার— প্রথম মুজিক। বংশের নাম মুজিক হলেও লোকে আমায় সর্বদা ডাকত গজকাঠি বলে। আমার দীর্ঘ ক্ষিপ্র পদক্ষেপের জন্যে এই নাম। সারা

রাশিয়ার এর জুড়ি ছিল না। আমার রক্তের চেয়ে খানদানি রক্ত নেই দুনিয়ার কোনো ঘোড়ার। তোমাদের কখনো বলতাম না কথাটা; বলে কী লাভ? তোমরা আমায় চিনতে পারতে না—যেমন ভিজাপুরিখা চিনতে পারে নি। ও তো আমার সঙ্গে ছিল খেনভোতে এইমাত্র আমাকে চিনতে পারল। ভিজাপুরিখার সাক্ষ্য না থাকলে আমার এ সব কথা বিশ্বাস করতে না তোমরা আর আমিও বলতাম না। কয়েকটা ঘোড়ার করুণায় দরকার নেই আমার। কিন্তু তোমরাই সেটা চাইলে। হ্যাঁ, আমি হলাম সেই বিখ্যাত গজকাঠি যার খোঁজ করছেন অশ্ববিশারদেরা সারা মল্লুকে, কিন্তু কোনো হদিস পাচ্ছেন না। সেই বিখ্যাত গজকাঠি যাকে কাউন্ট নিজে জানতেন, তাঁর পেয়ারের ঘোড়া 'রাজহংস'কে দৌড়ের পাল্লায় হারিয়ে দিয়েছিলাম আমি। তাই তাকে তিনি দল থেকে নির্বাসন দেন।

* * *

'ডোরাদার ঘোড়া' বলতে কী বোঝায় তা জন্মকালে আমি জানতাম না। ভেবেছিলাম, আমি নিছক একটা ঘোড়া মাত্র। মনে আছে আমার রং নিয়ে প্রথম কথা ওঠাতে কী অসম্ভব বিচলিত হয়েছিলেন মা, আর আমি নিজে। বোধহয় আমি জন্মেছিলাম রাতে। সকাল হল। মা ততক্ষণে আমায় চেটে চেটে সাফ করেছেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারছি তখন। মনে আছে কী যেন একটা চাইছিলাম আমি। সব কিছু আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য ও খুব সহজ ঠেকছিল। দরজায় গরাদ দেওয়া লম্বা গরম একটা বারান্দায় আমাদের চালা। গরাদের ভেতর দিয়ে বাইরের সব কিছু নজরে আসত। দুধের বাঁট এগিয়ে দিলেন মা। কিন্তু তখনো আমি অ্যায়সা বোকা যে মুখটা একবার গুঁজছি সামনের পায়ে, একবার বুকে। হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে মা পায়ের তলা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। সেদিনকার সহিসটা গরাদের ফাঁকে আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সে বলল, 'দ্যাখো, "বাবা"-র বাচ্চা হয়েছে।' দরজার খিল খুলে টাটকা খড় মাড়িয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল। 'দ্যাখো, দ্যাখো, ভারাস, কী ডোরা এর, যেন ছাতারিয়া।'

আমি তার কাছ থেকে সরে যেতেই হাঁটু দুমড়ে পড়ে গেলাম।

'হেই খুদ্দুর শয়তান।' বলল সে।

মা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু আমায় আগলাবার কোনো চেষ্টা

করলেন না। তিনি শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটু সরে গেলেন। অন্য সহিসগুলো ভেতরে এসে আমায় দেখতে লাগল। একজন গেল অশ্ব-পালককে ডাকতে। আমার গায়ের রং নিয়ে সবাই ঠাট্টা করতে লাগল, আর আমার মজাদার সব নাম দিতে লাগল। আমি বা মা সে সব নামের পুরো মানে বুঝতে পারলাম না। আজ পর্যন্ত আমাদের বংশে বা আত্মীয়-বর্গের মধ্যে একটিও ডোরাদার ঘোড়া জন্মায় নি। ঘোড়ার রঙচঙে হওয়াটা যে কিছু দোষের এ আমাদের ধারণা ছিল না। তবু আমার শক্তি ও সুঠাম গড়নের জন্য সবাই আমার প্রশংসা করল।

সহিস বলল, 'ছাখো, কী তেজী এই খুদেটা, ওর নাগাল পাওয়া দায়।'

একটু বাদে অশ্বপালক ভেতরে এল। সে অবাক হল, এমন কি যেন আহতও হল।

সে বলল, 'এই খুদে রাক্ষসটা কোথা থেকে এল? জেনারেল সাহেব ওকে কখনো দলে রাখবেন না। গোল্লায় যাক সব। বাবা, তুই আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলি।' আমার মা-র দিকে ঘুরে সে বলল। 'ডোরাদার এই ভাঁড়টার চেয়ে তুই একটা নেড়া বাচ্ছা দিলেও তো পারতিস, বাবা।'

মা কিছুই বললেন না। শুধু আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মা। এই রকম পরিস্থিতিতে ঐ ছিল তাঁর অভ্যেস।

'কোন্ শয়তানের চেহারাটা ওর মধ্যে এল। দেখতে ঠিক চাষার মত। দলে একে রাখা যাবে না। সারা দলের লজ্জা হয়ে দাঁড়াবে, ব্যাটা। কিন্তু ঘোড়াটা বহুৎ আচ্ছা ঘোড়া।' শুধু সে নয়, যারা আমায় দেখল, সবাই বলল ঐ একই কথা।

কয়েক দিন বাদে জেনারেল সাহেব নিজে আমায় দেখতে এলেন। তিনিও আঁতকে উঠলেন। আমার রঙের জন্যে গালাগাল করলেন আমাকে ও মাকে।

'কিন্তু ঘোড়াটা খাসা। চমৎকার ঘোড়াটা।' যারা আমাকে দেখল, তারা সবাই বলল।

বসন্তকাল পর্যন্ত ঘুড়ীদের আস্তাবলে আমরা ছিলাম—যে যার মা-র সঙ্গে। কিন্তু যখন চালার ছাদের ওপরকার বরফ সূর্যের তাপে গলতে

আরম্ভ করল, তখন তাজা খড় ছড়ানো খোঁয়াড়ে মায়েদের সঙ্গে আমাদের মাঝে মাঝে যেতে দেওয়া হোতো। এইখানেই আমি প্রথম দেখা পেলাম আমার নিকট ও দূর আত্মীয়দের। সে আমলের সব বিখ্যাত ঘুড়ীদের দেখলাম—তারা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে আলাদা আলাদা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসত। এর মধ্যে ছিল বুড়ী গ্লাংকা, আর সমেতাক্কার মেয়ে মুশকা। ক্রাসনুখা, আর জিন-ঘোড়া দব্রখতিহা। বাচ্চাদের নিয়ে জড়ো হল তারা। রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াল। খড়ের ওপর লুটোপুটি করল। শুঁকল পরস্পরকে। ঠিক আর দশটা সাধারণ ঘোড়ার মতই, সেই সুন্দরীদের মেলা —সে-কথা আজও আমার মনে আছে। তোমাদের আশ্চর্য লাগবে, বিশ্বাস করাও শক্ত আজ যে আমিও একদিন বাচ্চা ছিলাম, চঞ্চল ছিলাম। কিন্তু সত্যি ছিলাম। ঐখানেই আমার দেখা হয় ভিজাপুরিখার সঙ্গে। তখন এক বছরের। ওর স্বভাব ছিল তখন নরম গোছের, সদয়, আমুদে চঞ্চল। তবু বলতেই হবে. ও কিছু মনে করুক তা চাই না,—জাত ঘোড়া বলে যদিও তোমরা আজ ম.ন করো, কিন্তু তখনকার দিনে দলের মধ্যে ওকে নগণ্য বলে ধরা হত। ও নিজেই এ কথা স্বীকার করবে।

আমার ডোরাদার রংটা লোকে পছন্দ না করলেও ঘোড়ারা খুবই পছন্দ করত। তারা আমায় ঘিরে ধরত. তারিফ করত, খেলত আমার সঙ্গে। মানুষ আমার রং নিয়ে যা বলে তা আমি ক্রমে ভুলে যাচ্ছিলাম এবং খুশী বোধ করছিলাম। কিন্তু শিগগিরই জীবনের প্রথম বড় দুঃখ পেতে হল এবং সে দুঃখ এল মা-র কাছ থেকে।

বরফ যখন গলতে শুরু করেছে. চালার নিচে চড়ুই পাখিরা কিচমিচ আরম্ভ করেছে, বাতাসে বসন্তের সুগন্ধ, তখন আমার প্রতি মা-র মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। বলতে গেলে, তার সবই পালটে গেল। খোঁয়াড়ে জোরালো গতিতে দৌড়তেন ও নাচানাচি করতেন—যা তাঁর বয়সের পক্ষে ছিল অশোভন। কিংবা তিনি হয়তো দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে চিঁহিঁ রবে নিচু গলায় ডাক ছাড়তেন। অন্য ঘুড়ীদের কামড়ে দিতেন বা লাথি মারতেন। বা আমার গায়ের গন্ধ শুঁকে ঘৃণা ভরে নাকের শব্দ করতেন। বা বাঁট থেকে ঠেলে সরিয়ে নিজের 'ভুতো' বোন কুপচিখার কাঁধে মাথা রেখে রোদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী ভেবে তার পিঠ চুলকে দিতেন। আমাকে তাঁর কাছ থেকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিতেন।

এক দিন অশ্বপালক এসে মাকে লাগাম পরিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। মা হ্রেষা রব করলেন। আমি সাড়া দিয়ে তাঁর পেছনে ছুটলাম। কিন্তু মা আমার দিকে নজর দিলেন না। সহিস তারাস আমায় ঝাপটে ধরে রইল। দরজায় তালা পড়ল—মা বেরিয়ে যাওয়ার পর। আমি নিজেকে ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টায় সহিসকে খড়ের ওপর ফেলে দিলাম। কিন্তু দরজা বন্ধ। শুধু শুনলাম, মা-র গলার ডাক ক্রমেই ক্ষীণতর হচ্ছে। আর তাঁর হাঁকে আমায় ডাকছিলেন না তিনি, অন্য কিছু সেই হাঁকে। পরে শুনলাম, সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল আর একটি কণ্ঠ, গভীর জোরালো সেই কণ্ঠ, দব্রির কণ্ঠ, তাকে দুজন সহিস ধরে নিয়ে যাচ্ছিল মা-র সঙ্গে মোলাকাতে। আমি এত ভগ্ন হৃদয়ে ছিলাম যে তারাস কখন চলে গেল লক্ষ্য করি নি। অনুভব করলাম, মা-র ভালবাসা থেকে আমি চিরকালের জন্যে বঞ্চিত হয়েছি। আর তার কারণ আমি ডোরাদার, ভাবলাম আমি। আমার রং সম্পর্কে লোকেদের মন্তব্যগুলো মনে পড়তে লাগল এবং আমার মাথা এত গরম হয়ে উঠল যে আমি রাগের চোটে দেয়ালে মাথা আর হাঁটু দিয়ে ধাক্কা দিতে লাগলাম, যতক্ষণ না আমি ঘেমে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

অল্প কিছুক্ষণ বাদে মা ফিরে এল। শুনতে পেলাম, বারান্দা দিয়ে একটা অস্বাভাবিক পদক্ষেপে আসছেন মা, দরজা খুলে দেওয়া হল। তাকে এত জোয়ান আর এত সুন্দরী দেখাচ্ছিল যে আমার মনে হল যেন আমি তাঁকে চিনি না। তিনি আমায় শুঁকলেন, নাক দিয়ে শব্দ করলেন এবং হাসতে শুরু করলেন। তাঁর সব কিছুই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তিনি আর আমাকে ভালবাসেন না। তিনি বললেন, 'দব্রি কী সুন্দর এবং মা তাকে কত ভালবাসেন।'

বার বার দ্রব্রির সঙ্গে মোলাকাতের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। আর আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শীতল থেকে শীতলতর হতে লাগল।

শীগগিরই ঘাস খাওয়ার জন্য আমাদের ছেড়ে দেওয়া হল। এতে নতুন আনন্দ পেলাম—যা মায়ের ভালবাসা হারানোর ক্ষতি কিছুটা পূরণ করল। বন্ধু ও সঙ্গী পেলাম ওখানে। ঘাস খেতে শিখলাম, বড়দের মত চিঁহিঁ ডাকতে শিখলাম। আর শিখলাম মায়েদের চারদিকে জোড়া পায়ে লাফিয়ে চক্কর দিতে। এসব ছিল সুখের দিন। সব অপরাধের ক্ষমা ছিল তখন, সবাই ভালবাসত আমায়, তারিফ করত, প্রশ্রয় দিত।

কিন্তু এরকম বেশি দিন চলল না। শিগ্‌গিরই একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল।

* * *

আক্কা একটা গভীর নিশ্বাস টেনে চলে গেল।

ভোর হল। ফটকের ক্যাঁচকোচ আওয়াজ শোনা গেল। নেস্তের ভেতরে এল। ঘোড়ারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। নেস্তের আক্কার পিঠে জিন কষে বাঁধল এবং দলটাকে চরাতে নিয়ে চলল।

৬

দ্বিতীয় রাত্রি

সন্ধ্যেবেলা আস্তাবলে ফিরতেই সব ঘোড়া ডোরাদার আক্কাটার কাছে এসে জড়ো হল।

সে বলতে লাগল।

আগস্ট মাসে আমাকে মার কাছ ছাড়া করা হল। খুব বিশেষ রকমের কোনো দুঃখ পেলাম না। দেখলাম, তখন আমার ছোট্ট ভাইয়ের (বিখ্যাত উসান) ভূমিষ্ঠ হবার আর বেশি দেরী নেই। মার কাছে আমার আগের আদর আর নেই। আমার তাতে হিংসে হচ্ছিল না। মার প্রতি আমার ভালবাসাও ক্রমেই কমে আসছিল। তাছাড়া আমি জানতাম যে আমাকে মার কাছ-ছাড়া করে বাচ্চাদের আস্তাবলে রাখা হবে। সেখানে দুটি বা তিনটি বাচ্চা এক সঙ্গে থাকব এবং প্রতিদিন আমাদের হাওয়া খাওয়াতে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। ওখানে ডার্লিং নামের একটি ঘোড়া আমার সহবাসী হল। ডার্লিং ছিল জিন ঘোড়া, সে পরে সম্রাটের খাস ঘোড়া হয়, এবং সম্রাটসহ তার ছবি আঁকে চিত্রশিল্পীরা ও মূর্তি বানায় ভাস্করেরা।

তখন সে ছিল একটি সাধারণ বাচ্চা। নরম উজ্জ্বল ছিল তার চামড়া, রাজহাঁসের মত ছিল গলা, পাগুলো ছিল সোজা আর লিকলিকে রোগা—বাজনার তারের, আমুদে ও ভাল স্বভাবের অমায়িক ঘোড়া ছিল সে। লম্ফঝম্ফ, বন্ধুদের গা চাটা, ঘোড়া ও মানুষকে জব্দ করা—এই সব ওর ভাল লাগত। আমরা ছিলাম দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সারাটা যৌবন আমাদের এ বন্ধুত্ব অটুট ছিল। তখন ও ছিল ফুর্তিবাজ আর একটু চপল ধরনের।

তখন থেকেই ও প্রেমে পড়তে আরম্ভ করেছে। ঘুড়ীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টিও শুরু হয়েছে। আমার ভালমানুষি নিয়ে ও হাসিঠাট্টা করত। ওকে তখন নকল করতে শুরু করলাম—নইলে আর আত্মসম্মান বজায় থাকছিল না কিন্তু তাতেও কষ্টে পড়ে গেলাম, খুব শিগগির আমিও প্রেমে পড়লাম। এই অকাল-মোহ আমার জীবনের বিরাট পরিবর্তন এনে দিল।

হ্যাঁ, আমি প্রেমে পড়েছিলাম। ভিজাপুরিখা আমার চেয়ে এক বছরের বড। কিন্তু শরৎকালের শেষ বরাবর লক্ষ্য করলাম যে সে আমার সম্পর্কে একটু লাজুক হতে শুরু করেছে। আমার প্রথম প্রেমের বিষাদ-কাহিনীর সবটুকু বলার চেষ্টা করব না। সেই উন্মত্ত আবেগের কথা নিশ্চয়ই ওর মনে আছে। কিন্তু এর ফলে আমার জীবনের সবচেয়ে পরিবর্তন ঘটল। অশ্ব-পালকের লোকেরা আমায় ওর কাছে থেকে আলাদা করে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে পেটাল। একদিন সন্ধ্যায় তারা একটা বিশেষ চালায় আমায় নিয়ে গেল। সারা রাত সেখানে কাঁদলাম, পরের দিন কী ঘটবে তা যেন আমি আগেই বুঝতে পারছিলাম।

সকালে জেনারেল সাহেব, আস্তাবলের কর্তা, সহিস ও পালকেরা বারান্দা দিয়ে আমার চালায় এল, আর তুমুল হৈ চৈ শুরু হল। জেনারেল সাহেব আস্তাবলের কর্তাকে খুব চেঁচিয়ে বকতে লাগলেন, কর্তা নিজের সপক্ষে বলল যে সে আমাকে বাইরে বার না করার জন্য হুকুম দিয়েছে, কিন্তু সহিসরা তার কথা শোনে না। জেনারেল বললেন, তিনি সবাইকে চাব-কাবেন, আর আমাকে খাসী করে দিতে হবে। কর্তা বলল, হুকুম তামিল করবে। সব কিছু শান্ত হলে তারা চলে গেল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এটুকু আঁচ করলাম যে আমাকে একটা কিছু করা হবে।

* * *

পরদিন আমার চিঁহিঁ রব চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। আজ আমায় যা দেখছ তাই হয়ে গেলাম আমি। সারা দুনিয়াই আমার চোখে বদলে গেল। কিছুতেই আর আমি আনন্দ পেতাম না। আমি নিজের ভেতরে সেঁধিয়ে গেলাম, আর নানা কথা ভাবতে লাগলাম। গোড়ার দিকে কিছুতেই আর উষ্ণ উৎসাহ বোধ করতাম না। বন্ধুদের সঙ্গে খেলা তো দূরের কথা, খেতে বা হাঁটতেও ইচ্ছে করত না আমার। পরে এক এক সময় লাফাতে, কদমে ছুটতে ও ডাক ছাড়তে ইচ্ছে হত। কিন্তু তারপরেই আমি

নিজেকে সেই ভয়াবহ প্রশ্নটা করতাম, 'কেন? কী জন্যে?' আর সঙ্গে সঙ্গেই সারাটা জীবন বিস্বাদ হয়ে যেত এবং প্রাণে কোনো জোরও থাকত না।

পালটিকে ফিরিয়ে আনার সময় একদিন সন্ধ্যের আমায় নিয়ে গেল বেড়াতে। দূরে দেখলাম ধুলোর মেঘে আবছা আমাদের ঘুড়ীগুলো। কানে এল তাদের হাসি, মাটিতে পা ঠোকার শব্দ। দাঁড়িয়ে পড়লাম। সহিস জোর টানছে। লাগাম ঘাড়ে কেটে বসছে। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এগিয়ে-আসা পালটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। চিরদিনের জন্যে যে সুখ হারিয়ে গেছে সেই দিকে লোক যেমন করে তাকায়, আমিও তেমন করেই চেয়ে ছিলাম। ওরা যখন কাছে এল তখন সবাইকে চিনলাম একে একে। আমার সব পুরানো বন্ধুরা—কী সুন্দর, রাজকীয়, চকচকে আর স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল! ওদের কে একজন তাকাল আমার দিকে। লাগামে হেঁচকা টান মেরেই চলেছে সহিস। কিন্তু সে ব্যাথাটা কিছু নয়। নিজের সব কিছু ভুলে আমি আগেকার মতো হ্রেষারব করে কদমে ছুটলাম ওদের দিকে। কিন্তু আমার ডাকটা শোনাল বিষণ্ণ, হাস্যকর, উদ্ভট। পুরোনো বন্ধুরা কেউ হাসল না বটে, কিন্তু দেখলাম ওদের অনেকে সঙ্গত ব্যবহারের খাতিরে অন্য দিকে ফিরে দাঁড়াল। বুঝলাম আমার চেহারাটা ওদের কাছে বিশ্রী, করুণ, লজ্জাকর, আর সবচেয়ে বেশি—হাস্যকর। আমার রোগা শির-বার-করা গলা! প্রকাণ্ড মাথা! (তখন আমার ওজন অনেক কমে গিয়েছিল) লম্বা কিম্ভুত ঠ্যাং! বোকার মত আলগা হেঁটে আগেকার মতো সহিসকে ঘোরা! সব কিছু নিশ্চয়ই হাস্যকর দেখাল। আমার হ্রেষায় কেউ সাড়া দিল না। সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিল। আর হঠাৎ সব কিছু আমি বুঝে ফেললাম। বুঝলাম, ওদের কাছে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত অচেনা হয়ে গেছি চিরদিনের জন্যে। এত দুঃখ হল যে কী ভাবে সেদিন আস্তাবলে ফিরেছিলাম মনে নেই।

এর আগেও গম্ভীর চিন্তামগ্নতার প্রবণতা আমার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। এখন আমি পুরোটাই ঐ রকম হয়ে গেলাম। আমার ডোরা দাগ লোকের মনে অবোধ্য ঘৃণা জাগায়, আমার অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্য, পাল ঘোড়ায় খামারে আমার বিচিত্র স্থান, যার বিষয়ে আমি সচেতন, কিন্তু যার কারণ আমার অজ্ঞাত—সব মিলে আমাকে বাধ্য করল নিজের মনের মধ্যে ঢুকে

যেতে। ভোয়া দাগের জন্য মানুষরা আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতো—এই অবিচার নিয়ে আমি ভাবতাম। ভাবতাম মায়ের স্নেহের ও সাধারণত নারীপ্রেমের ভঙ্গুর প্রকৃতির কথা, সে-প্রেম তো নির্ভর করে শুধু শারীরিক ব্যাপারের ওপর। সবচেয়ে বেশি ভাবতাম, আমাদের জীবনে মানুষ নামক যে জন্তুর ভূমিকা সবচেয়ে গুরুতর তার খামখেয়াল নিয়ে, যে খেয়ালের জন্যে পাল ঘোড়ার দলে আমার অবস্থাটা এমন অদ্ভুত। অবস্থাটার বিষয়ে আমি সচেতন, কিন্তু কেন এমন তার কোনো ব্যাখ্যা পেলাম না। মানুষের খেয়ালের জন্যেই যে এটা ঘটেছে তা আমার কাছে পুরো উদ্‌ঘাটিত হল একটি ঘটনায়।

শীতের ছুটিতে ঘটেছিল ঘটনাটা। সারা দিন আমায় কোন দানা-পানি দেওয়া হয় নি। পরে জানলাম যে এর কারণ, সহিস নেশা করে পড়ে ছিল। সেদিন শেষে আস্তাবলের কর্তার নজর পড়ল—আমায় অভুক্ত দেখে অনুপস্থিত সহিসের উদ্দেশ্যে খুব খানিকটা খিস্তি করে চলে গেল। পরের দিন সহিস আর তার দোস্তকে আমাদের চালায় খাবার আনতে দেখলাম, তার বিশেষ একটা ফ্যাকাশে ও মনমরা ভাব, তার লম্বা পিঠে এমন একটা কিছু ছিল যেটা মনোযোগ আকর্ষণ করে ও অনুশোচনা জাগায়। গরাদের ভেতর দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে খড় ছুঁড়ে দিল সে। মাথাটা বার করে তার কাঁধে রাখতে যাচ্ছি, সে নাকে অ্যায়সা এক ঘুঁষি ঝাড়ল যে ছিটকে পেছনে এলাম। তারপর সে পেটে একটা লাথি কষাল।

'এই ঘেয়ো শয়তানটাই সব নষ্টের মূল।' বলে উঠল সে।

'কেন।' শুধোল অন্য সহিস।

'বেটা কাউন্টের ঘোড়ার বাচ্চা দেখতে যায় না, কিন্তু নিজের খাস ঘোড়াটিকে দেখা চাই দিনে দু'বার করে।'

'বটে! ওকে ডোবাদারটা বুঝি দিয়ে দিয়েছে?' আর একজন শুধোল।

'দিয়েছে না বেচেছে শয়তানই শুধু জানে। কাউন্টের ঘোড়ার বাচ্চাগুলো না খেয়ে মরলেও ওর কোনো পরোয়া নেই। কিন্তু ওর সম্পত্তি যে এটি—একে না খাইয়ে রাখি, কী দুঃসাহস! বলল, "শুয়ে পড়।" আর চাবুক চালাল। খাঁটি খৃস্টান কিনা। মানুষের চেয়ে জন্তুর ভাবনা বেশি। সবাই জানে অধার্মিক লোক ও-ব্যাটা। শুনে শুনে চাবুক কষালো। বেটা জানোয়ার!

জেনারেল সাহেবও কাউকে এমন চাবকান না—সারা পিঠ একেবারে খুবলে খুবলে দিয়েছে। সত্যি বলছি। ব্যাটার দয়ামায়া বলে কিচ্ছু নেই।'

খৃষ্টধর্ম ও চাবকানো ভালই বুঝতে পারলাম। কিন্তু 'ওর খাস ঘোড়া', 'ওর সম্পত্তি' কথাগুলোর মানে বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারলাম না। মনে হল আমার ও আস্তাবলের কর্তার মধ্যে একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে কথাগুলোয়, কিন্তু সম্পর্কটা কী, আমার কোনো ধারণা ছিল না তখন। এর কিছু দিন পরে অন্য ঘোড়াদের কাছ-ছাড়া করা হলো আমায়, তখুনি মানে স্পষ্ট বোঝা গেল। আমায় যে কারো সম্পত্তি বলা যেতে পারে, তখন আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমাকে, জ্যান্ত একটা ঘোড়াকে 'আমার ঘোড়া' বলাটা অদ্ভুত ঠেকল, ঠিক যেমন অদ্ভুত ঠেকত যদি ও বলত 'আমার মাটি', 'আমার বাতাস', 'আমার জল'।

তবু কথাগুলোর গভীর ছাপ রয়ে গেল আমার মনে। সারাক্ষণ মনের মধ্যে ভাবনার আলোড়ন চলতে লাগল। মানুষের সঙ্গে নানা বিচিত্র সম্পর্কের অভিজ্ঞতার পর শুধু এসব অদ্ভুত কথাগুলো বলতে লোকে কী বোঝায় হৃদয়ঙ্গম হল। মানেটা হচ্ছে এই, মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে কাজ নয়, কথা। কিছু করা বা না করার সুযোগ যে তাবা উপভোগ করে তা নয়, কয়েকটি বস্তুতে ছকবাঁধা কয়েকটা কথা প্রয়োগ করার সুযোগ পেলে তারা আনন্দ পায়। সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করে যে সব কথায় তাদের একটি হচ্ছে 'আমার'। ও কথাটা তারা প্রয়োগ করে নানা রকমের প্রাণী ও বস্তুর প্রসঙ্গে। এমন কি জমি, মানুষ ও ঘোড়াও বাদ নয়। ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছে যে একটা বিশেষ জিনিসের ক্ষেত্রে একটি মাত্র লোকের শুধু 'আমার' কথাটি ব্যবহারের অধিকার থাকবে। আর তাদের এই খেলায় যে সবচেয়ে বেশি জিনিসের প্রসঙ্গে কথাটি ব্যবহারের অধিকার পেয়ে যায়, লোকের মতে সেই হল সবচেয়ে সুখী। এমনটা কেন হয় তা আমার কল্পনার বাইরে, কিন্তু ব্যাপারটা এই। দীর্ঘকাল আমি এর প্রত্যক্ষ সুবিধে কী তা বার করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, বহু লোক যারা আমায় তাদের সম্পত্তি বলত, তারা আমার পিঠে চড়ে নি। অন্য নানা লোকে চড়ত। তারা খাওয়াত না, খাওয়াত অন্য নানা লোকে। তারা আমার সম্পর্কে সদয় ব্যবহারও করত না, করত অন্য নানা লোকে, যেমন, কোচওয়ান, সহিস এবং এই

রকম সব লোক। তাই অনেক দেখে শুনে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে শুধু ঘোড়া নয়, সব বিষয়ে 'আমার' এই প্রত্যয়ের মূলে আছে শুধু একটা বর্বরোচিত নীচ প্রবৃত্তি, যেটাকে ওরা নিজেরাই বলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সহজাত বোধ বা অধিকার। 'আমার বাড়ি' লোকে বলে, যদিও সেখানে থাকে না। তারা শুধু বাড়ি তৈরি করে রেখে দেয়। 'আমার দোকান', 'আমার কাপড়ের দোকান' বলে ব্যবসায়ীরা, যদিও খাস দোকানের সেরা কাপড়ের পোশাক কখনো গায়ে দেয় না। এমন লোকও আছে যারা এক টুকরো জমিকে নিজেদের বলে দাবী করে, কিন্তু কোন দিন পা দেয় নি সে মাটিতে, চোখেও দেখে নি কখনো। এমন কি, এমন লোকও আছে যারা অন্য মানুষকে নিজেদের সম্পত্তি বলে মনে করে, অথচ কোন দিন চোখেও দেখে নি তাদের, তাদের সঙ্গে সম্পর্কের মূল কথা তাদের ক্ষতি করা। লোকে আবার কয়েকটি মেয়েমানুষকে বলে তাদের নিজেদের মেয়েমানুষ, নিজেদের স্ত্রী, অথচ মেয়েগুলো থাকে অন্য পুরুষদের সঙ্গে। আর জীবনে মানুষের উদ্দেশ্য হলো যেটাকে ভালো মনে করে তা করা নয়, যত বেশি পারে জিনিসকে নিজের বলাটা। আমার কোনো সন্দেহ নেই মানুষ আর আমাদের মতো পশুদের মধ্যেকার প্রধান পার্থক্য এইটাই। মানুষের কার্য-কলাপ, অন্তত যাদের সংস্পর্শে আমি এসেছি; তাদের প্রত্যেকের ক্রিয়া-কলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজ নয়, কথা। আর আমাদের ক্রিয়াকলাপের পেছনে আছে কাজ। শুধু এটারই জন্য মানুষের তুলনায় শ্রেয় আমাদের অন্যান্য গুণাবলীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমরা জোর করে বলতে পারি যে প্রাণীজগতে মানুষের চেয়ে আমাদের স্থান এক ধাপ উঁচুতে।

যাই হোক, আমাকে 'আমার ঘোড়া' বলার অধিকার দেওয়া হয়েছিল আস্তাবলের কর্তাকে। তাই সহিসকে সে চাবকালো। এই কথাটা জেনে অভিভূত বোধ করলাম। আমার রং দেখে লোকের মনে যে জাতীয় চিন্তা জাগত, তাও অভিভূত করল আমাকে। মায়ের বিশ্বাসঘাতকতায় বিষণ্ণ ছিলাম, তায় তার সঙ্গে এই সব। ক্রমে তাই আমি হয়ে পড়লাম অতি গম্ভীর ও ভাবনাচ্ছন্ন—যেমন আজ আমায় দেখছ।

আমার মন্দভাগ্য তিন রকমের। ডোরা দাগ, আমি আক্তা, আর লোকের ধারণা অনুযায়ী আমি এই আস্তাবলের কর্তার সম্পত্তি। আমি নিজের নই, ঈশ্বরের জীবও নই—যেটা হওয়া প্রতিটি প্রাণীর পক্ষে স্বাভাবিক।

আমার সম্পর্কে ওদের এই সব ভাবার ফল হল নানা রকমের। প্রথমত, আমায় অন্য ঘোড়াদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়, ভালো রকম খাওয়ানো হয়, ব্যায়াম বেশি করানো হয়, আর অন্যদের চেয়ে আগে বাগ মানানো হল আমাকে। তিন বছর বয়সে প্রথম লাগাম পরানো হয় আমাকে। দিনটা বেশ মনে আছে। আস্তাবলের কর্তা, যে আমায় তার সম্পত্তি মনে করত, সে এক দল সহিসের সঙ্গে এল গাড়ি জুততে। সবাই ধরে নিয়েছিল যে আমি দারুণ বাধা দেব—বাগ মানানো শক্ত হবে। মুখ বেঁধে, বমের মাঝখানটায় জোর করে ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধল। পিঠে চামড়ার চওড়া সব পেটি বসিয়ে বেঁধে দিল বমের সঙ্গে, যাতে পেছন দিকে লাথি ছুঁড়তে না পারি। কিন্তু আমি কাজ ভালবাসি, কাজ করতে চাই, এই ইচ্ছেটা তখন একমাত্র ছিল আমার!

বয়স্ক ঘোড়ার মত পা ফেলে বেরিয়ে আসতে দেখে ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা আমায় চালিয়ে নিয়ে বেড়াল, আমার কদমে চলা শেখার শুরু হল। আমি খুবই তাড়াতাড়ি শিখছিলাম। তিন মাস বাদে তাই জেনারেল সাহেব ও অন্যান্য অনেকে আমার গতিভঙ্গির প্রশংসা করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আমি নিজের নই, ঐ আস্তাবলের কর্তার সম্পত্তি বলে আমার এই গতিভঙ্গির সম্পূর্ণ একটা আলাদা মানে ছিল ওদের কাছে।

আমার সঙ্গের অন্যান্য বাচ্চা ঘোড়াদের ঘোড়দৌড়ে নিয়ে যাওয়া হত, তাদের সব কিছু টুকে রাখা হত, লোকে তাদের দেখতে আসত। তারা টানত গিল্টি করা দু'চাকার গাড়ি, পিঠে চাপাত দামী কাপড়! আর আমায় আস্তাবলের কর্তার সাধারণ গাড়ি টানতে হত, তাকে তার কাজে নিয়ে যেতে হত চেসৃমেন্‌কা ও অন্য সব গ্রামে। এর কারণ আমার গায়ের ডোরা দাগ, আর তাদের মতে আমি কাউন্টের সম্পত্তি নই, আস্তাবলের কর্তার সম্পত্তি।

যদি বেঁচে থাকি, তাহলে কাল তোমাদের বলব—আমায় তার সম্পত্তি ধরে নেওয়ার ভয়ংকর পরিণামের কথা।

পরদিন ঘোড়ারা গজকাঠিকে বিশেষ সম্মান ও সমীহ দেখালো। কিন্তু নেস্তের বরাবরের মতই খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। চাষীর ছাই রঙের

'সাফলের' ঘোড়াটা দলের কাছে এসে ডাক ছাড়ল আবার, বাদামী ঘুড়ীটাও আবার তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি আর ছেনালির চেষ্টা চালাল।

৭
তৃতীয় রাত্রি

উঠোনের মাঝখানে গজকাঠি দাঁড়িয়ে। অন্য ঘোড়ারা ভীড় করে ঘিরে আছে তাকে। প্রতিপদের চাঁদের স্নিগ্ধ আলো পড়েছে তার গায়ে।

সে বলছিল:

কাউন্ট বা ঈশ্বর কারুরই আমি নই, আমি আস্তাবলের কর্তার, এর সবচেয়ে আশ্চর্য একটা ফল হল। ক্ষিপ্র গতিভঙ্গি—যা একটি ঘোড়ার সবচেয়ে বড় গুণ—আমার সেই গুণের জন্যেই আমার নির্বাসন হল।

একদিন 'রাজহাঁস' নামের ঘোড়াটাকে নিয়মিত ব্যায়ামের অঙ্গ হিসেবে দৌড় করানো হচ্ছে, আস্তাবলের কর্তা তখন চেসমেনকা থেকে ফিরছিলো। সে আমায় দৌড়ের জায়গায় নিয়ে গেল। রাজহাঁস আমাদের পেরিয়ে গেল। সে খুব চমৎকার দৌড়চ্ছিল। কিন্তু চাল দেখাচ্ছিল বড় বেশি। আর দৌড়ের নৈপুণ্য ও কৌশলও আমার মত নয়। একটা খুর মাটিতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে অন্য খুর তুলে নেওয়ার অভ্যেস আমার করা ছিল, যাতে গতি এক বিন্দুও না বাধে, প্রত্যেকটা পদক্ষেপই দেহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগে। যা বলছিলাম, রাজহাঁস আমাদের পেরিয়ে গেল। দৌড়ের জায়গার দিকে চলেছি, বাধা দিল না কর্তা। 'আরে আক্কাটাকে একবার দৌড় করিয়ে দেখা যাক না!' সে চেঁচিয়ে বলল। পরের চক্করে রাজহাঁস যখন আমাদের কাছে এল, তখন সে আমায় দৌড়তে ছেড়ে দিল। রাজহাঁসের তখন বেশ গতি এসে গিয়েছে, তাই পয়লা চক্করে আমি পিছিয়ে রইলাম। কিন্তু দ্বিতীয় চক্কর থেকে এগোতে শুরু করলাম। আমি ওকে ক্রমে ধরেও ফেললাম, চললাম পাশাপাশি, তারপরে ওকে ছাড়িয়ে গেলাম।

এর পর আর একবার দৌড়ের পরীক্ষা হল আমার। ফল একই হল। আমি ওর চেয়ে অনেক জোরে ছুটি। এতে সবাইর আতঙ্ক হল। ঠিক হল, আমায় দূরে কোথাও বিক্রি করে দেওয়া হবে, যেখানে আমার কোন খোঁজ আর পাওয়া যাবে না। 'কাউন্ট এ শুনলে আর রক্ষে থাকবে না।' বলল সবাই।

এক অশ্ব-ব্যবসায়ীর কাছে আমায় বেচে দেওয়া হল গাড়ির মাঝের ঘোড়া হিসেবে। সে আমায় বেশি দিন রাখেনি। নতুন ঘোড়ার জোগাড়ে আসা এক হুজারের কাছে বেচে দিল সে আমাকে। এইসব ব্যাপার এত নির্দয় ও অন্যায় যে খ্রেনভো থেকে আমার এত আপন ও প্রিয় সব কিছু ছেড়ে যখন আমাকে যেতে হল তখন খুশী হলাম। আমার পুরনো বন্ধুদের মধ্যে থাকা আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হচ্ছিল। ওদের জন্যে ভালবাসা, সম্মান স্বাধীনতা আর আমার জন্যে—কাজ আর অসম্মান, অসম্মান আর কাজ, কেন? ওঃ! কেন? সামান্য একটি কারণ—আমার গায়ে আছে ডোরা দাগ। তাই আমায় অন্য লোকের সম্পত্তি করে দেওয়া হল।

সে রাতে গজকাঠি আর বেশি বলার সুযোগ পেল না। এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ফলে ঘোড়াদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল, খুবই মন দিয়ে এতক্ষণ গল্প শুনছিল কুপচিখা, তখনো তার বাচ্চা হয়নি, হঠাৎ সে ঘুরে তার চালায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে এত জোরে কাতরাতে লাগল যে সব ঘোড়া সে দিকে তাকাল। দেখল, সে শুয়ে পড়েছে। ধড়মড় করে উঠে পড়ছে, আবার শুয়ে পড়ছে। বয়স্কা ঘুড়ীরা বুঝল ব্যাপারটা। কিন্তু কমবয়সীরা ভীত হয়ে আস্তাকে ছেড়ে কুপচিখাকে ঘিরে দাঁড়াল।

সকালে আর একটি বাচ্চা ঘোড়া দেখা গেল—সে নড়বড়ে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নেস্তের ডাকল সহিসকে। সহিস ঘুড়ী আর বাচ্চাকে আস্তাবলে নিয়ে গেল। আর বাকী দলটাকে নিয়ে চলল নেস্তের।

৮

চতুর্থ রাত্রি

সেদিন সন্ধ্যায় যখন সব ফটক বন্ধ করে দিল, আর চারদিকে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, ডোরাকাটা তখন আবার তার কথা শুরু করল।

হাত-বদল হচ্ছিলাম একের পর এক, আর বহু রকমের মানুষ ও ঘোড়া দেখা হচ্ছিল আমার। দু'জন মালিকের কাছে সবচেয়ে বেশি সময় ছিলাম। একজন এক রাজপুত্র—হুজারদের অফিসার ছিলেন তিনি। আর একজন

হচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা—সিদ্ধিদাতা সেন্ট নিকলাসের গির্জার কাছে তিনি থাকতেন।

হুজারের সঙ্গেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কেটেছে। যদিও তিনি আমার ধ্বংসের কারণ, যদিও তিনি জীবনে কাউকে বা কিছুকে ভালবাসেন নি, তাও আমি তাঁকে ভালবেসেছিলাম এবং বেসেছিলাম ঠিক ঐ জন্যেই। তাঁকে ভালবাসতাম কারণ তিনি ছিলেন সুন্দর, ধনী এবং সুখী, আর সেই জন্যেই তিনি কাউকে ভালবাসতেন না। তোমরা নিশ্চয়ই এ কথাটা বুঝতে পারছ। এটা আমাদের ঘোড়াদের সবচেয়ে মহান মনোভাব। তাঁর নিরাসক্তি, তাঁর নিষ্ঠুরতা, তাঁর ওপরে আমার চরম নির্ভরতা—এ সবই তাঁর প্রতি আমার ভালবাসাকে আরো জোরালো করে তোলে। সেই সব সুন্দর পুরাতন দিনগুলোতে আমি ভাবতাম, 'আমাকে মারুন, দৌড়িয়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাক, তাতে আমি আরো সুখীই হব।'

আস্তাবলের কর্তা আমায় বেচেছিল যে ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে, তার কাছ থেকে তিনি আমায় কিনেছিলেন আট শো রুবল দিয়ে। আর কারো ডোরাদার ঘোড়া নেই—এইটাই ছিল তাঁর কেনার কারণ। ঐ দিনগুলোই আমার জীবনের সবচেয়ে সেরা দিন। তাঁর একজন রক্ষিতা ছিল। আমি জানি, কারণ আমিই তাঁকে তার কাছে রোজ নিয়ে যেতাম, বা কখনো কখনো দুজনে এক সঙ্গেও গাড়িতে ভ্রমণে বেরোতেন। তাঁর রক্ষিতা ছিল সুন্দরী। তিনি নিজেও সুদর্শন। তাঁর কোচওয়ানও দেখতে ভালো। এই জন্যে আমি তাঁদের ভালবাসতাম। আমার সুখের আর শেষ ছিল না।

এই ভাবে আমার দিন কাটছিল। সকালে সহিস আমার তদারক করতে আসত। কোচওয়ান নয় সহিস! সহিসটি ছিল চাষীদের ঘরের তরুণ তাজা ছেলে। আমাদের গায়ের ভাপ যাতে বেরিয়ে যায় তার জন্য দরজা খুলে দিত, ফেলে দিত নাদা, তারপর আমার পিঠের কাপড় সরিয়ে খটরা দিয়ে আমাকে আঁচড়ানো চলত। খাঁজকাটা কাঠের তক্তায় সাদা সারিতে চাঁচরা পড়ত। খেলার ছলে পা ঠুকে তার হাত কামড়াতাম। আমার পালা এলে ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চায় নিয়ে যেত, বেশ তারিফ করে দেখত তার নিজের হাতের কাজ, দেখত তীরের মত সোজা পিঠে চওড়া খুরে-বসা আমার পাগুলো। দেখত আমার চকচকে পিঠ আর পাছা, এত

মসৃণ যে তাতে ঘুমানো চলে। তারপর উঁচু ঝাঁঝরির ওপর দিয়ে ফেলে দেওয়া হত খড়, যই ছড়িয়ে দেওয়া হত গামলায়। অবশেষে দেখা দিত ফেওফান, কোচওয়ানদের সর্দার।

কোচম্যানটি ঠিক তার প্রভুর মত। দুজনেই নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসত না, ভয়ও পেত না কাউকে। আর সেজন্যই ওদের ভালবাসত সবাই। ফেওফান পরত লাল সার্ট, নকল মখমলের প্যান্ট, হাতাহীন কোট। আমার খুব ভাল লাগত যখন ছুটির দিনে হাতাহীন কোটে, তেল-চকচকে চুল আর গালপাট্টা নিয়ে আস্তাবলে এসে চেঁচিয়ে ও বলত, 'কী রে, আমায় ভুলে মেরে বসে আছিস নাকি, জানোয়ার?' আর একটা উকনঠেলার বাঁট দিয়ে খোঁচা দিত আমার রাঙে, ব্যথা দেবার জন্য নয়, মজা করে। আমি জানতাম ও শুধু মস্করা করছে, তাই কান লটকে দাঁত কড়মড় করতাম।

আমাদের একটা কালো ঘোড়া ছিল—সে জোরে কাজ করত। রাতে আমার থাকার জায়গা ছিল তার সঙ্গে। পলকান-টার হাসিঠাট্টার কোনো বোধ ছিল না, আর ঘোর শয়তান ছিল। পাশাপাশি আমাদের চালা, মাঝে গরাদ। তার শিকের ভেতরে মুখ বাড়িয়ে আমরা কামড়াকামড়ি করতাম—কিন্তু সেটা মোটেই মজা করে না। ফেওফান তাকে ভয় পেত না। সটান কাছে গিয়ে গর্জন করে উঠত, যেন জান নেবার মতলব। কিন্তু না—ওকে ছাড়িয়ে গিয়ে মুখের দড়ি নিয়ে ফিরে আসত। কুজনেৎস্কি স্ট্রীটে একবার পলকান আর আমি কী জোর দৌড়েছিলাম! কিন্তু না মনিব, না কোচম্যান, এতটুকু ভয় কারো নেই, হেসে ও চেঁচিয়ে লোকদের সতর্ক করে দিয়ে তারা এমন কায়দা করে আমাদের চালায় যে কারো কোনো চোট বা ধাক্কা লাগে নি।

জীবনের অর্ধেকটা আর আমার যা কিছু সেরা গুণ দিয়েছিলাম ওদের। বড় বেশি জল খেতে দিত আর আমার পাগুলোর দফারফা হয়ে গেল বটে, তবু ঐগুলোই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন।

দুপুর বারোটায় আমায় জিন লাগাতে আসত ওরা। খুরে চর্বি লাগানো হত। কেশরে আর সামনের ঝুঁটিতে জল। তারপর গাড়িতে জুতে দিতো।

বেতের স্লেটার ছিল মখমলের পাড়। লাগামে ছোট ছোট রূপোর

বকলস। রাশ আর জাল রেশমের। জিনটা এমন যে সব কটা বেল্ট আর পট্টি বসিয়ে কষে দেবার পর বলা যেত না কোথায় জিন-সাজের শেষ আর কোথায় ঘোড়ার শুরু। সাধারণত আমাকে জোতা হত চালায়। পিঠের চেয়ে পাছা চওড়া ছিল ফেওফানের। সে বগলের নিচে লাল বেল্টটা চেপে ধরে, সাজসজ্জা দেখে নিয়ে, রেকাবে পা দিয়ে একটা কিছু ইয়ার্কি দিয়ে স্লেটায় বসে কোট ঠিকঠাক করে, চাবুকটা তুলত একবার। না তুললে নয় কিনা। অবশ্য আমার পিঠে পড়ত না ওটা কখনো। তারপর বলত, 'চল্ রে, হট।' আর সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে ফটক পেরিয়ে যেতাম বাইরে, দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াত জলের বালতি হাতে রাঁধুনি, জ্বালানী কাঠ উঠোনে পৌঁছিয়ে দিয়ে চাষীরা হ্যাঁ করে চেয়ে থাকত।

ফটকের বাইরে একটু গিয়ে আমাদের থামবার কথা। মালিকের চাকরবাকর আর অন্য সব কোচওয়ান গাড়ি ঘিরে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিতো। সেখানে প্রবেশ-পথে সবাই দাঁড়িয়ে থাকতাম, কখনো তিনটি ঘণ্টা মাঝে-মধ্যে একটু ঘুরে আসা, তারপর আবার অপেক্ষা।

অবশেষে প্রবেশ-পথে সাড়া পাওয়া যায়। পাকা-চুল, পেটমোটা, ফ্রককোট-পরা তিখন ছুটে বেরিয়ে হাঁক দিত, 'গাড়ি লে-আও।' তখনকার দিনে ওরা বোকার মত 'সামনে' বলে চেঁচাত না। যেন কোন দিকে যেতে হবে, সামনে না পেছনে, জানা নেই আমার। জিভ দিয়ে টকটক আওয়াজ করত ফেওফান। এগিয়ে যাওয়া হত। আর রাজার ছেলে বেরিয়ে আসতেন। মাথায় শিরস্ত্রাণ ও গায়ে ওভারকোট—সুসজ্জিত। বীবরের লোমের ছাই-রঙা কলারে তাঁর সেই সুন্দর টকটকে লাল, কালো-ভুরু মুখ ঢাকা, যেটা হওয়া কখনো উচিত নয়। তাড়াতাড়ি উদাসীন ভাবে বেরিয়ে আসতেন তিনি। যেন স্লে, ঘোড়া আর ফেওফান—কেউ বা কিছু অসাধারণ নয় মোটেই। ফেওফান তো কুর্নিশ করে হাত ছড়িয়ে এমন একটা ভঙ্গি নিত যে মনে হত ও অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা অসম্ভব। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—জুতোর কাঁটা, তলোয়ার আর পেতলের গোড়ালি খটখটিয়ে, গালচের ওপর পা ফেলে এমন ভাবে বেরিয়ে আসতেন রাজপুত্র যেন তাঁর বড্ডো তাড়া রয়েছে। তিনি ছাড়া আর সবাই যাকে হাঁ হয়ে গিয়ে প্রশংসা করছে সেই আমাকে, ফেওফানকে ও অন্যান্য কোনো কিছুকে দেখার সময় নেই তাঁর। ফেওফানের টকটক আওয়াজে দড়িতে টান দিয়ে ভব্য গতিতে

কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, রাজপুত্রের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে রেশমের মত কেশর ঝুঁটিওয়ালা খানদানি মাথাটা ঝাঁকাতাম। মেজাজ ভালো থাকলে রাজপুত্র ফেওফানকে উদ্দেশ করে রসালো টিপ্পনি কাটতেন দু-একটা। জবাবে সুন্দর মাথা একটুখানি ফেরাত ফেওফান তারপর হাত পা নামিয়েই রাশে প্রায় বোঝা যায় না অথচ আমার জানা এমন একটা টান দিত, আর চলা শুরু হত আমার। খট-খট-খট, প্রত্যেক পদক্ষেপে গতি বাড়ছে। শরীরের সমস্ত পেশী কাঁপছে থরথর, কোচওয়ানের সিটের সামনের জায়গায় কাদা ও বরফের ছিটে লাগছে আমার পদাঘাতে। সে সব দিনে, যেন পেটটা ব্যথায় খিঁচিয়ে উঠছে এমন ভাবে বোকার মতো 'ওফ' বলে চেঁচাত না কোচওয়ানরা, ওরা হাঁকত, 'খবরদার।' ফেওফান হাঁকত 'খবরদার', আর ছত্রভঙ্গ হয়ে লোক পথ করে দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখত সুন্দর আক্তা ঘোড়া, সুদর্শন কোচওয়ান, আর রূপবান রাজপুত্র চলেছে।

অন্য চালের ঘোড়াকে হারিয়ে দিতে খুব মজা লাগত। প্রতিযোগিতার যোগ্য ঘোড়া ফেওফানের আর আমার চোখে পড়লেই তীরবেগে তার পেছনে ছুটতাম। ক্রমেই কাছে এসে পড়তাম। আরো কাছে, আরো। শেষে অন্য স্লে-র পেছনে লাগত আমার পায়ের কাদার ছিটে। যাত্রীটির পাশাপাশি এসে পড়ে তার মাথার ওপর নাক দিয়ে আওয়াজ করেই ঘোড়াটার যোয়াল বরাবর ছোটা। তারপর তাকে ছাড়িয়ে এত দূরে চলে যেতাম যে প্রতিযোগীকে আর দেখা যেত না, শুধু শুনতে পেতাম—তার পায়ের শব্দ মৃদু থেকে মৃদুতর হচ্ছে।

সামান্য শব্দও বেরোত না রাজপুত্র বা ফেওফান বা আমার মুখ দিয়ে। ভানটা ছিল, নিছক কাজের তাড়ায় রাস্তার ছ্যাকরা গাড়ির সওয়ারীদের দিকে তাকাবার পর্যন্ত ফুরসৎ নেই। ঘোড়া মাত্রকেই হারিয়ে দিতে ভাল লাগত, আরো ভাল লাগত অন্য চালের ঘোড়াকে আসতে দেখলে। একটি মুহূর্ত শুধু শাঁ-শাঁ আওয়াজ, পলকের দৃষ্টি বিনিময় আর দুজন দুজনকে ছাড়িয়ে আবার যে যার পথে গেল।

দরজাগুলোতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ হল। নেস্তের আর ভাস্কার গলাও শোনা যাচ্ছে।

পঞ্চম রাত্রি

আবহাওয়া বদলাচ্ছিল। সকাল থেকে আকাশ ছিল থমথমে। শিশির পড়েনি। হাওয়াটা কিন্তু গরম। মশাগুলো বিরক্ত করে চলেছে। খোঁয়াড়ে ফেরা মাত্র ডোরাকাটা আক্কার চার পাশে জড়ো হল সব ঘোড়ারা। আক্কা তার গল্প শেষ করল।

আমার সুখের দিন শীগগিরই শেষ হল। মাত্র দু-বছর এই সুখের কাল। দ্বিতীয় শীতের শেষে আমি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ পেয়েছিলাম। আর তার পরেই গভীরতম দুঃখ।

তখন শ্রোভ টাইড। ঘোড়দৌড়ের মাঠে নিয়ে গিয়েছিলাম রাজপুত্রকে। আতলাস্নি আর বিচক দৌড়চ্ছিল। জানি না বাজি রাখার জায়গায় কী নিয়ে কথা বলছিলেন রাজপুত্র। কিন্তু বেরিয়ে এসে তিনি ফেওফানকে হুকুম দিলেন দৌড়ের জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতে। মনে আছে সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। আতলাস্নির সঙ্গে দৌড়তে হল আমায়। একটা দু-চাকার গাড়ি টানছিল আতলাস্নি। আমি জোতা ছিলাম শহুরে স্লে-তে। বাঁকের মাথায় ওকে ছাড়িয়ে যেতে মাঠে হাসি আর হাততালির ধুম পড়ে গেল।

দৌড়ের জায়গায় আমাকে ঘোরাবার সময় গোটা ভিড়টা আমার পিছু পিছু হাঁটল। পাঁচজন অশ্বপ্রেমিক আমাকে কয়েক হাজার টাকা দিয়ে কিনতে চাইল। রাজকুমার সাদা উজ্জ্বল দাঁত দেখিয়ে হাসলেন।

'ও, না', বললেন তিনি। 'ও ঘোড়া নয়, একজন বন্ধু। সোনার একটা পাহাড় দিলেও বেচব না আমি ওকে। বিদায়, মশাইরা।' স্লের দরজা খুলে তিনি ভিতরে ঢুকে গেলেন।

'ওস্‌ত জেন্‌কা স্ট্রীট।' রক্ষিতার ঠিকানা ওটা, জোরে ছুটলাম।

আমার জীবনের শেষ সুখের দিন ওটা।

রক্ষিতার বাড়িতে পৌঁছলাম। তিনি রক্ষিতাকে বলতেন 'আমার'। কিন্তু সে ভালবাসল অন্য পুরুষকে এবং তারই সঙ্গে সে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে। খবরটা তিনি পেলেন তার ফ্ল্যাটে। তখন বিকেল পাঁচটা। আমার আর সাজ খোলা হল না। রক্ষিতার খোঁজে তিনি চললেন। আর একটা

ব্যাপার—এর আগে তেমন হয়নি কখনো। চাবুক মারা হচ্ছিল আমাকে যাতে লাফিয়ে ছুটি। জীবনে এই প্রথম একবার বেঠিক পা পড়ল। লজ্জিত হয়ে ভুল ঠিক করবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ শুনলাম রাজকুমার অস্বাভাবিক গলায় চেঁচাচ্ছেন 'ছোট, ব্যাটা', আর হাওয়ায় শিস দিয়ে চাবুকটা পড়ল পিঠে। আমি উধ্বর্শ্বাসে ছুটলাম। কোচওয়ানের সিটের সামনেটায় বারবার পা খটখট করে লাগতে লাগল। পঁচিশ ভারস্ট যাওয়ার পর রক্ষিতাকে ধরে ফেললাম।

রাজকুমারকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলাম। কিন্তু সারা রাত শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে-কাঁপনকে কিছুতে থামাতে পারি না। রাতে খেতে পারলাম না কিছুই। সকালে জল খেতে দিল। খেলাম আর তারপর আমি আর আগের আমি রইলাম না। অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমায় ওরা যন্ত্রণা দিল, শরীরের নানা ক্লেশ ঘটাল—যাকে বলে 'চিকিৎসা' তাই চালাল। খুরগুলো গেল ক্ষয়ে। শরীরে সর্বত্র হল পাঁচড়া। পাগুলো বেঁকে গেল। বুক দুমড়ে বসে গেল। দেহে-মনে সর্বদা শ্রান্তি।

একজন ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে আমাকে শেষে বেচে দেওয়া হল। সে গাজর আর কী সব খাইয়ে বোকা লোকের চোখে ধুলো দেবার মতো আমাকে কিছু একটা খাড়া করল। সেটা আমার আসল রূপ নয়। আমার না ছিল শক্তি, না ছিল জোরে ছোটবার ক্ষমতা। তাছাড়া আমাকে আরো একটা যন্ত্রণা দিত ঐ ব্যবসায়ীটি, কোনো খদ্দের এলে চালায় ঢুকে চাবকে ভয় দেখিয়ে আমায় পাগলা করে তুলত। তারপর চাবুক মারার দাগ মুছে খদ্দেরের কাছে বার করত আমায়।

আমায় কিনলেন এক বৃদ্ধা। সিদ্ধিদাতা সেন্ট নিকলাসের গির্জায় তিনি আমায় সর্বদা নিয়ে যেতেন, আর কোচওয়ানকে চাবকাতেন। কোচওয়ান আমার চালায় এসে কাঁদত। চোখের জলের যে একটা খাসা নোনতা স্বাদ আছে তা তখন জানতে পেলাম। তারপর বৃদ্ধা মারা গেলেন। তাঁর নায়েব এক দোকানদারের কাছে আমায় বেচে দিল। তার কাছে বেশি গম খেয়ে আবার রোগ বাড়ল আমার। সে তখন আমায় বেচে দিল এক চাষীর কাছে। আমি তার লাঙল টানতাম। আর প্রায় কিছুই খেতাম না। আবার আমি রোগে পড়লাম।

কিছু জিনিসের বদলে আমায় বেচা হল এক বেদের কাছে। নৃশংস

আচরণ করত লোকটা আমার সঙ্গে। শেষে এখানকার নায়েবের কাছে বেচে দিল। আর এই তো আমি।

কেউ টু শব্দটি করল না। বৃষ্টি শুরু হল।

৯

পরদিন সন্ধ্যায় যখন গোটা পালটাকে তাড়িয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, তখন দেখা গেল মালিককে, সঙ্গে কে একজন রয়েছে। কুলদিবা বাড়ির কাছে এসে প্রথম তাদের দেখে। দুটি পুরুষ মূর্তি। খড়ের টুপি পরা তরুণ মালিক। আর ফৌজী পোশাক পরা লম্বা-চওড়া একজন লোক। বুড়ো ঘুড়ীটা আড চোখে তাকিয়ে পাশ কাটাল। কিন্তু অন্যদের বয়স কম। তাদের কেমন একটা সঙ্কোচ আর অস্বস্তি। বিশেষ করে যখন মনিব ও আগন্তুক সোজা তাদের মধ্যে এসে হাত দিয়ে কী সব দেখিয়ে কথা বলতে লাগলেন।

'ডোরাদার ছাই রঙের ঘোড়াটা কিনেছি ভয়েকভের কাছ থেকে।' মালিক বললেন।

'ঐ সাদা-পা কালো কমবয়সী ঘুড়ীটা কার? দেখতে চমৎকার।' বললেন আগন্তুক।

অনেক ঘোড়া ওঁরা দেখলেন—ঘোড়াদের পেছনে ধাওয়া করে এবং দাঁড় করিয়ে। খয়েরি রঙের ঘুড়ীটা নজরে পড়ল।

'ও হল খ্রেনভোর জিন-ঘোড়ার বংশের।' বললেন মালিক।

সব কটা ঘোড়াকে সে অবস্থায় দেখা সম্ভব নয়। মালিক নেস্তেরকে ডাকায় ডোরাদার আজ্ঞা ঘোড়াটার পাঁজরে জুতোর খোঁচা মেরে বুড়ো কদমে দৌড়ে এল। এক পা খোঁড়াচ্ছে তবু ভালো করে দৌড়বার একটা চেষ্টা করল সে। বোঝা গেল, প্রাণপণে পৃথিবীর একদম অন্য সীমায় তাকে ছোটার হুকুম দিলেও আপত্তি করবে না। লাফিয়ে ছোটার ইচ্ছে তার। যে পা-টা ভালো সেটা দিয়ে চেষ্টাও করল একবার।

'আমার কথা শুনুন, সত্যি বলছি, সারা রাশিয়ায় ওর মত ঘুড়ী আর পাবেন না।' একটা ঘুড়ীকে দেখিয়ে মালিক বললেন। প্রশংসার সঙ্গে সায় দিলেন আগন্তুক। মালিক উত্তেজিত। ছোটাছুটি করে ঘোড়াগুলোকে

দেখাচ্ছেন, আর তাদের বংশের ইতিহাস শোনাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, আগন্তুকের একঘেয়ে লাগছে, তবু আগ্রহের ছলে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞেস করছেন।

'হ্যাঁ, কী? ও হ্যাঁ!' অন্যমনস্ক ভাবে তিনি বললেন।

'এটার দিকে একবার তাকাও।' মালিক বললেন। আগন্তুকের যে একঘেয়ে লাগছে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন নন। 'পাগুলো একবার ছাখো। ওর জন্য অনেক টাকা দিতে হয়েছিল। কিন্তু ওর তিন বছরের বাচ্চা এখনি কদমে চলতে শুরু করেছে।

'ভালো চলে?' আগন্তুক শুধোলেন।

একের পর এক সকল ঘোড়ারই আলোচনা শেষ হল। আর কিছু বলবার নেই। একটু বিরতি।

'আচ্ছা, এবার যাওয়া যাক, তাহলে!'

'হ্যাঁ।'

ফটক পার হয়ে ভেতরে গেলেন দু'জনে। দেখার পালা শেষ হয়েছে, আগন্তুক খুশী। এখন বাড়ি গিয়ে খানাপিনা চলতে পারবে। মেজাজটা তাঁর আগের চেয়ে ভাল বলে মনে হল। যদি আরো নতুন কিছু হুকুম হয়, এই প্রতীক্ষায় নেস্তের গজকাঠির ওপর বসে অপেক্ষা করছে। তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আক্তার পাছায় মাংসল বড় হাতে চাপড় মেরে আগন্তুক বললেন, 'চমৎকার' একটা ডোরাদার দেখছি। এক সময় আমারও একটা ডোরাদার ছিল। তোমায় বলেছিলাম—মনে আছে?'

মন্তব্যটি যেহেতু তাঁর নিজের ঘোড়াদের নিয়ে নয়, তাই মালিক কথাটায় কান দিলেন না। তিনি তাঁর ঘোড়ার দলের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎ তাঁর কানের একেবারে কাছে আক্তার দুর্বল বার্ধক্যক্ষীণ উদ্ভট হ্রেষাধ্বনির প্রয়াসে তিনি চমকে উঠলেন। আক্তার প্রচেষ্টা যথাযথ সমাপ্তি পর্যন্ত না গিয়ে হঠাৎ বিভ্রান্তির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। আগন্তুক বা মালিক কেউই সেদিকে কর্ণপাত না করে ফিরে গেল।

গজকাঠি মোটা বুড়ো লোকটিকে চিনতে পেরেছিল। লোকটি একদা ধনী সেই রাজকুমার সেরপুখভস্কয়।

টিপির টিপির করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। খোঁয়াড়ের মধ্যে মন ব্যাজার লাগে। কিন্তু বড় বাড়িতে এমনটা হয় না। জমকালো ড্রয়িং-রুমে পরিবেশিত হচ্ছে সুস্বাদু চা। টেবিলে বসেছিলেন গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী, আর আগন্তুক অতিথি।

গৃহকর্ত্রীকে দেখে বোঝা যাচ্ছে তাঁর শীগ্‌গির বাচ্চা হবে। তাঁর উদর স্ফীত, সামোভারের পেছনে তিনি খাড়া হয়ে বসে আছেন। একটা মোটা-সোটা ভাব এসেছে গোটা চেহারাটায়। আর তাঁর বড় চোখ দুটিতে বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে নম্র ও গম্ভীর একটি অভিব্যক্তি—যেন তিনি তাকিয়ে আছেন তাঁর অন্তরের দিকে।

গৃহকর্তার হাতে দশ বছরের পুরনো অত্যন্ত ভাল সিগারেটের একটি বাক্‌সো—যা তাঁর ছাড়া আর কারো নেই, অন্ততঃ অতিথির কাছে তিনি এ কথাটা বলে নিজেকে জাহির করলেন। গৃহকর্তার বয়স প্রায় পঁচিশ। দেখতে ভাল! তাজা, পরিচ্ছন্ন, সুবেশ। লণ্ডনে বানানো ঢিলে পশমী স্যুট তিনি বাড়িতে পরেন। ঘড়ির চেনে ভারী সোনার রিং। কফলিংক-গুলো বড়, ভারি সোনার, পীরোজা বসানো। দাড়ি তৃতীয় নেপোলিয়নের ধাঁচে ছাঁটা। ওপরের ঠোঁটের দু'পাশে পাতলা সরু গোঁফ মোম দিয়ে নিপুণভাবে পাকানো, যেন খোদ প্যারিসে বানানো। গৃহকর্ত্রীর পরনে ফুলের গুচ্ছের নকসা-কাটা পাতলা সিল্কের গাউন। বড় বাঁকানো সোনার পিন ঘন কটা চুলের রাশিতে। চুল তাঁর অত্যন্ত সুন্দর—সব চুল তাঁর নিজের নয় যদিও। হাতে বেশ কয়েকটি দামী আংটি আর বালা। সামোভারটা রূপোর। চায়ের সেট সেরা চীনা মাটির। দরজায় আদেশের অপেক্ষায় প্রস্তরমূর্তির মত অপেক্ষমাণ খানসামা। পরনে সুন্দর টেল্‌কোট ও সাদা ভেস্ট। গলায় টাই। ঘরের আসবাবে খোদাই-করা কাজ। সেগুলো একটু বাঁকানো ও অলংকৃত। দেওয়াল-কাগজের ঘন রঙে ফুল আঁকা। টেবিলের কাছে শুয়ে আছে বিশুদ্ধ রক্তের কুলীন গ্রেহাউণ্ড। তার গলার রূপোর শিকল মাঝে মাঝে রিনঠিন আওয়াজ করছে। কুকুরটার একটা অসাধারণ ইংরেজী নাম দেওয়া হয়েছে—সে নামটি মালিক বা তাঁর স্ত্রী কেউই উচ্চারণ করতে পারেন না, কারণ তাঁরা কেউই ইংরেজী জানেন

না। এক কোণে ফুলের মধ্যে অলংকৃত বড় একটা পিয়ানো। সব কিছু দেখে মনে হয় অভিনব, দুর্লভ, ব্যয়বহুল। সবই বেশ ভাল হত, যদি না সবকিছুতে থাকত বিলাস ও টাকার একটা বুদ্ধিহীন, রুচিহীন ছাপ।

রেসের ঘোড়া নিয়ে পাগল গৃহকর্তা। সবল স্বাস্থ্যবান ফুর্তিবাজ লোকটি সেই জাতের মানুষ যারা অমর অক্ষয়। এরা বেজীর লোমের পোশাক পরে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ায়, অভিনেত্রীদের ছুঁড়ে দেয় দামী ফুলের তোড়া, সবচেয়ে সৌখিন হোটেলে সবচেয়ে নতুন আর সবচেয়ে দামী মদ খায়, নিজের নামে পুরস্কার দেয়, আর রাখে সব চেয়ে বেশি টাকার রক্ষিতা।

তাঁর অথিতি নিকিতা সেরপুখভস্কয়ের বয়স চল্লিশের বেশি—বেশ লম্বা, মোটা, মাথায় টাক, বড় গোঁফ, জুলপি আছে। সন্দেহ নেই, যৌবনে তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। এখন শারীরিক, নৈতিক ও আর্থিক দিক থেকে তিনি অধঃপতিত।

ধার করেছিলেন আকণ্ঠ। তখন হাজতবাস এড়াবার জন্যে সরকারী চাকরী নিতে হয়েছে। এখন তিনি যাচ্ছেন একটি প্রাদেশিক শহরে। সেখানে অশ্বপালনের ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। চাকরীটা পেয়েছেন প্রভাবশালী আত্মীয়স্বজনদের জোরে। তাঁর পরনে ফৌজী টিউনিক ও নীল প্যান্ট। টিউনিক ও প্যান্ট ধনীসুলভ, অন্য কাপড়চোপড়ও তাই। ঘড়িটা ইংলণ্ডে তৈরি। জুতোর সোল্ অসাধারণ—প্রায় এক ইঞ্চি পুরু।

নিকিতা সেরপুখভস্কয় বিশ লক্ষ রুবল উড়িয়েছেন, এখন তাঁর ধার এক লক্ষ বিশ হাজার। অত টাকার মালিক হলে বেশ একটা প্রভাব হয়, তাতে আরো বছর দশেক ধারের টাকায় প্রায় বিলাসিতায় সময় কাটানো সম্ভব। কিন্তু সে দশ বছর শেষ হয়েছে। উবে গেছে প্রতিপত্তি। আর এখন নিকিতার জীবন দুর্বহ। মদ ধরেছেন তিনি, অর্থাৎ মদ খেলে এখন মাতাল হয়ে যান, যেটা আগে কখনো হতেন না। আর মদের ব্যাপারে বলা যায়, কবে ধরেছেন ও কবে শেষ কববেন তা বলা শক্ত, তাঁর অধঃপতিত অবস্থাটা সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে দৃষ্টির অস্থিরতায় (চোখে এরই মধ্যে শূন্য দৃষ্টি), কণ্ঠস্বর ও অঙ্গ সঞ্চালনের বাধো বাধো ভঙ্গিতে। আগে কখনো তিনি কাউকে বা কোনো কিছুকে ডরান নি। শুধু হালের দুঃখকষ্টের ফলে স্বভাববিরুদ্ধ আশঙ্কার একটা ভাব এসেছে, এটা স্পষ্ট ধরা পড়ে বলে অস্বস্তিটা আরো বেশি করে চোখে ধরা পড়ে। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী দুজনেই

এটা লক্ষ্য করে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, পরস্পরের মনের কথা বুঝেছেন তার আভাস দিয়ে। শুতে যাবার সময় পর্যন্ত লোকটির কথা না হয় স্থগিত থাক। আপাতত বেচারীকে মেনে নেওয়া হোক, এমন কি মিষ্টি ব্যবহার করা হোক তাঁর সঙ্গে। নবীন গৃহকর্তার সুখের চেহারায় ক্ষুণ্ণবোধ করলেন নিকিতা। অতীতের—যে-অতীত আর কখনো ফিরে আসবে না, সে-দিনের স্মৃতি ফিরে আসাতে ঈর্ষা হল মনে।

'ধূম পানে কিছু মনে করবেন না আশা করি, মেরি?' তিনি সৌজন্যের সঙ্গে শুধোলেন। মহিলাকে সম্বোধন করার ধরনটা বিচিত্র ও এড়িয়ে যাওয়া গোছের। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে এসেছে এই সৌজন্যের ও বন্ধুত্বের বিশেষ ধরনটা। কিন্তু পুরো সম্মানের নয় ধরনটা। বন্ধুর স্ত্রী নয়, তার রক্ষিতাকে এভাবে সম্বোধন করে চৌখোশ লোকেরা। মহিলাকে অসম্মান করার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। বরং তাঁর গৃহকর্তার মন জুগিয়ে চলার বাসনা আছে—যদিও নিজে সেটা তিনি কখনো স্বীকার করতেন না। এ ধরনের মেয়েদের সঙ্গে এভাবে কথা বলা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, এই মাত্র। তিনি জানতেন যে গৃহকর্ত্রীকে মহিলার সম্ভ্রম দেখ'লে তিনি নিজে অবাক হয়ে যেতেন, এমন কি অপমানিত বোধ করতেন। তাছাড়া সমকক্ষের খোদ স্ত্রীর সঙ্গে সমীহ করে কথা বলার প্রচলিত রীতিটা যত্রতত্র প্রয়োগ করা তো চলে না। রক্ষিতাদের তিনি সব সময়ই একটু খাতির করে সম্বোধন করতেন। তার কারণ এই নয় যে, পদনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মূল্য, বিয়ে ব্যাপারটার কৃত্রিমতা, ইত্যাদি বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথাকথিত মতে তিনি আস্থাশীল (এ ধরনের বাজে জিনিস তিনি কখনো পড়তেন না)। কারণটা এই, সভ্য শিষ্ট লোকের সবাই তাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে থাকে, আর তিনি নিজে তো অত্যন্ত সভ্যভব্য লোক—অবস্থাটাই আজ না হয় পড়ে গেছে।

একটি সিগার নিলেন তিনি। গৃহকর্তা বিবেচনার পরিচয় না দিয়ে কয়েকটা সিগার এক সঙ্গে তুলে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

'এইগুলো নাও না। ভাখো কী ভাল জিনিস।'

নিকিতা সিগারগুলো সরিয়ে দিলেন। অসম্মানিত ও আহত তিনি—এই রকম একটা অভিব্যক্তি চকিতে চোখে চমকে উঠল।

'ধন্যবাদ।' নিজের সিগার-কেস বার করে বললেন, 'এর একটা খেয়ে ভাখো।'

গৃহকর্ত্রী বুদ্ধিমতী ! ব্যাপারটা বুঝে তাড়াতাড়ি বললেন, 'সিগার আমার দারুণ ভাল লাগে। আশপাশের সবার মুখে চব্বিশ ঘণ্টা সিগার না থাকলে হয়তো আমি নিজেই খেতাম।' আর নিজের মিষ্টি হাসি, সদয় সৌজন্যের হাসি তাঁর মুখে ছড়িয়ে গেল। নিকিতা জবাবে সামান্য হাসলেন ; তাঁর সামনের দুটো দাঁত নেই।

'না। এটা নাও।' জোর করলেন বোধহীন গৃহকর্তা, 'আগেরগুলো বড় মোলায়েম। কটা নয় তেমন।' সঙ্গে সঙ্গে জার্মান খানসামাকে বললেন, 'আর একটা বাকসো নিয়ে এসো, ওখানে দুটো আছে।'

নতুন বাকসো নিয়ে এল জার্মান খানসামা।

'কোন্ রকম বেশি ভাল লাগে তোমার ? কড়া ? এগুলো আশ্চর্য রকমের ভাল। সবগুলো নিয়ে নাও।' জোরাজুরি করতে লাগলেন তিনি। নিজের দুর্লভ সব জিনিস দেখাতে পেরে তিনি খুশীতে আর সব ভুলে গেলেন। সেরপুখভস্কয় সিগার ধরিয়ে তাড়াতাড়ি পুরনো আলাপের খেই ধরলেন।

'আতলাস্ নির জন্যে কত টাকা দিয়েছিলে ?' শুধোলেন তিনি।

'অনেক। কম করে ধরলেও হাজার পাঁচেক। কিন্তু ঘোড়াটার ও-দাম হয়। ওর বাচ্ছাগুলোকে একবার তোমার দেখা উচিত।'

'রেসের ঘোড়া ?'

'প্রত্যেকটা। এ বছর ওর মদ্দা বাচ্চাটা তিনটে প্রাইজ পেয়েছে। তুলায়, মস্কোয়, আর সেন্ট পিতার্সবুর্গে ভয়েকভের ভরনয়ের সঙ্গে টেক্কা দিয়েছিল। হতচ্ছাড়া জকি বারবার চার বার ভুল করল। তা নাহলে ভরনয়কে একেবারে বসিয়ে দিত।'

'ও এখনো একটু কাঁচা। আমার মত বড্ডো বেশি ডাচ্ রক্ত ওর শরীরে।' বললেন সেরপুখভস্কয়।

'আর মাদীগুলো ? কাল দেখাব তোমায় দব্রিনিয়াকে—কিনি তিন হাজার রুবলে, আর লাস্কভায়াকে দু হাজারে।'

গৃহকর্তা আবার নিজের ধনসম্পত্তির বড়াই চালালেন। গৃহকর্ত্রী দেখলেন এতে সেরপুখভস্কয়ের মনে বড় কষ্ট হচ্ছে, তিনি নিতান্ত শোনার ভান করছেন।

'আর একটু চা নেবেন ?' গৃহকর্ত্রী অনুরোধ জানালেন।

'না।' বলে গৃহকর্ত্রী কথা বলেই চললেন। গৃহকর্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। কর্তা কিন্তু বাধা দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন তাঁকে।

ওদের যখন দেখছিলেন, তখন সেরপুখভস্কয় প্রায় হাসতে যাচ্ছিলেন। ওদের খুশী করবার জন্য অস্বাভাবিক একটা সৌজন্য-হাসি। কিন্তু গৃহকর্তা যখন উঠে মহিলাটির কোমর জড়িয়ে ধরে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন, তখন তাঁর মুখের অভিব্যক্তি হঠাৎ বদলে গেল। তিনি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর ফুলো মুখে একটা হতাশার ছায়া দেখা দিল। এমন কি, ক্রুদ্ধ এক বিরূপতার ছায়াও ফুটে উঠল।

১১

গৃহকর্তা হাসিমুখে ফিরে এলেন এবং নিকিতার মুখোমুখি বসলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ—দু'জনেই।

'ওকে ভয়েকভের কাছ থেকে কিনেছ বলছিলে, তাই না?' হঠাৎ এমনি যেন শুধোলেন।

'হ্যাঁ, আতলাসনিকে। দুবভিৎস্কির কাছে একটা মাদী ঘোড়া কেনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কেনার মত কিছু পেলাম না।'

'ওর হয়ে গেছে।' বলেই সেরপুখভস্কয় হঠাৎ থেমে গিয়ে চার পাশে একবার তাকিয়ে নিলেন। মনে পড়ে গেল এই 'হয়ে-যাওয়া' লোকটির কাছে তিনি বিশ হাজার রুবল ধারেন। দুবভিৎস্কি 'হয়ে গেছে' যদি লোকে বলে, তাহলে তাঁর নিজের বিষয়ে কী বলবে? তিনি চুপ করে রইলেন।

আবার এক দীর্ঘ বিরতি। গৃহকর্তা ভাবতে লাগলেন কী দেখিয়ে অতিথির কাছে নিজেকে জাহির করা যায়। নিজে এখনও 'হয়ে যান নি' বোঝাবার জন্য কী বলা যায় ভাবতে লাগলেন সেরপুখভস্কয়। সিগারগুলো বেশ কড়া বটে, কিন্তু কারুরই বুদ্ধি তেমন খুলল না।

'কখন যে একটু মদ খেতে দেবে?' ভাবলেন সেরপুখভস্কয়।

'একটু মদ না খেলে নয়। নইলে একঘেয়োমতে মারা পড়ব।' ভাবলেন গৃহকর্তা।

'এখানে বেশি দিন থাকবার ইচ্ছে আছে?' শুধোলেন সেরপুখভস্কয়।

'আর এক মাস। রাতের খাবার খেলে কেমন হয়, অ্যাঁ? ফ্রিৎস্, খাবার তৈরী?'

তাঁরা খাবার ঘরে দু'জনে গেলেন। ঝাড়ের নিচে টেবিল, তাতে শাখান্বিত সুন্দর দীপাধার, আর নানান চমকদার জিনিস, স্নাইফন, ছিপিতে আঁটা পুতুল, ভোদ্‌কা, উৎকৃষ্ট মদের ডিকাণ্টার, উৎকৃষ্ট খাদ্যে পূর্ণ রেকাবী। মদ খাওয়া হল, তারপরে আহার, আবার মদ, তারপর আবার আহার। শেষে আরম্ভ হল কথা। সেরপুখভস্কয়ের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কথাবার্তা এখন অবাধ।

কথা উঠল মেয়েদের নিয়ে। যেসব মেয়েদের সঙ্গে তারা সহবাস করেছে তাদের কথা—বেদেনী মেয়ে, ফরাসী মেয়ে, নাচউলি মেয়ে।

'মাতিয়েকে ছেড়ে দিলে তাহলে?' গৃহকর্তা শুধোলেন। যে স্ত্রীলোকটি সেরপুখভস্কয়ের 'হয়ে যাওয়া'-র কারণ তারই নাম মাতিয়ে।

'আমি নই। ও ছেড়েছে আমাকে। সত্যি, বয়সকালে কত টাকা না উড়িয়েছি। আজ হাজার রুবল ছুঁতে পেলে খুশী লাগে। সবাইকে ছেড়ে কেটে পড়াটা মনে হয় বেশ। মস্কোতে থাকার আর উপায় নেই। ওঃ, সত্যি সে সব কথা যখন মনে পড়ে!'

গৃহকর্তার একঘেয়ে লাগছে সেরপুখভস্কয়ের কথাবার্তা। তাঁর ইচ্ছে নিজের কথা বলা, ডাঁট দেখানো। আর সেরপুখভস্কয় চান নিজের কথা বলতে, নিজের উজ্জ্বল অতীতের দিনগুলোর কথা বলতে। আর এক গেলাস তাঁকে ঢেলে দিয়ে গৃহকর্তা তাক করে রইলেন কখন তাঁর কথা শেষ হবে, তাহলে তিনি জানতে পারবেন কী ভাবে তিনি ঘোড়ার পাল-খামারের সুব্যবস্থা করছেন, অভাবিত ব্যবস্থা সেটা। আর মেরি যে তাঁকে টাকার জন্য ভালবাসে তা নয় মোটে, ভালবাসে মনে প্রাণে।

'তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে আমার খামারে,' আরম্ভ করলেন তিনি, কিন্তু বাধা দিয়ে সেরপুখভস্কয় বললেন, 'এক কালে বেঁচে থাকতে ভাল লাগত। জানতাম কী করে বাঁচতে হয়। জোর গলায় বলতে পারি সেটা। ঘোড়ায় চড়ার কথা এইমাত্র বলছিলে না? বল তো, সবচেয়ে তেজী কোন্ ঘোড়া তোমার?'

পাল-খামারের কথা বলার সুযোগ এতক্ষণে পেয়ে খুশী হয়ে গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি শুরু করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আবার বাধা দিয়ে সেরপুখভস্কয় বললেন, 'ও হ্যাঁ, পাল-খামারের মালিকরা তো শুধু নাম বাড়াতেই চাও, জীবনকে

ভোগ করতে চাও না। খাসা সময় কাটানো তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয় না! আমি কোন দিনই ঐ রকম ছিলাম না। তোমাকে তো আজকেই বলছিলাম আমার একটা ডোরাদার কদম চালের ঘোড়া ছিল। যে ঘোড়াটায় তোমার অশ্বপালক বসেছিল ঠিক তার মত ডোরাদার। ঘোড়ার মত ঘোড়া ছিল। বললে বিশ্বাস হবে না তোমার। ১৮৪২ সাল, সবে মস্কোয় গিয়েছি। ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে দেখি একটা ডোরাদার আক্তা ঘোড়া। বেশ ভাল। পছন্দ হল। দাম কত? এক হাজার। ঘোড়াকে পছন্দ হয়েছিল। কিনে ফেললাম। চড়া শুরু হল। ওর মত ঘোড়া তোমার আমার বা আর কারো হবে না কখনো! যেমন গতি, তেমন শক্তি আর রূপ ওর জুড়ি নেই। তোমার বয়স তখন খুবই কম, ওকে দেখ নি। কিন্তু ওর কথা শুনেছ নিশ্চয়ই, সারা মস্কো জানত ওর কথা।

'হুঁ মনে হচ্ছে শুনেছিলাম।' অনিচ্ছায় বললেন গৃহকর্তা। 'কিন্তু তোমাকে বলতে চাইছিলাম যে আমার—'

'শুনেছিলে নিশ্চয়। আমি তো ওকে দুম করে কিনে ফেললাম—দলিল, বংশপরিচয় বা সুপারিশের তোয়াক্কা না ক'রে। পরে জানতে পারি ভয়েকভ আর আমি বার করে ফেলি। ও হল গজকাঠি, বাজিবাহাদুরের ছেলে। পা ফেলত কী—প্রকাণ্ড লম্বা পদক্ষেপ। ডোরাদার বলে খ্রেনভো পাল-খামার থেকে ওকে অশ্বপালের কাছে বেচে দেওয়া হয়েছিল, সে তাকে আক্তা করে বেচে দেয় একটা ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে। ওর মত ঘোড়া আর দেখিনি। আঃ! সে-সব কী দিন ছিল! যৌবন, হায়রে আমার হারানো যৌবন!' বেদেদের একটা গানের কলি ভাঁজলেন তিনি। নেশা ধরতে শুরু করেছে। 'আঃ! সে-সব দিন ছিল বটে। আমার বয়স তখন পঁচিশ। আর ছিল বছরে আশি হাজার। চুল পাকে নি একটাও। একটিও দাঁত পড়ে নি। দাঁত ছিল মুক্তোর মত। যাতে হাত দিই তাই সোনা হয়ে ওঠে। সাফল্য সর্বত্র। আর এখন······সব শেষ।'

'তখনকার দিনে কিন্তু ঘোড়াগুলো এত তেজী ছিল না।' সেরপুখভস্কয়-এর থেমে যাওয়ার সুযোগটা ছাড়লেন না গৃহকর্তা। 'তোমায় বলি তাহলে, আমার প্রথম ঘোড়াগুলো দৌড়তে শুরু করে······'

'তোমার ঘোড়াগুলো! বটে! তখনকার ঘোড়া দৌড়ত আরো অনেক জোরে।'

'আরো জোরে দৌড়ত—তার মানে?'

'যা বলছি তাই—আরো জোরে। মনে আছে একবার গজকাঠিকে মস্কোর রেসে দৌড় করিয়েছিলাম। রেসের ঘোড়া রাখতাম না আমি। রেসের ঘোড়া কখনো আমার ভালো লাগে নি। আমি শুধু খাস জাত ঘোড়া রাখতাম। যেমন, জেনারেল, শলে মহম্মদ। হ্যাঁ, গজকাঠিতে চেপে যেতাম। কোচম্যানটিও ছিল চমৎকার। আমাদের পেয়ারের কোচম্যান। দারুণ মাতাল হয়ে যেত ব্যাটা। যাহোক, পৌঁছলাম রেসের মাঠে। ওরা জিজ্ঞেস করল, 'সেরপুখভস্কয়, রেসের ঘোড়া কবে কিনছেন বলুন তো?' আমি জবাব দিলাম, 'রেসের ঘোড়া দিয়ে আমি কী করব? আমার এই গাড়ির ডোরাকাটা ঘোড়া আপনাদের রেসের ঘোড়াকে দৌড়ে হারিয়ে ভূত করে দিতে পারে।' ওরা বলল, 'বলছেন কী আপনি? তা কখনই পারবে না।' আমি বললাম, 'ঠিক আছে, এক হাজার রুবল বাজি।' ওরা রাজী হয়ে আমার হাতে হাত রাখল। ঘোড়ার দৌড় হল। পাঁচ সেকেণ্ড আগে আমার ঘোড়া দৌড় শেষ করল। হাজার রুবল আমি জিতলাম। কিন্তু সে কিছু নয়। একবার তিনটে খাস জাত ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তিন ঘন্টায় এক শো ভার্স্ট গিয়েছিলাম। সারা মস্কো শহরে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

সেরপুখভস্কয় খুবই নৈপুণ্যের সঙ্গে একনাগাড়ে এমন চাল মেরে চললেন যে গৃহকর্তা একটি কথাও বলবার সুযোগ পেলেন না। সামনে হতাশ মুখে বসে নিজের এবং অতিথির জন্য মদ ঢালা ছাড়া আত্মবিনোদনের আর কিছু নেই।

পরিষ্কার হয়ে আসছে। তাও তাঁরা দুজনে বসে আছেন। গৃহকর্তার বিরক্তির শেষ নেই। তিনি উঠে পড়লেন।

'আচ্ছা, এবার তাহলে শুয়ে পড়া যাক।' বলে সেরপুখভস্কয় কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে ভস্ ভস্ করে নিশ্বাস ফেলে টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

গৃহকর্তা তাঁর রক্ষিতার পাশে শুয়ে ছিলেন।

'একেবারে অসম্ভব লোক। মাতাল হয়ে লোকটা মিথ্যে ছাড়া আর কিছুই বলল না।

'আর আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টির চেষ্টাও করেছিল।'

'ভয় হচ্ছে লোকটা নিশ্চয়ই আমার কাছে ধার চাইবে।'

পোশাক না ছেড়েই বিছানায় শুয়ে ভস্‌ভস্‌ করে নিশ্বাস ফেলছেন সেরপুখভস্কয়।

'অনেক চাল মেরে ফেলেছি মনে হচ্ছে।' তিনি ভাবলেন। 'বেশ, তাতে কী। মদটা ভাল ছিল! কিন্তু লোকটা একটা শূয়ার। ঠিক 'বেনের' মত। আমিও একটা শূয়ার।' নিজের মনে কথাগুলো বলতে বলতে তিনি হাসিতে ফেটে পড়লেন। 'আগে আমি রক্ষিতা পুষতাম। এখন ওরাই আমায় পোষে। ভিন ক্লেরশা আমাকে রাখছে—ওর কাছ থেকে টাকাও নিই। ঠিক হয়েছে লোকটার। এটাই ওর প্রাপ্য। কিন্তু এখন পোশাক ছাড়া দরকার। বুট জুতো জোড়া কখনো খুলতে পারি না আমি।'

উঠে বসলেন। টিউনিক ও ওয়েস্টকোট খুলে প্যান্ট লাথি মেরে দূরে ফেললেন। কিন্তু বুট জুতো কিছুতেই আর খুলতে পারেন না। তাঁর নধর ভুঁড়িটি বড়ই মুস্কিল করছে। এক পাটি অবশেষে বহু কষ্টে খোলা গেল। কিন্তু অন্য পাটি অনেক হাঁসফাঁস ও টানাটানি সত্ত্বেও খুলল না। সুতরাং তিনি সেই এক পাটি জুতো পরেই ধপাস করে বিছানায় পড়লেন এবং নাক ডাকতে লাগলেন। ঘরটাকে ভরে দিলেন তামাক, মদ ও বার্ধক্যের নোংরা গন্ধে।

১২

সে-রাতে গজকাঠি আরো বহু কথা মনে করতে পারত। কিন্তু ভাসকা বাধা দিল। সে তার গায়ের ওপর একটা মোটা কাপড় চাপিয়ে জোর ছুটিয়ে নিয়ে গেল এক মদের দোকানে। সেখানে দোকানের বাইরে এক চাষীর একটি ঘোড়ার পাশে সারা রাত সে বাঁধা রইল। উভয়কে বেশ পছন্দ করল। সকালে ঘোড়ার দলে ফিরে এসে গজকাঠি নিজেকে চুলকোতে শুরু করল।

'গা এত চুলকাচ্ছে কেন?' সে মনে মনে ভাবল।

পাঁচ দিন কাটল। ঘোড়ার ডাক্তারকে ডাকা হল।

'পাঁচড়া হয়েছে।' ডাক্তার খুশী স্বরে বলল। 'ওকে বেদেদের কাছে বেচে দাও।'

'কেন? গলা কেটে দিলেই হবে। তাহলে আজকের মধ্যেই ওকে সরানো যাবে।'

সকালটা পরিষ্কার, চুপচাপ। ঘোড়ার দল গেছে চরতে। গজকাঠিকে ফেলে রেখে গেছে। একটা উদ্ভট দেখতে লোক এল তার কাছে। লোকটা রোগা, কালো, নোংরা, আর তার কোটের সর্বত্র দাগ। সে কশাই। গজকাঠির দিকে না তাকিয়েই তার মুখের দড়ি টেনে তাকে নিয়ে চলল বাইরে। গজ-কাঠি শান্ত ভাবে চলল। পেছন ফিরে তাকাল না, বরাবরের মতো পা টেনে চলল। খড়ে আটকে পেছনের পা হোঁচট খেল। দরজা পার হয়ে সে কুয়োর দিকে ফিরতেই লোকটা একটা টান মেরে বলল, 'ওদিকে গিয়ে কী ফয়দা?'

পেছনে আসছিল ভাসকা। তুজনে তাকে নিয়ে গেল ইঁটের চালাটার পেছনের খাদে। তারপরে তু'জনে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন এই অতি মামুলি জায়গাটায় আহামরি গোছের একটা কিছু আছে। তারপর ঘোড়ার মুখের দড়িটা ভাসকাকে দিয়ে কোট খুলে ফেলে জামার আস্তিন গুটোলো কশাই. বুটের ভেতর থেকে একটা ছুরি আর শান দেওয়ার পাথর বার করে ছুরিতে শান দিতে লাগল। মুখের দড়িটার দিকে এগোল আক্কা ঘোড়া। একঘেয়ে লাগছে। ওটাকে চিবিয়ে তবু সময় কাটবে কিছুটা। কিন্তু দড়িটা বড্ড দূরে, তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুঁজল সে। ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল। হলদে দাঁতের টুকরো দেখা গেল। ছুরি শানাবার আওয়াজে তন্দ্রা এসে গেছে। কেবল আলগা ভাবে রাখা, ফোলা বেতো পা-টা কেঁপে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ কে যেন জোয়াল চেপে মাথাটা ঠেলে ওপরে তোলাতে চোখ খুলল। সামনে তুটো কুকুর! একটা কশাইয়ের দিকে নাক উঁচু করে হাওয়া শুকছে, আর একটা বসে তাকিয়ে আছে ঘোড়ার দিকে, যেন তার কাছে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা। তাদের দিকে চেয়ে তাকে ধরে-থাকা হাতটায় ঘোড়াটা গাল ঘষতে লাগল।

'আমার চিকিচ্ছে করবে।' ভাবল সে। 'বেশ করুক।'

আর নিশ্চিত, তার গলার কাছে ওরা কিছু একটা করছে—সে বেশ বুঝতে পারছে। কী একটা বিঁধিয়ে বসিয়ে দিল—চকিত তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। সে চমকে উঠে পা ছুড়ল, কিন্তু টাল সামলে নিয়ে এরপর কী ঘটে তা দেখবার অপেক্ষায় রইল। ঘাড় আর বুক বেয়ে দরদর করে গরম একটা কিছু

গড়িয়ে পড়ছিল। গভীর নিশ্বাস টানল একটা। এত গভীর যে পাঁজরা-গুলো ফুলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একটু আরামও হল। জীবনের সব বোঝা ঝরে হালকা হচ্ছে যেন। চোখ বুজে এল। মাথা পড়ল ঝুঁকে। কেউ মাথা ধরল না। গলা নেমে এল। পাগুলো থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত শরীর ভেতর থেকে টলছে। সব কিছু একদম অন্য রকম ঠেকছে। ভয় তত নয়, যতটা বিস্ময়। বিস্ময়ে ঠেলে ছুটে এগিয়ে যেতে চাইল সে। চেষ্টা করল লাফিয়ে ওঠবার। কিন্তু পা দুমড়ে গেছে। একদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা—নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করাতে শরীরের বাঁ দিকে ভর দিয়ে পড়ে গেল হুড়মুড় করে। কুকুর দুটোকে ধরে অপেক্ষা করে রইল কশাই শরীরের আক্ষেপ থেমে না যাওয়া পর্যন্ত। তারপর কাছে এসে একটা পা-ধরে ঘোড়াটাকে দিল চিৎ করে শুইয়ে, ভাসকাকে পা ধরে রাখতে বলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করল।

'বয়সকালে চমৎকার ঘোড়া ছিল।' বলল ভাসকা।

গায়ে যদি আর একটু মাংস থাকত, তাহলে চামড়াটা আরো ভাল হোতো।' বললো কশাই।

ছোট পাহাড় পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ার দল ফিরে এল। বাঁ-দিকের ঘোড়াগুলো দেখতে পেল মাটিতে লাল কী একটা জিনিস নিয়ে কয়েকটা কুকুর খুব ব্যস্ত। কয়েকটা চিল ও কাক উড়ছে। দু'পায়ে জিনিসটা চেপে একটা কুকুর মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁত দিয়ে এত জোরে টান দিল যে কড়মড় শব্দে একটা টুকরো বেরিয়ে এল।

খয়েরী রঙের ঘুড়ীটা থমকে দাঁড়াল। ঘাড় বাড়িয়ে দেখল। বাতাসে গন্ধ শুঁকল অনেকক্ষণ ধরে, অনেক কষ্টে তাকে সরানো গেল।

ভোর বেলা পুরনো বনের খাদে ঘন ঝোপের মধ্যে কয়েকটা নেকড়ের বাচ্চা ফুর্তিতে কুঁই কুঁই করছিল। বাচ্চা ছিল পাঁচটি। তার মধ্যে চারটি প্রায় একই আকারের। আর একটি এদের চেয়ে ছোট, এর মাথা দেহের চেয়ে বড়। রোগা লিকলিকে নেকড়ে-মা বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে, বৃহৎ বাঁট ঝুলে পড়ে মাটি ছুঁয়েছে। সে বসল বাচ্চাগুলোর সামনে। তারা দাঁড়িয়ে রইল অর্ধ-বৃত্তাকারে। সবচেয়ে ছোটটার কাছে গিয়ে, সামনের

পা দুটো বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে নেকড়ে-মা মুখ খুলল, অস্থিরভাবে কয়েক-বার পেট কাঁপিয়ে ঘোড়ার মাংসের একটা বড় টকরো ছুঁড়ে দিল ওপরে। বড়গুলো দৌড়ল তার পেছনে। কিন্তু নেকড়ে-মা তাদের ভাগিয়ে দিয়ে গোটা টুকরোটা দিয়ে দিল ছোটটাকে। যেন রাগে গরগর করে বাচ্চাটা খপ করে টুকরোটা ধরে ফেলে থাবায় চেপে ছিঁড়তে শুরু করল। ঠিক তেমনি করে নেকড়ে-মা একে একে আরো চারটে টুকরো ছুঁড়ে দিল। তারপর বাচ্চাদের কাছে শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

এক সপ্তাহের মধ্যে ইঁটের চালার কাছে একটা বড় খুলি ও ঠ্যাঙের হাড় দুটো ছাড়া আর কিছু রইল না। গ্রীষ্মে হাড়-কুড়ানো এক চাষী সেই খুলি ও ঐ হাড় দুটো নিয়ে গুঁড়ো করে তার কাজে লাগাল।

বহু পানাহার করছিলেন যে সেরপুখভস্কয় তাঁর মৃতদেহকে মাটি দেওয়া হল অনেক পরে। তাঁর চামড়া, মাংস ও হাড় কারো কোন কাজে এল না। কুড়ি বছর ধরে তাঁর দেহ ছিল একটি বোঝা বিশেষ, সেই দুর্বহ মৃতদেহের অন্তিম সৎকার লোকের কাছে বিরক্তির ব্যাপার বলে মনে হল।

দীর্ঘ কাল তাঁকে কারো প্রয়োজন হয় নি। বরং লোকে তাকে অবাঞ্ছিত বোঝা বলে মনে করত। তবু জীবন্মৃত যারা মৃতদেহের সৎকার করে তারা ভাবল স্ফীত গলিত দেহটাকে সুন্দর পোশাক ও বুট পরানো খুবই দরকার। তাই করে চার কোণে রেশমের থোপনা লাগানো চমৎকার নতুন একটা কফিনে শুইয়ে সেটাকে আবার রাখা হল একটা সীসের কফিনে। তারপর মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে পুরোনো নর-অস্থি খুঁজে বার করে নেওয়া হল, যাতে ঠিক সেই জায়গাটিতেই নতুন ইউনিফর্ম ও পালিশ-চকচকে-বুটপরা তাঁর গলিত পোকা-লাগা দেহটিকে মাটি দেওয়া যায়।

১৮৮৫

আইভান ইলিচের মৃত্যু

১

আদালতের বৃহৎ বাড়িতে, মেলভিন্স্কি মামলার শুনানীর বিরতি-কালে, আদালতের সদস্যরা আইভান ইয়েগোরোভিচ শেবেকের অফিসে সরকারী উকিলের সঙ্গে মিলিত হল। ব্যাপারটা আদালতের নাগালের মধ্যে একথা ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ উত্তেজিত ভাবে অস্বীকার করলেন। কিন্তু আইভান ইয়েগোরোভিচ তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। পিওতর আইভানভিচ গোড়া থেকেই চুপচাপ—কোনো পক্ষের হয়েই কথা বলেন নি। সদ্য পাওয়া খবর কাগজ পড়ছিলেন তিনি।

'শুনুন।' তিনি বললেন। 'আইভান ইলিচ মারা গেছেন।'

'সত্যি!'

'এই যে, পড়ে দেখুন।' ফিওদরকে কাগজটা দিয়ে বললেন তিনি। কাগজটাতে তখনও ছাপাখানা কালির গন্ধ।

কালো বোর্ডারের লেখা রয়েছে, 'প্রাস্কভিয়া ফিওদরভনা গলভিনা তাঁর আত্মীয়-বন্ধুদের শোকার্তভাবে জানাচ্ছেন যে ১৮৮২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারালয়ের সদস্য কৌসুলী আমার প্রিয় স্বামী আইভান ইলিচ গলভিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বৃহস্পতিবার বেলা একটার সময় অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে।'

এখানে সমবেত ভদ্রলোকদের সহকর্মী ছিলেন আইভান ইলিচ এবং সকলেই তাঁকে বেশ পছন্দ করতেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং তাঁর রোগ নাকি ছিল দুরারোগ্য। কর্মস্থানে তাঁর পদ সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু গুজব ছড়িয়েছিল যে তাঁর অবর্তমানে এ পদ আলেক্সেভ্ পেতে পারেন এবং ভিন্নিকভ বা শ্তাবেল আলেক্সেভের পদ পেতে পারেন। আইভানের মৃত্যু সংবাদে তাই ওঁদের প্রথমেই মনে খেলে গেল পদের উন্নতি ও পরিবর্তন সংক্রান্ত চিন্তাগুলো।

ফিওদর ভাসিলিয়েভিচ ভাবল, 'শ্ তাবেল বা ভিন্নিকভের জায়গায় আমি নিশ্চিত নিযুক্ত হব। এই পদোন্নতির ব্যাপারে আমাকে অনেক আগেই কথা দেওয়া হয়েছিল। এই উন্নতিতে আমার মাইনে বাড়বে আটশ' রুবল। তার ওপরে আছে অফিস খরচ বাবদ কিছু টাকা।'

পিওতর আইভানভিচ ভাবল, 'কালুগা থেকে আমার শালাকে এখানে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমার স্ত্রী তাহলে খুশী হবে তার বাড়ির কোনো লোকের জন্য আমি কিছু করি না এই অপবাদ আর সে আমায় দিতে পারবে না।'

পিওতর আইভানভিচ বলল, 'আমি নিশ্চিত জানতাম যে এ রোগ থেকে ওঁর মুক্তি নেই। কী দুঃখের কথা!'

'ঠিক কী হয়েছিল ওঁর?'

'ডাক্তাররা ঠিক সব ধরতে পারে নি—মানে ধরেছিল, কিন্তু সব ডাক্তারেরই আলাদা আলাদা মত ছিল। শেষ যখন ওঁকে দেখতে যাই তখন ওঁকে একটু ভাল দেখেছিলাম।'

'ছুটির পরে আর ওঁর ওখানে আমার যাওয়া হয়নি। কিন্তু সব সময়ই যাওয়ার কথা ভেবেছি।'

'টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন? কী মনে হয় তোমার?'

'তাঁর স্ত্রীর সামান্য কিছু আছে। কিন্তু বলবার মতো তেমন কিছু নয় বলেই মনে হয়।'

'কিন্তু আদালতের কাজ ছেড়ে তো আমরা এখন বেরোতে পারছি না। ওঁদের বাড়ি তো বেশ দূরে।'

'তোমার বাড়ি থেকে। তোমার থেকে সব কিছুই অনেক দূরে।'

'নদীর ওপারে থাকতাম বলে উনি আমায় কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন নি।' শেবেকের দিকে তাকিয়ে পিওতর আইভানভিচ বলল। এ থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গার আপেক্ষিক দূরত্ব নিয়ে কথা উঠল এবং পরে তাঁরা আদালত ঘরে চলে গেলেন।

পদের উন্নতি বা পরিবর্তন সম্পর্কে সম্ভাব্যতার চিন্তা ছাড়া আর একটা জিনিস তাদের মনে ছিল, এত পরিচিত একটি লোকের মৃত্যুতে তাদের আনন্দ হচ্ছিল এই ভেবে যে মৃত্যু ঘটেছে তাদের একজন সহকর্মী বন্ধুর তাঁদের নিজেদের কারো নয়।

'ব্যাপারটা ভাবো, লোকটা মৃত, কিন্তু আমি মৃত নই।' এই ছিল প্রত্যেকের চিন্তা বা অনুভূতি। যারা বেশি পরিচিত, আইভান ইলিচের তথাকথিত বন্ধুরা তাদের অজ্ঞাতসারেই আর একটু বেশি ভাবছিল। অন্ত্যেষ্টির অনুষ্ঠানের ক্লান্তিকর কর্তব্য করতে হবে, আবার তারপরে বিধবা মহিলাকে সান্ত্বনা জানাতে যেতে হবে।

ফিওদর ও পিওতরের মত ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর কেউ ছিল না। পিওতর ছিল আইভান ইলিচের সহপাঠী, এ ছাড়াও আইভানের কাছে পিওতর নানা উপকার পেয়ে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ মনে করত। সেদিন সন্ধ্যায় খেতে বসে সে তার স্ত্রীকে আইভান ইলিচের মৃত্যু সংবাদ দিল এবং বলল যে এতে তার শালার এই বদলী হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে। তারপরে বিশ্রামের জন্যে না শুয়ে সে ফ্রক-কোট চাপিয়ে আইভ্যান ইলিচের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

সে যখন পৌঁছল তখন আরো দু'একটা গাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। একতলায় প্রবেশ-পথে, টুপি রাখবার স্ট্যাণ্ডের ঠিক পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা ছিল অলংকৃত পালিশ-করা কফিনের ঢাকনাটা। কালো পোশাক পরা দু-জন মহিলা তাঁদের কোট খুলে রাখছিলেন। সে মহিলাদের একজনকে চিনত। একজন আইভান ইলিচের বোন, আর একজন অপরিচিত। পিওতরের এক বন্ধু, সোয়ার্তজ সিঁড়ি দিয়ে সবে নামতে শুরু করেই তাকে দেখতে পেল, এবং থেমে একটু চোখ মটকালো. যেন এই কথাটা বলতে চাইছে, 'আইভান ইলিচ জীবনটাকে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিল নিশ্চয়ই। তোমার ও আমার ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা।'

সোয়ার্তজের এক ধরনের মহিমা ও গাম্ভীর্য ছিল। তার জুলফি ইংরেজদের মত, তার ফ্রক-কোটে ঢাকা পাতলা চেহারা—এইসব মিলিয়ে ও ব্যাপারটা, এই গাম্ভীর্যের সঙ্গে তার চরিত্রের ফুর্তিবাজ ধরনটা লক্ষণীয় একটা বৈপরীত্যের সৃষ্টি করত। এই পরিস্থিতিতে সেটা আরো বিশিষ্ট হয়ে উঠছে। অন্তত পিওতরের তাই মনে হল।

পিওতর মেয়েদের আগে যেতে দেওয়ার জন্য পাশ করে দাঁড়াল ও পরে ওদের পেছনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সোয়ার্তজ থেমে ওপরেই দাঁড়িয়ে রইল। পিওতর এর কারণটা অনুমান করল, আজ সন্ধ্যায় তাস খেলার আড্ডাটা কোথায় বসানো হবে এটাই ঠিক করতে চায় সে। মেয়েরা

সন্তবিধবাকে দেখতে ভেতরে চলে গেল। সোয়ার্তজের ঠোঁটে গাম্ভীর্য ও চোখে ফূর্তিবাজ ঔজ্জ্বল্য। সে চোখ দিয়ে একটা ঘরের দিকে ইশারা করল—ঐ ঘরে মৃত শায়িত।

সবারই যেমন হয় এই সময়ে, পিওতরেরও তেমনি হল, তার চিন্তা জাগল যে এখন তার কাছে ঠিক কোন ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশিত। সে জানত এই সব বিষয়ে নিজেকে ক্রস্-চিহ্নিত করায় কারুর কোনোদিন কোনো ক্ষতি হয়নি। মাথাটা নত করা উচিত কি না এ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল না এবং সেইজন্য মাঝামাঝি ধরনের একটা ভঙ্গি করল। ঘরে ঢুকে সে নিজেকে ক্রশ-চিহ্নিত করে এমন একটা ভঙ্গি করল যাকে নত ভঙ্গি বলে ধরা যেতে পারে। কতটা পরিমাণে এটা সফল হল, তা বোঝাবার জন্য সে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দুজন তরুণ, আইভানের ভাইপো বোধহয়, একজন তাদের মধ্যে ছাত্র, তারা বেরিয়ে যাওয়ার সময় নিজেদের ক্রশ-চিহ্নিত করল। একজন বৃদ্ধা নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিল। ভুরুটা উদ্ভটভাবে উঁচোনো এমন একজন মহিলা তাঁকে ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বলছিলেন। সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফ্রক-কোট-পরা একজন ধর্মযাজক উঁচু গলায় কিছু একটা পড়ছিলেন। কোনো বিরোধিতাকেই আমল না দেওয়ার সুর তাঁর কণ্ঠে। খাদ্যদ্রব্যের তদারককারী ছোকরা চাকর গেরাসিম মেঝেতে কী যেন ছড়াতে ছড়াতে পিওতরের সামনে দিয়ে খুব হালকা পায়ে চলে গেল। এটা দেখেই পচনের একটা মৃদু গন্ধ সম্পর্কে পিওতর হঠাৎ সচেতন হল। শেষবার আইভান ইলিচের সঙ্গে দেখা করতে এসে এই ছেলেটিকে দেখেছিল পিওতর, ছেলেটি রোগশয্যায় রোগীর দেখাশোনা করছিল এবং আইভান ইলিচ ছেলেটির সম্পর্কে বিশেষ স্নেহাসক্ত ছিল। পিওতর নিজেকে ক্রশচিহ্নিত করতে লাগলেন। কফিন ও ধর্মযাজকের মাঝামাঝি জায়গায় ঈষৎ ঝুঁকে কোণের টেবিলের মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। যখন তিনি অনুভব করলেন যে বাড়াবাড়ি রকমের ক্রশ করার বিপদের মধ্যে তিনি এসে পড়ছেন, তখন তিনি থামলেন, এবং মৃত মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সব শবের মত এই মৃতদেহটিও শায়িত অবস্থায় চোখের দেখাতেই ভারী বলে বোধ হতে লাগল। হাত-পাগুলো শক্ত, কফিনের কুশনের মধ্যে যেন ঢুকে গেছে। মাথাটা বালিশের ওপরে স্থায়ীভাবে সামনে ঝুঁকে আছে।

অল্প মৃতদেহের মতই যেন প্রদর্শন করছে তার হলদে মোমের মত কপাল, বসে-যাওয়া রগের কাছে চকচকে দাগ এবং ওপরের ঠোঁটের ওপরে যেন চেপে বসে আছে এমন লম্বিত নাসিকা। আইভান ইলিচের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পিওতরের শেষ দেখার পরে আইভান আরো রোগা হয়েছে, কিন্তু তাও, সকল মৃতের মতই, তার মুখে একটা অধিকতর সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি রয়েছে। সৌন্দর্য না বলে বরং বলা উচিত তাৎপর্য। সারাটা জীবন যতটুকু তাৎপর্য বহন করেছে ঐ মুখ, এখন তা যেন অনেক বেশি। অভিব্যক্তির মধ্যে যেন এই কথাটি বলা হচ্ছে যে যা করবার ছিল তা করা হয়েছে এবং যথাযথ ভাবে করা হয়েছে। তাছাড়া অভিব্যক্তির মধ্যে যেন জীবিতদের প্রতি একটা ভর্ৎসনা বা কিছু একটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গি বর্তমান। এ ভঙ্গিটা নিতান্ত অনাহূত মনে হল পিওতরের। যাই হোক, এ ভঙ্গির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, আর তাই দ্রুত নিজেকে ক্রশ চিহ্নিত করতে লাগল। শিষ্টতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে সেই দ্রুততায়, মনে হল তার। সে বাইরে চলে এল।

পাশের ঘরে সোয়ার্তজ তার জন্য অপেক্ষা করছিল। পা দুটো ফাঁক করে শক্ত হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। পেছন দিকে দু' হাতে টুপিটা নিয়ে খেলা করছিল সে। এই ফুর্তিবাজ, সুবেশ, মর্যাদাসম্পন্ন চেহারাটি একবার দেখেই তার উৎসাহ ফিরে এল। পিওতর বুঝল যে সে, সোয়ার্তজ প্রভৃতি এ সবের অনেক ওপরে আছে এবং শোকের প্রভাবের শিকার তারা হতে পারে না। তার গোটা চেহারাটা যেন বলতে চাইছে, 'আইভান ইলিচের অন্ত্যেষ্টির ঘটনা আমাদের নিয়মিত আড্ডা বন্ধ করার পক্ষে কোনো ক্রমেই যথেষ্ট কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে না, অর্থাৎ আজ সন্ধ্যের আড্ডা নষ্ট করার মত কিছু হয়নি, নতুন এক প্যাকেট তাস খুলে বসতে হবে আজ সন্ধ্যেয়— যদি আইভান, ইলিচের খানসামা কফিনের চার দিকে চারটে মোমবাতি ঠিক ঐ সময়েই জ্বালিয়ে দেয়, তবুও—। সাধারণভাবে একথা মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, এই ঘটনা আমাদের আজ সন্ধ্যের বিনোদন পর্বকে ব্যাহত করতে পারে।' ঘরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় ঠিক এই সব কথা সে সত্যি পিওতরের কানে ফিসফিস করে বলল।

কিন্তু পিওতর সে-সন্ধ্যায় তাস খেলার জন্য নিয়তি নির্দিষ্ট ছিল না। প্রাসকভিয়া ফিওদরভনা একজন মোটা বেঁটে মহিলা। বিপরীত রকমের

যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর ঘাড়ের দিকটা সরু আর তলার দিকটা অনুপাতে অনেক চওড়া। সর্বাঙ্গে কালো পোশাক। মাথায় কালো লেসের স্কার্ফ। কফিনের পাশের মহিলার মতই ভুরুটি উদ্ভটভাবে উচোঁনো কয়েক জন মহিলা সহ তিনি বেরিয়ে এসে তাঁকে মৃতের ঘর দেখিয়ে বললেন, 'এখনি অনুষ্ঠান শুরু হবে। ভেতরে আসুন।'

সোয়ার্তজ মাথাটা অস্পষ্ট ধরনে ঝুঁকিয়ে, আহ্বানটা গ্রহণ বা বর্জন কিছুই না করে থামল। পিওতর আইভানভিচকে প্রাসকভিয়া ফিওদরভনা চিনতে পেরে এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং সোজা তাঁর কাছে এসে তার হাত ধরে বললেন, 'আমি জানি, আপনি আইভান ইলিচের একজন সত্যিকার বন্ধু......' উপযুক্ত সাড়া পাওয়ার প্রত্যাশায় তিনি চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। যেমন ক্রশ করার ব্যাপারটা পিওতর জানত, তেমনি এও জানত যে এখন তার ঐ মহিলার হাতটা একটু জোরে চেপে ধরা উচিত এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলা উচিত, 'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি......' ঠিক এই কাজগুলিই সে করল, এবং করেই বুঝল যে সে তার বাঞ্ছিত ফল পেয়েছে। উভয়েই অভিভূত।

'শুরু হওয়ার আগে এদিকে আসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে।' বিধবা বললেন, 'আপনার হাতটা দেখি।'

পিওতর বাহু বাড়িয়ে দিলো, এবং উভয়ে সোয়ার্তজের পাশ দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল। সোয়ার্তজ পিওতরকে চোখ মটকে ইশারা করল, যেন বলল, 'ঐ হয়ে গেছে তোমার তাস খেলা! তোমার জায়গায় যদি আমরা অন্য কাউকে বসাই তবে কিছু মনে কোরো না। মুক্ত হয়ে যখন বেরিয়ে আসবে তখন পঞ্চম আসনটি পেতে পারো।'

পিওতর আরো গভীরভাবে ও আরো দুঃখভরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, আর প্রাসকভিয়া কৃতজ্ঞতায় তার আঙুলগুলো মোচড়াতে লাগলেন। মহিলার ড্রইং-রুমের সব আচ্ছাদন লাল রঙের এবং সে-ঘরের আলো স্তিমিত। উভয়ে সেখানে একটি টেবিলে বসল। মহিলা সোফায়, আর পিওতর স্প্রিং-ভাঙ্গা একটি নিচু ছোট অটোমানে। পিওতর বসবার সময় সেটা আর্তনাদ করল। প্রাসকভিয়া তাকে ওটা ব্যবহার করতে বারণ করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু এই শোকের অবস্থার সঙ্গে ওটা সঙ্গতিসম্পন্ন হবে না বলে বিরত ছিলেন। বসে পিওতরের মনে পড়ল, আইভান এই ঘর

সাজাবার সময় তার পরামর্শ নিয়েছিল—আচ্ছাদনের লালের মধ্যে সবুজ পাতা কেমন মানাবে? সোফায় বসতে যাওয়ার সময় (আসবাবে বোঝাই ছিল ঘর) বিধবার কালো স্কার্ফের লেস্ কীসে যেন আটকে গেল। পিওতর সেটা ছাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অর্ধেকটা উঠল। উঠতেই চাপমুক্ত স্প্রিং তাকে একটা মৃদু ধাক্কা দিল। বিধবা নিজেই লেস্ ছাড়ালেন এবং পিওতর নিজের জায়গায় বসল—অবাধ্য স্প্রিংগুলোকে দমন করে। কিন্তু বিধবা মহিলা লেস্‌টিকে পুরো খুলতে পারেননি। পিওতর আবার আধা-ওঠা অবস্থায় ঝুঁকে এগোলেন এবং আবার স্প্রিং সশব্দে জাগ্রত হল। এসব শেষ হলে তিনি একটি সাদা রুমাল বার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু লেস্ ও অটোমানের স্প্রিং এই উভয়ের মধ্যে পড়ে পিওতরের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল। তাই সে শুধু চুপচাপ মুখভার করে বসে রইল। পরিস্থিতির চাপ ও আড়ষ্টতা ভাঙল আইভানের ভৃত্য সকোলভের আবির্ভাবে। সে ঘরে ঢুকে ঘোষণা করল যে সমাধিস্থানের যে-জমি প্রাসকভিয়া বেছেছেন তার দাম পড়বে দু'শো রুবল! মহিলা কান্না থামিয়ে পিওতরের দিকে একটি শহীদের দৃষ্টিপাত করলেন, এবং ফরাসী ভাষায় বললেন যে, এসব তাঁর পক্ষে এখন কত কঠিন। পিওতর তাঁর সহানুভূতি জানাবার জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস দান করলেন।

'ইচ্ছে হলে ধূমপান করতে পারেন।' উদার অথচ ক্লিষ্ট স্বরে বললেন মহিলা, এবং সকোলভের সঙ্গে কবরের জমির দাম নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। ধূমপানের আগুন জ্বালবার সময় পিওতর লক্ষ্য করল যে মহিলা বিভিন্ন রকমের কবরের জমির দাম সম্পর্কে খুব খুঁটিয়ে খোঁজখবর করছেন এবং শেষপর্যন্ত অত্যন্ত বিচক্ষণ একটি নির্বাচন করলেন। এ ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি শোক-অনুষ্ঠানের গায়কদল ভাড়া করার বিষয়টা আলোচনা করলেন। তারপর সকোলভ বেরিয়ে গেল।

'সব জিনিসই আমার নিজেকে দেখতে হয়।' টেবিলে রাখা অ্যালবামটা সরিয়ে রেখে তিনি পিওতরকে বললেন। টেবিলে সিগারেটের ছাই পড়বার বিপদ খুবই আসন্ন এটা লক্ষ্য করে তিনি তাড়াতাড়ি পিওতরকে একটা ছাইদানি দিলেন। বললেন, 'আমি শোকে সংসারের কাজ করতে অপারগ একথা বললে ভণ্ডামি করা হয়। বরং কোনো কাজ যদি আমায়—ইয়ে সান্ত্বনা নয়, কিন্তু আমার মনটাকে একটু অন্যভাবে ব্যস্ত রাখতে পারে,

তবে সে-কাজ তাঁরই জন্যে করা। আবার তিনি রুমাল বার করলেন—যেন তিনি এখনই কেঁদে ফেলবেন। কিন্তু এক আকস্মিক প্রচেষ্টায় তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, এবং মাথাটা একটু তুলিয়ে শান্তভাবে বললেন 'একটা কাজের কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।'

পিওতর মাথা ঝোঁকালেন, কিন্তু বিদ্রোহের নতুন ধ্বজাবাহী স্প্রিংগুলোকে মাথা তুলতে দিলেন না।

'শেষ কয়েক দিন উনি ভয়ংকর কষ্ট পেয়েছেন।'

'তাই নাকি?'

'ভয়ংকর। অবিরাম চীৎকার করেছেন। দু'এক মিনিট নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তিনদিন একনাগাড়ে কাতরেছেন—নিশ্বাস নেওয়ার জন্যেও থামেন নি। সে বলা যায় না। আমি জানি না আমি কী করে সহ্য করেছি। তিনঘর ওদিকে ওঁর কাতরানি শোনা যাচ্ছিল। কী আমায় সহ্য করতে হয়েছে সে আপনাকে বোঝানো অসম্ভব।'

'আইভানের কি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান ছিল?'

'হ্যাঁ।' ফিসফিস্ করে বললেন মহিলা। 'একদম শেষ পর্যন্ত। মৃত্যুর মাত্র পনেরো মিনিট আগে উনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং ভলদিয়াকে নিয়ে যেতে বললেন।'

নিজের অপ্রীতিকর সচেতনা এবং এই মহিলার ভণ্ডামি সত্ত্বেও একজন লোকের যন্ত্রণার চিন্তায় পিওতরের গভীরভাবে নাড়া লাগল। একজন, যাকে সে খুব ভাল করে চিনত, প্রথমে খোশমেজাজের দিলদরিয়া স্কুল-বালক হিসেবে পরে বয়স্ক কালে সহকর্মী হিসেবে। আর একবার সে দেখল সেই কপালটা এবং ওপরের ঠোঁটে চেপে দাঁড়িয়ে থাকা নাকটা। আর নিজের সম্পর্কে একটা ভয় তাকে অধিকার করে ফেলল।

'তিন দিন একনাগাড়ে নিদারুণ যন্ত্রণা—তারপরে মৃত্যু। যে-কোনো মুহূর্তে আমারও ঐ অবস্থা হতে পারে।' সে ভাবল এবং সংক্ষিপ্ত একটি সেকেণ্ডের জন্যে সে ভয়ের অধিগত হল। কিন্তু পর মুহূর্তেই, কেন তা সে বলতে পারে না, তার মনে এই স্বাভাবিক চিন্তাটা এল যে, মৃত্যু তার কাছে আসে নি, এসেছে আইভ্যান ইলিচের কাছে, এবং এ জাতীয় ঘটনা তার ক্ষেত্রে ঘটতে পারে না, ঘটা উচিত নয়। এইসব চিন্তা হতাশ করে তোলে মনকে, এ অবস্থাটা এড়াতে হবে,—সোয়ার্তজের মুখচোখ এ কথাটা খুব ভাল

ভাবে জানিয়ে গেছে। এই যুক্তিধারা অনুসরণ করে পিওতর তার মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। এমন কি, আইভান ইলিচের মৃত্যুর খুঁটিনাটি খোঁজ নেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ দেখাল। যেন মৃত্যু নামক দুর্ঘটনা শুধু আইভানের ক্ষেত্রেই মাত্র ঘটতে পারে, তার নিজের ক্ষেত্রে নয়।

আইভান ইলিচের নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণার বিশদ ইতিহাস বলবার পর (প্রাসকভিয়ার নার্ভের ওপর ফলাফল দেখেই পিওতর আইভানের যন্ত্রণা অনুমান করল) বিধবা মহিলা কাজের কথায় আসতে পারলেন।

'ওঃ! পিওতর আইভানভিচ, আমার পক্ষে কী কঠিন, কী নিদারুণ!' আবার তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।

পিওতর আর একটি দীর্ঘশ্বাস দান করল এবং তার নাক ঝাড়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। মহিলার নাক ঝাড়া হয়ে গেলে সে বলল, 'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি……' মহিলা তখন আবার কথা বলতে শুরু করলেন এবং যে বিষয়ে পরামর্শের জন্য তাকে ডাকা সেই বিষয়ে এলেন। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর প্রসঙ্গে তিনি কী করে একটা সরকারী বৃত্তি পেতে পারেন, এটাই তাঁর জিজ্ঞাস্য। তিনি পেনশনের সম্পর্কে খবর নিলেন, কিন্তু পিওতর দেখল যে মহিলা তার থেকে অনেক বেশি খবর রাখেন এবং খবরের অন্ধিসন্ধি পর্যন্ত জানেন। স্বামীর মৃত্যুতে তাঁর ঠিক কত টাকা প্রাপ্য সেই অঙ্কটি নির্ভুলভাবে তিনি জানেন। কিন্তু তিনি জানতে চান যে তাঁর পেনশনটা, আরো বাড়াবার কোনো উপায় আছে কিনা। এটা কী করে করা যায় এ সম্পর্কে পিওতর ভাববার চেষ্টা করল, কিন্তু কয়েক মিনিট ভেবে, এবং সরকারের কিপ্‌টেমিকে নিন্দে করে, তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেও তাঁকে বলতে হল, বেশি পাওয়া অসম্ভব। এতে তিনি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস টানলেন এবং এই সাক্ষাৎকারের যবনিকাপাত কী করে করা যায় সেই চিন্তায় নিজেকে দৃশ্যতঃ ছেড়ে দিলেন। সে সেটা বুঝে সিগারেট নিবিয়ে উঠে পড়ল এবং করমর্দন করে বেরিয়ে হল-এ গেল।

খাবার ঘরে পিওতর পুরোহিত ও আরো কয়েকজন পরিচিতকে দেখতে পেল। আইভান ইলিচের সুন্দরী মেয়েকেও দেখতে পেল। সে সম্পূর্ণ কালো পোশাকে ছিল, তাতে তার সুন্দর ক্ষীণ কটি ক্ষীণতর দেখাচ্ছিল। তার চোখ মুখে ছিল বিষণ্ণ, জেদী, প্রায় ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। পিওতরকে অভিবাদনের জন্য সে এমন ভাবে ঝুঁকল, যেন একটা কিছুর জন্যে

সে পিওতরকে দোষী করছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে একজন যুবক—তাকেও ঐ একই রকম দেখাচ্ছে। পিওতর যুবককে চেনে। যুবকটি ধনী, ম্যাজিস্ট্রেট এবং লোকে তাকে তরুণীটির প্রেমিক বলে। একটা বিষণ্ণ অভিবাদন জানিয়ে পিওতর মৃতের ঘরে ফেরবার জন্য প্রায় ঘুরেছে, এমন সময় আইভান ইলিচের ছেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। সে এখনও ছাত্র, দেখতে অনেকটা তার বাবার মত। আইনের ছাত্র হিসেবে যে তরুণ আইভানকে পিওতর জানত এ যেন সে। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। তের-চোদ্দ বছরের কাঁদুনে চোখ-রগড়ানো ছেলের চোখের মত। পিওতরকে দেখে সে লজ্জিত ভ্রূকুটি করল। পিওতর তাকে অভিবাদন জানিয়ে মৃতের ঘরে এল। অনুষ্ঠান শুরু হল। মোমবাতি, কাতরানির শব্দ, ধুনোর গন্ধ, চোখের জল, ফোঁপানি। পিওতর ভুরু টেনে সামনের লোকেদের পায়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবারও সে মৃতদেহ বা অন্য এমন কিছুর দিকে তাকাল না, যাতে তাকে বিষণ্ণ প্রভাবের শিকার হতে হয় এবং ঘর থেকে বেরোবার সময় প্রথম দলের লোকদের মধ্যেই সে ছিল। হল-এ কেউ ছিল না। ছোকরা চাকর গেরাসিম সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে এল এবং পর্বতপ্রমাণ বহির্বাসের ভেতর থেকে হাতড়ে পিওতরের ওভারকোট বার করে দিল।

'হ্যাঁ, গেরাসিম!' কিছু বলার জন্যই বলল পিওতর। 'তোমার দুঃখ হচ্ছে?'

'এ তো ভগবানের ইচ্ছে, হুজুর। আমরা তো সবাই একদিন না একদিন মরব।' বলল গেরাসিম। তার চাষীসুলভ অভঙ্গ শক্ত সাদা দাঁতের সারি বেরিয়ে পড়ল তার কথা বলার সময়। তারপর অতিরিক্ত কাজে ব্যস্ত লোকের মত সে দরজা খুলে চীৎকার করে কোচম্যানকে ডাকল, পিওতরকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল এবং লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল—যেন নতুন কাজের সন্ধানে অধৈর্য।

ধুনো, মৃতদেহ ও কারবলিক অ্যাসিডের গন্ধের পর বাইরের তাজা বাতাসে নিশ্বাস নিতে তার বেশ ভাল লাগল।

'কোথায় যাব?' কোচম্যান শুধোল।

'এখনও খুব দেরী হয়নি। ফিওদর ভাসিলিভিচের ওখানে নামব।'

সেখানে পৌঁছে সে দেখল তাদের প্রথম রাবার সেইমাত্র শেষ হল।

সুতরাং পরেরটার জন্য পঞ্চম খেলুড়ে হিসাবে বসে যাওয়াই সুবিধের মনে হল তার।

২

আইভান ইলিচের জীবনকাহিনী সরল, সাধারণ এবং ভয়াবহ।

বিচার বিভাগীয় কাউন্সিলের সদস্য আইভান ইলিচ মারা গেল পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। সে একজন সরকারী কর্মচারীর পুত্র। তিনি বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তর ও বিভাগে কাজ করে চাকরির এমন জায়গায় উঠেছিলেন যেখানে সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ কাজে অক্ষম হয়েও নিছক চাকরিকালের দৈর্ঘ্য ও উচ্চ পদের জোরে কর্মে বহাল থাকে, উচ্চতর পদে যায়, ছয় হাজার থেকে দশ হাজারের এক অকল্পনীয় মাইনে পায়, এবং সেই টাকায় পূর্ণ পরিণত বার্ধক্য পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য ইলিয়া ইয়েফিমভিচ্ গলভিন্ ছিলেন এমন একজন লোক—বহু অনাবশ্যক বাড়তি প্রতিষ্ঠানের অনাবশ্যক বাড়তি লোক।

তাঁর তিন ছেলের মধ্যে আইভান ইলিচ হচ্ছে দ্বিতীয়। বড় ছেলে ঠিক বাপের পদাংক অনুসরণ করেছিল—ভিন্ন এক মন্ত্রিদপ্তরে; এবং শীগগিরই সে চাকরির সেই স্তরে পৌছবে যেখানে আপনা থেকেই টাকা আসে। তৃতীয় ছেলে জীবিকার ক্ষেত্রে একেবারে ব্যর্থ। বিভিন্ন পদে চাকরির সময় বিশেষ দুর্নাম হয়েছে তার। বর্তমানে সে আছে রেলওয়ে বিভাগে। তার বাবা ও ভাইয়েরা, বিশেষত তাদের স্ত্রীরা তার সঙ্গ এড়িয়ে চলত এবং যেখানে সম্ভব সেখানে তার অস্তিত্বই ভুলে যেত। তাদের বোনের বিয়ে হয়েছে ব্যারন গ্রেফের সঙ্গে। সেন্ট পিতাসবুর্গে ব্যারনও তার শ্বশুরের মত চাকরি করে। আইভ্যান ইলিচের স্থান মাঝামাঝি জায়গায়। সে বড় ভাইয়ের মত শীতল ও অতি নিয়মনিষ্ঠ নয়, আবার ছোট ভাইয়ের মত বেপরোয়া নয়। সে চালাক-চতুর, প্রাণবন্ত ও পছন্দসই লোক। সে ও তার ছোট ভাই উভয়েই বিচারবিধি-শিক্ষালয়ে প্রেরিত হয়েছিল। ছোট ভাই কোন দিনই এক পাঠ শেষ করে নি; পঞ্চম কোর্সে পৌছবার পর সে শিক্ষালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। আইভান ইলিচ খুব কৃতিত্বের সঙ্গে কোর্স সম্পূর্ণ করেন। সারা জীবন ব্যাপী যেমন ছিল সে, আইনের ছাত্র হিসেবেও ছিল তেমনি, সক্ষম, হাসিখুশি, সামাজিক, ভদ্র, কর্তব্য বলে যেটাকে বিবেচনা করত সেটাকে

সম্পূর্ণ করার জন্য একাগ্র ও উচ্চ পদের লোকেরা যেগুলোকে কর্তব্য বলে ঠিক করে সেগুলোকে সে কর্তব্য বলে বিবেচনা করত। প্রথম বয়সে বা বয়স্ককালে কোন সময়েই সে নীচ চাটুকার ছিল না। কিন্তু তারুণ্যের প্রথম সময় থেকেই তার চেয়ে উন্নত লোকদের দিকে সে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হত—প্রজাপতি যেমন আগুনের দিকে আকৃষ্ট হয়। সে তাদের আদবকায়দা ও মতগুলিকে গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। বাল্যের ও যৌবনের সকল উৎসাহ-উদ্দীপনা তার জীবনে এক বিন্দু ছাপও না রেখে বিদায় নিয়েছিল। অহংকার ও ইন্দ্রিয়পরতা এক সময় তার দেখা দিয়েছিল, এবং ছাত্রজীবনের শেষ দিকে সে উদারনীতি নিয়ে খেলা করেছিল, কিন্তু সে সবই তার চরিত্র ও সংস্কারের বিচক্ষণ সীমার মধ্যে।

ছাত্রজীবনে এমন অনেক কিছু সে করেছে যা সেই সময় তার কাছে ঘৃণা বলে মনে হয়েছিল এবং সে-কাজ করে সে নিজেই নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠত, কিন্তু পরে উচ্চ পদের লোকদের সেসব কাজ নীতিচিন্তাহীন ভাবে করতে দেখে পূর্ব অনুভূতি ভুলেছিল। সে সব কাজকে ভালও মনে করত না, আবার পাপের চিন্তাও তাকে নিয়ত পীড়িত করত না।

আইন পাঠ সাঙ্গ করে বাপেরকাছ থেকে পোশাকের টাকা পেয়ে শার্মারের দোকান থেকে কয়েকটি ভাল স্যুট করালো এবং শিক্ষালয়ের প্রধানের কাছে বিদায় নিয়ে ডননের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে খানাপিনা করল। তারপর সেরা দোকান থেকে কেনা কেতাদুরস্ত নতুন ব্যাগ, স্যুট, পোশাক, ক্ষৌরী ও প্রসাধনের সামগ্রী নিয়ে একটি মফঃস্বল শহরে চলে গেল। সেখানকার গভর্ণরের বিশেষ কমিশনের সেক্রেটারীর পদটি তার জন্য তার বাবা আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

সেই মফঃস্বল শহরেও সে তার জীবনকে খুব তাড়াতাড়ি সহজ ও আনন্দময় করে তুলল—যেমন ছাত্রজীবনে ছিল। সে কাজ করতে লাগল, চাকরিতে উন্নতির দিকেও নজর রাখল, আবার আমোদ-প্রমোদের আনন্দ-দায়ক ও অভিজাত উপায়গুলিকেও গ্রহণ করল। মাঝে মাঝে ওপরওয়ালার হয়ে তাকে গ্রামাঞ্চলে যেতে হত। সে-সব সময় সে তার নিচের ও ওপরের কর্মচারীদের সঙ্গে মর্যাদা দিয়ে ব্যবহার করত এবং তার ওপর ন্যস্ত কাজ সততার সঙ্গে সম্পন্ন করত (ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গেই প্রধানত থাকত তার কাজ)। এই সততা সম্পর্কে সে ছিল ন্যায়সঙ্গত ভাবেই গর্বিত। সরকারী

কর্তব্যে রত অবস্থায়, তার যৌবন ও প্রমোদ-প্রীতি সত্ত্বেও সে ছিল অত্যন্ত সংযত, ব্যবহারে আনুষ্ঠানিক, এমন কি কঠোর। কিন্তু সামাজিক জীবনে সে ছিল আমুদে, পরিহাসনিপুণ সর্বদাই মেজাজ ভাল, ভদ্র। তার ওপরওয়ালার বাড়িতে তার যথেষ্ট যাতায়াত ছিল। ওপরওয়ালা ও তাঁর স্ত্রী উভয়েই তাকে চমৎকার লোক বলে মনে করতেন।

এখানে এই মফঃস্বল অঞ্চলে কেতাদুরস্ত তরুণ এই আইনজীবীর দিকে নিজেদের নিক্ষেপ করেছিল এমন মেয়েদের একজনের সঙ্গে সে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। পরিদর্শনে আগত অফিসারদের সঙ্গে মদ্যপানের আসর বসত এবং নৈশ আহারের পরে দূরের রাস্তার একটি বাড়িতে যাতায়াত ছিল। ওপরওয়ালার তো বটেই, তাঁর স্ত্রীরও নানা কাজকর্ম সে করে দিত। কিন্তু এ সবই করা হোতো এমন এক উচ্চ আভিজাত্যের সুরে বেঁধে যে ব্যাপারটাকে খারাপ কিছুই বলা যেত না। প্রবাদবাক্যের অনুসরণে বলা যায় যে এ সবই করা হোতো পরিষ্কার হাতে, পরিষ্কার শার্ট পরে, ফরাসী ভাষা বলে এবং—উঁচু সমাজে যেটা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চপদস্থদের অনুমোদন নিয়ে।

আইভান ইলিচ এই পদে ছিল পাঁচ বছর। এর পরে আইনের কতকগুলি রদবদল হোলো। নতুন কিছু আদালত প্রতিষ্ঠিত হল, নতুন লোকের দরকার হল।

আইভান এই রকম একজন নতুন লোক।

তাকে বিচারকের পদ দেওয়া হয়েছিল এবং সে আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছিল। যদি এটা গ্রহণের অর্থ অন্যত্র যাওয়া, বর্তমান সম্পর্কগুলিকে ভেঙ্গে নতুন সম্পর্ক তৈরী করা। আইভানকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানানো হোলো, বন্ধুদের সঙ্গে ফোটো তোলা হল, তারা তাকে রূপোর সিগারেট-কেস উপহার দিল এবং সে নতুন চাকরি করতে চলে গেল।

এখানেও সে আগের মতই ভদ্র। সরকারী কাজ আর ব্যক্তিগত কাজ-গুলো আগের মতই আলাদা করে রাখা। সকলের মধ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক হোলো আগের মতই। পূর্ব পদের চেয়ে বিচারকের পদ তার কাছে অনেক বেশি ভাল লাগল। আগের পদেও আনন্দের জিনিস কম ছিল না। শার্মারের দোকানের পরিচ্ছন্ন পোশাক চাপিয়ে হেলতে-দুলতে সহজভাবে সে ঢুকত ওপরওয়ালার ঘরে। যেতে হত ওয়েটিং রুমের মধ্য দিয়ে। সেখানে

উদ্বিগ্ন মক্কেল কেরানীরা বসে আছে এবং ঈর্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে তার দিকে। সে সোজা ওপরওয়ালার ঘরে ঢুকে চা ও সিগারেট নিয়ে তার সঙ্গে বসত। এ ব্যাপারটা পরম তৃপ্তিদায়ক ছিল তার কাছে। কিন্তু ঐ চাকরিতে খুব অল্প লোকই ছিল তার নিচে। শুধু ছিল জেলার পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেন্ট, আর গ্রামাঞ্চলে গেলে যে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তার দেখা হত তারা। এদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে, সব জিনিস বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে আলোচনা করে, তাদের ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে, সে সৌজন্যের সঙ্গে ও জাঁক না দেখিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করছে এইটা তাদের অনুভব করানোর চেয়ে বেশি উপভোগের বস্তু তার আর কিছু ছিল না। কিন্তু নিচের লোকের সংখ্যা বড়ই কম। কিন্তু এমন বিচারক হিসেবে তার অধীনে সবাই, কেউ বাদ নয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ ও আত্মসন্তুষ্ট ব্যক্তিও তার ক্ষমতার অধীন। সরকারী ছাপে শিরোনামা আছে এখন কাগজে শুধু দু'ছত্র লেখা। ব্যস্, তখনি সবচেয়ে জবরদস্ত ও আত্মতৃপ্ত লোককে এসে দাঁড়াতে হবে তার সামনে—সাক্ষী হিসেবে, বা এমন কি বন্দী হিসেবে এবং তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় সে বসবার অনুমতি না দিলে তাদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আইভান কোনো দিনই তার ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করে নি। বরং উদার ভাবে সেটার ব্যবহার করতে চেয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং তার উদার হওয়ার অধিকার—এটাই ছিল তার নতুন পদের প্রধান আকর্ষণ। বিচার-কার্যের সময় তার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না এমন জিনিসগুলো বের করে বাদ দেওয়ায় তার দক্ষতা ছিল। আর জটিলতম মামলার ক্ষেত্রেও সরল প্রকাশপদ্ধতির উদ্ভাবন—সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখেও—এটায় তার কৃতিত্ব ছিল। এ ব্যাপারটা ছিল নতুন। ১৮৬৪ সালের বিচারবিধি-সংস্কার যেটা হয়েছিল, তার কার্যকরী রূপ দেওয়ায় সে ছিল অগ্রণীদের অন্যতম।

বিচারক হিসেবে নতুন শহরে এসে সে নতুন পরিচিতি ঘটালো, নতুন সংসর্গ জোটালো, আচরণে নতুন ধারা গ্রহণ করল এবং গলার সুর পর্যন্ত বদলে নতুন করে নিল। এবার স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকেও সে নিজেকে মর্যাদার সঙ্গে সরিয়ে রাখল। সেরা আইন-মহল ও ধনী অভিজাতদের মধ্যে বন্ধু বাছল। ঈষৎ উদারতাবাদ ও সমাজমনস্কতার একটা ধরণ গ্রহণ করল সে, এবং সেই সূত্রে সরকারকে মৃদু ভর্ৎসনা করত।

পোশাকের ক্ষেত্রে আগে যতটা কষ্ট করত এখনও তাই রইল, কিন্তু চিবুক কামানো বন্ধ করে সেখানে দাড়িকে যথেচ্ছ গজাতে দিল।

আগের শহরের মতই নতুন শহরেও আইভান ইলিচের জীবন অত্যন্ত আনন্দদায়ক হল। গভর্নরের সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে যে দলটা ছিল তারা আইভানের খুব আগ্রহ জাগাল ও বন্ধু হয়ে গেল। তার রোজগার ছিল প্রচুর এবং নতুন সখ হয়েছিল হুইস্ট খেলা (এক রকমের তাস খেলা)। সাধারণ ভাবেই খোশমেজাজে তাস খেলতে তার ভাল লাগত। খেলার সময় সে দ্রুত সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করতে পারত এবং ফলে সাধারণত সে জিতত।

এই শহরে দু' বছর থাকবার পরে তার সঙ্গে তার ভাবী স্ত্রীর পরিচয় হল। প্রাসকভিয়া ফিওদরভনা মিখেল ছিল আইভানের পরিচিত মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল, চালাক, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় তরুণী। বিচারকের কর্তব্যের মধ্যে মধ্যে যে-সব আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল, তার সঙ্গে সে আর একটি জিনিস যোগ করল—প্রাসকভিয়ার সঙ্গে হালকা ফষ্টিনষ্টি।

স্পেশাল কমিশনের সচিব হিসেবে সে নাচত—নিয়ম করে। আর বিচারক হিসাবে সে নাচত—নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে। একটা জিনিস দেখাবার জন্যে সে নাচত। নতুন বিচারবিধির সে একজন প্রয়োগকারী এবং পঞ্চম পদের একজন আইনজ্ঞ, কিন্তু তাও নাচেও সে সাধারণের চেয়ে উঁচুতে। তাই মাঝে-মধ্যে সন্ধ্যার শেষে সে প্রাসকভিয়ার সঙ্গে নাচত এবং প্রধানত এই নাচের সময়ই সে তাকে জয় করেছিল। প্রাসকভিয়া তার প্রেমে পড়েছিল। বিয়ে করার স্পষ্ট নিশ্চিত কোনো ইচ্ছা আইভানের ছিল না, কিন্তু মেয়েটি যখন তার প্রেমে পড়ে গেল, তখন সে প্রশ্নটির সম্মুখীন হল। মনে মনে সে বলল, 'কেন বিয়ে করে ফেলাটা কি আমার উচিত নয়?'

প্রাসকভিয়া সদ্বংশজাত, সুন্দরী, কিছু টাকাও আছে তার। আরো একটু ভাল বিয়ে করা যেত, কিন্তু এও খারাপ নয়। আইভানের রোজগার আছে। মেয়েটিরও কিছু আয় আছে। সে-আয়ও তার রোজগারের কাছাকাছি, আইভান আশা করেছিল। শ্বশুরবাড়ির কুটুমেরাও যোগাযোগের দিক থেকে ভাল। মেয়েটি মিষ্টি, সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, তরুণী। আইভান তাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল এবং প্রাসকভিয়া তার জীবন সম্পর্কিত সকল মতে সহানুভূতি

জানিয়েছিল, এ কথাটা ভুল, যেমন ভুল এই কথা বলা যে, তার সান্নিধ্যের লোকেরা অনুমোদন করেছিল বলেই আইভান প্রাসকভিয়াকে বিয়ে করেছিল ঃ এই দুটো কারণেই আইভান এ বিয়ে করেছে। এই বৌ ঘরে এনে নিজে আনন্দ পেয়েছিল আইভান এবং উচ্চ মহল তার এ কাজকে সমর্থন করেছে, যথাযোগ্য ভেবেছে।

আইভান ইলিচ বিয়ে করল।

পূর্বরাগ, আসল বিয়ে এবং বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্ব চমৎকার কাটল। দাম্পত্য আদর, নতুন আসবাব, নতুন ডিশ, নতুন পোশাক—এই সব নিয়ে স্ত্রীর প্রথম পোয়াতি হওয়া পর্যন্ত খুব ভাল কাটল। এত ভাল যে আইভান সত্যি সত্যি ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে বিয়েটা সমাজ অনুমোদিত আনন্দময়, সহজ, ক্লান্তিহীন, অভিজাত জীবনযাত্রায় বিয়ে কোন বাধা নয় ; এমন কি, বিয়ে এ জীবনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু স্ত্রীর প্রথম পোয়াতিকালের গোড়ার কয়েক মাসে সে একটা নতুন, অপ্রত্যাশিত, বিস্বাদ, বিশ্রী ও অসহ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হল—যা সে আগে একদম ভাবেওনি এবং যাকে নিশ্চিহ্ন করতেও সে পারে না।

স্ত্রী একদম বিনা কারণে সমস্ত আনন্দ ও জীবনযাত্রার শিষ্টতা নষ্ট করতে আরম্ভ করেছে এই ছিল তার মত। বৌ অকারণে তাকে হিংসে করে, বেশি মনোযোগ দাবী করে, তার সব কাজেই খুঁত ধরে এবং স্থূল অশিষ্ট সব কাণ্ড ঘটায়।

অভিজাত সহজ মনোভাব তাকে প্রথম জীবনে সাফল্য দিয়েছিল। এখানেও গোড়ায় সে সেই মনোভাব বজায় রাখার চেষ্টা করল, এবং আশা করল যে এতেই পরিস্থিতির বিরক্তিটা থেকে সে মুক্তি পাবে। বৌর বদমেজাজের ঝোঁকগুলোতে সে বিশেষ মন দেওয়া বন্ধ করল এবং আনন্দময় সহজ গোছের জীবন চালিয়ে যেতে লাগল। বন্ধুদের তাস খেলবার জন্য বাড়িতে আমন্ত্রণ করত, নিজেও যেত ক্লাবে বা অন্য বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু একবার এমন স্থূল ভাষায় তাকে স্ত্রী বকাঝকা করল এবং পরে প্রত্যেকবারই ভয়ংকর ভাবে করে চলল যে স্ত্রীর নির্দিষ্ট কাজ করতে সে আরো অপারগ হল এবং বীভৎস লাগতে লাগল তার (স্ত্রীও চাইছিলো একেবারে তার নিয়মে আত্মসমর্পণ করুক স্বামী)। আইভান হৃদয়ঙ্গম করল যে বিবাহ—অন্তত এই স্ত্রীর সঙ্গে—জীবনের আনন্দ ও যথাযোগ্যতাকে বাড়ায় না। বরং

গুলোর ধ্বংসের আশঙ্কা থাকে এবং সে ওগুলো বাঁচাবার চেষ্টা করবে। একটা উপায়ও সে বার করে ফেলল। একমাত্র তার কাজই প্রাসকভিয়ার মনে প্রসন্ন ছাপ রাখত, সেইজন্য আইভান স্ত্রীর সঙ্গে যুঝে নিজের স্বাধীনতা বক্ষার জন্য তাব কাজ ও ঐ সংক্রান্ত দায়গুলিকে ব্যবহার করত।

শিশুর জন্মের পর তাকে খাওয়ানোর অসুবিধে, সত্য ও কল্পিত অসুস্থতা (যাতে আইভানের সহানুভূতি প্রত্যাশিত, কিন্তু যা আইভানের মাথায় কিছুই ঢুকত না), ইত্যাদির ফলে সংসাবের বাইরে নিজের জন্য বেড়া-দেওয়া একটি ক্ষেত্র রচনা খুবই জরুরী হযে দেখা দিল। স্ত্রী যতই বিরক্তিকর হয়ে নানা কিছু আদায়েব চেষ্টা করতে লাগল, ততই আইভান ইচ্ছে করে তার জীবনেব ভারকেন্দ্র বাড়ি থেকে অফিসে সরিযে নিতে লাগল। সে তার কাজে আবো আসক্ত হতে থাকল এবং উচ্চাশা তার আগেব চেয়ে ক্রমেই বাড়তে লাগল।

খুব শীঘ্র, বিযেব মাত্র এক বছর পবে, আইভান বুঝল যে কয়েকটা সুবিধে দিলেও দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত কঠিন ও জটিল ব্যাপার এবং এ ব্যাপাবে কর্তব্য হচ্ছে সমাজের অনুমোদন ও সুনাম পাওযার জন্য সৌজন্যের সঙ্গে কযেকটি নীতি মেনে চলা—যেমন লোকে তার জীবিকার ক্ষেত্রে কিছু নীতি মেনে চলে।

এই নীতিগুলো আইভান ঠিক কবে ফেলল। বিবাহিত জীবনের কাছে তাব একমাত্র দাবী হল বাড়িতে খাওযাব ব্যাপাবটা। স্ত্রীর কাছে দাবা শয্যা ও সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ, সৌজন্য বক্ষা, কাবণ এর ওপর সমাজের অনুমোদন ও সুনাম নির্ভব করবে। পারিবাবিক জীবনে সে আনন্দ খুঁজত। তা পেলে কৃতজ্ঞ থাকত। প্রতিহত হলে এবং অসন্তোষ ও অভিযোগই মাত্র শুনলে সে তৎক্ষণাৎ তার বেড়া ঘেরা কর্মজগতে চলে আসত এবং সেখানে সুখকে খুঁজত।

তাব পবিশ্রমের গুণে তিন বছবে সে সহকারী সরকারী কৌঁশুলীর পদে উন্নীত হল। তার নতুন কাজ, সে-কাজের গুরুত্ব, লোকজনদের বিচারের জন্যে আনা এবং কয়েদ করার অধিকার, জনসভায় তার বক্তৃতা এবং তার সাফল্য—এ সবই তার কাজের আকর্ষণ আরো বাড়িয়ে তুলল।

অন্য সন্তানেরা জন্মাল। বৌ হল আরো ঝগড়াটে, তার মেজাজ হল আরো খারাপ। কিন্তু আইভান-গৃহীত নীতির বর্মে তার অসন্তোষের আঘাত প্রায় পুরোটাই প্রতিহত হতে লাগল।

সাত বছর এই শহরে থাকবার পর আইভান অন্যত্র বদলী হল সরকারী কৌশুলী হিসেবে। নতুন জায়গায় যেতে হল। তাতে টাকার অনটন দেখা দিল, এবং স্ত্রীর নতুন শহর অপছন্দ হল। তার মাইনে বাড়লেও তার জীবনধারণের খরচও বেড়ে গিয়েছিল। এর ওপর তাদের দুটি সন্তান মারা গেল, ফলে পারিবারিক জীবন আইভানের কাছে আরো বিস্বাদ হয়ে গেল।

নতুন শহরের সব দুর্ভাগ্যের জন্য প্রাসকভিয়া তার স্বামীকে দোষী করল। স্বামী স্ত্রীর আলোচনার সকল বিষয়, বিশেষত সন্তানদের শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার সময়ে আগের ঝগড়ার কোনো না কোনো বিষয় উঠে পড়তই। পুরাতন ঝগড়া সর্বদাই নতুন হয়ে দেখা দেওয়ার আশংকা থাকত। ভালবাসার মুহূর্ত ছিল কদাচিৎ, কিন্তু সেই মুহূর্তগুলোও কখনো দীর্ঘস্থায়ী হত না। সম্পূর্ণ নিরাসক্তির গোপন বিরোধের সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার আগে মুহূর্তগুলো ছিল দম্পতির বিশ্রাম দ্বীপ। এই নিরাসক্ত বিচ্ছিন্নতা আইভানকে কষ্ট দিত যদি সে এর অস্তিত্ব অবাঞ্ছিত মনে করত। কিন্তু ইতিমধ্যে সে এ ব্যাপারটাকে যে শুধু স্বাভাবিক মনে করে তাই নয়, কাম্যও মনে করে। সচেতন ভাবেই সে এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। পারিবারিক জীবনের সব বিক্ষোভ ও অশান্তি থেকে সে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করে, এবং ওগুলো যাতে ক্ষতিকর বা অশোভন হয়ে না পড়ে সেইদিকে তার লক্ষ্য। এটি সে অর্জনও করেছে দুটি উপায়ে, সে বাড়িতে ক্রমে কম সময় থাকছে, আর বাড়িতে থাকতে হলে শান্তি রক্ষার জন্য বাইরের লোককে আমন্ত্রণ করে আনে।

তার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তার কাজ। জীবনের সত্যিকার আগ্রহ তার এই কাজে। এই আগ্রহের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা, যাকে ইচ্ছে তাকেই ধ্বংস করবার অধিকার, আদালতে ঢোকবার সময় বা নিম্নপদস্থদের সঙ্গে কথা বলার সময় তার ভারিক্কী ধরন, উপরস্থ ও অধীনস্থ সকলের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা, মামলা পরিচালনায় তার দক্ষতা এবং এ নৈপুণ্য সম্পর্কে তার নিজের তৃপ্ত মূল্যায়ন—এ সবই তাকে আনন্দ দিত। এর সঙ্গে ছিল সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ, ভোজনের পার্টি, হুইস্ট খেলা—এই দিয়েই তার জীবন পূর্ণ ছিল। তাই, মোটের ওপর, আইভান ইলিচের জীবন ঠিক তেমনি যেমনটি সে হওয়া বলে মনে করে—সুখকর ও শোভন।

এই ভাবে আরো সাত বছর কেটে গেল। মেয়ের বয়স এখন ষোলো। আর একটি শিশু মারা গেছে। একটি ছেলে রয়েছে, পড়ে স্কুলে, সে পিতা-মাতার মধ্যে বহু মতান্তরের কারণ। আইভান চায়, ছেলে আইন পড়ুক। প্রতিহিংসা বলে প্রাসকভিয়া তাকে আইনে না দিয়ে সাধারণ লাইনে রাখতে চায়। মেয়ে বাড়িতে পড়ে, তার পড়াশুনো ভালই চলছে। ছেলেটিও ছাত্র হিসেবে ভাল।

৩

বিবাহিত জীবনের সতেরটা বছর আইভানের এইভাবে কেটে গেল। আইভান এখন একজন অভিজ্ঞ সরকারী কৌঁশুলী। সে কয়েকটি ভাল পদ ছেড়ে দিয়েছে—আরো ভাল পাওয়ার প্রত্যাশায়। এমন সময় একটা ঘটনা, তাতে তার জীবনের সুশৃংখলা বড রকমের চোট খেল। একটি বিশ্ববিদ্যালয় শহরে প্রধান বিচারপতি হবার আশা ছিল তার। কিন্তু কোনো ভাবে গোপ্পে তারও আগে এগিয়ে গিয়ে এই পদ পেয়ে গেল। আইভান ভয়ংকর ক্ষুব্ধ হল, অভিযোগ করল। গোপ্পের সঙ্গে এবং তার ওপরওয়ালাদের সঙ্গে ঝগডা করল। তার প্রতি তাদের ব্যবহারে শীতলতা লক্ষ্য করা গেল এবং পরের বারের চাকরিতেও অন্য লোক তাকে পেরিয়ে এগিয়ে গেল।

এ ঘটনা ১৮৮০ সালের। বছরটা আইভান ইলিচের জীবনের সবচেয়ে অসুখকর বছর হিসেবে দেখা দিল। একদিকে পরিবারের খরচের তুলনায় তার আয় যথেষ্ট নয়। অন্যদিকে, তাকে তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। তার কাছে যা ভয়ংকর ক্রোধের ও হৃদয়হীন অন্যায়ের বিষয় বলে মনে হচ্ছে, সেটা আবার অন্যেরা সম্পূর্ণ সাধারণ বলে ধরে নিয়েছে। এমন কি তার বাবাও তাকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করলেন না। আইভানের মনে হল সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে। অথচ তারা এটাকেই খুব স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছে, এমন কি তার ভাগ্য বলে মনে করছে যে সে সাড়ে তিন হাজার রুবল মাসিক পাচ্ছে। একমাত্র সে-ই জানত প্রকৃত অবস্থাটা। ঘরে স্ত্রীর অবিরাম পেছনে লেগে থাকা, আর আয়ের চেয়ে উঁচু মানে জীবন নির্বাহের জন্য অনেক ধার জমে ওঠা—এ সবে বোঝা যায় যে সে মোটেই স্বাভাবিক নেই।

সেই গ্রীষ্মে, খরচ কমাবার জন্য সস্ত্রীক সে শালার গ্রামের বাড়িতে

ছুটি কাটাতে গেল। সেখানে ঐ গ্রামাঞ্চলে এই প্রথম আইভান কিছু করবার মত কাজ খুঁজে পেল না। প্রচণ্ড একঘেয়ে লাগতে লাগল তার। এমন অকথ্য শোচনীয় অবস্থা হল তার যে, সে সিদ্ধান্ত করল যে, সে একটা কিছু করবে, নিশ্চিত একটা উপায় বার করতে হবে তার।

বারান্দায় পায়চারি করে এক বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে সে ঠিক করল, সে সেন্ট পিতাসবুর্গে ফিরে যাবে এবং অন্য কোনো মন্ত্রিদপ্তরে বদলী হওয়ার চেষ্টা করবে। যারা তার মূল্য বুঝল না তাদের এতে শাস্তি দেওয়া হবে।

পরের দিন বৌ ও শালার প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে সেন্ট পিতার্সবুর্গে যাত্রা করল। একটাই উদ্দেশ্য ছিল তার যাওয়ার, পাঁচ হাজার রুবলের একটা চাকরি যোগাড় করা। কোন্ মন্ত্রিদপ্তর, বা কোন্ বিভাগ, বা কী ধরনের কাজ, এতে তার কিছু যায় আসে না। পাঁচ হাজারের একটা পদ সে চায় যে কোন প্রতিষ্ঠানে—ব্যাংক, রেলওয়ে, সাম্রাজ্ঞী মারিয়ার প্রতিষ্ঠান, এমন কি শুল্ক আদায় বিভাগে। শুধু জরুরী হচ্ছে পাঁচ হাজার রুবল। তাহলেই সে সেই মন্ত্রীদপ্তর ছেড়ে দেবে যা তার দাম বোঝে নি।

এই অভিযান বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করল। কুর্স্কে ট্রেন আসতেই তার এক বন্ধু—এফ. এস্. ইলিন তার প্রথম শ্রেণীর কামরায় এসে বলল যে মন্ত্রিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ রদবদলের কথা জানিয়ে তার এসেছে কুর্স্কের গভর্ণরের কাছে। আইভান সোমিওনোভিচ পিওতর আইভানভিচের জায়গায় বহাল হবে।

প্রস্তাবিত পরিবর্তন রাশিয়ার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ তো বটেই, আইভানের পক্ষেও বিশেষ তাৎপর্যের। এই বদলে আইভানের সুবিধে হচ্ছে। জাখার আইভানভিচ ছিল তার বন্ধু ও সহপাঠী। সে আইভানকে আইনমন্ত্রীর দপ্তরে—যেখানে আইভান কাজ করত—উচ্চতর পদ দেবে কথা দিয়েছিল। মস্কোয় সংবাদটা যে সত্য তা সঠিকভাবে জানা গেল। আইভান সেন্ট পিতার্সবুর্গে গিয়েই জাখার আইভানভিচের সঙ্গে দেখা করল।

এক সপ্তাহ বাদে সে স্ত্রীকে এই তারবার্তা পাঠাল—মিলারের জায়গায় নিযুক্ত। প্রথম রিপোর্টের পরে আমি উচ্চতর পদ পাচ্ছি।

এই পরিবর্তনকে ধন্যবাদ, তার সহকর্মীদের থেকে দু'ধাপ ওপরে আইভান নিযুক্ত হল। তার মাইনে হল পাঁচ হাজার রুবল। বাসস্থান বদলের জন্য

আরো সাড়ে তিন হাজার। বিরোধীদের এবং মন্ত্রিদপ্তরের বিরুদ্ধে তার আগের রাগ সে ভুলে গেল এবং সম্পূর্ণ সুখী হল সে।

অনেক দিন তাকে কেউ এত ফুর্তিতে ও সন্তুষ্ট অবস্থায় দেখে নি। এই ভাবে সে গ্রামে ফিরল। প্রাসকভিয়াও উৎসাহিত হয়ে উঠল, এবং সাময়িক ভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল। আইভান সব বর্ণনা করে গেল, কীরকম সহৃদয়তার সঙ্গে সেন্ট পিতার্সবুর্গে তাকে গ্রহণ করা হয়েছে, শত্রুরা কেমন অসম্মানিত ও অপদস্থ হয়েছে এবং এখন তারা আইভানের ওপর ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষাকাতর, বিশেষত সেন্ট পিতার্সবুর্গে মর্যাদার সঙ্গে সে গৃহীত হওয়ার পর।

প্রাসকভিয়া সব মনোযোগ দিয়ে শুনল। আইভানের সব কথা বিশ্বাস করছে এমন ভান করল। তার কোন কথায় বাধা দিল না। নতুন কর্মস্থলের শহরে কেমন করে নতুন বাসা কেমন ভাবে থাকা হবে এই পরিকল্পনায় সে নিজেকে ছেড়ে দিল। তার পরিকল্পনার সঙ্গে মিলছে দেখে আইভান খুশী হল। তাদের মতের মিল হচ্ছে। সামান্য নাড়া খাওয়ার পর তাদের জীবন আবার সুখকর ও শোভন হবে—এটাই স্বাভাবিক জীবনগতি বলে তার মনে হল।

অল্প দিন থাকতে এসেছিল আইভান। সেপ্টেম্বরের দশ তারিখে তার নতুন কার্যভার গ্রহণ করতে হবে। তার ওপর নতুন জায়গায় বাসস্থান বদলাতে হবে, সব জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে, নতুন জিনিস কিনতে হবে, কতগুলোর অর্ডার দিতে হবে। সে মনে মনে যেভাবে ভেবে রেখেছিল ঠিক সেই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার জীবন। প্রাসকভিয়াও তার অন্তরে এই জীবন কামনা করে।

এখন সব কিছুই অনুকূল। সে ও তার স্ত্রী ঐকমত এবং বিয়ের পরের প্রথম দিনগুলো ছাড়া এত সৌহার্দ্য তাদের আর কখনো হয় নি। আইভান তখনই তার গোটা পরিবারকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু শালা ও শালাজ এখন হঠাৎ খুবই অনুনয়পূর্ণ ও সহৃদয় হয়ে পড়েছেন আইভান ও তার পরিবারের প্রতি ; তাদের জোরাজুরিতে আইভান একাই যাত্রা করল।

একা বেরল সে। একদিকে সাফল্য, অন্যদিকে বৌর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক। এক বাড়ায় অন্যকে। মনটা খুব খুশী। এ খুশী ভাবটা সারাক্ষণই রইল। যেমন চমৎকার ফ্ল্যাটের স্বপ্ন দেখেছে আইভান ও তার স্ত্রী, ঠিক তেমন একটি ফ্ল্যাট নিল সে। পুরনো ধরনের প্রকাণ্ড বড় ও খুব উঁচু ড্রইং

রুম, সুবৃহৎ ও সর্বসুবিধাযুক্ত পড়বার ঘর, স্ত্রী ও কন্যার জন্য আলাদা আলাদা ঘর, ছেলের পড়াশুনোর ঘর—বাড়িটা যেন তাদের কথা ভেবেই তৈরী করা হয়েছিল। আইভান নিজেই আসবাব ও অলংকরণের ভার নিল। দেওয়ালের কাগজ, গৃহসজ্জার নানা সরঞ্জাম, আসবাব—সব সে নিজেই পছন্দ করল। এ সব বেশির ভাগই পুরনো ধরনের জিনিস—এগুলিই তার কাছে বিশেষ অভিজাত বলে মনে হল। সবকিছু জমে জমে শেষ পর্যন্ত তার আদর্শের কাছাকাছি এল তার ভবিষ্যৎ বাসগৃহ। অর্ধেকটা হতেই ফল প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেল। ফ্ল্যাট পূরো সাজানো হলে স্থূলতার চিহ্ন বর্জিত কী সুন্দর ও যথাযথ দেখাবে তা সে তার মনের চোখে দেখতে পাচ্ছিল। সব ঠিক হলে বসবার ঘরটা কেমন দেখতে হবে তাই মানস-দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে সে ঘুমোল। অসমাপ্ত ড্রইং রুমের দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল ফায়ার-প্লেস, পর্দা, এখানে ওখানে ছড়ানো চেয়ার, দেওয়ালে চীনা প্লেট। এ সব জিনিসের প্রতি বৌ ও মেয়েরও রুচি আছে। তাদের কী রকম তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে এ কথা ভেবে সে খুশী হল। তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না তাদের জন্য কী করে রাখছে সে। পুরনো ধরনের আসবাব সংগ্রহে তার ভাগ্যও বিশেষ সাহায্য করল। বেশ সস্তা হল। আবার পুরাতন আভিজাত্যের মহিমাও ছিল তাতে। আসলে যত ভাল, চিঠিতে তার চেয়ে অনেক খারাপ করে লিখল ইচ্ছে করেই যাতে শেষ ফলটা চরম হয়। চাকরিতেই সে আনন্দ পায় সবচেয়ে বেশি, কিন্তু বাড়ির এইসব কাজে সে এত ডুবে গেল যে সরকারী কাজ প্রত্যাশার থেকে কম আগ্রহ নিয়ে করছিল। আদালতে সেসন চলবার সময়ও তার মন মাঝে মাঝে ছুটে চলে যেত তার গৃহসজ্জার খুঁটিনাটি চিন্তায়। আবিষ্ট আইভান বাড়িতে মজুরদের সঙ্গে নিজেও কাজে লেগে যেত ; এই আসবাব সরাচ্ছে, এই ছবি টাঙাচ্ছে।

একদিন সে মইতে উঠে পর্দা কী ভাবে টাঙানো হবে দেখাচ্ছে, হঠাৎ পা পিছলে পড়-পড় হল, কিন্তু সে এত সক্ষম ও চটপটে ছিল যে, কোন রকমে সামলে নিল। জানালার ফ্রেমে একটা পাশ খারাপ ভাবে চোট খেল মাত্র—এ ছাড়া তার বিশেষ কিছুই হল না। শরীরের একটা পাশে একটু ক্ষণ একটা ব্যথা থাকল, কিন্তু একটু বাদে সেটা চলে গেল। গোটা সময়টাতেই সে বেশ ভাল ছিল, ফুর্তিতেই ছিল। সে চিঠিতে লিখেছিল, 'আমার পনের বছর বয়স কমে গেছে মনে হচ্ছে।'

সেপ্টেম্বরের মধ্যে সে সব শেষ করবে ঠিক করেছিল, কিন্তু অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজটা চলল। তবে তার ফল হল দুর্ধর্ষ। এটা শুধু তার একারই মনে হয়েছিল তাই নয়, যারা ফ্ল্যাট দেখল তাদের সবারই মনে হল।

যারা ধনী নয় কিন্তু ধনীদের মত নিজেদের দেখাতে চায়, এমন লোকেরা যতটা এবং যা অর্জন করে, আইভানও আসলে তাই করল। ধনীর মত হয় না তারা, পরস্পরের মত হয়। পর্দা, ফুল, কাঠ, ব্রোঞ্জ, সবই কালো রঙের এবং দারুণ পালিশ করা—এটা বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা করে সেই শ্রেণীর অন্যদের মত হবার জন্য। তার ফ্ল্যাটও ঠিক এই শ্রেণীর অন্য লোকদের ফ্ল্যাটের মতই হল, যা মনে বিশেষ ভাল কোন ছাপ রাখে না। কিন্তু আইভান ভাবল, এটা অসাধ্য হয়েছে। স্টেশন থেকে সে তার গোটা পরিবারকে নিয়ে এলো উজ্জ্বল-আলোকিত ফ্ল্যাটে। ফুলে-সাজানো ঢোকবার হল্-এ সাদা নেকটাই পরা খানসামা দরজা খুলে দিল। সেখান থেকে তারা গেল ড্রয়িং-রুমে। তারপরে পড়ার ঘরে। খুশীতে তাদের নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আর এ সব ঘটবার সময় আইভান নিজেও খুব খুশী হল। সব জায়গাটা সে তাদের দেখালো। প্রশংসা ও পরিতৃপ্তি চারদিকে। সেদিন সন্ধ্যায় চা খাওয়ার সময় প্রাসকভিয়া তার পড়ে যাওয়ার ঘটনাটা জিজ্ঞেস করল। আইভান হেসে উঠল, এবং কেমন করে পড়েছিল ও মজুরটিকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল সেটা মজাদার করে বলল ও দেখালো।

'ভাগ্যিস জিমনাস্টিক্ শেখা ছিল। অন্য লোক হলে খারাপ রকমের চোট খেত। কিন্তু আমার শুধু এই পাশের দিকটা একটু ধাক্কা লেগেছে। এখনও ছুঁলে লাগে, কিন্তু কমে যাচ্ছে। একটা সামান্য মচ্‌কে যাওয়া গোছের ব্যাপারটা।'

নতুন জায়গায় তারা বাস করতে শুরু করল। কিন্তু সব বাড়িতেই সাধারণত যা ঘটে থাকে—এখানেও একটি ঘর কম পড়ল। আর একটা ঘর থাকলে একেবারে নিখুঁত হত। নতুন রোজগারের ক্ষেত্রেও সর্বদাই যা হয়ে থাকে—আর একটু বেশি, পাঁচ শো রুবল আর যদি বেশি আয় হত, তাহলে তাদের সব দরকার ভালভাবে মিটত। কিন্তু মোটের ওপর, সব কিছু চমৎকার। গোড়ার দিকে সব কিছুই বিশেষ ভাবে ভাল। যখন ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ সজ্জিত হয়নি, কিছু কিনতে বা অর্ডার দিতে বা সারাতে বা সরাতে

হবে, তখনো খুব ভাল। ঠিকই, কখনো কখনো এক-আধটু ভুল-বোঝাবুঝি উঁকিঝুঁকি মেরেছে, কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এত তুষ্ট এবং ব্যস্ত থাকার মত এত কিছু রয়েছে যে ছোট ঐ অংকুরগুলো পুরো কলহে বিশদ হওয়ার আগেই মিটে যেত। ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ সজ্জিত হওয়ার পর জীবন একটু একঘেয়ে লাগতে লাগল, মনে হল একটা কী যেন নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা নতুন লোক-জনের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল, নতুন অভ্যাস তৈরী করছিল। এই সব ব্যস্তবতায় দিন কেটে যাচ্ছিল।

আইভানের সকালটা কাটত আদালতে। পরে সে খেতে আসত বাড়িতে। গোড়ায় চমৎকার উৎসাহের মধ্যেই ছিল সে—যদিও বাড়ির ব্যাপারে তার মনঃপীড়া লেগেই ছিল। টেবিল-ক্লথের প্রতিটি দাগ, পর্দার যে কোনো আলগা দড়ি তার বিরক্তির কারণ ছিল—এত তিনি খেটেছেন এ সবের জন্যে যে এর বিন্দুমাত্র ক্ষতি তার মনোবেদনার কারণ হয়।

কিন্তু মোটের ওপর, আইভানের মতে যেমন জীবন হওয়া উচিত, তেমনটিই হয়েছিল, সহজ, সুখকর এবং শোভন। সকাল নটায় উঠে কফি খেয়ে কাগজ পড়ে। তারপর চাকরির ইউনিফর্মটি চাপিয়ে আদালতে বেরিয়ে যায়। কাজের যোয়াল তার জন্যে সেখানে তৈরী থাকে—সে সহজে তার মধ্যে ঢুকে যায়। আবেদনকারী, অনুসন্ধান, খোদ অফিস, সিটিং, ইত্যাদি। এখানে যত রকমের সম্পর্ক সব সরকারী, আনুষ্ঠানিক, 'ওফিশিয়াল'। ধরা যাক, একটা লোক কিছু খোঁজ করতে এল। অফিসের বাইরে এমন লোকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না, সে রাখে না। কিন্তু এখানে সে আদালতে প্রার্থী—আদালতের সঙ্গে সম্পর্কিত (যে-সম্পর্ক আদালতের ছাপ মারা কোনো কাগজে সে হাজির করেছে), সুতরাং এই সম্পর্কের সীমার মধ্যে আইভান তার জন্য সব করবে—তার ক্ষমতার মধ্যে একদম সব। এমন কি, সম্মান দিয়ে তার সঙ্গে ব্যবহার করবে—মানবিক, এমন কি সুহৃদ-সম্পর্কের আদলে। কিন্তু 'ওফিশিয়াল' বা সরকারী সম্পর্কটা যেই শেষ হল, সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যায়। সরকারী সম্পর্ককে আসল জীবন থেকে আলাদা করে রাখবার অসাধারণ গুণ আছে আইভানের। এই গুণ সে এত উন্নত ও বিকশিত করেছে যে—তার প্রতিভা ও অভিজ্ঞতাকে ধন্যবাদ—সে এমন একটা স্তরে পৌঁছেছে যেখানে সে মানবিক ও সরকারী সম্পর্ককে মাঝে মাঝে ইচ্ছেমত মিশিয়ে

দিতে পারে—যেন মজা করছে। এটা সে করতে পারে, কারণ দরকার হলে যে কোনো মুহূর্তে মানবিক সম্পর্ককে বাদ দিয়ে সরকারী সম্পর্ককে আলাদা করে নেওয়ার ইচ্ছাশক্তি আছে তার। আইভান যে এটা শুধু সহজে সানন্দে করত তাই নয়, সৌজন্যের সঙ্গেও করত, শিল্পীর মত করত। এ সব সময়ের মধ্যে সে সিগারেট খেত, চা খেত, কথা বলত রাজনীতি নিয়ে, পেশার বিষয়ে, তাসের খেলা নিয়ে এবং সবচেয়ে বেশি চাকরির নিয়োগ নিয়ে। অবশেষে সে ক্লান্ত হত, কিন্তু চমৎকার কাজ দেখাতে পেরেছে এমন শিল্পীর তৃপ্তিও থাকত তার। অরকেস্ট্র্যার প্রথম বেহালার সুরটি যেন বাজিয়ে সে বাড়ি ফিরত। সন্ধ্যায় কাজে বা আমোদে তার স্ত্রী ও কন্যা বেরোত। তার ছেলে হয় স্কুলে থাকত, নয়তো বাড়ি ফিরে স্কুলের সব পড়া পরিশ্রমের সঙ্গে তৈরী করত একজন শিক্ষকের সঙ্গে বসে। সব কিছু চমৎকার। খাওয়ার পরে, কোনো অতিথি না থাকলে, যে বইটি তখন শহরের সবচেয়ে বেশি আলোচ্য সেই বইটি পড়ত। তারপর সে দলিল পরীক্ষা, আইন দেখা বিচার করা, সেগুলিকে আইনের সঙ্গে মেলানো ইত্যাদি কাজে লেগে যেত। এ কাজ তার কাছে একঘেয়ে বিরক্তিকরও নয়, আনন্দদায়কও নয়। তাস খেলা ছাড়তে হলে কাজটা বিরক্তিকর। কিন্তু তাস খেলা না থাকলে, একা বসে থাকা বৌর সঙ্গে বসার চেয়ে এ কাজ ভাল, আইভানের বিশেষ আনন্দ ছিল ছোট ছোট স্ত্রী-পুরুষের দলকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে। আইভানের ড্রইং রুমটাকে তারা নিজের ড্রইংরুমের মত ব্যবহার করে চলে যেত।

একবার এক সান্ধ্যপার্টিতে নাচেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আইভান দারুণ ফুর্তির মেজাজে ছিল। সব কিছু অসাধারণ ভাল ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল—শুধু প্যাস্ট্রি ও মিঠাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একটা বিশ্রী রকমের ঝগড়া হয়ে গেল। স্ত্রীর ইচ্ছে, এ সব বাড়িতে তৈরী করা হোক। আইভান চায়, শহরের সব চেয়ে দামী মিঠাইওয়ালার কাছ থেকে এগুলো আনা হবে। প্রচুর প্যাস্ট্রির অর্ডার দিল সে। অনেকগুলো বাড়তি হল, এদিকে দাম পড়ল পঁয়তাল্লিশ রুবল। এই নিয়ে ঝগড়া শুরু। জোরালো ও কত তিক্ত হয়েছিল ঝগড়াটা তা এই থেকে বোঝা যাবে যে প্রাসকভিয়া তাকে 'বোকা' ও 'মেরুদণ্ডহীন' বলে গাল দিল, আর আইভান তার নিজের মাথা ধরে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা বিড় বিড় করল। কিন্তু পার্টিটা খুব আমোদের

হয়েছিল। সেরা লোকেরা সব এসেছিল এবং আইভান রাজকুমারী ক্রুফনভার সঙ্গে নেচেছিল। 'আমার ভার তুমি নাও' নামক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী বিখ্যাত ক্রুফনভার বোন। অফিসের পরিশ্রমে যে আনন্দ তাতে তার উচ্চাশার তৃপ্তি, আর বাড়ির পরিশ্রমের আনন্দে তার অহংকারে তৃপ্তি। সব থেকে খাঁটি আনন্দ সে পেত তাস খেলে। সে স্বীকার করত, যাই ঘটুক না কেন, যত বড় হোক না কোনো হতাশা একটা উজ্জ্বল আলো সব অন্ধকারের মধ্যেও তৃপ্তি দেয়। সেটি হচ্ছে ভাল কয়েকটি খেলুড়ের সঙ্গে বসে তাস খেলা। খেলুড়েরা চেঁচামেচি করবে না। 'ভিন্ট' এর চার হাতের খেলা খেলবে (পাঁচ হাতের খেলা খেলে পাশে বসে থাকা আর নজর রাখা বড় কষ্টকর), তারপর রাতের হালকা খাবারের সঙ্গে একটু ভাল মদ পান করবে। তাস খেলার পর আইভান বিশেষ ভাল মেজাজে ঘুমোতে যায়—যদি একটু জেতে তবে তো কথাই নেই (বেশি জিতলে সে অস্বস্তি বোধ করে)।

সুতরাং তাদের জীবন চলতে লাগল। সেরা মহলে তাদের গতায়াত। তাদের বাড়িতেও ঘন ঘন আসে গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা এবং তরুণেরা।

কাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে হবে এ বিষয়ে স্বামী, স্ত্রী ও কন্যাদের মতের সম্পূর্ণ মিল ছিল। দেওয়ালে জাপানী প্লেট বসানো ড্রইং রুমে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যারা ক্রমাগত আসে, তাদের মধ্যে কারা তাদের আভিজাত্যের পক্ষে কলঙ্ক বিশেষ তা পরস্পরের সঙ্গে বিনা পরামর্শেই বুঝে ফেলতে তারা সমান দক্ষ ছিল। শীগগিরই এই অবাঞ্ছিত লোকেরা আসা বন্ধ করল এবং শুধুমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজের মধ্যে এদের চলাচল সুগম হল। তরুণেরা লিজার পাণিপ্রার্থনায় এগিয়ে এল। তরুণ একজামিনিং ম্যাজিস্ট্রেট, পেত্রিশেচভ, দমিত্রি আইভানভিচের ছেলে ও তাঁর সব সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তার প্রণয়-উদ্যোগে এত উৎসাহ যে আইভান এ বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল এবং একটা স্লে-র পার্টি বা থিয়েটারের বন্দোবস্ত করতে বলল।

এই ভাবে তাদের জীবন চলছিল। এক দিন থেকে পরের দিন—সব ঠিক চলছিল। কোনো পরিবর্তন নেই। সবই খুব চমৎকার।

৪

সবাই খুব ভাল আছে। আইভান শুধু এক এক সময় অভিযোগ করে, সে তার মুখে একটা বিচিত্র স্বাদ পায়, আর তার বাঁ-দিকে কী যেন একটা হয়েছে তবে একে অসুস্থতা বলা চলে না।

এই 'কী যেন একটা' ক্রমে আরো খারাপ চেহারা নিল। যদি এটা ঠিক ব্যথা নয়, একটা চাপ যেন, যা তাকে নিত্য হতাশার মধ্যে রাখে। এই অবস্থাটা গভীর হয়। আর গলভিন পরিবারের সহজ শোভন জীবনের আনন্দ নষ্ট হতে শুরু করে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ঘন ঘন হতে লাগল। সহজ সুখকর বসবাস অন্তর্হিত হল। শোভন শালীনতা অতি কষ্টে বজায় রাখা হল। বাড়িতে প্রায়ই ঝগড়া হতে লাগলো। আবার কয়েকটি দ্বীপখণ্ড মাত্র এবং তেমন দ্বীপ খুবই কম যেখানে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকলে বিস্ফোরণ না ঘটবে।

স্বামীর ধরন-ধারণটাই বেয়াড়া, মানিয়ে চলা শক্ত,—এ কথাটা এখন প্রাসকভিয়া ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বলতে পারে। একটু বাড়িয়ে বলার ঝোঁক তার আছে। সেই ঝোঁকে এখন সে বলল যে স্বামীর বরাবরই এই অসহ্য ধরনটা ছিল, তার চরিত্রের ধরনটা দেবদূতের মত বলেই কুড়ি বছর সে সহ্য করেছে। এ কথা সত্য যে এখন তর্কগুলো আইভান আরম্ভ করে। যখন খাবারটা তৈরী, অথবা যখন স্যুপটা সবে দেওয়া হয়েছে, তখন সে সাধারণত খুঁত ধরে। হয় ডিশ ময়লা, নয়ত খাবারটা খারাপ, কিংবা ছেলে টেবিলে কনুই রেখেছে, অথবা মেয়ের চুল ঠিক মত আঁচড়ানো নেই। আর এ সব কিছুর জন্যই সে দোষ দিত প্রাসকভিয়াকে। গোড়ায় প্রাসকভিয়া পালটা ঝগড়া করত এবং তাকে ভয়ংকর সব কথা বলত। কিন্তু দু'বার খাওয়ার ঠিক শুরুতে এমন বন্য ক্রোধের প্রকাশ ঘটল যে সে নিজেকে সংযত রাখে, কোনো উত্তর দেয় না। শুধু খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে চায় সে। এ রকম সংযমের জন্য সে নিজেকে প্রভূত কৃতিত্ব দান করে। স্বামী ব্যক্তিটি একেবারে অসম্ভব এবং সে তার জীবন নষ্ট করেছে, এই সিদ্ধান্তের পর তার নিজের প্রতি করুণা হল। যতই করুণা করল নিজেকে, ততই ঘৃণা করল স্বামীকে। সে আশা করতে লাগল যে স্বামী মারা যাবে। কিন্তু এটা পুরো আশাও করা যায় না, কারণ তাহলে রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। এতে সে আরও

স্বামীর বিরুদ্ধে যায়। তার যন্ত্রণাবোধ তীব্রতর হয় এই ভেবে যে এমন কি স্বামীর মৃত্যুও তাকে রক্ষা করতে পারে না। এতে সে বিরক্তি বোধ করে, বিরক্তিটা ঢাকবার চেষ্টা করে এবং সেই দমিত বিরক্তি তার বিরক্তি আরো বাড়ায়।

একটি কলহ-দৃশ্যে আইভান অভিযোগের সময় বিশেষ অন্যায় করে। এতই অন্যায় যে মিটমাটের সময় সে স্বীকার করল যে সে বিরক্তিকর হয়ে পড়ছে। কিন্তু এর কারণ তার অসুস্থতা। স্ত্রী বলল, অসুস্থ হলে চিকিৎসা করা দরকার এবং একজন নামজাদা ডাক্তার দেখাবার জন্য জোরাজুরি করতে লাগল।

ডাক্তার দেখানো হল। সাক্ষাৎটা ঠিক প্রত্যাশিত ধরনের সর্বদা যেমন হয় ঠিক তেমনি। অপেক্ষা, ডাক্তারের গুরুত্বপূর্ণ বাইরের চেহারা (তার কাছে এত পরিচিত, কারণ আদালতে ঢুকে সে নিজেও ওই গুরুত্বের চেহারাটা দেখায়), টোকা দেওয়া, শোনা, আগে-শোনা অনাবশ্যক উত্তর জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা, ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করলে সব সেরে যাবে এমন ভঙ্গিতে তাকানো, কারণ কী করতে হবে ডাক্তারই তো নিশ্চিত জানে, রোগী যে হোক সবার কাছে অগ্রসর হবার একই ধরন ইত্যাদি। সব ঠিক আদালতের মত। অভিযুক্তের সঙ্গে ব্যবহারে সে যেমন গুরুত্বের আবহাওয়া গড়ে তোলে, রোগীর সঙ্গে তেমনি ডাক্তার।

ডাক্তার বলল, এটা-এবং-ওটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আপনার এটা-ও-ওটায় একটু গলদ হয়েছে, কিন্তু যদি এটা-এবং-ওটার বিশ্লেষণে আমাদের রোগ-নির্ণয় নিশ্চিত বলে বোঝা না যায়, তাহলে আমরা সন্দেহ করব যে আপনার এটা-এবং-ওটা হয়েছে। যদি আমরা ধরে নিই যে আপনার এটা-ও-ওটা হয়েছে, তাহলে……ইত্যাদি। আইভান একটি প্রশ্নেরই উত্তর চাইছিল, তার অবস্থাটা বিপজ্জনক কি না? কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ডাক্তার প্রশ্নটি অবহেলা করলেন। ডাক্তারের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন বিবেচনার অযোগ্য। সম্ভাবনাগুলোকে নিক্তিতে ওজন করে দেখতে হবে। ফ্লোটিং কিডনি, দীর্ঘকালীন মাথার সর্দি বা অন্য কোন ব্যাধি। আইভানের জীবনের কোন প্রশ্ন এখানে ওঠে না, ওঠে ফ্লোটিং কিডনি ও মাথার সর্দির প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা। আইভানের উপস্থিতিতে ডাক্তার এর একটা দিকে সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। শুধু একটা যোগ করলেন যে নতুন বিশ্লেষণে নতুন

তথ্য পাওয়া বোলে কেস্‌টা পুনর্বিবেচনা করতে হবে। এ কাজ আইভানও হাজার বার করেছে—ডকের বন্দীর সামনে আজকের এই ডাক্তারেরই মত চমৎকারভাবে। এখন ডাক্তার একটা সুন্দর সারমর্ম তৈরি করলেন, বিজয়ীর দৃপ্ত ভঙ্গিতে ও ফুর্তিতে। ডাক্তারের কথায় আইভান সিদ্ধান্ত করল যে তার অবস্থাটা খারাপ। কিন্তু এটা ডাক্তারের কাছে কিছুই নয়। অন্য কারো কাছেই কিছু নয়। এই সিদ্ধান্তে এসে আইভান আহত হল। একটা তীব্র করুণা নিজেরই সম্পর্কে জাগল। আর এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে এত উদাসীন থাকায় ডাক্তারের সম্পর্কে জাগল তীব্র বিদ্বেষ। কিন্তু সে কোন প্রতিবাদ করল না। সে শুধু উঠে পড়ল, টেবিলে টাকাটা রাখল, এবং দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বলল, 'আমার ধারণা, রোগীর মূর্খ প্রশ্ন শুনে আপনি অভ্যস্ত। সাধারণ ভাবে আপনি কি আমার রোগকে বিপজ্জনক বলবেন?'

চশমার উপর দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে ডাক্তার তার দিকে চাইলেন, যেন বললেন, 'বন্দী, তুমি যদি অনুমোদিত প্রশ্নের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রাখো, তাহলে আমি তোমাকে আদালতের বাইরে বার করে দিতে বাধ্য হব।'

ডাক্তার বললেন, 'যা দরকার ও যা উচিত, বলে আমি মনে করি, তা আপনাকে আমি বলেছি। বিশ্লেষণের পর বাকীটা বলা যাবে।'

ডাক্তার অভিবাদন করে তাকে বিদায় করলেন।

ধীরে বেরিয়ে এসে আইভান তার শ্লেজে বসল এবং বাড়ি ফিরল। সারা রাস্তা ডাক্তারের কথাগুলো সে ভাবল, অস্পষ্ট ও বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোকে সাদাসিদে ভাষায় অনুবাদ করে সে এই উত্তরটা পেল—'খারাপ, খুব খারাপ? অথবা এখনও তত খারাপ নয়?' ডাক্তারের সব কথার নির্যাস তার মনে দাঁড়াল—খারাপ, খুব খারাপ। এখন যেদিকেই তাকায় আইভান, বিস্বাদ লাগে তার—গাড়ীর চালক, বাড়িগুলো, পথচারী, দোকানগুলো,—সব সব। সেই একঘেয়ে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে ছাড়ে নি, ডাক্তারের অস্পষ্ট মন্তব্যের আলোকে সে-যন্ত্রণা এখন নতুন ও গভীরতর তাৎপর্য গ্রহণ করল। আতঙ্কের এক নতুন চেতনায় সে তার যন্ত্রণায় সমস্ত মনোযোগ সংহত করল।

বাড়ি ফিরে বৌকে জানাল সব। বৌ শুনল। কিন্তু কথার মধ্যে টুপি পরে মেয়ে ঢুকল। মা ও মেয়ে বাইরে যাচ্ছে। স্ত্রী জোর করে নিজেকে

বসিয়ে তার একঘেয়ে ইতিবৃত্ত কিছুক্ষণ শুনল, কিন্তু দীর্ঘকাল নয়। তার স্ত্রীও সব শুনল না।

স্ত্রী বলল, 'বেশ। খুব ভাল লাগছে। নিয়মিত ওষুধ খেয়ো। তোমার প্রেস্‌ক্রিপশন্‌টা দাও। গেরাসিমকে পাঠাই।' স্ত্রী পোশাক পালটাতে গেল।

স্ত্রী যতক্ষণ ঘরে ছিল, সে তার দম বন্ধ করে রেখেছিল। এখন সে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সে বলল, 'ও! বেশ! হয়তো সতিাই অত খারাপ নয় ব্যাপারটা।'

ওষুধ খাওয়া শুরু হল। ডাক্তারের উপদেশ সে সব ঠিকই মেনে চলে, বিশ্লেষণের পর উপদেশ কিছু পালটানো হয়েছে। বিশেষ বিশ্লেষণ সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সুবিখ্যাতদের কাছে আবেদন করা অসম্ভব। কিন্তু যেমনটি হওয়ার কথা তাঁরা বলেছিলেন তা ঠিক হচ্ছে না, তা সে যে কারণেই হোক। হয় ডাক্তার কিছু ভুলে গেছে, অথবা রোগীর কাছে কিছু মিথ্যে বলেছে, কিংবা গোপন করেছে।

যাই হোক আইভান তাঁর উপদেশ সম্পূর্ণভাবে মেনে চলতে লাগল এবং গোড়ার দিকে এই মেনে চলাতেই কিছু স্বস্তি এল।

এখন তার প্রধান কাজ হল, স্বাস্থ্য সম্পর্কে ডাক্তারের কথা শোনা। ওষুধ খাওয়া, যন্ত্রণায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা। মানুষের স্বাস্থ্য ও অসুখ—এই হল আইভানের প্রধান আগ্রহের বিষয়। তার সামনে যদি কেউ অন্য কারো অসুখ বা মৃত্যুর কথা বলে, বিশেষত সে-রোগ যদি তার নিজের রোগের মত হয়, তাহলে সে সব বিবরণ উদগ্র আগ্রহে শোনে, নিজের রোগের সঙ্গে তুলনা করে।

ব্যথাটা গেল না। কিন্তু 'ভাল বোধ করছি' এটা আইভান নিজেকে জোর করে ভাবাচ্ছিল। যতক্ষণ সব মোটামুটি ভাল চলে ততদিন সে নিজেকে সফল ভাবে ঠকায়। কিন্তু যেই বৌর সঙ্গে ঝগড়া হয়, বা অফিসে কিছু অশান্তি হয় বা তাস খেলায় ভাগ্য বিরূপ হয়, সঙ্গে সঙ্গেই সে তার অসুখ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠে। আগে দুর্ভাগ্যের মোকাবিলা সে সাহসের সঙ্গে করেছে, দুর্ভাগ্যকে কাটিয়ে উঠবে এই আস্থা ছিল তার নিজের ওপরে, সাফল্যের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রতিরোধ করেছে সে। কিন্তু এখন প্রতিটি দুর্ঘটনা তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়ে যায় এবং

হতাশার গর্ভে তাকে নিক্ষেপ করে। সে নিজের মনে বলল, 'এইখানে আমি ছিলাম, একটু ভাল হয়ে উঠলাম, ওষুধটা ঠিক ধরতে শুরু করেছিল, আর ঠিক এই সময় এই দুর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যটা এসে পড়ল...'

দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে বা যারা দুর্ভাগ্য এনে তাকে হত্যা করছে তাদের বিরুদ্ধে সে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়। সে বোঝে যে এই ক্রোধও তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ সম্পর্কে সে আর কিছু করতে পারে না। লোকজন এবং পরিস্থিতির ওপর তার এই রাগ তার অসুখকেই বাড়িয়ে তুলছে। সেইজন্যে দৈবাৎ-ঘটে-যাওয়া গোলমালগুলোর প্রতি তার এত মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তার যুক্তি চলত বিপরীত দিকে। সে বলত তার দরকার হচ্ছে শান্তিতে থাকা, ঠাণ্ডা থাকা, সুতরাং যা শান্তি বিঘ্নিত করে তার বিরুদ্ধে তাকে সতর্ক থাকতে হবে, আর সে ঘটনা যত ছোটই হোক তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক, ডাক্তারি বই পড়ে আর ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করে সে ব্যাপারটা আরো খারাপ করছিল। ক্রমশ এত ধীরে তার অবস্থা খারাপ হচ্ছিল যে এক দিনের সঙ্গে পরের দিনের পার্থক্য বোঝবার মত নয়। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেলে সে বুঝত যে সে শুধু যে খারাপ দিকে চলেছে তাই নয়, খুবই দ্রুত চলেছে। এ সত্ত্বেও সে নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে চলল।

সেই মাসেই সে আর এক অতি বিখ্যাত ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করল। সমস্যাটা একটু ভিন্ন ভাবে তুলে ধরলেও, আগের ডাক্তার যা বলেছিল ইনিও তাই বললেন। এঁর পরামর্শ শুধু আইভানের সন্দেহ ও ভয়কে আরো বাড়িয়ে তুলল।' তার বন্ধুর বন্ধু—একজন নামজাদা ডাক্তার—সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রোগের কথা বললেন। যখন তিনি বললেন যে আইভান ভাল হয়ে যাবে, তখন তার প্রশ্ন ও ধারণা তার মনকে আরো এলোমেলো করে দিল এবং সন্দেহ দিল বাড়িয়ে। একজন হোমিওপ্যাথ আর এক রোগ ঠিক করলেন এবং অন্য এক ওষুধ বাতলালেন। কাউকে না জানিয়ে এক সপ্তাহ সে এই ওষুধ খেল। সপ্তাহান্তে কোন ফল না পাওয়ায় এই চিকিৎসায় তো বটেই অন্য সব চিকিৎসায়ও বিশ্বাস নষ্ট হল তার এবং আগের চেয়ে অনেক বেশি হতাশাগ্রস্ত হল সে।

একবার তার একজন পরিচিত মহিলা তাকে এক ঠাকুর-বিগ্রহের জলপড়া জাতীয় ওষুধের কথা বলল। আইভান খুব মন দিয়ে সব শুনল

এবং এ রকম নিরাময়ের সম্ভাবনায় বিশ্বাসও করল। কিন্তু ঘটনাটায় ভয় পেল সে। 'আমি কি সত্যিই এই রকম নপুংসক বনে গিয়েছি?' নিজেকেই সে প্রশ্ন করল। যত সব বাজে ব্যাপার! এত নার্ভাস হওয়া আমাকে বন্ধ করতেই হবে। একজন ডাক্তার বেছে দৃঢ়ভাবে তাঁর চিকিৎসাধীনে থাকতে হবে। হ্যাঁ, এই করতে হবে আমার। যথেষ্ট হয়েছে। আমি নিজের কথা ভাবা বন্ধ করব। গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত ডাক্তারের আদেশ কড়াকড়ি ভাবে মেনে চলতে হবে, তারপরে দেখা যাবে। আর দ্বিধায় সংশয়ে ভুলব না।'

এ সিদ্ধান্ত করা সহজ ছিল। কিন্তু কার্যে পরিণত করা ছিল দুরূহ। এক পাশের তার ব্যথাটা তাকে জীর্ণ করতে লাগল। যেন ইদানীং ওটা বাড়ছে। এই ব্যথাটা তাকে বিশ্রাম দেয় না। মুখের স্বাদটা আরো বিচিত্র হয়েছে। তার মনে হয়, বিরক্তিকর এক দুর্গন্ধের নিশ্বাস হয়েছে তার। খিদে চলে গেছে তার, আর ক্রমেই বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। নিজেকে ঠকানো নয়, আইভানের একটা ভয়ংকর কিছু ঘটছে, নতুন রকমের কিছু, এর থেকে বড় রকমের কিছু ঘটেনি তার জীবনে। এটা একমাত্র সে নিজেই জানে। তার আশেপাশের লোকেরা হয় বোঝে না, নয়তো বোঝার জন্য পরোয়া করে না, এবং তারা ভাবে, পৃথিবীর সব কিছু আগেও যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমন আছে। অন্য সব কিছুর চেয়ে এইটাই তাকে কষ্ট দিত বেশি। তার বাড়ির লোকেরা—তার স্ত্রী ও কন্যা তখন সামাজিকতার চূড়ান্ত ঋতুর মধ্য দিয়ে চলেছে। তারা কিছুই দেখে না, কিছুই বোঝে না। আইভান এত হতোদ্যম ও অতিরিক্ত দাবীকারী বলে তার প্রতি বিরক্ত, যেন এ সবই তার দোষ। যতই তারা লুকোতে চেষ্টা করুক, আইভান দেখতে পেত যে তারা তাকে একটা বিশ্রী উৎপাত বলে মনে করে। স্ত্রী তার অসুখ সম্পর্কে একটা বিশেষ মনোভাব তৈরি করে নিয়েছে। মনোভাবটা এই রকম—'দ্যাখো', সে বলত তার বন্ধুদের, 'সব নরম মনের লোকের মতই আইভান ইলিচও ডাক্তারের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে অক্ষম। ওষুধ ও পথ্যের নিয়ম আজ ঠিক ঠিক মানল। কাল, আমি চোখ না রাখলে, সে ওষুধ খেতে ভুলে যায়, স্টার্জন মাছ খেয়ে বসে (ও মাছ ওর খাওয়া বারণ), বেলা একটা পর্যন্ত তাস খেলে।'

একদিন বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে আইভান জিজ্ঞেস করেছিল, কবে আমি এ সব করেছি? মাত্র একবার, পিওতর আইভানভিচের বাড়িতে।'

'আর শেবেকের সঙ্গে গত রাত্রে।'

'ওটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ব্যাথায় ঘুমোতে পারছিলাম না আমি।'

'ওতে কিছু আসে-যায় না। ওগুলো বেশি মাথায় রাখলে তুমি কোন দিনই ভাল হবে না, আর আমাদের ওপরে অত্যাচার করবে।'

প্রাসকভিয়া বন্ধুদের ও স্বয়ং আইভানকে যা বলেছে তা থেকে বোঝা যায় যে সে আইভানকেই তার অসুখের জন্য দায়ী মনে করে এবং গোটা ব্যাপার-টাই তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য স্বামীর একটি নতুন উপায়। আইভান বুঝত যে স্ত্রীর এ মনোভাব তার ইচ্ছাকৃত নয় কিন্তু তাতে ব্যাপারটা তার কাছে তেমন কিছু সহজ হত না।

কাজের জায়গাতেও আইভান লক্ষ্য করত, বা লক্ষ্য করত বলে মনে করত যে সেখানেও এক বিচিত্র মনোভাব রয়েছে। শীগগির সে পদটি খালি করে দেবে এমন একটা বিশেষ দৃষ্টিতে সহকর্মীরা মাঝে মাঝে তাকাত বলে তার মনে হত, কখনো তার কল্পিত রোগ নিয়ে তারা সৌজন্যের সঙ্গেই হাসা-হাসি করত। সেই ভয়াবহ, আতঙ্ককর, অশ্রুত রোগ, যা তার মধ্যে জন্মলাভ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার প্রাণশক্তিকে দিবারাত্রি নিঃশেষ করছে, অপ্রতিরোধ্য ভাবে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় কোন্ অতলে,—এই বিষয়টা যেন ঠাট্টার একটা উপযুক্ত বিষয়। সোয়ার্তজের ওপর সে বিরক্ত হত সব চেয়ে বেশি। তার সজীবতা, আমুদেভাব, সব সময় হাসিখুশী থাকার গুণ—এ সবই আইভানকে তার নিজের দশ বছর আগেকার জীবনের কথা মনে করিয়ে দিত।

তার বন্ধুরা তার সঙ্গে তাস খেলতে আসত। তারা টেবিলে বসত, নতুন তাস ভাঁজত, বাঁটত। সে তার হাত সাজাত, সব রুইতনগুলো এক জায়গায় আনত, সাতটা রুইতন পেয়েছে সে। তার পার্টনার হাঁকত, 'নো ট্রাম্প্স্।' এবং দুটি রুইতন নামিয়ে রাখে। আর কী সে চাইতে পারে? খুব খুশী হওয়া উচিত তার—একটা 'দারুণ হাত।'

কিন্তু হঠাৎ সেই যন্ত্রণাটা সে অনুভব করে। বিরাট কোন জন্তুর দাঁতের মধ্যে পিষে গেলে যেমন ব্যথা, ঠিক তেমনি। আর মুখে সেই বিচিত্র স্বাদ। এই অবস্থায় 'দারুণ হাতে' খুশী হওয়া পাগলামি। তার পার্টনার মিখাইল মিখাইলোভিচ তার মাংসল হাতে টেবিল চাপড়ায় আস্তে আস্তে, দানটা না তুলে আইভানের দিকে ঠেলে দেয়, যাতে বেশি দূর হাতটা না বাড়িয়েই

সে দান তোলার আনন্দ পায়। 'ও কি ভাবে—আমি এত দুর্বল যে হাতটা বাড়াতেও পারি না?' আইভান ভাবতে থাকে, আর ভুলে যায় কীসের রং, 'দারুণ হাতে'ও তিনের হার হয় সবচেয়ে খারাপ, সে দেখতে পায় মিখাইল মিখাইলোভিচ কী রকম বিচলিত কিন্তু তাতেও সে বেশি পরোয়া করে না। কেন সে পরোয়া করে না ভাবলে আতঙ্ক হয়।

সবাই দেখতে পায় সে কী রকম খারাপ বোধ করছে। তারা বলে, 'তুমি যদি ক্লান্ত বোধ কর, তবে আজ খেলা এইখানেই থাক। একটু বিশ্রাম কর।' বিশ্রাম? কেন, সে একটুও ক্লান্ত নয়, সে রাবার শেষ করবে। তারা সবাই গম্ভীর ও নীরব। আইভান জানে যে সে এর কারণ কিন্তু সেটা দূর করতে সে অপারগ। রাতের হালকা খাবার সেরে অতিথিরা চলে যায়। আইভানকে একা ফেলে যায়। এই জ্ঞান সহ সে পড়ে থাকে যে তার জীবন বিষাক্ত, সে অন্যদের জীবনও বিষাক্ত করেছে, আর বিষ দুর্বল না হয়ে ক্রমেই তার সত্তার গভীরে, আরো গভীরে প্রবেশ করছে।

এই জ্ঞান, শারীরিক যন্ত্রণা এবং এই সঙ্গে একটা আতঙ্কের চেতনা নিয়ে সে শয্যায় শুয়ে থাকবে, রাতের বেশি অংশই যন্ত্রণায় বিনিদ্র অবস্থায়। আবার সকালে তাকে উঠতে হবে, পোশাক পরতে হবে, আদালতে যেতে হবে, কথা বলতে হবে, লিখতে হবে। আর যদি সে আদালতে না যায়, তাহলে চব্বিশটা ঘণ্টা বাড়িতে কাটাতে হবে। সে-চব্বিশের প্রতিটি ঘণ্টাই তার কাছে যন্ত্রণা। মৃত্যুর প্রান্তে একদম একা, তাকে বেঁচে থাকতে হবে। একটি লোকও তাকে বুঝবে না, তাকে দয়া করবে না।

৫

এক মাস, তারপরে আর এক মাস, এই ভাবে কাটতে থাকে। ঠিক নব বর্ষের আগে তার শালা তাদের ওখানে একবার বেড়াতে আসে। যখন সে পৌঁছল, আইভান তখন আদালতে। প্রাসকভিয়া কেনাকাটা করতে বাইরে গেছে। বাড়ি ফিরে আইভান শালাকে দেখতে পেল—তাজা স্বাস্থ্যবান লোক, পড়ার ঘরে তার ব্যাগ খুলছে। আইভানের পায়ের শব্দ শুনে সে মাথা তুলল এবং এক মুহূর্ত তার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। এই দৃষ্টি আইভানের কাছে সব কিছু উন্মোচিত করল। নিশ্বাস নেবার জন্য শালা

মুখ খুলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই খাবি খাওয়া থেকে নিজেকে নিরস্ত করল। আর এতে সব কিছু নিশ্চিত হল।

'কেন? আমি কি বদলেছি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ! বদলেছ।'

এর পরে, বহু চেষ্টাতেও, তার চেহারা সম্পর্কে শালার মুখ দিয়ে আর একটিও কথা বার করা গেল না। আইভান ঘরে ঢুকে দরজায় তালা দিয়ে আয়নায় নিজের দিকে তাকাল। প্রথমে পাশ থেকে, পরে সামনে থেকে পূরো। বৌর সঙ্গে তোলা একটা ফটো তুলে নিয়ে তার সঙ্গে আয়নার চেহারা তুলনা করল এবং পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর জামার হাতা টেনে দিল, অটোমানে গা ডুবিয়ে বসল এবং রাতের চেয়েও কালো চিন্তায় নিজেকে আচ্ছন্ন করল।

'নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না।' সে নিজেকে বলল। সে লাফিয়ে উঠল, লেখার টেবিলে গেল, একটা মামলার নোটগুলো খুলল এবং পড়তে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে দরজা খুলে বসবার ঘরে গেল। ড্রয়িংরুমে যাওয়ার দরজা ভেজানো ছিল। সে পা টিপে টিপে এগিয়ে শুনল।

'ওঃ! তুমি বাড়িয়ে বলছ।' বলল স্ত্রী।

'বাড়িয়ে বলছি? তুমি নিজে চোখে দেখতে পাও না? আইভান তো মড়া লোকের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখো। চোখে কোনো প্রাণ নেই। ওর কী হয়েছে?'

'কেউ জানে না। নিকলায়েভ (আর একজন ডাক্তার) বলেন একটা কিছু কিন্তু আমি ঠিক বলতে পারি না·····লেশ্‌চেতিৎস্কি (বিখ্যাত ডাক্তার) ভক উলটো কথা বলেন।'

আইভান সরে এল। গেল নিজের ঘরে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, 'কিডনি। ফ্লোটিং কিডনি।' ডাক্তারদের সব কথা সে মনে করতে লাগল। কিডনি নাকি আলগা হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক ভাসমান। কল্পনায় সে কিডনিটি ধরে যথাস্থানে বসিয়ে দিল। মনে হল, কী সহজ। 'হ্যাঁ, আমি বেরোব, পিওতর আইভানভিচের সঙ্গে দেখা করব (বন্ধু পিওতরের একজন ডাক্তার-বন্ধু আছে)। ঘন্টা বাজিয়ে গাড়ী ঠিক করতে বলল এবং বেরবার জন্য তৈরি হল।

'কোথায় যাচ্ছ, জাঁ?' স্ত্রী জিজ্ঞেস করল। বিশেষ শোকপূর্ণ ও অসাধারণ সদয় তার কণ্ঠস্বর।

'পিওতর আইভানভিচের সঙ্গে দেখা করব।'

তার বাড়িতে গিয়ে দুজনে ডাক্তার-বন্ধুর বাড়িতে গেল। ডাক্তার বাড়িতে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তা হল।

তার দেহের মধ্যে শারীরিক কয়েকটা পরিবর্তন হচ্ছে—ডাক্তারের কথা শুনে বেশ পরিষ্কার বুঝল আইভান।

সামান্য, একটা সামান্য কিছু। দুরারোগ্য নয় মোটেই। সহজেই সারানো যায়। একটা প্রত্যঙ্গ সবল করতে হবে, অন্যটা করতে হবে দুর্বল, আর কিছু করতে হবে আত্মসাৎ, এবং সব ঠিক হয়ে যাবে।

খেতে আইভানের একটু দেরী হয়ে গেল। খাওয়ার পর ফুর্তির সঙ্গে সে কিছুক্ষণ কথাবর্তা বলতে লাগল, পড়ার ঘরে কাজ করতে যেতে পারল না। অবশেষে সে পড়ার ঘরে গেল এবং কাজে বসল। কতকগুলো মামলার কাগজপত্র পড়ল, কাজে বেশ মন দিল। কিন্তু মনের গভীরে সর্বদাই সে একটা জরুরী ও ব্যক্তিগত কাজ সম্পর্কে সচেতন ছিল—মামলার কাগজ দেখা শেষ হলেই সেই কাজ করতে যেতে হবে। মামলার কাজ শেষ হলে তার ব্যক্তিগত কাজটির কথা ভাল করে মনে পড়ল। কাজটি হচ্ছে, তার রোগের চিন্তা, রোগ-রোমন্থন। কিন্তু তখনি সে কাজটায় ঠিক মত বসল না। ড্রয়িংরুমে গেল চা-র জন্যে। অতিথি ছিল সেখানে। তারা পিয়ানো বাজাচ্ছিল ও গান গাইছিল। তাদের মধ্যে মেয়ের বাঞ্ছিত প্রেমিক সেই একজামিনিং ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। প্রাসকভিয়া দেখল, পার্টিতে আইভানই সব থেকে আমুদে লোক। কিন্তু আইভান এক মিনিটের জন্যেও ভোলে নি যে সে তা গুরুত্বপূর্ণ রোগ-চিন্তা সরিয়ে রেখেছে। এগারটার সময় সে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে এল। অসুস্থতার পর থেকে পড়ার ঘরের পাশে একটি ছোট ঘরে সে ঘুমোয়। ভেতরে গিয়ে পোশাক ছেড়ে সে জোলার একটা উপন্যাস নিয়ে বসল, কিন্তু পড়ার বদলে সে ভাবনার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিল। কল্পনা করল যে তার কাম্য আরোগ্য ঘটে গেছে। স্বাভাবিক কাজকর্ম সব আবার শুরু হয়েছে। মনে মনে বলল, সত্যি, প্রকৃতিকে সাহায্য করা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য। এতে মনে পড়ল ওষুধের কথা। একটু উঠে ওষুধ খেয়ে আবার হেলান দিল। ওষুধের

উপকারিতা অনুভব করল—কী চমৎকার ব্যথা কমিয়ে দেয়। 'নিয়মিত খেতে হবে, খারাপ প্রভাবগুলো এড়াতে হবে। বেশ ভাল বোধ করছি। আগের থেকে অনেক ভাল।' পাশের দিকে একটু খোঁচা দিল। তাতে ব্যথা লাগল না। 'আমার একদম লাগছে না। সত্যি অনেকটা ভাল আছি।' বাতি নিবিয়ে সে পাশ করে শুলো। তার রোগ ভাল হচ্ছে। হঠাৎ সে পুরনো পরিচিত ব্যথাটা অনুভব করল। শান্ত, গভীর ও একগুঁয়ে ব্যথা। মুখে সে খারাপ স্বাদ। মনটা দমে গেল, মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিড়বিড় করল, 'হায় ভগবান, হায় ভগবান! আবার, আবার, এ কোনো দিনও যাবে না।' হঠাৎ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন আলোয় দেখল সে। 'যকৃৎ, কিডনি!' মনে মনে বলল সে, 'যকৃৎ বা কিডনির ব্যাপার নয় এটা। এটা জীবনের ব্যাপার……এবং মৃত্যুর ব্যাপার। হ্যাঁ, এক দিন জীবন ছিল, এখন তা চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে। আর এই চলে-যাওয়া থামানোর মত কিছুই করতে পারি না আমি। নিজেকে ঠকাবো কেন? আর কারো কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু আমার কাছে সুস্পষ্ট যে আমি মরছি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, কয়েক দিনের মধ্যে হয়তো বা কয়েক ঘন্টার মধ্যে আলো ছিল, এখন অন্ধকার। আমি এখানে ছিলাম। আমি সেইখানে যাচ্ছি। কোথায়?' ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল শরীরে। নিশ্বাসে কষ্ট হতে লাগল। বুকের স্পন্দন ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই সে শুনতে পাচ্ছিল না।

'আমি আর থাকব না। কী থাকবে? কিছুই না। আমার অস্তিত্ব মুছে গেলে আমি কোথায় থাকব? এই কি মৃত্যু? ওঃ, আমি মরতে চাই না!' বাতি জ্বালতে সে লাফিয়ে উঠল। হাতড়াচ্ছিল সে, হাতটা কাঁপছে। বাতিদান সহ মোমবাতিটা হাতের ধাক্কায় পড়ে গেল। সে আবার বালিশের ওপর এসে পড়ল। 'কী এসে যায়? সবই সমান। অন্ধকারের দিকে পরিষ্কার চোখে তাকিয়ে সে ভাবল। 'মৃত্যু। হ্যাঁ, মৃত্যু। ওরা জানে না, এবং জানতে চায় না এবং কোনো দুঃখ বোধও নেই। ওরা গান বাজনা করছে।' (বন্ধ দরজার মধ্য দিয়ে নারী কণ্ঠের গান ও পিয়ানোর সঙ্গত সে শুনতে পাচ্ছে।) 'এখন ওদের কাছে সবই সমান। কিন্তু ওরাও শীগগিরই মারা যাবে। মূর্খ! আমি আগে যাব। তারপরে ওরা। ওদের কাছেও মৃত্যু আসবে। এখন ওরা ফুর্তি করছে! পশু সব!' তার ক্ষোভ তার শ্বাস

রোধ করল প্রায়। তার অবস্থা ভয়ংকর শোচনীয়—অবর্ণনীয় রকমের শোচনীয়। ধারণাই করা যায় না যে প্রত্যেকে নিয়ত এই ভয়াবহতার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হবে। সে নিজেকে তুলল।

'কোথাও একটা কিছু গোলমাল হচ্ছে। আমার একটু শান্ত হয়ে ব্যাপারটা গোড়া থেকে ভাবা দরকার।' এবং সে ভাবতে লাগল। 'আমার অসুস্থতার শুরু। আমার এই পাশের দিকে চোট লাগল। কিন্তু তেমন কিছু নয়, আগের মতই ছিলাম। পরের দিনও তাই রইলাম। সামান্য একটু ব্যথা হচ্ছিল। পরে বাড়ল। তারপর আমি ডাক্তারের কাছে যাওয়া শুরু করলাম। উদ্যমহীন, হতাশ হয়ে পড়লাম, তারপর আরো ডাক্তার। এর মধ্যে আমি ক্রমেই মৃত্যুর কাছে, আরো কাছে এগোচ্ছি। আমার শক্তি নিঃশেষিত হল। কাছে, আরো কাছে। এখন আমি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। আমার চোখে প্রাণ নেই। মৃত্যু। এখনও আমি আমার যকৃতের কথা ভাবি। আমার পেটের নাড়ীভুড়ির মেরামতের কথা ভাবি।' আর সর্বদা ভাবি মৃত্যুর কথা। কিন্তু সত্যিই কি মৃত্যু?'

আবার সে আতঙ্কে আচ্ছন্ন হল। নিশ্বাসে কষ্ট হতে লাগল। নিচু হয়ে দেশলাই খুঁজল। বিছানার ধারের টেবিলে কনুইটা গুঁতো খেল। চলার পথেই ওটা। বেশ লাগল তার। ওটার ওপর সে রেগে গেল। দ্বিতীয় বার সে ওটাকে আরো জোরে আঘাত করল মরিয়া হয়ে, নিশ্বাসের চেষ্টায় সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, এবং সেই মুহূর্তেই মৃত্যুর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অতিথিরা বাড়ি ফিরছে। প্রাসকভিয়া তাদের এগিয়ে দিচ্ছিল। টেবিল পড়ার শব্দ শুনে সে ঘরে এল।

'কী ব্যাপার?'

'কিছু না, দৈবাৎ ওটার ওপর পড়ে গেছি।'

স্ত্রী বাইরে থেকে একটা মোমবাতি এনে দিল। আইভান শুয়ে রইল—তার স্থির চোখ স্ত্রীর ওপর। জোরে জোরে ও দ্রুত নিশ্বাস নিচ্ছে। হাঁপাচ্ছে—যেন অনেকটা দৌড়ে এসেছে।

'কী হয়েছে জাঁ?'

'কি-কিছু না। অটায় ধাক্কা লেগেছে।' '(কেন তাকে বলতে যাব? সে বুঝবে না।' ভাবল সে।)

স্ত্রী বুঝল না। টেবিল্‌ তুলে বাতি জেলে সে দ্রুত চলে গেল। অতিথি-দের বিদায় দিতে হবে তার।

যখন সে আবার ফিরে এল, তখনও আইভান একভাবে শুয়ে আছে—সিলিং-এর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

'কী হয়েছে? আরো খারাপ কিছু?'

'হঁ্যা।'

স্ত্রী মাথা নেড়ে বসল।

'আমি আশ্চর্য হচ্ছি, জঁা। লেশ্‌চেতিৎস্কিকে আমাদের ডাকা দরকার, তা কি তুমি মনে কর না।'

সুবিখ্যাতকে ডাকা মানেই আবার অনেক টাকা খরচ। আইভান ঠাট্টার হাসি হাসল এবং বলল, 'না।'

স্ত্রী একটুক্ষণ বসে থেকে তার কাছে গেল এবং কপালে চুমু খেল।

চুম্বনের সময় আইভান তাকে সকল হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করল এবং তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দেওয়ার জন্য তাকে প্রচণ্ড চেষ্টা করতে হল।

'বিদায়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার এখন ঘুম আসবে।'

'হঁ্যা।'

৬

আইভান ইলিচ দেখল যে সে মারা যাচ্ছে। নিয়ত হতাশার মধ্যে তার সময় কাটছে। তার অন্তরের গভীরে জানত যে সে মরছে এবং ধারণাটায় সে অভ্যস্ত হয় নি তাই শুধু নয়, সে ঘটনাটাকে ধরতে পারছে না, সম্ভবত ঠিক মত ধরতে পারছে না।

সারা জীবন সে কিজেওয়েতেরের যুক্তিবিজ্ঞানের এই কথাটা জানত, 'কাইউস্‌ একজন মানুষ, মানুষ মরণশীল, সুতরাং কাইউস্‌ মরণশীল।' কিন্তু মরণশীলতার এই বক্তব্য একমাত্র কাইউস্‌ সম্পর্কেই সত্য বলে সে জানত, নিজের সম্পর্কে সত্য বলে জানত না। কাইউস্‌ একজন মানুষ। কিন্তু তার কাছে এ মানুষ ছিল নিতান্তই ভাবাত্মক অর্থে মানুষ। পৃথিবীর অন্য সব মানুষ থেকে সে ছিল আলাদা। বাবা ও মা-র কাছে সে ছিল ছোট্ট ভানিয়া, ভায়েদের কাছে মিটিয়া এবং ভলদিয়া ছিল সে কোচম্যান, দেখাশুনো করার নার্স, কাটিয় ও তার খেলনার কাছে। শৈশব, বাল্য ও যৌবনের সকল

আনন্দ, দুঃখ ও চরম পুলকের মধ্য দিয়ে বেঁচেছে ভানিয়া। ভানিয়ার ফুটবলের চামড়া-চামড়া গন্ধটা ভীষণ ভাল লাগত—কাইউস্ কি তা কোনো দিনও জেনেছে? মা-র হাতে চুমু খাওয়ার সময় যে অপূর্ব ভাল লাগার স্বাদ ভানিয়া পেয়েছে—তা কি কাইউস্ কোনো দিন জেনেছে? মা-র সিল্কের স্কার্টের খসখস শব্দ ভানিয়ার কী ভাল লাগত—তেমন ভাল কি কোন দিন কাইউসের লেগেছে? সে কি কোনো দিন প্রেমে পড়েছে? আদালতের সেশনে সে কি কখনো এত চমৎকার ভাবে সভাপতিত্ব করেছে?

কাইউস্ মরণশীল ছিল বটে এবং তা-ই সঠিক ও যথাযোগ্য। কিন্তু সে, ভানিয়া, আইভান ইলিচ, তার সব চিন্তা ও অনুভূতি সহ—তার কাছে এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। সে মরবে এটা কখনই সঠিক ও যথাযোগ্য হতে পারে না। এ চিন্তাটাই ভয়ংকর।

সে যা ভাবল তা এই।

'কাইউসের মত আমিও যদি মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট থাকতাম, তাহলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম, কোন অন্তঃস্বর আমায় তা বলত। কিন্তু তেমন কিছুই আমি জানি না। আমি নিজে জানি ও বন্ধুরাও সবাই জানে যে আমি কাইউসের ধরনের লোক নই। কিন্তু এখন—! না, তা হতে পারে না। হতে পারে না। হতে পারে না। কিন্তু হচ্ছে। কেমন করে এটা সম্ভব? কী করে লোকে বুঝবে এটা?'

সে বুঝতে পারল না এবং মিথ্যা বিভ্রান্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর এই চিন্তা, আনবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এটা চিন্তার চেয়ে কিছু বেশি, এটা ছিল বাস্তব। তাই এটা বারবার ফিরে আসতে লাগল এবং তার মুখোমুখি দাঁড়াল।

একের পর এক অন্য চিন্তাকে সে আহ্বান করে আনতে লাগল—যদি সেখানে কোন সমর্থন মেলে। আগে যে সব চিন্তা তাকে মৃত্যু-চিন্তা থেকে রক্ষা করেছে, সে সব ধরনে চিন্তা সে মনে আনতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা আজ মৃত্যুর চেতনাকে মন থেকে মুছতে বা লুকোতে পারছে না। কিন্তু তাও আইভান চেষ্টা করে যেতে লাগল। যেমন, সে নিজেকে বলতে লাগল, 'নিজেকে আমি কাজে ডুবিয়ে দেব। ঐ কাজই ছিল একদিন আমার জীবন।'

মন থেকে সব সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে আদালতে যেত। বন্ধুদের

সঙ্গে কথাবার্তায় যোগ দিত। তাদের মধ্যে বসত—আগের মতই। তার ওক্ কাঠের চেয়ারের হাতল চেপে ধরে বসবার সময় আদালতে জমায়েৎ লোকজনের ওপর দিয়ে অস্পষ্ট ও চিন্তিত একটা দৃষ্টি বুলিয়ে নিত। পাশের লোকের দিকে একটু ঝুঁকে, কাগজপত্রগুলো সরিয়ে, ফিস ফিস করে কথা বলে। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে চোখ তুলে আদালতের কাজ শুরু করবার সুপরিচিত শব্দগুলো উচ্চারণ করত। কিন্তু আদালতের কাজের ঠিক মাঝখানে, মামলাটা ঠিক কোন্ স্তরে আছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে, এক পাশের সেই ব্যথাটা তার পেষাইর কাজটা শুরু করে দেয়। আইভান ব্যথাটায় সামান্যই মনোযোগ দেয়, পরে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এটা তার কাজের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক চলতে থাকে, তাকে চোখে চোখ রেখে সামনে এসে দাঁড়ায় এবং সে হতবুদ্ধি বোধ করে, তার চোখের আলো নিবে যায়। এবং সে আবার নিজেকে জিজ্ঞেস করে, 'এই কি একমাত্র সত্য?' আর তার সহকর্মী ও অধীনস্থ কর্মচারীরা বিস্ময় ও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে বরাবরের উজ্জ্বল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির বিচারক তালগোল পাকিয়ে ভুল করছে। সে মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিজেকে ঠিকঠাক করে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং কোনো রকমে আদালতের প্রসিডিং শেষ করে বাড়িতে ফেরে। তখনও সে বিষণ্ণভাবে সচেতন থাকে যে যে-জিনিসটা সে লুকাতে চায় তা আদালতের প্রসিডিং দিয়ে লুকানো যায় না, কোন আদালতের কাজই এ থেকে তাকে মুক্তি দিতে সমর্থ নয়। আর সব থেকে খারাপ হচ্ছে এই যে এ তাকে কিছু করতে বলে না, কিন্তু সমস্তটুকু মনোযোগ দখল করে, শুধু এর দিকে তাকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করে। সোজা সর্বক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়।

মনের এই ভয়ংকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আইভান অন্য উপায় খুঁজত। অন্য আচ্ছাদন খুঁজত যা ঐ দৃষ্টিটাকে ঢেকে রাখতে পারে। গোড়ার দিকে হয়তো একটু উপকারও পাওয়া যেত। কিন্তু খুব শীগগিরই সে আচ্ছাদন ধ্বসে পড়ে যেত, বা স্বচ্ছ বলে মনে হত, যেন ঐ দৃষ্টিটা সর্বভেদী, এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারে না।

কখনো কখনো সে সেই ড্রইংরুমে যেত, যেটা সাজাতে তাকে খুব খাটতে হয়েছিল ও যেখানে সে পড়ে গিয়েছিল। তিক্ত হেসে এখনও সে ভাবে এই

ঘরের জন্যেই সে জীবন দিয়েছে; কারণ সে নিশ্চিত যে তার অসুস্থতার সূচনা ঐ পড়ে যাওয়া থেকে।

ড্রইংরুমে ঢুকে একদিন দেখল, পালিশ করা টেবিলে একটা দাগ। দাগের কারণটাও খুঁজে পেল—ব্রোঞ্জ-বাঁধানো একটা অ্যালবামের মোচড়ানো একটা ক্লিপ্। অ্যালবামটা তুলল সে। জিনিসটা দামী। সযত্ন ভালবাসায় একদিন সে এ অ্যালবামটা ভর্তি করেছিল। মেয়ে ও তার বন্ধুদের অবহেলায় সে ক্রুদ্ধ হল। ক্লিপটা দুমড়েছে, ভেতরের ছবিগুলোর মাথা নিচের দিকে! সে বসে বসে কষ্ট করে ছবিগুলোকে ঠিক করে সাজালো এবং ক্লিপটা সোজা করল।

অ্যালবাম সহ ছোট টেবিলটাই সরিয়ে একটা কোণে—যেখানে গাছগুলো আছে—সেখানে রাখার পরিকল্পনা তার মাথায় এল। খানসামাকে ডাকল। স্ত্রী এল সাহায্য করতে। তাদের মতান্তর ঘটল। স্ত্রীর এই পরিবর্তনে আপত্তি। আইভান তর্ক করল, রেগে গেল। কিন্তু এসবই খুবই ভাল। কারণ এর ফলে মৃত্যু চিন্তাটা অল্পক্ষণের জন্য ভোলা গেল। ওটা কিছুক্ষণ নজরের আড়ালে গেল।

কিন্তু যখন সে টেবিলটা নিজেই সরাতে শুরু করল, তখন স্ত্রী বলল, 'কোরো না। চাকরবাকরদের করতে দাও। তোমার আবার চোট লেগে যাবে।' আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই চিন্তাটা—সেই দৃষ্টিটা—সব আবরণ ভেদ করে এগিয়ে এল, চোখের সামনে হঠাৎ স্পষ্ট হল। সে আশা করল, ওটা আবার মিলিয়ে যাবে, কিন্তু অনিচ্ছাতেও সে তার একটা পাশে ব্যথাটা বোধ করতে লাগল। একটা কিছু যেন সেখানে রয়েছে, পিষছে এবং সে ভুলতে পারল না। গাছগুলোর আড়াল থেকে সেই দৃষ্টি তার দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে আছে। আর তাহলে এই সব বাজে ঝঞ্ঝাটের কী মানে?

'এ কি সত্য হতে পারে যে, আমি এইখানে আমার প্রাণ হারাব? নিশ্চয়ই না। কী বীভৎস! কী অসম্ভব আজগুবি! এ হতে পারে না। এ হতে পারে না।······কিন্তু এটা তো রয়েছে।'

সে পড়বার ঘরে গেল, শুয়ে পড়ল এবং আবার নিজেকে একা সেটার সঙ্গে দেখল—একেবারে মুখোমুখি। আর তার কিছু করবারও নেই। কিছু না, শুধু এটাকেই ভাবা এবং রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার অবস্থাটা অনুভব করা।

৭

কী ভাবে তা বলা যায় না, কিন্তু কোন এক ভাবে তার অসুস্থতার তৃতীয় মাসে তার স্ত্রী, মেয়ে, ছেলে, ভৃত্যেরা, বন্ধুরা, ডাক্তাররা এবং বিশেষত সে নিজে জানত যে এখন তার সম্পর্কে সবার একমাত্র আগ্রহ,—কত তাড়াতাড়ি সে তার স্থানটিকে শূন্য করবে। তার উপস্থিতি অন্যদের বিব্রত করছে। আর তারও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া দ্রুত দরকার। খুব ধীরে ধীরে, স্পষ্ট বোঝা যায় না এমন ভাবে, ধাপে ধাপে এ চিন্তাটা এল।

ক্রমেই সে কম ঘুমোচ্ছে। তাকে এখন আফিমের কয়েক মাত্রা আর মরফিন ইন্‌জেকশন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাতে কোন সুবিধে হচ্ছে না। প্রথম দিকে অর্ধ-সচেতন অবস্থায় ঘোলাটে ধরনের কষ্টটা এই অর্থে ভাল ছিল যে ব্যাপারটায় এক ধরনের নূতনত্ব ছিল। কিন্তু ক্রমে নূতনত্ব কেটে কষ্টটা আরো বেশি বলে মনে হল।

ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে তার জন্য আলাদা খাবার তৈরি হত। কিন্তু খাবারগুলো তার কাছে আরো বেশি বিস্বাদ ও বিরক্তিকর লাগতে লাগল।

পেট পরিষ্কার রাখার জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটা এক দৈনিক অত্যাচার। অপরিচ্ছন্নতা, অশোভনতা, দুর্গন্ধ এবং ব্যাপারটায় সর্বদাই অন্যের সাহায্য নিতে হত—এই সব মিলিয়ে একটা অত্যাচার। কিন্তু এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থায় একটা সুবিধা হয়েছিল। ছোকরা চাকর গেরাসিম রোজ পট্ নিতে আসত।

গেরাসিম চাষীর ঘরের ছেলে—তাজা ও পরিচ্ছন্ন। এখন শহরের খাদ্যে স্বাস্থ্যবান। সে সব সময়ই খুশী ও প্রাণবন্ত। এই পরিচ্ছন্ন বালকটিকে এই বিরক্তিকর কাজটা করতে দেখে গোড়ার দিকে আইভানের অস্বস্তি হত। একদিন পট্ থেকে ওঠবার সময় সে আরাম কেদারায় পড়ে গেল। এত দুর্বল ছিল যে ট্রাউজার্স টেনে তুলতেও পারল না এবং ভীত ও আর্ত হয়ে নিজের নগ্ন পায়ের ডিমের দিকে চেয়ে রইল—সেখানটার শিথিল মাংস ও চামড়া ঝুলছিল।

সেই মুহূর্তে গেরাসিম এসে ঢুকল। হালকা ও শক্তিমান পদক্ষেপ তার। তার গা থেকে শীতের তাজা বাতাসের গন্ধ বেরোচ্ছিল। তার জুতোয় লেগে ছিল আলকাতারা—তারও একটু গন্ধ বেরোল। তার পরনে ছিল

পরিচ্ছন্ন বাড়িতে তৈরি অ্যাপ্রোন এবং পরিষ্কার সূতী-শার্ট। জামার হাতাটা গোটানো থাকায় তার নবীন সবল বাহু ছিল উন্মুক্ত। আইভান ইলিচের দিকে না তাকিয়ে (সম্ভবত ভীত, তার চোখ মুখ থেকে বিচ্ছুরিত জীবন-আনন্দে প্রভুকে বিদ্রূপ করতে ভীত) সে সোজা পট্-এর কাছে চলে গেল।

'গেরাসিম'। আইভান দুর্বল স্বরে বলল।

গেরাসিম একটু চমকে উঠল। কিছু ভুল করে ফেলেছে এই তার ভয়। খুব দ্রুত সে রোগীর দিকে মুখ ফেরাল। সে-মুখ ছিল তাজা, সরল, সৎ ও নবীন। দাড়ি গজাবার প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার মুখে।

'আজ্ঞে কী?'

'এ কাজটা তোমার নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে। আমায় ক্ষমা কর। আমি নিজে এটা করতে পারি না।'

'আপনি এ কী বলছেন, হুজুর!' তারপর গেরাসিমের চোখ ও দাঁত ঈষৎ স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল দেখাল। 'আপনার জন্যে এটুকু করব না? আপনার অসুখ।'

সবল সক্ষম হাতে সে তার নিয়মিত কাজ করে হালকা পায়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। পাঁচ মিনিট বাদে ঠিক অমনি হালকা পায়ে আবার ফিরে এল।

আইভান তখন আরামকেদারায় শুয়ে আছে।

পরিষ্কার পট্ নামিয়ে রাখবার পর আইভান বলল, 'গেরাসিম, আমাকে একটু ধর্, এদিকে আয়।' গেরাসিম কাছে গেল। 'আমায় একটু তুলে ধর। আমি নিজে উঠতে পারি না, দ্মিত্রিকে বাইরে পাঠিয়েছি।'

ঝুঁকে সবল হাতে, তার পদক্ষেপের মতই হালকা ভাবে ছুঁয়ে, আস্তে ও নিপুণভাবে তাকে তুলল। এক হাতে তাকে ধরে অন্য হাতে ট্রাউজার্স টেনে তুলে দিল। তাকে আবার কেদারায় বসাতে যাচ্ছিল, আইভান বলল তাকে সোফায় বসিয়ে দিতে।

'ধন্যবাদ। কী ক্ষমতা তোর—কী সক্ষম……সব কাজ কী ভাল করে করতে পারিস।'

গেরাসিম ঈষৎ হেসে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে কাছে পেয়ে এত ভাল লাগছিল আইভানের যে সে তাকে যেতে দিল না।

'এখানে—ঐ চেয়ারটা নিয়ে আয়। কিছু মনে করিস না। না, এটা।

আমার পায়ের তলায় দেওয়ার জন্যে। পা-টা তুলে রাখলে একটু আরাম পাই।'

গেরাসিম চেয়ারটা নিয়ে এল—একটা দ্রুত টানে। তারপর চেয়ারটা পরখ করে দেখল ও নিঃশব্দে রেখে আইভানের পা তার ওপর তুলে দিল।

'পা তুলে দিলে একটু আরাম লাগে।' বলল আইভান। 'বালিশটা এনে পায়ের নিচে দিয়ে দে।'

গেরাসিম তাই করল। রোগীর পা তুলে তার নিচে বালিশ দিয়ে দিল।

পা-টা যখন গেরাসিম তুলে ধরল তখন আইভানের ভাল লাগল। নামিয়ে দিতে খারাপ লাগল।

'গেরাসিম, তোর কি এখন কোনো কাজ আছে?'

'না, হুজুর।' কী করে প্রভুদের সম্বোধন করতে হয় তা গেরাসিম শহুরে লোকদের কাছ থেকে শিখেছে।

'আর কী কাজ আছে তোর এখন?'

'না, আর কিছু নেই। কালকের জন্য কিছু কাঠ কেটে টুকরো করা ছাড়া আর সবই করা হয়ে গেছে।'

'আমার পা-টা আগের মত একটু উঁচু করে তুলে ধরবি? একটুখানির জন্যে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, হুজুর।' গেরাসিম পা তুলে ধরল, আর আইভান কল্পনা করল যে এই ভাবে পা-টা রাখায় তার ব্যথাটা একদম চলে গেছে।

'কিন্তু কাঠের কী হবে?'

'ও নিয়ে ভাববেন না হুজুর। ওর জন্যে আমি অন্য সময় পাব।'

আইভান তাকে বসালো। পা-টা ধরে রইল গেরাসিম এবং আইভান তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

এর পর থেকে মাঝে মাঝে সে গেরাসিমকে ডেকে পাঠায়। সে পা ঘাড়ে করে বসে থাকে এবং আইভানের এই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে। গেরাসিম সব কিছুই করে স্বেচ্ছায়, সহজে, সরলভাবে এবং এমন প্রসন্নভাবে যে আইভান অভিভূত বোধ করে। গেরাসিমের ছাড়া অন্য প্রত্যেকের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং ফূর্তির ভাব আইভানের বিরক্তিকর লাগে।

আর গেরাসিমের স্বাস্থ্য ও ফূর্তির ভাবটা বিরক্তির বদলে তার মনে স্নিগ্ধ শান্তি আনে।

অন্যান্য লোকদের মিথ্যে কথায় সে সব চেয়ে কষ্ট পেত। সবাই কোনো কারণে মিথ্যার আশ্রয় নিত। সবাই বলত, সে অসুস্থ মাত্র। বলত না যে সে মরছে। সে যদি চুপচাপ থেকে ডাক্তারের সব কথা মেনে চলে তাহলে সে সেরে উঠবে। সে খুব ভাল করেই জানত যে যাই করা হোক সবই বৃথা। কিছুই বদলাবে না—শুধু তার যন্ত্রণা ক্রমাগত বাড়বে, এবং সে মারা যাবে। এই মিথ্যাটা সবাই একটা অত্যাচারের মত তার ওপরে চালাত। মিথ্যাটা স্বীকার করতে কেউ চাইত না—এই-ই অত্যাচার। সেও জানে, অন্য সবাই জানে সত্যটা। কিন্তু তাও তার অবস্থার ভয়াবহতার জন্য এই মিথ্যেটা লোকে তার ওপরে চাপাত এবং এই মিথ্যাচারে একজন অংশীদার হতে তাকে বাধ্য করত। এই মিথ্যে, মৃত্যুর আগে তার ওপর চাপানো এই মিথ্যে। মৃত্যুর পবিত্র ও ভীষণ কাজটিকে সামাজিক সাক্ষাৎ-কার ও রাতের খাবারের শামুকের স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। এই ব্যাপারটাতে সে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করত। আশ্চর্যের কথা, বহুবার যখন তারা তার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা করে, তার তখন প্রায় চেঁচিয়ে উঠবার ইচ্ছে হয়, 'তোমাদের মিথ্যে কথা বলা বন্ধ কর। তোমরাও জান ও আমিও জানি যে, আমার মৃত্যু খুব কাছে। তোমরা অন্তত মিথ্যে কথাটা বন্ধ কর।' কিন্তু এ কাজটা করার সাহস তার ছিল না। সে বেশ বুঝতে পারত যে তার মরার ভয়ংকর কাজটা আকস্মিক এক অপ্রীতিকরতার স্তরে নিয়ে আসা হয়েছে। যেন এক ধরনের শালীনতা-ভঙ্গ (ড্রইংরুমে ঢুকে দুর্গন্ধ-ছড়ানো লোকের সঙ্গে যেমন, তেমনি তার সঙ্গে ব্যবহার করল)—'সৌজন্য'-ভঙ্গ, যে-সৌজন্যের প্রতি সে সারাজীবন দাসখৎ লিখে দিয়েছে। সে দেখল যে, কেউ তার জন্য দুঃখ বোধ করছে না, কারণ কেউই তার পরিস্থিতিটা বুঝতে সচেষ্ট নয়। একমাত্র লোক যে বুঝত এবং দুঃখ বোধ করত, সে হচ্ছে গেরাসিম। এই জন্যে আবার, যে একটি লোকের সঙ্গে আইভান থাকতে পছন্দ করে সে হচ্ছে গেরাসিম; কিছুক্ষণ গেরাসিম তার কাছে বসলেই সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। অনেক সময় পা ঘাড়ে রেখে রাতে বিছানায় শুতে যায় নি সে এবং সারা রাত এই ভাবে জেগে কাটিয়েছে। সে বলত, 'এ নিয়ে ভাববেন না। আমি পরে ঘুমোব।' অথবা, যখন আইভানকে সে বলত, 'আপনার দেখাশুনো আমি করব না কেন? আপনার এখন অসুখ করেছে।' তখন বোঝা যেত যে একমাত্র গেরাসিমই মিথ্যে কথা বলে না।

সে যা কিছু করত, তার সব কিছুতে স্পষ্ট ছিল যে সে-ই একমাত্র প্রকৃত অবস্থাটা বোঝে এবং তা লুকোবার দরকার বোধ করে না। সে শুধু এই হতভাগ্য মুমূর্ষু মনিবের জন্য দুঃখবোধ করে। একদিন আইভান যখন তাকে সরিয়ে দিল, সে মনিবকে খুব খোলা মনে বলল, 'একদিন না একদিন আমরা সবাই মারা যাব। আজ আমি আপনাকে সাহায্য করব না কেন?' এ কথার পরে সে বলল যে আইভানের সেবা তার কাছে বিরক্তিকর নয়, কারণ সে এটা করছে একজন মরণাপন্ন লোকের জন্য এবং যখন তার এই সময় আসবে তখন তার জন্যেও কেউ এ রকম করবে।

মিথ্যা ও তার আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলির পরে আইভানের দ্বিতীয় যন্ত্রণার বিষয় হচ্ছে—কেউ তার জন্য দুঃখবোধ করে না, যা করলে তার ভাল লাগত। দীর্ঘ যন্ত্রণার পরে এমন অনেক মুহূর্ত আসত যখন সে সবচেয়ে বেশি চাইত, স্বীকার করতে লজ্জিত হলেও চাইত দুঃখমিশ্রিত সমাদর—ঠিক রুগ্ন শিশুর মত। সে চাইত আদর, চুম্বন, ক্রন্দন—যেমন রোগা শিশুরা চায়। সে জানত যে, সে আদালতের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, তার দাড়ি পাকছে এবং তাই এ সব একেবারে অসম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে এই চাইত।

গেরাসিমের সঙ্গে সম্পর্কের গতি এই দিকে ছিল, তাই গেরাসিমে তার এত স্বস্তি। আইভান কাঁদতে চাইত। চাইত—তার গায়ে কেউ হাত বুলিয়ে দিক, তার জন্য কেউ কাঁদুক। কিন্তু ঐ তার সহকর্মী শেবেক আসছে তাকে দেখতে। আদালতের এই সদস্যের কাছে ক্রন্দন ও স্বস্তি প্রার্থনা করার বদলে গম্ভীর বিচক্ষণ চেহারায় নিছক জড়গতির বশে কোর্ট অব অ্যাপীলের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব সম্পর্কে তার মতামত দেয় এবং একগুঁয়ে ভাবে তার স্বপক্ষে বলতে থাকে।

তার নিজের ভেতরকার মিথ্যা ও তার আশপাশের মিথ্যা, এই দুই বিষ আইভানের শেষ দিনগুলোকে বিষাক্ত করতে লাগল—এমন বিষাক্ত আর কোনো বিষই করে নি।

॥ ৮ ॥

সকাল হল। সকাল হওয়ার একমাত্র চিহ্ন—গেরাসিম বাইরে চলে যায়, আর খানসামা পিওতর ভেতরে এসে বাতি নেবায়, একটা জানলায়

পর্দা টেনে দেয় ও নিঃশব্দে ঘর পরিষ্কার করতে হাত লাগায়। সকাল বা রাত্রি, শুক্রবার বা রবিবার কোন তফাৎ নেই, একেবারে এক রকম, সেই পেষণ, মুহূর্ত-বিরতিহীন তীব্র কষ্টদায়ক যন্ত্রণা ; জীবন অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলে যাচ্ছে, কিন্তু এখনও যায় নি—এই চেতনা ; একমাত্র বাস্তব, ঘৃণ্য মৃত্যু ধীরে কিন্তু একগুঁয়ে ভাবে তার ওপরে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে—এই চেতনা ; আর তারপর—সেই মিথ্যা। দিন, সপ্তাহ বা ঘন্টার কী চিন্তা আসবে ?

'আপনাকে চা দেব, হুজুর ?'

('লোকটার ওপর নিশ্চয়ই হুকুম আছে। সকালে বাড়ির সবাই চা খায়।' ভাবল আইভান।)

'না।' সে বলল।

'আপনি সোফায় গিয়ে বসবেন, হুজুর ?'

('লোকটা বোধহয় ঘর পরিষ্কার করবে, আর আমি মূর্তিমান বাধা, আমি ঘরটা নোংরা করে রাখছি, বিশৃঙ্খল করে রেখেছি।' ভাবল আইভান।)

'না। আমায় একা থাকতে দাও।' বলল সে।

খানসামা আর একটু কাল ঘরের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখল। আইভান হাতটা বাড়িয়ে দিল। পিওতর এগিয়ে এল।

'কী, হুজুর ?'

'আমার ঘড়িটা।'

ঘড়িটা আইভানের নাগালের মধ্যেই ছিল। পিওতর সেটা তুলে তার হাতে দিল।

'সাড়ে আটটা। অন্যরা কি উঠেছে ?'

'না, এখনও নয়, হুজুর। ভাসিলি আইভানভিচ (পুত্র) স্কুলে গেছে, আর প্রাসকভিয়া ফিওদরভনা হুকুম দিয়ে রেখেছেন আপনি বললে ওঁকে ডেকে দিতে। আমি কি ওঁকে ডাকব হুজুর ?'

'ও নিয়ে মাথা ঘামিও না।' ('আমার বোধহয় একটু চা খেলে ভাল হত।' ভাবল সে) 'আমায় একটু চা দাও।'

পিওতর দরজার দিকে এগোল। একা থাকতে হবে এই আশংকায় ভীত হল আইভান। ('ওকে রাখার জন্যে কী করতে পারি আমি ? ও, হ্যাঁ, আমার ওষুধ।')

'পিওতর, আমার ওযুধটা দাও।' ('কেন নয়? এতে সত্যি ভাল হতে পারে।') সে এক চামচ নিল। ('না, এতে কিছু হয় না। বাজে সব। আত্মপ্রতারণা।' মুখে সেই পরিচিত মিষ্টি-মিষ্টি অপদার্থ স্বাদটা সম্পর্কে সচেতন হতেই সে সিদ্ধান্ত করল। 'আমি এ সবে আর বিশ্বাস করি না। কিন্তু কেন, ওঃ, কেন আমাকে এই কষ্টটা সইতে হবে? যদি এক মিনিটের জন্যেও রেহাই পেতাম!') তার একটা কাতরানির শব্দ বেরোল মুখ দিয়ে। পিওতর ফিরে এল।

'না। যাও। আমার জন্য চা নিয়ে এসো।'

পিওতর বেরিয়ে গেল। একা পড়ে রইল আইভান। যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল সে এখন। কিন্তু একটা হতভাগ্য দুঃখকর অবস্থায় পড়ে কষ্টও হতে লাগল। 'একই ব্যাপার, চলছে, চলছে। একই রকমের অন্তহীন সব দিন ও অন্তহীন রাত। যদি শুধু সেটা তাড়াতাড়ি আসত! কোন্‌টা? মৃত্যু, অন্ধকার। না, না! মৃত্যুর চেয়ে আর সব ভাল।

যখন পিওতর প্রভাতী খাবারের ট্রে নিয়ে ফিরল, তখন আইভান কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে—বুঝতেই পারছে না ও লোকটা কে, ও কী চায়! তার বিচলিত ভাবটায় আইভানের সম্বিৎ ফিরল।

সে বলল, 'ও হ্যাঁ, চা। ভাল। এখানে রাখ। আমি একটু হাতমুখ ধোব—তোমায় একটু সাহায্য করতে হবে। আর একটা পরিষ্কার শার্ট দিতে হবে।'

নিজেই আইভান ধুতে আরম্ভ করল। মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে নিয়ে সে দাঁত ব্রাশ করল, হাত-মুখ ধুলো, চুল আঁচড়ালো এবং আয়নায় নিজের দিকে তাকাল। সে আঁতকে উঠল। তার ফ্যাকাশে কপালের ওপর তার ছোট ছোট চুল এসে পড়েছে—তাই দেখেই তার ভয় হল। যখন শার্ট বদলে দেওয়া হচ্ছিল, তখন সে জানত যে সে তার দেহের দিকে তাকালে আরো বেশি আতংকিত হয়ে পড়বে, তাই সে তাকালো না। অবশেষে সব হয়ে গেল। একটা ড্রেসিং গাউন পরে পায়ে কম্বল চাপা দিল। চা খাওয়ার জন্য বসল আরাম-কেদারায়। ঠিক এক মুহূর্তের জন্য সে একটু তাজা বোধ করেছিল। কিন্তু যেই সে চায়ে চুমুক দিল অমনি সে তার ব্যথা ও মুখের সেই স্বাদটা সম্পর্কে সচেতন হল। সে জোর করে চা খেল,

তারপর সে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ে, সে পিওতরকে চলে যেতে বলল।

আবার সব কিছুর পুনরাবৃত্তি। এক মুহূর্তে এক বিন্দু আশার ক্ষীণ আলো, পরের মুহূর্তে হতাশার ক্ষুব্ধ সমুদ্র। আর সব সময়েই এই যন্ত্রণা এই যন্ত্রণা, এই কষ্ট, চলছে, চলছে। একা থাকলে কষ্টটা আরো অসহ্য। সে তখন কাউকে ডাকতে চায়। কিন্তু সে আগে থাকতেই জানে যে সেটা আরো খারাপ হবে। 'যদি ওরা আবার আমায় মরফিন দেয়, তাহলে আমি ভুলতে পারি। ডাক্তারকে একটা কিছু করতে বলব। এ অসম্ভব, অসম্ভব।'

এক ঘন্টা, আরেক ঘন্টা, এই ভাবে কেটে গেল। ঢোকবার মুখে হল্-এ ঘন্টা বাজল। বোধহয় ডাক্তার। হ্যাঁ, ডাক্তার—তাজা, মোটা, কর্মশক্তি-সম্পন্ন, খুশী-মেজাজ। তার মুখের ভাবটা যেন সর্বদা বলছে, 'চলে এসো। কিছু একটার জন্য তুমি ভয় পাচ্ছ। আমরা এক তুড়িতে সব ঠিক করে দেব।' ডাক্তার জানত যে এ ভাবটা এখানে অনুপযোগী, কিন্তু ভঙ্গীটা চেহারায় একবার এনেছে তো চিরকালের মতই এনেছে। আর বদলাতে পারে না। সকালে রোদে বেরোবার আগে গায়ে চাপানো ফ্রক কোটটা যেমন আর খুলতে পারে না তেমনি।

ডাক্তার জোরালো ভাবে হাত দুটো ঘষল।

'আমার শীত করছে। ভয়ংকর ঠাণ্ডা। এক মিনিট সবুর করুন—একটু গরম হয়ে নি।' ডাক্তারের গলার স্বরটায় এই ইঙ্গিত রয়েছে যে এই অপেক্ষা করাটা খুব দরকার, আর তার পরেই সে সব ঠিক করে দেবে।

'আচ্ছা, আপনি কেমন বোধ করছেন?'

আইভান নিশ্চিত যে ডাক্তার এই ধরনের প্রশ্ন করতে চাইছিল। 'কী, পেটের অবস্থা কী' কিন্তু সেটা বড়ই ভাঁড়ামির মত শোনাবে, তাই বলল, 'কালকের রাত কেমন কেটেছে?'

আইভান ডাক্তারের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো যার মানে দাঁড়ায়, 'তুমি কি মিথ্যে বলতে কোন দিনই লজ্জিত হবে না?' কিন্তু ডাক্তার বুঝতে চায় না।

আইভান বলল, 'সেই একই ভাবে কেটেছে রাত। বীভৎস। ব্যথাটা কখনো থামে না, কখনো কমে না, আমাকে যদি তেমন একটা কিছু দাও!'

বেশ, বেশ। সব রোগীই সমান দেখছি।......আচ্ছা, এখন একটু গরম হয়েছি মনে হচ্ছে। এখন আমার টেম্পারেচার নিখুঁত—কি প্রাসকভিয়া ফিওদরভনাও এখন কোনো খুঁত বার করতে পারবেন না—যদিও তিনি এ সব ব্যাপারে খুব কড়া। আচ্ছা, সুপ্রভাত।' ডাক্তার তার করমর্দন করল।

সব চপলতা সরিয়ে ডাক্তার গম্ভীর হয়ে রোগীকে পরীক্ষা শুরু করল। নাড়ী দেখল, তাপ দেখল, বুক বাজাল, হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন শুনল।

আইভান নিশ্চিত ও প্রশ্নাতীত ভাবে জানত যে এগুলো সব বাজে ব্যাপার, শূন্য প্রতারণা। কিন্তু ডাক্তার যখন তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে কান পাতল, কখনো নিচে, কখনো ওপরে এবং গম্ভীর মুখ সব রকম করে কোঁচকাতে শুরু করল, তখন আইভান তার প্রভাবে পড়ল, যেমন সে উকিলদের বক্তৃতার প্রভাবাধীন হত—উকিলরা মিথ্যে বলছে এবং কেন বলছে তা খুব ভাল করে জানা সত্ত্বেও।

ডাক্তার তখনও সোফায় হাঁটু গেড়ে বসে তার বুক ঠুকছে, এমন সময় দরজায় সিল্কের খসখস শব্দ ভেসে এল এবং শোনা গেল ডাক্তারের আসার খবর তাকে না দেওয়ার জন্য প্রাসকভিয়া পিওতরকে বকছেন।

সে ভেতরে এসে স্বামীকে চুম্বন করল। আর তৎক্ষণাৎ ব্যাখ্যা করতে শুরু করল যে সে অনেক আগেই উঠেছে এবং ঠিক বুঝতে পারে নি বলেই ডাক্তার আসার সময় সে রোগীর ঘরে আসতে পারে নি।

আইভান তার দিকে তাকাল, তার চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখল এবং তার ঘৃণা হল স্ত্রীর শুভ্রতায়, পুষ্টতায়, বাহু ও কাঁধের পরিচ্ছন্নতায়, চুলের ঔজ্জ্বল্যে, চোখের প্রাণবন্ত দীপ্তিতে। তার সত্তার প্রতিটি সত্তা তাকে ঘৃণা করছিল। যতবার সে তাকে ছুঁলো, ততবার তার ঘৃণায় জোয়ার এল।

তার প্রতি ও তার রোগের প্রতি প্রাসকভিয়ার মনোভাব কিছু বদলায় নি। এই ডাক্তারের যেমন রোগীদের সম্পর্কে একটা অপরিবর্তনীয় মনোভাব আছে, ঠিক সেই রকম মনোভাব তার আইভানের প্রতি, অর্থাৎ যা আইভানের করা উচিত নয়, তাই সে করছে, সুতরাং তার এই অবস্থার জন্যে তারই দোষ, এবং প্রাসকভিয়ার একমাত্র কাজ সপ্রেম ভাবে তাকে সংশোধন করা। এই মনোভাব সে বদলাতে পারে নি।

'আইভান মোটেই শুনবে না। সে তার ওষুধ নিয়মিত খায় না। আর

সব চেয়ে খারাপ, শূন্যে পা তুলে সে এমন একটা ভঙ্গিতে শোয় যেটা তার শরীরের পক্ষে খারাপ।'

গেরাসিমকে আইভান ঐ পা জোড়া ধরে থাকতে বলেছিল—সে বিবরণ দিল সে।

ডাক্তার প্রসন্ন স্মিত সম্মতি জানাল। কী করা যাবে? আমাদের এই সব রোগী সব সময়ই অদ্ভুত কৌশলের কথা ভাবে। কিন্তু আমাদের এদের ক্ষমা করতে হবে।

রোগীর পরীক্ষা সেরে ডাক্তার ঘড়ি দেখল। তখন প্রাসকভিয়া ঘোষণা করল যে আইভান পছন্দ করুক বা না করুক, একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসককে সে আজ আসতে বলেছে এবং তিনি ও মিখাইল দানিয়েলভিচ (সাধারণ এই ডাক্তারটির নাম) দুজনে একসঙ্গে তাকে পরীক্ষা করবেন ও পরামর্শ করবেন।

'দয়া করে প্রতিবাদ কোরো না। এ আমি করছি আমার জন্য।' বক্রভাবে সে বলল কথাটা, অর্থাৎ তাকে জানাল যে এটা সে করছে আইভানের জন্য এবং তাকে প্রতিবাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যেই কথাটা ও-ভাবে ঘুরিয়ে বলল। আইভান ভ্রূকুটি করল। কিছু বলল না। সে জানত যে সে এমন মিথ্যার একটা জালে ধরা পড়েছে যে এখন মিথ্যা ও সত্য আলাদা করাও অসম্ভব। প্রাসকভিয়া আইভানের জন্যে যা করে সব কিছু আসলে তার নিজের জন্যেই করে। এখানেও সে কথা সত্য। কিন্তু কথাটা বলল এমন সুরে যে এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য এবং আইভানকে তা উলটো অর্থেই নিতে হবে।

সাড়ে এগারোটার সময় সত্যিই সুবিখ্যাত ডাক্তার এসে পৌঁছলেন। আবার তার উপস্থিতিতে শব্দ করা আর ভারী ভারী কথা বলা চলল। পাশের ঘরে কিড্‌নী ইত্যাদি নিয়ে গম্ভীর মুখে আলোচনা চলল। আইভানের কাছে এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন। এদের কাছে বেচাল কিড্‌নির প্রশ্ন। উভয়ে একমত হয়ে পূর্ব চিকিৎসা বহাল রাখলেন।

গম্ভীর কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশ নয়, এমন মুখে বিখ্যাত ডাক্তার বিদায় নিলেন। তখন ভয় ও আশার চোখে তাকিয়ে ভীতভাবে সুবিখ্যাত ডাক্তারকে সে জিজ্ঞেস করল যে তার সারবার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না। তিনি উত্তর দিলেন, তিনি নিশ্চিত নন, তবে সম্ভাবনা আছে।

ডাক্তার যখন বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন আইভানের চোখ তাকে অনুসরণ করল। সে-চোখের আশার আলো এত মর্মস্পর্শী ছিল যে পড়ার ঘরে গিয়ে বিখ্যাত ডাক্তারকে ফি দেওয়ার সময় প্রাসকভিয়া ভেঙে পড়ল।

ডাক্তারের সম্ভাবনার কথা তাকে উৎসাহিত করল। কিন্তু দীর্ঘকালের জন্যে নয়। আবার সেই এক ঘর, এক ছবি। পর্দা, দেওয়ালের কাগজ, ঘরের টুকিটাকি—সব এক। এক যন্ত্রণা, এক ব্যথাতুর দেহ। আইভান কাতরাতে আরম্ভ করল। একটা ইংজেকশন দেওয়ার পর—বিস্মৃতির একটা অবস্থায় এল মনটা।

এই অবস্থা যখন কাটল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। তাকে খাবার দেওয়া হল। সে খুব চেষ্টা করে একটু স্যুপ খেল। আবার সব এক। আবার রাত।

সাতটার সময় প্রাসকভিয়া সান্ধ্য পোশাক পরে তার পূর্ণ বক্ষ লেসে আবৃত করে ও মুখে পাউডার মাখার চিহ্ন ছড়িয়ে আইভানের ঘরে এল। সকালে সে বলেছিল যে তারা সন্ধ্যায় থিয়েটার দেখতে যাবে। সারা বার্নহার্ড্‌ট্ শহরে এসেছেন এবং আইভানেরই জোরাজুরিতে বক্‌সের টিকিট নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইভান এখন সে সব ভুলে গেছে এবং প্রাসকভিয়ার এই ব্যাপক প্রসাধনে সে আহত হল। সে সেটা গোপন করল। তার মনে পড়ল, সে নিজেই বিশেষ করে বক্‌সের টিকিট কিনতে বলেছিল, কারণ তার মনে হয়েছিল, সন্তানদের পক্ষে শিল্পসৌন্দর্যের আনন্দের একটা শিক্ষা-মূল্য আছে।

প্রাসকভিয়া ভেতরে এল। দেখলে মনে হয় নিজেকে নিয়ে বেশ খুশী। অবশ্য একটুখানি অপরাধী-ভাবও আছে। সে বসল। জিজ্ঞেস করল, আইভান কেমন্ বোধ করছে। শুধু প্রশ্নের জন্যেই প্রশ্ন, বেশ দেখতে পেল আইভান। কিছু সত্যিই প্রাসকভিয়া জানতে চাইছিল তা নয়, কারণ কিছুই জানবার নেই। তারপরে যা বলার দরকার তাই সে বলল। সে যাওয়ার কথা ভাবতও না, যদি না বক্‌সের টিকিট কাটা হয়ে থাকত এবং ইলেন, তাদের মেয়ে ও প্রেত্রিশ্চেভ (কন্যার প্রেমিক, একজামিনিং ম্যাজিস্ট্রেট) যদি না যেত এবং সে তাদের একা ছাড়তে পারে না। কিন্তু ঘরে সে আইভানের সঙ্গে বসে থাকতেই পছন্দ করে এবং তার বাইরে থাকার সময় সে যেন ডাক্তার-নির্দেশিত করণীয়গুলি ঠিক মত করে।

'আর ফিওদর পেত্রোভিচ্ (কন্যার প্রেমিক) তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সে কি আসবে? আর লিজাও।'

'আসুক।'

বোয়েবোবার সাজপোশাক পরে মেয়ে এল। পোশাকে তার তরুণ দেহের অনেকটাই অনাবৃত। তরুণ দেহ প্রদর্শনের জন্যেই এই পোশাক! আর আইভানের দেহ এমন প্রচণ্ড যন্ত্রণার কারণ। মেয়ে স্বাস্থ্যবতী, সবলা। খুবই প্রেমে পড়ে আছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে। মেয়ের সুখশান্তির ওপরে তার রোগ, কষ্টভোগ ও মৃত্যুর কালো ছায়া পড়বে—এই চিন্তায় সে বিরক্ত হল।

ফিওদর পেত্রোভিচ সান্ধ্য পোশাক পরে এসেছে। তার চুল কোঁকড়ানো। তার লম্বা শক্ত ঘাড় ঘিরে আছে সাদা কড়া কলার। তার বুক ঢেকে আছে সাদা শার্ট-ফ্রন্ট। তার সবল পা সরু কালো ট্রাউজার্সে আবৃত। এক হাতে এক দস্তানা পরা। অন্য হাতে একটা অপেরা হ্যাট্।

তার পেছনে আইভানের ছেলে। স্কুলে পড়ে। অলক্ষ্যে ঢুকে এসেছে। নতুন ইউনিফর্ম পরা। হতভাগ্য ছেলে। হাতে দস্তানা। চোখের কোলে কালো দাগ—যার মানে আইভান জানে।

সে সব সময়েই ছেলের জন্য দুঃখবোধ করেছে। বালকের এখনকার ভীতি ও করুণার দৃষ্টির মধ্যে ভয়াবহ একটা কিছু দেখতে পাচ্ছে। আইভান অনুভব করল, গেরাসিম ছাড়া একমাত্র ভাসিয়া তাকে বোঝে এবং তার প্রতি তার সহানুভূতি আছে।

তারা সবাই বসে আবার জিজ্ঞেস করল, সে কেমন বোধ করছে। একটা বিরতি। লিজা অপেরা-গ্লাসের কথা তার মাকে জিজ্ঞেস করল। বেঠিক জায়গায় রাখা হয়েছে জিনিসটা এবং কে রেখেছে এই নিয়ে মা ও মেয়েতে ছোট একটা ঝগড়া হয়ে গেল। বড় বিরক্তিকর।

ফিওদর আইভানকে জিজ্ঞেস করল, সে কোনো সময়ে সারা বার্নহার্ডট্‌কে দেখেছে কি না। প্রথমে আইভান প্রশ্নটা বুঝতে পারল না। তারপরে সে বলল, 'না। তুমি দেখছ?'

'হ্যাঁ। আদ্রিয়েন লেকুভ্রেয়ারে।'

প্রাসকভিয়া বলল, সারা বিশেষ মনোহারিণী। কন্যা আপত্তি করল। সারার অভিনয়ের মনোহারিতা এবং স্বাভাবিকতা বিষয়ে তখন একটি আলোচনা শুরু হল এবং ঐ সম্পর্কে সর্বদা যা বলা হয়ে থাকে, তাই বলতে লাগল।

আলোচনার মধ্যেখানে ফিওদর আইভানের দিকে তাকাল এবং কথা

বন্ধ করল। অন্যরাও তার দিকে এখন তাকাল এবং চুপ করল। আইভান তীব্র চোখে তাকিয়েছিল। তার বিরূপতা সে ঢাকতে পারছিল না। কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কিছুই করা গেল না। নীরবতাটা ভাঙতে হবে। কিন্তু কেউ সে সাহস করল না। তারা সবাই ভয় পেতে লাগল, সৌজন্যের খাতিরে যে মিথ্যাকে লালন করা হচ্ছে সেটা হঠাৎ ফুটে বেরোতে পারে, এবং সব কিছু তাদের সত্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। লিজাই প্রথমে সাহস সঞ্চয় করল। সে নীরবতা ভঙ্গ করল। সবাই যা বোধ করছে সেটা লুকোবার জন্য সে এটা করল। কিন্তু তার পরিবর্তে বরং সেটাই উচ্চারিত হয়ে উঠল।

'আচ্ছা, যদি আমরা যাই, তাহলে আমাদের উঠতে হয়।' ঘড়ি দেখে সে বলল। ঘড়িটা তার বাবার দেওয়া উপহার। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে একটু হাসল। হাসিটা তাব যুবক প্রেমিকের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেটা প্রায় বোঝাই যায় না। তাৎপর্যটুকুও মাত্র তারা দুজনেই বুঝল। তারপর সে সিল্কের খসখস শব্দ করে উঠল।

তারা সবাই উঠে বলল—বিদায়। তারপর চলে গেল।

তাদের চলে যাওযার পর আইভান যেন ভাল বোধ করল। অন্তত মিথ্যা চলে গেল—ওদের সঙ্গে।

কিন্তু ব্যথাটা রয়ে গেল। সেই পুরানো ব্যথা। সেই পুরনো ভয—তাতে কিছুই কঠিনতর বা সহজতর হল না। ব্যথাটা বাড়তে লাগল।

আবার সময় অতি মন্থর গতিতে চলতে লাগল—মিনিটের পর মিনিট, ঘন্টাব পর ঘন্টা, ঠিক আগের মত, কোন শেষ নেই কিন্তু নিশ্চিত পরিসমাপ্তিব আতংক তার মনের ওপর ক্রমেই জমছে।

হ্যাঁ, গেরাসিমকে পাঠিয়ে দাও।' পিওতরের প্রশ্নেব উত্তরে সে বলল।

৯

স্ত্রী যখন ফিরল তখন অনেক রাত। সে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল, কিন্তু আইভান শুনতে পেল। সে চোখ খুলল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার বন্ধ করল। গেরাসিমকে বাইরে পাঠিয়ে স্ত্রী তার পাশে বসতে চাইছিল। কিন্তু আইভান চোখ খুলে বলল, 'না, চলে যাও।'

'তুমি কি ভয়ংকর কষ্ট পাচ্ছ?'

'সে কিছু নয়।'

'একটু আফিং খাও।'

সে রাজী হয়ে আফিং পান করল। স্ত্রী বাইরে গেল।

সকাল তিনটে পর্যন্ত সে যন্ত্রণায় অর্ধ-অচেতন অবস্থায় কাটাল। তার মনে হল তাকে যেন কারা সংকীর্ণ একটি কালো থলের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। তারা গভীরে, আরো গভীরে তাকে ঠেলছে, কিন্তু একেবারে তলা পর্যন্ত ঢোকাতে পারছে না। আর এই ভয়ংকর কাজটি তার যন্ত্রণার কারণ। তার ভয় করছিল, কিন্তু সে থলের মধ্যে ঢুকতেও চাইছিল। একই সঙ্গে সে বাধাও দিচ্ছিল, আবার ঢুকতেও চাইছিল। হঠাৎ সে ভেঙ্গে পড়ল এবং জেগে উঠল। বিছানার পায়ের কাছে তখনো গেরাসিম বসে আসে। ধৈর্যে সঙ্গে বসে আছে। নিঃশব্দে একটু ঝিমোচ্ছে। ছেলেটির কাঁধে শীর্ণ মোজা-পরা পা তুলে আইভান শুয়ে আছে। শেডের আড়ালে মোমবাতিটা তখনো জ্বলছে। তখনো ব্যথাটা রয়েছে তার সঙ্গে।

'শুতে যা, গেরাসিম।' ফিসফিস স্বরে বলল।

'ঠিক আছে, হুজুর। আর খানিকক্ষণ থাকি।'

'না। চলে যা।'

আইভান তার পা নামিয়ে নিল। পাশ ফিরে গালে হাত দিয়ে শুলো। আর নিজেকেই করুণা করতে লাগল। গেরাসিম পাশের ঘরে চলে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। তারপর সে শিশুর মত কাঁদতে লাগল। সে কাঁদল নিজের অসহায়তায়, নিজের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতায়, মানুষ ও ঈশ্বরের হৃদয়হীনতায়, কাঁদল ঈশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য।

'ঈশ্বর, তুমি ঐ সব কেন করেছ? কেন তুমি আমায় এ পৃথিবীতে এনেছিলে? কী, ওঃ আমি কী করেছি যে তুমি আমায় এইভাবে পীড়ন করবে?'

সে কোনো উত্তর প্রত্যাশা করে নি এবং সে কাঁদল উত্তর পেল না বলে, উত্তর হতে পারে না বলে। আবার ব্যথাটা শুরু হল, কিন্তু সে নড়ল. না, কাউকে ডাকল না। সে শুধু নিজেকে বলল, 'খুব ভাল, আবার আমায় আঘাত কর। আরো জোরে। কিন্তু কীসের জন্যে? আমি তোমার কী করেছি?'

তারপর সে শান্ত হল। শুধু কান্নাটা থামল তাই নয়, নিশ্বাসও বন্ধ

করল এবং মনটাকে কেন্দ্রীভূত করল। তার মনে হল সে কোনো বাইরের উচ্চারিত স্বর শুনছে না, শুনছে তার আত্মার নীরব স্বর। শুনছে তার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ভাবনাস্রোতের ধ্বনি।

'তুমি কী চাও?' ভাষায় প্রকাশ করবার মত যথেষ্ট পরিষ্কার এই প্রথম চিন্তাটা। 'কী চাও? তুমি কী চাও?' সে নিজেকে বারবার বলল। 'কষ্ট পেতে নয়, বাঁচতে চাই।' উত্তর দিল সে।

আবার একবার সে মনকে সংহত করল। এত কঠিন সেই সংহতি যে তার সেই যন্ত্রণাও তাকে বিচলিত করতে পারল না।

'বাঁচব? কী ভাবে বাঁচব?' তার আত্মার স্বর বলল।

'আগের মত করে বাঁচব। একটি ভাল, আনন্দদায়ক জীবন।'

'তোমার জীবন কি আগে এত ভাল ও আনন্দদায়ক ছিল?' সেই স্বর প্রশ্ন করল। সে তখন তার আনন্দময় জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিকে মনে আনতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, আনন্দময় জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি আর ঠিক আগের মত শ্রেষ্ঠ বলে মনে হল না। বাল্যের আদিতম স্মৃতি ছাড়া সবেরই দশা ঐ। শৈশবের এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যা সত্যিই আনন্দময়। সেই দিনগুলো ফিরে এলে তার জন্য বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু এই আনন্দ যে পেয়েছে সে আর এখন নেই। সে যেন অন্য কারো স্মৃতিকে মনে করছে।

যেই তার স্মৃতিগুলি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হল যে আজকের আইভানে রূপান্তরিত, অমনি তার সংহত মনোযোগের মধ্যে অতীতের আনন্দময় ঘটনাগুলো গুঁড়িয়ে মিলিয়ে গেল এবং সেগুলিকে মূল্যহীন অপদার্থ, এমন কি বিরক্তিকর মনে হল।

যত শৈশব থেকে দূরে চলে যেতে লাগল এবং বর্তমানের কাছাকাছি আসতে লাগল, ততই তার আনন্দগুলিকে আরো বেশি করে মূল্যহীন ও সন্দেহজনক বলে মনে হতে লাগল। আইন-শিক্ষালয় থেকে এর শুরু। সেখানে অনেক জিনিস দেখেছে যা সত্যিই ভাল। খুশীভাব, বন্ধুত্ব, আশা। কিন্তু যত ওপরের ক্লাসে উঠতে লাগল, তত ভাল জিনিসগুলো ক্রমেই খুব কমে যেতে লাগল। পরে, গভর্নরের সেক্রেটারীর চাকরীর প্রথম বছরে সে আবার কিছু ভাল জিনিস পেয়েছিল। এর বেশির ভাগ তার প্রেমে পড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। তারপর তার জীবন হয়েছে জটিল এবং ভাল জিনিস কমে

গেছে। পরে ভালোর পরিমাণ আরো কমে গেল। আরো এগোতে আরো কমে গেল।

তার বিয়ে—এই রকম একটা হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া বিয়ে এবং মোহভঙ্গ, এবং তার স্ত্রীর নিশ্বাসের গন্ধ, ইন্দ্রিয়পরতা এবং ভণ্ডামি! তার ঐ প্রাণহীন পেশা! এবং টাকার জন্যে উদ্বেগ—বছরের পর বছর, এক বছর, দুই, দশ, কুড়ি, কোনো পরিবর্তন নেই এর। যত দীর্ঘ হচ্ছিল কালটা, তত প্রাণহীন হয়ে পড়ছিল সব কিছু। 'যেন আমি একনাগাড়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামছিলাম, যখন আমি ভাবছিলাম যে আমি উঠছি। হ্যাঁ, এই রকমই ছিল ব্যাপারটা। আমার বন্ধুদের মতে, আমি উঠছিলাম, কিন্তু আমার পায়ের তলায় তখন জীবন ভেঙ্গে-দুমড়ে পড়ছিল। আর এখন এইখানে আমি, মৃত্যুপথযাত্রী।

'কী ঘটছে? কেন? অবিশ্বাস্য। আমার জীবন যে এত বিরক্তিকর ও অর্থহীন হবে তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যদি এত বিরক্তিকর ও অর্থহীন, তবে আমায় কেন মরতে হবে এবং এই উদ্বেগের মৃত্যু? কোথাও একটা কিছু ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই।

'ঠিক যে ভাবে আমার বাঁচা উচিত ছিল, সে-ভাবে আমি বাঁচি নি বোধহয়?' এই চিন্তাটা তার মাথায় এল। 'কিন্তু তা হতে পারে না। ঠিক যেভাবে যা করা উচিত, সব আমি ঠিক সেই ভাবে করেছি।' এটাকে একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করে, জীবন ও মৃত্যুর সমস্ত সমস্যার সামনে মুহূর্তে এই একটি উত্তরকে দাঁড় করিয়ে দিল।

'এখন তুমি কী চাও? বাঁচতে? কেমন করে বাঁচতে?

'যেন তুমি আদালতে, ঘোষক চেঁচিয়ে ঘোষণা করছে, "মহামান্য বিচারক আসছেন।" বিচারক আসছেন, বিচারক আসছেন—' বারবার উচ্চারণ করল সে। 'এই যে এখানে তিনি—মহামান্য বিচারক। কিন্তু আমাকে দোষ দেওয়া চলে না।' সে ক্রুদ্ধ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

'আমার কী দোষ?' দেওয়ালের দিকে মুখ করে সে একই কথা বারবার ভেবে যেতে লাগল। 'কেন, কী কারণে, আমায় এই ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে যেতে হবে?'

কিন্তু যথেষ্ট ভাবলেও সে কোন উত্তর পেল না। যখন এ চিন্তাটা আসত (প্রায়ই আসত) যে ঠিক যে-ভাবে বাঁচা উচিত ছিল, সে সে-ভাবে

বাঁচে নি, তখন সে উদ্ধতভাবে একটা উত্তরে ফিরে যেত—কী সঠিক ভাবে সে বেঁচেছে !

১০

আরো দুটো সপ্তাহ চলে গেল। আইভান আর সোফা থেকে উঠল না। বিছানায় শুতে ইচ্ছে করছিল না, তাই সোফায় শুয়ে ছিল। যখন সে ওখানে শুয়ে ছিল, প্রায়শই দেওয়ালের দিকে মুখ করে, তখনও ঠিক সেই একই রকম দুর্বোধ্য যন্ত্রণা একা ভোগ করতে লাগল এবং একই দুর্বোধ্য প্রশ্নের চিন্তা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় করতে লাগল। 'এটা কী? এই কি মৃত্যু?' আর অন্তরের স্বর উত্তর করল, 'হ্যাঁ, এই-ই মৃত্যু।' 'কিন্তু কেন এই কষ্টভোগ!' ভেতরের স্বর উত্তর করল, 'সম্পূর্ণ বিনা কারণে।' এই পর্যন্ত সংলাপটা গেল—এর বেশি নয়।

তার অসুস্থতার সূচনার দিন থেকে, প্রথম ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দিন পর্যন্ত আইভানের জীবন দুটি বিরোধী ভাবের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটা ভাব হতাশার, ভয়াবহ অচিন্তনীয় মৃত্যুর পূর্বাভাস যেন পাচ্ছিল সে; অন্যটি আশার, যার জন্যে তার দেহের কর্মবিধি লক্ষ্য করবার সজীব আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। এখন সে দেখছে কিড্‌নি বা অনুরূপ কোন একটি যন্ত্র—যা সাময়িক ভাবে ঠিক মত কাজ দিচ্ছে না। এখন সে মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, ভয়াবহ ও অতল মৃত্যু, যার থেকে কোনো ভাবেই মুক্তি নেই।

রোগের শুরু থেকেই এই দুটি ভাব পালা করে আসত। কিন্তু রোগটা যতই এগোচ্ছে, ততই কিড্‌নি সম্পর্কিত চিন্তা অলীক ও অসম্ভব মনে হচ্ছে, এবং অগ্রসরমান মৃত্যুর চেতনা বেশি বাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

তিন মাসে আগে সে কেমন ছিল এবং এখন কেমন আছে, সেই ঢালু জায়গাটা দিয়ে সে কী রকম নির্দিষ্ট ভাবে নামছে, শুধু এই কথাটা মনে করাই আশার সব সম্ভাবনা ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট।

শেষের ক'দিন আইভান এক চরম নিঃসঙ্গতার মধ্যে থাকল। দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকা অবস্থায় জনবহুল শহরের মধ্যে সে ছিল নির্জনতম লোক। বহু বন্ধু ও আত্মীয়ের মধ্যে এই নিঃসঙ্গতা। সমুদ্রের তলায় বা পৃথিবীর গর্ভেও এই নির্জনতা বোধহয় এত সম্পূর্ণ হতে পারত না।

সেই ভয়াবহ নির্জনতার শেষের দিনগুলিতে আইভান অতীতের মধ্যে কাটাল। বিগত দিনের ছবি একের পর এক তার মনের মধ্য দিয়ে যেতে লাগল। সর্বদাই শুরু হতো নিকট-অতীতের কোনো ঘটনা থেকে, ক্রমে চলে যেত দূর অতীতে, তার শৈশবে এবং সেখানে দীর্ঘকাল থেকে যেত। সকালে দেওয়া কুলের জ্যামের কথা ভাবলে মনে পড়ে যায় শৈশবের চটচটে কোঁচকানো কুলের কথা, তার বিচিত্র স্বাদ, আঁটি চোষবার সময় তীব্র লালা-প্রবাহ এবং এই স্বাদের স্মৃতি সেকালের এক বৃহত্তর স্মৃতি প্রবাহের মধ্যে নিয়ে যেত তাকে—ধাই, ভাই, খেলনা। 'আমি এসব ভাবব না।······ এ বড় যন্ত্রণাকর।' নিজের মনে একথা বলে নিজের চিন্তাকে বর্তমানে নিয়ে এল। সোফার পেছনের বোতাম এবং মরক্কো চামড়ার ভাঁজ। 'মরক্কোর দাম বেশি এবং তেমন ভাল দেখায়ও না। বৌর সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া করেছিলাম। বাবার ব্রীফ্-কেস চিরে দিয়েছিলাম ছোটবেলায়, সে সময় মরক্কো চামড়া অন্য রকম ছিল। বাড়িতে ভয়ংকর সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। আমাদের সাজা পেতে হয়েছিল। পরে মা আমাদের পেস্ট্রি এনে দিয়েছিল।' আবার তার চিন্তা শৈশবকে কেন্দ্র করে চলতে লাগল, আবার তার সেটাকে বেদনাদায়ক মনে হল। আবার সে অন্য কিছু চিন্তা করে সেটাকে দূরে সরাতে চেষ্টা করল।

এই চিন্তার পাশাপাশি একই সময় অন্য চিন্তার স্রোতও বইতে লাগল—তার রোগের সূচনা ও বৃদ্ধির চিন্তা। সে অনুভব করল, যত দূর অতীতের তার জীবন, তত প্রাণবন্ত সে জীবন। আগে জীবনে ভালোর পরিমাণ ও জীবনীশক্তির পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। একটার সঙ্গে যেন আরেকটা মিশে ছিল। 'এখন আমার রোগভোগ যত ক্রমাগত বাড়ছে, তত আমার গোটা জীবনও ক্রমেই খারাপ হচ্ছে।' ভাবল সে। একটি মাত্র উজ্জ্বল বিন্দু—ঐ শৈশব। তারপর ক্রমেই কালো, আরো কালো হয়েছে। হয়েছে দ্রুত, আরো দ্রুত গতিতে। একটা পাথর ক্রমেই দ্রুততর গতিতে নামছে—এই ছবিটি তার মাথায় খেলে গেল। জীবন, ক্রমবর্ধমান কষ্টভোগের একটি সংগ্রহ, দ্রুততর গতিতে এগোচ্ছে তার লক্ষ্যের দিকে—সে লক্ষ্যও অবর্ণনীয় কষ্ট। 'আমি পড়ছি······' সে চমকে উঠল, কেঁপে উঠল, বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু এখন সে জানে যে বাধা দেওয়া অসম্ভব। আবার চিন্তায় ক্লান্ত, কিন্তু যা মনের স্রোতে সামনে জেগে ওঠে তা থেকে চোখ ফেরাচ্ছে

অসমর্থ, সে সোফার পেছন দিকে তাকিয়ে রইল এবং অপেক্ষা করতে লাগল। অপেক্ষা—ভয়ংকর সেই পতনের জন্য, শেষ আঘাতের জন্য, ধ্বংসের জন্য। 'কোনো প্রতিরোধ নয়।' সে নিজেকে বলল। 'শুধু যদি জানতে পারতাম কেন এটা হবে।' কিন্তু সেটাও অসম্ভব। 'যে ভাবে বাঁচা উচিত ছিল সে ভাবে যদি না বাঁচতাম, তাহলে তবু কোনো একটা মানে হোতো। কিন্তু সেটা স্বীকার করা অসম্ভব।' জীবনের সব সঠিক ভাব, সৌজন্য, যথা-যোগ্যতা মনে পড়ল। 'এ আমি স্বীকার করিতে পারি না।' ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে রইল—কেউ দেখলে হাসি বলে ভুল করে ঠকতে পারে। 'এর কোনো মানে হয় না। অর্থ নেই এর। উদ্বেগ। মৃত্যু। কেন?'

১১

এইভাবে আর এক পক্ষকাল কেটে গেল। সেই সময়ে তার ও তার প্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল। পেত্রিশ্চেভ আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রস্তাব করল। ঘটনাটা ঘটল সন্ধ্যেবেলায়। পরদিন সকালে প্রাসকভিয়া তার স্বামীর ঘরে এল। স্বামীর কাছে কী ভাবে কথাটা বলবে এ নিয়ে বারবার ভেবেছে সে। কিন্তু ঐ রাতে আইভানের অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেছে। প্রাসকভিয়া তাকে সেই সোফাটার ওপরে দেখল, কিন্তু একটা ভিন্ন ভঙ্গিতে। সে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল।

প্রাসকভিয়া তার সঙ্গে তার ওষুধ সম্পর্কে কথা শুরু করল। সে চোখ ফিরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল। আর তার কথা তার মুখে আটকে গেল—এত ঘৃণা ছিল আইভানের সেই দৃষ্টিতে—প্রাসকভিয়ার প্রতি ঘৃণা—যা সে দেখতে পেল আইভানের চোখে।

'ভগবানের দোহাই! আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।'

প্রাসকভিয়া বেরোবার উদ্যোগ করছিল, এমন সময় তাদের মেয়ে বাবাকে 'সুপ্রভাত' বলতে ঘরে এল। স্ত্রীর দিকে যেমন ভাবে তাকিয়েছিল ঠিক তেমনি দৃষ্টিতে আইভান তাকাল মেয়ের দিকে। যখন মেয়ে জিজ্ঞেস করল আইভান কেমন আছে, তখন আইভান উত্তর দিল যে তারা শীগগিরই আইভানের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। উভয়ে চুপ করে একটুক্ষণ বসে থেকে তারপর বেরিয়ে গেল।

লিজা তার মাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কী দোষ? আমাদের দোষ

দেওয়া হচ্ছে কেন? তোমরা ভাবতে পারো এটা আমাদের দোষ। বাবার জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু বাবা আমাদের ওপর এমন অত্যাচার করবেন কেন?'

নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার এল। তার ওপর থেকে স্থির প্রজ্জ্বলিত দৃষ্টি একবারও না সরিয়ে আইভান 'হ্যাঁ' ও 'না' জবাব দিয়ে গেল।

'আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে কিছুতেই কিছু হবে না। আমাকে একা থাকতে দিন।'

'আমরা আপনার কষ্টটা কমাতে পারি।' বললেন ডাক্তার।

'না। আপনি তাও পারেন না। আমায় একা থাকতে দিন।'

ডাক্তার ড্রইংরুমে গিয়ে প্রাসকভিয়াকে বললেন যে আইভানের অবস্থা খুব খারাপ। তার ভয়ংকর কষ্ট থেকে তাকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র উপায় —আফিং।

ডাক্তারের কথা ও অনুমান অনুযায়ী আইভানের অনেক বেশি ভয়ংকর হোলো নৈতিক কষ্টভোগ। সেটাই ছিল তার আসল কষ্ট।

সেদিন রাতে গেরাসিমের ঘুম-পাওয়া ভাল-মেজাজ চওড়া মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আইভানের নৈতিক কষ্ট বোধটা এল। সে ভাবল, আমার জীবন, 'আমার গোটা পরিণত জীবনটা যা হওয়া উচিত ছিল, যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে কী?'

যে চিন্তা আগে একদম অসম্ভব বলে মনে হোতো (অর্থাৎ জীবন যে ভাবে কাটানো উচিত ছিল সেভাবে কাটানো হয় নি), এখন মনে হচ্ছে তা সত্য হতেও পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা যাকে ভালো বলে বিবেচনা করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার কদাচিৎ অনুভবগম্য প্রেরণাকে সে বরাবর দমন করে এসেছে। এইখানেই হয়তো আসল জিনিসটা ছিল। আর বাকী সব এই আসলের বাইরে। তার সরকারী কর্তব্য, তার জীবনধারণের পদ্ধতি, তার পরিবার, তার সামাজিক ও পেশাগত আগ্রহ—এ সবই হয়তো আসলের বাইরে। এ সবের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করবার সে চেষ্টা করল, কিন্তু যাদের রক্ষার চেষ্টা করছে তাদের অপদার্থতা সম্পর্কে হঠাৎ সে সচেতন হলো। এদের রক্ষা করবার কিছু নেই।

সে নিজের মনে বলল, 'তাই যদি হয়, জীবনের অপব্যয় করেছি এবং এখন আর তা শোধরানোর সময় নেই, এই চেতনা নিয়ে যদি আমি জীবন

থেকে বিদায় নিই,—তাহলে কী ?' উপুড় হয়ে শুয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সে সারাটা জীবনের পর্যালোচনা করতে লাগল।

সকালে প্রথমে খানসামা, পরে স্ত্রী, তারপরে মেয়ে এবং শেষে ডাক্তারকে দেখে, তাদের প্রতিটি কথা ও গতিবিধি লক্ষ্য করে, রাত্রিতে উদ্ভাসিত ভয়াবহ সেই সত্যকে সে নিশ্চিত প্রমাণিত বলে জানল। তাদের মধ্যে সে নিজেকে দেখতে পেল। যা দিয়ে তার জীবন তৈরি, সেই সব দেখতে পেল। আর পরিষ্কার দেখতে পেল, এই সব আসল জিনিসের বাইরে। দেখতে পেল, জীবন ও মৃত্যুর সত্যকে আড়াল করে রয়েছে, এই সব বিপুল ভয়াবহ ভণ্ডামি। এই উপলব্ধি তার দৈহিক যন্ত্রণাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিল। সে কাতরাতে লাগল। ছটফট করতে লাগল। নিজের কাপড়চোপড় খিমচে ধরতে লাগল। কাপড় যেন তাকে পিষছে, নিংড়োচ্ছে, শ্বাসরোধ করছে এবং সে এদের ঘৃণা করছে।

তাকে বড এক মাত্রার আফিং দেওয়া হোলো এবং সে এ সব ভুলল। কিন্তু খাওয়ার সময় আবার শুরু হোলো। সে সবাইকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে বিছানায় ছটফট করতে লাগল।

স্ত্রী তার কাছে এসে বলল, 'জাঁ, ওগো এইটুকু আমার জন্য কর। (আমার জন্য ?) এ কিছু ক্ষতি করবে না। বরং এতে অনেক সময় কাজ হয়। অন্য কোনো মানে নেই এর। এমন কি, ভাল লোকেরাও—'

বড় চোখে আইভান স্ত্রীর দিকে তাকাল।

'কী ? স্যাক্রামেন্ট্ অনুষ্ঠান গ্রহণ করব ? কেন ? আমি চাই না। তবু...'

স্ত্রী কাঁদতে আরম্ভ করল।

'করবে না, ওগো ? আমাদের পুরুত মশাইকে ডাকতে পাঠাই—উনি এত ভাল লোক !'

'খুব ভাল। চমৎকার।' বলল আইভান।

যখন পুরুতমশাই এলেন ও তার স্বীকারোক্তি শুনলেন, আইভানের হৃদয় কোমল হোলো। যেন তার সন্দেহ ঘুচে যাচ্ছে এবং এতেই যেন কষ্ট কিছুটা কমল ও মুহূর্তের জন্য আশা ফিরে এল। তার রুগ্ন প্রত্যঙ্গ ও তার নিরাময়ের সম্ভাবনার কথা সে ভাবতে শুরু করল। স্যাক্রামেন্ট গ্রহণের সময় তার চোখে জল এসে গেল।

অনুষ্ঠানের পর যখন তাকে আবার শুইয়ে দেওয়া হোলো তখন এক মুহূর্তের জন্য সে ভাল বোধ করল এবং আর একবার সে আরোগ্যের আশায় পূর্ণ হোলো।

ডাক্তার যে অপারেশনের কথা বলেছিল, সেকথা সে ভাবল। 'আমি বাঁচতে চাই।' নিজের মনে বলল। তার স্ত্রী তাকে অভিনন্দন জানাতে এলো। বরাবর যে সব কথা বলে তাই বলল সে। তারপর যোগ করল, 'তুমি এখন নিশ্চয়ই ভাল বোধ করছ, তাই না?'

'হ্যাঁ।' তার দিকে না তাকিয়ে বলল আইভান।

তার পোশাক, তার দেহ, তার মুখভাব, তার কণ্ঠস্বর—প্রত্যেকটিই আইভানকে বলছিল, 'আসল জিনিসের বাইরে। তোমার জীবন যা ছিল এবং এখনও যা আছে, তা একটি মিথ্যা ও ভণ্ডামি—যা জীবন ও মৃত্যুর যথার্থ সত্যকে তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখছে।' যে মুহূর্তে এই চিন্তাটা তার মাথায় এল, তার মধ্যে তখনি ঘৃণাটা জাগ্রত হোলো। ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গেই এল উদ্বিগ্ন দৈহিক কষ্ট। আর কষ্টের সঙ্গে এল আসন্ন অপরিহার্য মৃত্যুর উপলব্ধি। তার ভেতরে একটা কিছু মোচড় দিতে, কামড়াতে ও শ্বাস রোধ করতে লাগল।

যখন সে ঐ 'হ্যাঁ' কথাটা উচ্চারণ করল, তখন তার মুখের অভিব্যক্তি ছিল ভয়ংকর। কথাটা বলে, স্ত্রীর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে, হঠাৎ খুব দ্রুত উপুড় হয়ে পড়ল। তার মত দুর্বল লোকের পক্ষে অবিশ্বাস্য সে দ্রুততা। পড়েই চীৎকার করে উঠল।

'চলে যাও! চলে যাও! আমাকে একা থাকতে দাও।'

১২

সেই মুহূর্ত থেকে তিন দিন অবিরাম এত ভয়ংকর চীৎকার চলতে লাগল যে এমন কি দুটো ঘর পেরিয়ে ওদিকে লোকে শুনতে পেত এবং না কেঁপে উঠে উপায় থাকত না তাদের। স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মুহূর্তেই সে বুঝেছিল যে সব শেষ হয়ে গেছে, আর কোনো আশা নেই, শেষ, সব কিছুর পরে যে শেষ তাই, এখন একেবারে নিকটে, তার সংশয় চিরদিনের সংশয়ই থেকে গেল, কোন দিন আর তার উত্তর পাওয়া যাবে না।

'আঃ! আঃ! আঃ!' সে নানা সুরে চেঁচাত। 'আমি চাই না'

এই চেঁচানি দিয়ে সে শুরু করেছিল, এবং তারপর ক্রমাগত চেঁচাচ্ছিল—'আহ!'

সেই তিনটে দিন তার কাছে অনন্তকাল বলে মনে হয়েছিল। একটা কালো থলের মধ্যে অদৃশ্য অপ্রতিরোধ্য একটা শক্তি তাকে যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সে ঠেকাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে চেষ্টা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লোকের মত—যে জানে উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই, তবু জল্লাদের হাতের মুঠোর মধ্যে চেষ্টা করে। সে বুঝল, প্রতিটি মুহূর্তে, চেষ্টার মরিয়া ধরন সত্ত্বেও, যাকে সে ভয় করছে তা নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে। সে অনুভব করল যে ঐ কালো গর্তের মধ্যে তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়াই হচ্ছে তার কষ্টের কারণ। আরো বড় কারণ—ঐ গর্তটার মধ্যে সে নিজে যেতে পারছে না। সেই জন্যেই কষ্ট বেশি। তার জীবনটা ছিল বেশ ভাল—এই বিশ্বাসটাই ছিল স্বেচ্ছাপ্রবেশের বাধা। তার নিজের জীবন সম্পর্কে সাফাইটা ছিল অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক এবং এটা তাকে অন্য সব কিছু থেকে কষ্ট বেশি দিত।

তার বুকে ও পাশে একটা কোন শক্তি আঘাত করল। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। সে সোজা গর্তটার মধ্যে নিমজ্জিত হোলো। গর্তের শেষ প্রান্তে সে একটি আলোর রেখা দেখতে পেল। একবার একটি রেলের কামরায় চড়ে তার মনে হয়েছিল যে সে সামনের দিকে যাচ্ছে, যখন সে আসলে যাচ্ছিল পেছন দিকে এবং হঠাৎ আসল দিকটা টের পেয়েছিল। সেই রকম একটা উপলব্ধি হোলো এখন।

সে নিজের মনে বলল, 'হ্যাঁ, এ সব আসল জিনিসের বাইরে। কিন্তু ঠিক আছে। আমি এখনও একে আসল জিনিসে রূপান্তরিত করতে পারি। কিন্তু আসল জিনিস কী?' এই প্রশ্ন করেই সে শান্ত হয়ে গেল।

তৃতীয় দিনের শেষে, তার মৃত্যুর আগে এ ঘটনা ঘটে। ঠিক সেই সময় তার ছেলে ঘরে এবং তার বিছানায় কী ভাবে যেন চলে আসে। মরণাপন্ন লোকটি তখনো বন্যভাবে চীৎকার করছে আর হাত-পা ছুঁড়ছে। একটা হাত তার ছেলের মাথায় পড়ল। বালক সেই হাতটি টেনে নিয়ে তার ঠোঁটের কাছে চেপে ধরল এবং কাঁদতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে আইভান গর্তের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আলোর রেখা দেখেছিল। আর তার উপলব্ধি হয়েছিল যে তার জীবন যা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি, কিন্তু সে এখনও

সব শুধরে নিতে পারে। 'আসল জিনিস কী?'—নিজেকে এই প্রশ্ন করে সে শান্ত হয়ে গেল। সে শুনছিল। এই সময় সে বুঝল, একজন কেউ তার হাতে চুমু খাচ্ছে। সে চোখ খুলল ও ছেলের দিকে তাকাল। ছেলের জন্য মায়া ও করুণায় তার মন ভরে গেল। তার স্ত্রী ভেতরে এল। সে স্ত্রীর দিকে একবার তাকাল। স্ত্রী দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিল—তার মুখ হাঁ হয়ে ঝুলে পড়েছিল, তার নাকে ও গালে জল—মোছা হয় নি। তার মুখে হতাশার ছায়া। তার জন্যে আইভানের করুণা হল।

সে ভাবল, 'আমি এদের কষ্ট দিচ্ছি। এরা আমার জন্যে দুঃখ বোধ করে কিন্তু আমার চলে যাওয়ার পরে এদের ভাল হবে।' সে এ কথা ওদের বলতে চাইল, কিন্তু বলবার শক্তি ছিল না তার। 'কিন্তু বলার কী ফল? আমি কিছু করব।' ভাবল সে। সে স্ত্রীর দিকে ঘুরে পুত্রকে ইশারা করল।

সে বলল, 'ওকে নিয়ে যাও। হতভাগ্য ছেলে...আর তুমি...' সে যোগ করতে চাইল 'ক্ষমা কর' এবং তার মুখ দিয়ে বেরোল 'ভুলে যাও।' কিন্তু কথাটা আর শোধরাবার শক্তি ছিল না তার। সে শুধু হাতের একটা ইশারা করল। সে জানত, যে বোঝবার সে ঠিক বুঝবে।

শাগগিরই এটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে এতদিন যা কিছু তাকে কষ্ট দিয়েছে এবং যাদের সরিয়ে ফেলতে সে অপারগ ছিল, তারা নিজেরাই এখন পড়ে যাচ্ছে—দু'দিক দিয়ে, দশ দিক দিয়ে, সব দিক দিয়ে একই সঙ্গে। সে ওদের জন্য দুঃখবোধ করল। ওদের দুঃখ দূর করবার জন্য সে কিছু করবে। ওদের ও নিজের কষ্ট সে দূর করবে। 'কী ভাল আর কী সোজা!' ভাবল সে। 'আর ব্যথাটা?' সে নিজেকে প্রশ্ন করল। 'ব্যথাটা সরাই কী করে? এখানে, কোথায় এখন তুমি, হে ব্যথা?'

ব্যথাটা খুঁজল।

'ও, এই তো, এর কী করা যায়? থাক এটা।'

'আর মৃত্যু? কোথায় মৃত্যু?'

তার অভ্যস্ত মৃত্যুভয়কে সে খুঁজল এবং পেল না। কোথায় মৃত্যু? মৃত্যু কোথায়? মৃত্যু নেই বলে ভয়ও নেই।

মৃত্যুর বদলে আলো আছে।

'এই তাহলে মৃত্যু!' সে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, 'কী সুখ!'

এ সব ঘটল একটি মুহূর্তে। কিন্তু সেই মুহূর্তের তাৎপর্য দীর্ঘস্থায়ী। যারা উপস্থিত ছিল তাদের কাছে এ মৃত্যুযন্ত্রণা আরো দু'ঘণ্টা চলেছিল। তার গলায় কী যেন ঘড়ঘড় করছিল। তার শার্ণ দেহে হেঁচকির টান লাগতে লাগল। কিন্তু ক্রমে ঘড়ঘড়ানি বন্ধ হয়ে গেল।

'সব শেষ হয়ে গেছে।' একজন কেউ বলল।

সে কথাগুলো শুনল এবং অন্তরের মধ্যে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল।

'মৃত্যু শেষ হয়ে গেল।' সে নিজেকে বলল। 'এখন আর মৃত্যু নেই।'

সে একটা গভীর নিশ্বাস টানল, কিন্তু তার মধ্যেই নিশ্বাসটা ভেঙে পড়ল। সে হাত-পাগুলো একটু ছড়িয়ে দিল এবং মারা গেল।

১৮৮৬

ক্রৎজার সোনাটা

"...আমি তোমাদিগকে বলি, যে কেহ নারীর দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকায়, আপন অন্তরের অন্তঃস্থলে সে ব্যভিচারের পাপে লিপ্ত।"

ম্যাথু ৫ ; ২৮

তাঁহার শিষ্যরা তখন তাঁহাকে বলিলেন, "যদি এইরূপ হয় যে কোন ব্যক্তি স্ত্রীর দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকায় তাহা হইলে বিবাহ করা অনুচিত।" কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "সকল লোকের পক্ষে এ আদেশ পালন করা সম্ভব নয়। যাহাদের উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে, কেবল তাহারাই এমত সংযমের অধিকারী। কেহ কেহ মাতৃগর্ভ হইতেই নপুংসক হইয়া জন্মায়। কোন কোন লোককে মানুষে নপুংসক করিয়া দেয়। আবার কেহ কেহ ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের নপুংসক করিয়া রাখে। যাহারা এই অনুজ্ঞা পালন করিতে পারে, তাহারা করুক।

ম্যাথু ১৯, ১০, ১১, ১২

১

বসন্তের প্রথমদিক। প্রায় দুদিন হয়ে গেল আমরা গাড়ীতে উঠেছি। যাত্রীদের মধ্যে যারা কাছাকাছি যাবে তাদের কেউ কেউ নেমে গেল। আবার অনেক নতুন যাত্রী গাড়ীতে উঠল। কেবল আমি এবং আর তিনজন দূরপাল্লার যাত্রী সেই গাড়ী ছাড়ার সময় থেকে সমানে বসেছিলাম। তিনজনের মধ্যে একজন নিতান্ত সাধারণ চেহারার, পুরুষালী পোশাকপরা মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা ক্লান্ত-বিধ্বস্ত মুখে একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলার পাশে বসেছিলেন তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোক—ভদ্রলোকের বয়স বছর চল্লিশ, খুব কথা বলতে পারেন। সঙ্গের মালপত্তর

বেশ ছিমছাম, মনে হয় সদ্য কিনেছেন। তৃতীয় যাত্রীটি একা একা, সকলের থেকে আলাদা হয়ে বসেছিলেন। এ ভদ্রলোক মাঝারি রকম লম্বা, হাবভাব দেখলে মনে হয় ঝোঁকের মাথায় কাজ করেন। ভদ্রলোক বুড়ো হননি, কিন্তু অল্প বয়সেই তাঁর কোঁকড়ানো চুলে পাক ধরেছে। চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, অস্থির, লক্ষ্যহীন চাহনি। ভদ্রলোকের মাথায় আস্ত্রাখান টুপি, গায়ে আস্ত্রাখান কলার লাগানো একটি পুরোন কোট, সবই বেশ পয়সা খরচ করে তৈরী করানো। কোটের বোতাম খুলতে দেখা গেল ভিতরে আছে একটি রাশিয়ান জ্যাকেট ও আর একটি সূক্ষ্ম কারুকার্য করা গলাবন্ধ ঊর্ধ্ব বাস। ভদ্রলোক থেকে থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ করছিলেন—সেটা মাঝে মাঝে গলা খাঁকারি দেওয়া, আবার মাঝে মাঝে হাসি চাপার শব্দের মত শোনাচ্ছিল। ইনি সারাক্ষণ অন্য যাত্রীদের এড়িয়ে চলছিলেন। কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে কাটাকাটা উত্তর দিচ্ছেলেন বটে, কিন্তু বাকি সময়টা বই পড়ে, বাইরের দৃশ্য দেখে, পুরনো একটা থলি হাঁতড়ে খাবার-দাবার বার ক'রে এবং চা, সিগারেট, জল খাবার ইত্যাদি খেয়ে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন।

উনি একলা পড়ে গেছেন ভেবে আমি দু-চারবার কথাবার্তা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার চোখে চোখ পড়ামাত্রই (আমরা মুখোমুখি বসে থাকায় চোখাচোখি প্রায়ই হচ্ছিল) ভদ্রলোক মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হয় বই পড়তে, না হয় জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দৃশ্য দেখতে শুরু করে দিচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় একটা বড় স্টেশনে অনেকক্ষণ গাড়ী থামতে জল গরম করে এনে চা তৈরী করলেন। সিগারেট-খাওয়া মহিলা ও তাঁর বন্ধুটি (পরে জানলাম ইনি উকিল) স্টেশনের রেস্তোরাঁয় চা খেতে গেলেন। এদের অনুপস্থিতির মধ্যে বেশ কয়েকজন নতুন যাত্রী আমাদের কামরায় উঠলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ব্যবসাদার ছিলেন—লম্বা, বেশ পরিষ্কার করে দাড়ি গোঁফ কামানো, গায়ে ফারের কোট, টুপিতে মুখের অনেকখানি ঢাকা।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি উকিলবাবু ও তাঁর বান্ধবীর আসনে উলটো দিকে বসে পড়েই একজন যুবকের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। যুবকটিকে দেখে মনে হল কোন দোকানের কর্মচারী হতে পারে। সে-ও সদ্য গাড়ীতে উঠেছিল।

আমি ওদের উলটো দিকে একটু তেরছাভাবে বসেছিলাম। গাড়ী যতক্ষণ থেমেছিল এবং লোকজনের যাতায়াত, হৈ-চৈ ইত্যাদি বন্ধ ছিল, ততক্ষণ আমি ওঁদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। ব্যবসাদার ভদ্রলোক বললেন যে তিনি পরের স্টেশনে, তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে নেমে যাবেন। তারপর ওঁরা দুজন ব্যবসা, বাজার দর, মস্কোর বাজার, নিঝ্নি নভ্গোরদের মেলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। দোকান কর্মচারীটি মেলায় কজন বড় ব্যবসাদার মেয়েছেলে নিয়ে কি রকম ঢলাঢলি করেছিল সে-ই কেচ্ছা শুরু করেছিল। বুড়ো ভদ্রলোক তাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি নিজে কুনাভিনোতে কি রকম ফুর্তিফার্তা করেছিলেন, তাই বলতে আরম্ভ করলেন। মদ খেয়ে তিনি ও তাঁর ইয়ার-বক্শিরা কিরকম দারুণ বেলেল্লে-পনা করেছিলেন, নীচু গলায় তার বর্ণনা দিতে দিতে ভদ্রলোকের চোখ লালসায় ও গর্বে চকচক করে উঠছিল। গল্প শেষ হওয়ার পর দোকান কর্মচারীটির অট্টহাস্যে সারা কামরা গম্গম্ করে উঠল। বুড়ো ভদ্রলোকও দুটি হলদে দাঁত বার করে হেসে উঠলেন।

কোন আগ্রহ-জাগানো কথাবার্তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই দেখে আমি একটু হাত পা খেলানোর জন্য প্ল্যাটফর্মের দিকে যাব ঠিক করলাম। দরজার কাছে গিয়ে দেখি সেই উকিল ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গের মহিলা মহা উৎসাহে কথাবার্তা বলছেন। উকিলবাবুটি বেশ আলাপী। আমাকে দেখে বললেন, "এক্ষুণি গাড়ী ছাড়ার ঘন্টা পড়বে, বেড়ানোর সময় নেই মশাই"। সত্যি সত্যি কামরাগুলো পেরোতে না পেরোতে গাড়ী ছাড়ার শেষ ঘন্টা পড়ল। ফিরে এসেও দেখলাম ওরা দুজন সমান উৎসাহে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। বুড়ো লোকটি উল্টোদিকের বেঞ্চিতে বসে মাঝে মাঝে কড়া চোখে ওদের দিকে তাকাচ্ছেন আর দাঁতে দাঁত ঘষে বিরক্তি প্রকাশ করছেন। ওঁদের আসনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম উকিল ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বলছেন, 'মহিলা একদিন স্রেফ্ বলে বসলেন যে তিনি আর স্বামীর ঘর করতে পারবেন না। কারণ—'

কারণটা আর শোনা গেল না। গার্ড এল, একটা লোক ছুটে পালিয়ে গেল, তারপর কিছুক্ষণ এত চেঁচামেচি, হল্লা হতে থাকল যে উকিলবাবুর কথার বাকি অংশটা একেবারেই ডুবে গেল। গণ্ডগোল থামতে আবার তাঁর কথা শুনতে পেলাম। একটা বিশেষ ঘটনার কথা বলতে বলতে ততক্ষণে তিনি

বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন। উকিলবাবু বলছিলেন যে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা, ভাবনা, আলোচনা ইত্যাদি হচ্ছে। রাশিয়াতেও বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। খানিকবাদে ভদ্রলোকের খেয়াল হলো যে তিনি একাই বক্‌বক্‌ করে যাচ্ছেন। তখন তিনি বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বললেন, 'আগেকার দিনে এসব ছিল না, কি বলেন?' বুড়ো ভদ্রলোক উত্তর দিতে যাবেন এমন সময় গাড়ী চলতে আরম্ভ করল এবং ভদ্রলোক হঠাৎ টুপি খুলে ফেলে বুকে ক্রস চিহ্ন এঁকে উপাসনা করতে আরম্ভ করলেন। উকিলবাবু ভদ্রতা করে অন্যদিকে তাকিয়ে প্রার্থনা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। বৃদ্ধটি উপাসনা শেষ করে তিনবার বুকে ক্রস-চিহ্ন এঁকে, টুপি পরে নিয়ে জমিয়ে বসে কথা বলতে শুরু করলেন—'আগেকার দিনেও যে এসব ঘটনা একেবারে না হোতো তা নয়. তবে সংখ্যায় অনেক কম। আজকাল যে রকম লেখাপড়া শেখার হিড়িক পড়েছে, তাতে এসব ঘটনা যে বাড়বে তার আর আশ্চয্যি কি?'

ট্রেনটা হঠাৎ ঘটাং ঘটাং শব্দ ক'রে জোরে চলতে শুরু করায় আবার আমি কিছুক্ষণ কোন কথা শুনতে পেলাম না। অথচ আলোচনাটা দারুণ জমে উঠেছিল। বাধ্য হ'য়ে উঠে এসে বুড়োর পাশে বসলাম।

আমার পাশের সেই উজ্জ্বল-চোখ অস্থির ভদ্রলোকটিও বোধহয় আমাদের কথাবার্তায় ঔৎসুক্য বোধ করছিলেন। নিজের জায়গা থেকেই তিনি গলা বাড়িয়ে শুনতে লাগলেন।

ভদ্রমহিলা অল্প হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পড়াশুনা করলে ক্ষতি কি? আপনার কি ধারণা, আগেকার দিনে যে কোন রকম আলাপ পরিচয় না করিয়েই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া হোত, সে ব্যবস্থাটা খুব ভাল ছিল?' এক একটা আড়বুঝো লোক থাকে যারা অন্যে কি বলতে চায় সেটা ঠিকমত না শুনেই তার ওপর মন্তব্য করতে শুরু করে, ভদ্রমহিলা সেই ধরনের। বুড়োকে পাত্তা না দিয়ে, আমার ও উকিলবাবুর সমর্থন পাবেন আশা করে ভদ্রমহিলা বলে যেতে লাগলেন, 'সেকালে পাত্রপাত্রীরা পরস্পরকে ভালবাসে কিনা বোঝার আগেই যাকে পেত তাকে বিয়ে ক'রে ফেলতে বাধ্য হত। তারপর সারা জীবন ধরে যন্ত্রণা ভোগ করতো। এ রকম হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়ার কোন মানে হয়?' বুড়োটি ভদ্রমহিলার কথার

জবাব দিলেন না। শুধু তাঁর দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'লেখাপড়া শেখার হুজুগটা আজকাল বড্ড বেশি বেড়েছে।'

উকিলবাবু মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "লেখাপড়া শেখার সঙ্গে অসুখী দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক কী?" বুড়ো ব্যবসায়ীটি কোন উত্তর দেওয়ার আগেই মহিলা ফোড়ন কাটলেন, "না, না, ওসব আগেকার যুগ চলে গেছে।" উকিলবাবু বললেন, "আহা থামই না, ভদ্রলোকের মতটা কি শুনতে দাও।"

বুড়ো ব্যবসায়ীটি খুব জোর দিয়ে বলে উঠলেন, "লোকে যত লেখাপড়া শিখছে তত গাধা তৈরি হচ্ছে।"

'বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীরা পরস্পরকে ভালবাসে কি-না তা বিচার না করেই সব বিয়ে দিয়ে দেবে। তারপরে বিবাহিত জীবন অসুখী হলে যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল এমন ভাব করবে। আরে বাবা, মালিকের মর্জিমত জন্তুরা বাচ্চা পয়দা করতে পারে কিন্তু মানুষ তো আর জন্তু নয়। মানুষের নিজস্ব পছন্দ আছে, বাছবিচার আছে।' ভদ্রমহিলার বক্তৃতাতে বুড়ো ভদ্রলোককে বেশ একটু খোঁচা দেওয়ার ভাব ছিল। পুরো কথাটাই তিনি বললেন, আমার, উকিলবাবুর ও দোকান কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে। সে ছোকরা তখন হাসি-হাসি মুখে সিটের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বুড়ো ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'আপনি ভুল করছেন। জন্তুদের সঙ্গে কি মানুষের তুলনা চলে? মানুষকে আইন-কানুন মানতে হয়।'

ভদ্রমহিলা যেন খুব একটা নতুন কথা বলছেন এমনভাবে বললেন, 'যারা পরস্পরকে ভালবাসে না, তারা সারা জীবন একসঙ্গে থাকবে কি করে?"

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, 'আগে এসব সূক্ষ্ম ফ্যাকড়া ছিল না। এ-সব আজকাল হয়েছে। বউ স্বামীকে বলবে "ওগো আমি আর তোমার ঘর করতে পারব না" এমনতর কথা আমাদের সময়ে ভাবাই যেত না। আজকাল এমনকি গাঁয়ের চাষাভূষোদের মাথায় পর্যন্ত এইসব অদ্ভুত ধারণা ঢুকে গেছে। কিরকম উদ্ভট ব্যাপার ভেবে দেখুন, চাষী-বউ হয়ত সকালবেলা উঠে বলে বসল "এই রইল তোমার ঘরকন্না। ওপাড়ার ভসিয়ার চুলগুলি ভারি সুন্দর। তাকেই আমার পছন্দ, তার সঙ্গেই চললুম।" এই তো

হয়েছে আজকালকার অবস্থা। মেয়েছেলেদের ভয়ডর থাকা দরকার, বুঝলেন।'

দোকান কর্মচারীটি আমার, উকিল বাবুর ও তাঁর বান্ধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল, আমরা কথাটা কি ভাবে নিই। যদি দেখে আমরা সবাই হাসছি, তাহলে সে-ও হাসবে, আর যদি আমরা সবাই সায় দিই, তাহলে সে-ও তা-ই করবে।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভয় মানে? কাকে ভয়?'

বুড়ো ব্যবসায়ীটি উত্তর দিলেন, 'স্বামীকে। আবার কাকে?'

'সে সব যুগ আর নেই।'

'নেই মানে? আলবৎ আছে। চিরকাল থাকবে। বাপু হে, আমাদের পাঁজরা থেকে ভগবান ইভকে তৈরি করেছিলেন, এ কথাটা তো আর মিথ্যে নয়।' কথা শেষ করে বৃদ্ধ এমন নিশ্চিন্তভাবে ঘাড় নাড়লেন যে দোকানী ছোকরা তক্ষুণি ঠিক করে ফেলল যে বুড়োরই জয় হয়েছে।

উকিলের বান্ধবী দমবার পাত্রী নন। বলে উঠলেন, 'পুরুষরা তো এ ধরনের কথা বলবেই। নিজে সব যা ইচ্ছে ক'রে বেড়াবে; যত ধরাবাঁধা কেবল মেয়েদের বেলায়।'

'যা ইচ্ছে করার অধিকার কেউ পুরুষদের দেয় নি। তবে পুরুষ যা ইচ্ছে তা-ই করে বেড়ালেও তো আর সংসারে প্রজাবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু মেয়েছেলের ব্যাপার আলাদা। মেয়েছেলেকে সামলে-সুমলে রাখতেই হবে।'

মনে হল বুড়োর কথা বলার জোরালো ভঙ্গি দেখে শ্রোতারা তাঁর বক্তব্য নিয়েছেন। ভদ্রমহিলা কিন্তু কাবু হলেও হাল ছাড়লেন না। বলে উঠলেন, 'কিন্তু একথা তো আপনাকে মানতেই হবে যে মেয়েরাও মানুষ। পুরুষদের মত তাদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। স্বামীকে ভালবাসতে না পারলে কি করবে?' বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ভালবাসতে শিখবে।'

আচমকা এমন একটা অপ্রত্যাশিত উত্তর পেয়ে ছোকরাটি ভারি খুশি হয়ে সায় দিয়ে উঠল।

ভদ্রমহিলাটি বললেন, 'ও-সব কথার কোন মানে হয় না। কেউ নিজের থেকে ভাল না বাসলে তাকে দিয়ে জোর ক'রে ভালবাসবার চেষ্টা ক'রে কোন লাভ হয় না।'

উকিলবাবু ফোঁড়ন কাটলেন, 'যদি ধরুন স্ত্রী স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ সম্পর্কে আসক্ত বোধ করে, তখন কি করা হবে?'

'ও-সব আসক্তি-ফাসক্তি চলবে না বাপু। মেয়েছেলেকে কড়া নজরে রাখতে হবে।'

'কিন্তু একবার ঘটনাটা ঘটে গেলে তখন কি করবেন? এমন ঘটনা তো আজকাল আকছার হচ্ছে।'

'যেখানে হচ্ছে, সেখানে হচ্ছে। আমাদের ঘরে ওসব চলে না'—বুড়ো ব্যবসায়ীটি বলে উঠলেন।

সবাই চুপচাপ। তারপর হঠাৎ সেই দোকানের ছোকরাটি নড়ে চড়ে আমাদের কাছে এসে বসে বলতে শুরু করল, 'আমার মালিকের বাড়িতে না একটা বিরাট কেচ্ছা হয়েছিল। মালিকের ছেলের বউ-এর, একটু যাকে বলে, চরিত্তিরের দোষ ছিল। স্বামী লোকটা বেশ শক্ত জোয়ান, বেশ ভদ্দর মতন। কিন্তু হলে কি হবে, দুদিন যেতে না যেতেই বউটা খেল শুরু করে দিল। প্রথমে একটা হিসেব-লিখিয়ের সঙ্গে মাখামাখি আরম্ভ করল। স্বামী বেচারা অনেক বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। তারপর, বলব কি মশাই, মেয়েটা টাকা চুরি করতে আরম্ভ করল। স্বামী বেদম পেটাল। তাতে বউটা আরও বিগড়ে গেল। শেষে এক ব্যাটা ইহুদির সঙ্গে ঝুলে পড়ল। স্বামী ভদ্দরলোক আর কি করবে? বউটাকে ত্যাগ ক'রে অবধি একটা ছন্নছাড়া আইবুড়োর মত জীবন কাটাচ্ছে। আর বউটা রাস্তায় রাস্তায় খদ্দের ধরছে।

'স্বামীটা একটা আস্ত গাড়ল। প্রথম থেকে শক্ত হাতে রাশ টেনে রাখলে এমনটা ঘটতে পারত না। এ্যাদ্দিনে দুজনে বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করত। গোড়ার দিকে বউটাকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া-ই ভুল হয়েছে। ছেড়ে রাখলে গাইগোরু এর-তার খেতে মুখ দেবে, মেয়েছেলে নষ্ট হয়ে যাবে—এতো ধরা কথা।'

বুড়ো ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলেছেন, এমন সময় গার্ড টিকিট দেখতে এল। টিকিট দেখিয়ে তিনি আবার আরম্ভ করলেন, 'মেয়েছেলেকে প্রথম থেকেই জব্দ রাখতে হয় মশাই, তা না হলে সবে সারধর্ম—সব রসাতলে যাবে।'

আমি আর থাকতে না পেরে বলে উঠলুম, 'একটু আগে যে আপনি

বলছিলেন যে আপনারা, বিবাহিত সংসারী লোকেরা সব কুনাভিনোর মেলায় মেয়েছেলে নিয়ে হুল্লোড় করেছিলেন।'

'সে ব্যাটাছেলেদের কথা আলাদা' বলে ভদ্রলোক শামুকের মত গুটিয়ে গেলেন। গাড়ি থামবার বাঁশি বাজলে তিনি টুপি-কোট পোঁটলা পুঁটলি টেনে বার করে নিয়ে কামরা ছেড়ে চলে গেলেন।

২

ভদ্রলোক নামতে না নামতে সবাই একসঙ্গে কলকল ক'রে কথা বলে উঠল।

সেই দোকান কর্মচারী ছোকরাটি পরম তাচ্ছিল্যভরে বলে উঠল, 'সব পুরোনো জামানার লোক।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এই হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচারী বর্বরদের চেহারা। বিয়ে ও মেয়েদের সম্পর্কে সব মান্ধাতার আমলের ধারণা নিয়ে বসে আছে। একমাত্র প্রেমই বিয়েকে পবিত্র ক'রে তুলতে পারে। এ সব লোক বুঝতেই পারে না যে প্রেমহীন বিয়েকে বিয়ে বলে ধরাই উচিত নয়।'

উকিলবাবু সায় দিয়ে বললেন, 'বিয়ে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনায় আমরা ইউরোপের অন্যান্য দেশের থেকে অনেক পিছিয়ে আছি।'

দোকানী ছোকরাটি সমস্ত কথাবার্তা গোগ্রাসে গিলতে লাগল—যাতে এসব দারুণ জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য যুৎসইভাবে অন্যত্র লাগিয়ে দিতে পারে।

মহিলার কথার মধ্যে হঠাৎ আমার পিছন থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ পেলাম —শব্দটি যুগপৎ চাপা হাসি ও চাপা আর্তনাদের মত শোনালো। চমকে পিছন ফিরে দেখি সেই নিঃসঙ্গ উজ্জ্বলচোখ ভদ্রলোক। হট্টগোলের মধ্যে লক্ষ্যই করিনি কখন তিনি কথাবার্তায় উৎসাহ বোধ করে আমাদের কাছে সরে এসেছেন। ভদ্রলোক বেঞ্চির পেছনে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। উত্তেজনায় সারা মুখ লাল, রগের দুপাশের পেশীগুলো দপ্ দপ্ করছে। দুম্ ক'রে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'প্রেম মানে কি? যে প্রেম বিবাহকে শুচিশুদ্ধ ক'রে তোলে তার সংজ্ঞা কি?'

তাঁর উত্তেজনা দেখে মহিলা খুব শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'প্রেম মানে সত্যিকারের গভীর ভালবাসা। এরকম ভালবাসা থাকলে তবে-ই বিয়ে ব্যাপারটার একটা মানে দাঁড়ায়।'

ভদ্রলোক তাঁর উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকালেন। আত্ম-সচেতনভাবে একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'তাই মানলাম। কিন্তু বুঝব কি করে কোন্‌টা সত্যিকারের ভালবাসা ?'

ভদ্রমহিলা বোধহয় আর বেশীক্ষণ কথাবার্তা চালাতে চাইছিলেন না। একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'সত্যিকারের প্রেম বলতে কি বোঝায় তা সকলেই জানে।'

ভদ্রলোকটি বললেন, 'অন্ততঃ আমি তো জানি না। আপনি ঠিক কি ভাবছেন একটু গুছিয়ে বলুন তো।'

ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, 'এ বোঝা তো খুবই সহজ।' বলে কিন্তু একটু থামলেন, তারপর ভেবেচিন্তে বললেন, 'যখন বিশেষ একজন ব্যক্তিকে অন্য সকলের চেয়ে বেশী আপন বলে মনে হয়, তখনই বুঝতে হবে আমি তাকে ভালবাসি।'

চুল-পাকা ভদ্রলোকটি একটু হেসে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা প্রেম আখ্যা পেতে গেলে এই আপন মনে হওয়ার অনুভূতিটি কতদিন স্থায়ী হতে হবে ? একমাস ? দুদিন ? আধঘণ্টা ?'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি বোধহয় অন্য কোন অনুভূতির কথা বলছেন।'

'না, না আমি প্রেমের কথাই বলছি।'

উকিলবাবু বলে উঠলেন, 'প্রেম বা পারস্পরিক আকর্ষণ-ই বিয়ের ভিত্তি হওয়া উচিত এবং এই ভিত্তিটি থাকলে তবেই দাম্পত্য জীবন পবিত্র বলে মানতে পারা যায়। অপর পক্ষে যে বিয়েতে প্রেম বা পারস্পরিক সম্প্রীতি নেই তাতে কোন নৈতিক দায়িত্বও থাকতে পারে না। কথা শেষ করে ভদ্রলোক মহিলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আপনার কথা ঠিক ধরতে পেরেছি তো ?'

মহিলা সায় দিলেন। উকিলবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঐ ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই যে পারস্পরিক আকর্ষণের কথা বলছেন, এটা কতদিন স্থায়ী হয় ?' উত্তেজনায় ভদ্রলোকের চোখগুলো আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছিল। তিনি আর নিজেকে সংযত করে রাখতে পারছিলেন না।

ভদ্রমহিলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলেন, 'কতদিন স্থায়ী হয় মানে ? বহুদিন হতে পারে। কখনও কখনও সারা জীবন স্থায়ী হতে পারে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'উপন্যাসে এরকম শাশ্বত প্রেমের কথা পড়া যায় বটে। কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রেমের আয়ু কয়েকঘন্টা, কি কয়েকদিন, বড়জোর কয়েক-মাস, কচিৎ কখনও কয়েক বছর।' উপস্থিত সকলেই তাঁর কথাবার্তায় আহত হচ্ছে বুঝতে পেরে ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছিলেন।

আমরা তিনজন সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠলাম, "কি, বলছেন আপনি।" ছোকরাটি পর্যন্ত আপত্তি জানাল।

ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ গলায় আমাদের সব আপত্তি ডুবিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনারা কল্পনার কথা বলছেন। আমি বলছি অভিজ্ঞতার কথা, বাস্তবে আসলে কি হয়ে থাকে, সে-ই কথা। আপনারা যে প্রেমের কথা বলছেন, যে কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলে যে কোন পুরুষ মানুষের সেই অনুভূতি হয়ে থাকে।'

'আপনি যে বড় ভয়ংকর কথা বলছেন মশাই। জগতে নিশ্চয়ই এমন ভালবাসা আছে যার আয়ু একমাস দুমাস নয়, যা সারা জীবন টিঁকে থাকে।'

'না, না, ও-সব কিছু নেই। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেন যে কোন পুরুষ আজীবন একই নারীতে আসক্ত হয়ে থাকলেন, তাহলে আবার দেখবেন যে মহিলা অন্য আর কাউকে ভালবাসতে শুরু করেছেন। এই রকমই চিরকাল হয়ে থাকে।' কথা শেষ ক'রে ভদ্রলোক সিগারেট ধরালেন।

উকিলবাবু বললেন, 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে আকর্ষণটা পারস্পরিক।'

আগের ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'অসম্ভব। একগাড়ি মটরদানা বোঝাই করার সময় পূর্বনির্দিষ্ট দুটি দানা ঠিক পাশাপাশি পড়ে গেল এবং যাবতীয় ধাক্কাধাক্কি সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে রইল, এরকম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যতটা, স্ত্রী-পুরুষের আজীবন পারস্পরিক অনুরক্তির সম্ভাবনাও প্রায় ততটাই। তাছাড়া কথাটা সম্ভব-অসম্ভবের নয়। সব কিছুরই তো একটা স্বাভাবিক পরিণতি আছে। আজীবন একটা প্রেম জীবন্ত থাকবে কি করে? সারাজীবন ধরে কি একটিমাত্র বাতি জ্বলে যেতে পারে? আলো দিতে পারে?' ভদ্রলোক সিগারেটে জোরে টান দিলেন।

মহিলা বললেন, 'কিন্তু আপনি তো শুধু শারীরিক আসক্তির কথা বলছেন। যাঁদের মধ্যে আত্মিক সঙ্গতি আছে, একই ধরনের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ যাদের প্রেমের ভিত্তি, তাঁদের প্রেম চিরস্থায়ী হবে না কেন?'

সেই আগের মত অদ্ভুত শব্দ ক'রে ভদ্রলোক অধীরভাবে হেসে উঠলেন। বললেন, 'আত্মিক সঙ্গতি! আদর্শ! আত্মিক সঙ্গতির জন্য রোজ রাত্রে দুজনকে বিছানায় যেতে হবে কেন?'

উকিলবাবু বললেন, 'বাস্তব অবস্থা কিন্তু আপনার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাচ্ছে! দাম্পত্য সম্পর্ক পৃথিবীতে আছে—অধিকাংশ লোকই বিয়ে করে এবং তার মধ্যে অনেকেই বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে আজীবন সেই বিবাহ সম্পর্কের মর্যাদা রেখে চলে।'

ভদ্রলোক আবার হাসলেন। তারপর বললেন, 'আপনার যুক্তিগুলো ঠিক স্পষ্ট নয়। এই আপনি বললেন প্রেম বিয়ের ভিত্তি। আমি জিজ্ঞাসা করলুম প্রেম কি। তার উত্তরে আপনি এখন বলছেন, বিয়ে ব্যাপার-টাই প্রেমের অস্তিত্বের প্রমাণ। সত্যি কথাটা হল এই যে আজকালকার দিনে বিয়ে এক ধরনের প্রতারণা, ভণ্ডামি।'

উকিলবাবু প্রতিবাদ করলেন, 'না, না, আমি তা বলতে চাইনি। আমি বলছি যে বিয়ে জিনিসটা চিরকাল ছিল এবং এখনও আছে।'

'আছে ঠিক কথাই। কিন্তু কাদের মধ্যে, কিসের ভিত্তিতে আছে বলুন তো? যাঁরা বিয়েকে একটা পবিত্র অনুষ্ঠান বলে মনে করেন, যাঁরা মনে করেন, বিবাহিত দম্পতিদের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য আছে এবং এই কর্তব্য পালনের জন্য তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কেবল সেইসব লোকেদের কাছেই বিয়ে ব্যাপারটার একটা অর্থ আছে। আমাদের সমাজে সত্যিকারের বিয়ে বলে কিছু নেই। আমাদের শ্রেণীর লোকেদের কাছে বিয়ে মানেই যথেচ্ছ মৈথুন। তাই অধিকাংশ বিয়েরই পরিণতি হয় প্রতারণায়, নয় জিঘাং-সায়। এই দুই ধরনের পরিণতির মধ্যে প্রতারণা অবশ্য কিছু কম নারকীয়। এসব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দুজনকে বিশ্বাস করায় যে তারা পরস্পরের প্রতি দারুণ বিশ্বস্ত অথচ গোপনে দুজনেই দুজনকে ঠকিয়ে চলে। এই পুরো পারস্পরিক প্রতারণার ব্যাপারটা নোংরা কিন্তু সহনীয়, কিন্তু বিবাহ সম্পর্কের মধ্যে এর চেয়ে আরও অনেক বেশি বীভৎস ব্যাপার ঘটে থাকে। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যেই অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ঘেন্না করতে আরম্ভ করে, পরস্পরকে ত্যাগ করতে চায় আবার তা সত্ত্বেও শিকলে বাঁধা জন্তুর মত বছরের পর বছর তারা এক বাড়িতে বাস করে যায়। এরকম একটা দম-আটকানো আবহাওয়ার মধ্যে, যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে

কেউ মাতাল বনে যায়, কেউ আত্মহত্যা করে, কেউ বা হিংস্র হয়ে খুন করে বসে।'

ভদ্রলোক শেষের দিকে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে দ্রুত কথা বলে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা।

উকিলবাবু এ ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা শেষ করে দেওয়ার জন্য বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক, বিবাহিত জীবনে সময় সময় দারুণ সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।'

ভদ্রলোক একটু আত্মস্থ হয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন তাহলে।'

উকিলবাবু তো অবাক। আমতা আমতা করে জানালেন যে তাঁর সে সৌভাগ্য হয় নি।

আমাদের সকলের দিকে একবার চট্ করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে চেনা অবশ্য সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। আমার নাম পঝ্‌দনিশেভ, একটু আগে আপনি যে ধরনের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা বলছিলেন, আমার নিজের জীবনে সে রকম সময় এসেছিল এবং আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছিলাম।'

কি যে বলা উচিত তা বুঝতে না পেরে আমরা সকলে চুপ করে বসে রইলাম।

ভদ্রলোক আবার সেইরকম অদ্ভুত শব্দ করে বললেন, "এখন অবশ্য কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। কিন্তু মাপ করবেন। আমি···মানে ···আপনাদের আমি বিব্রত করতে চাইনি।"

উকিলবাবুটি দু-একবার "আমি ভাবছিলাম কি" জাতীয় কিছু একটা বলার চেষ্টা করলেন। তারপর সম্ভবতঃ কি বলবেন ভেবে না পেয়ে থেমে গেলেন। তাঁর দিকে দৃকপাত মাত্র না ক'রে পঝ্‌দনিশেভ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে পড়লেন। উকিলবাবু তাঁর সঙ্গের মহিলাটিকে ফিসফিস করে কি যেন বলতে লাগলেন।

পঝ্‌দনিশেভের একেবারে পাশেই বসেছিলাম আমি। তখন এত অন্ধকার হয়ে এসেছে যে আর পড়া যায় না। অগত্যা চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার ভান করতে লাগলুম। পরের স্টেশন পর্যন্ত এরকম চুপচাপ কাটল।

পরের স্টেশনে উকিলবাবু তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে অন্য গাড়ীতে চলে গেলেন। গার্ডের সঙ্গে তাঁদের আগেই বন্দোবস্ত করা ছিল। দোকান কর্মচারিটি বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পঞ্চদনিশেভ সারাক্ষণ জেগে বসে একের পর এক সিগারেট ও চা খেয়ে যেতে থাকলেন। আমি চোখ খুলে তাঁর দিকে তাকাতেই হঠাৎ বিরক্ত গলায় বলে উঠলেন, "আমার পরিচয় জানার পর বোধহয় আপনার আমার সঙ্গে এক কামরায় থাকতে অসুবিধা হচ্ছে। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।"

আমি বললাম : 'না, না, অসুবিধার কি আছে?'

'তাহলে একটু চা খাবেন নাকি? এটা অবশ্য বড় বেশি কড়া হয়ে গেছে' বলে ভদ্রলোক আমার জন্য চা ঢালতে লাগলেন।

তারপর হঠাৎ ফুঁসে উঠলেন, 'শুধু কথা আর কথা, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে।'

ঠিক কি সম্পর্কে মন্তব্যটা করলেন বুঝতে না পেরে আমি প্রশ্ন করলাম।

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'প্রেমের কথা বলছি, মানে ওঁরা যাকে প্রেম বলেন, তার আসল চেহারার কথা। আপনি কি খুব ক্লান্ত।

'আদৌ না।'

'তাহলে আপনার আপত্তি না থাকলে ঐ প্রেম নামক অনুভূতিটির দ্বারা তাড়িত হয়ে আমি কি করেছিলাম, সে কথা বলব।'

'আপনার কষ্ট হবে না তো?'

কিছু না বলে চুপ করে থাকলে আমার আরও বেশি যন্ত্রণা হয়। নিন, চা খান। বড় বেশি কড়া হয়ে গেল, না?'

চা-টা সত্যিই প্রচণ্ড কড়া, প্রায় বীয়ারের মত। তা-ও এক গ্লাস খেলাম। ভদ্রলোক আবার কথা বলতে আরম্ভ করবেন, এমন সময় আমাদের পাশ দিয়ে গার্ড চলে গেলেন। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক তাঁর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তিনি চলে যাওয়ার পর নিজের কথা বলতে শুরু করলেন।

৩

'তাহলে শুরু করা যাক। কিন্তু আপনি কি সত্যিই শুনতে চান?'

আমি 'হ্যাঁ' বলায় ভদ্রলোক মিনিটখানেক অপেক্ষা করলেন। তারপর দু'হাতে নিজের মুখটা একবার মুছে নিয়ে আরম্ভ করলেন,

'একেবারে প্রথম থেকে শুরু করা ভাল। বিয়ের আগে আমি কি ধরনের লোক ছিলাম এবং কেন আমি বিয়ে করবো ঠিক করলাম—এই দুটো ব্যাপার বোঝা খুব জরুরী। বিয়ের আগে আমি আমাদের সমাজে অধিকাংশ ছেলে যেভাবে জীবন কাটায়, সেই ভাবেই কাটিয়েছি। আমার জমিদারি ছিল, প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছিল। বিয়ের আগে আর পাঁচটা বড়লোকের ছেলের মত আমিও অসংযমী জীবন যাপন করতাম এবং আর সকলের মত আমারও ধারণা ছিল যে এতে কোন অন্যায় নেই। নিজেকে আমি বেশ ভদ্র ও মার্জিত বলে মনে করতাম। আমার রুচি বিকৃত ছিল না। মেয়ে নাচিয়ে বেড়ানো বলতে যা বোঝায়, সেরকম ব্যাপারও বিশেষ করতাম না। সমবয়সী যুবকরা কেউ কেউ যেমন নারী সম্ভোগকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলে ধরে নিয়েছিল, সেরকম বাড়াবাড়ির মধ্যে আমি কখনও ডুবে যাইনি। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নিয়ম-মাফিক ভদ্রভাবে আমি শরীরের খিদে মিটিয়ে নিতাম। বাচ্চাকাচ্চার মা হয়ে পড়ে ঝামেলা পাকাতে পারে কিংবা বেশি জড়িয়ে পড়তে পারে, এরকম স্ত্রীলোকদের এড়িয়ে চলতাম। কখনও কখনও অবশ্য ছেলেপুলে হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। দু'একজন মহিলা একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন—এমন ঘটনাও যে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমি চোখ বুজে থাকতাম। এসব ব্যাপারে আমি নিজেকে দোষী বলে মনে করিনি কখনও। বরঞ্চ এক ধরনের অহংকারই বোধ করেছি।'

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক অভ্যাস মত সেই অদ্ভুত শব্দটা করলেন—কিছুটা চাপা হাসি আর কিছুটা চাপা কান্নার মত একটা অস্পষ্ট আওয়াজ। নতুন কোনও ভাবনা মাথায় এলেই তিনি ঐ শব্দটা করতেন। তারপর গলার স্বর একটু চড়িয়ে বললেন, 'এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে বীভৎস। যৌন-সংসর্গ আমার বিকৃত বলে মনে হয় না। কিন্তু যে স্ত্রীলোকটির শরীর ভোগ করলাম, তার সম্পর্কে নৈতিক দায়িত্ব অস্বীকার করা একটা জঘন্য বিকৃতি। অথচ এই নৈতিক দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারাটাকে আমি বাহাদুরি বলে মনে করতাম। একবার একটি মেয়ে আমাকে ভালবেসে তার শরীর দিয়েছিল। তাকে টাকা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম বলে কিছুদিন খুব বিবেক দংশন অনুভব করেছিলাম। তারপর কোন রকম নৈতিক দায়িত্ব না নিয়ে, শুধু টাকা পাঠিয়েই আবার আমার বিবেক শান্ত হয়ে গেল। আপনার ঘাড়

নাড়া দেখে মনে হচ্ছে এ ব্যাপারটাকে আপনি খুব স্বাভাবিক বলে মনে করছেন।' ভদ্রলোক হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, 'আপনারা ভুল করেছেন। আপনারা···আপনারা সবাই সমান। আপনাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ভাল, এমনকি তারাও, আমি আগে যেরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলাম, ঠিক সেই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন।' এ পর্যন্ত বলে আবার গলা নামিয়ে বললেন, 'কিন্তু তাতে কি আসে যায়? মাপ্ করবেন, নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। পুরো ব্যাপারটা আমার এত পাশবিক, এত বীভৎস বলে মনে হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এর মধ্যে বীভৎস কি দেখছেন?'

'মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা এমন প্রচণ্ড ভ্রান্তির মধ্যে বাস করি! এ ব্যাপারে কথা বলতে গেলে আমি আর স্বাভাবিক থাকতে পারি না। না, আমার জীবনে একটা প্রচণ্ড সঙ্কটের মুহূর্তে আমি যে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছি সেজন্য নয়। আসলে সেই দুর্ঘটনার পর আমার হঠাৎ কিরকম চোখ খুলে গেল। আমি সব কিছু নতুন করে—একেবারে সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে দেখতে পেলাম।'

ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়ে, সামনে ঝুঁকে আবার কথা বলতে শুরু করলেন। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে তাঁর গলার স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম—একজন আন্তরিক ও সহৃদয় মানুষের কণ্ঠস্বর।

৪

'প্রচণ্ড যন্ত্রণা পাওয়ার পর কিংবা বলা ভাল, যন্ত্রণা পেয়েছিলাম বলেই আমি এ পাপের একেবারে মূল পর্যন্ত দেখতে পাই। বুঝতে পারি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি ভয়ানক বীভৎস হয়ে উঠেছে। আসলে পুরো ব্যাপারটা কিরকম হওয়া উচিত, তাও বুঝতে পারি। আমি কি করে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম, তা বোঝাতে গেলে একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।

'ঘটনাটা যখন প্রথম ঘটল, তখন, আমি স্কুলের ছাত্র, সবে ষোলয় পড়েছি। দাদা সত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছে। তখনও পর্যন্ত নারীসম্ভোগ করি নি বটে, কিন্তু আমাদের ওপর মহলের আর পাঁচটা হতভাগা ছেলের মত আমারও অন্য ধরনের যৌন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বছর

ছয়েক ধরে আমি কয়েকজন বদ ছোকরার পাল্লায় পড়েছিলাম। ঐ বয়সেই মেয়ে দেখলে আমার শরীরে যন্ত্রণা হোত—বিশেষ কোন একটি মেয়ে নয়—যে-কেউ, যে-কোন মেয়ের আকর্ষণই আমার কাছে তীব্র মনে হোত—মেয়ে আর তার উলঙ্গ শরীর। একা থাকলেও এ আলোড়ন থেকে আমার নিস্তার ছিল না। আমাদের সমাজের অধিকাংশ ছেলের মত আমিও শরীরের ক্ষিদেয় ছটফট করতাম। যন্ত্রণায়, ভয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে অসহায়ভাবে পাপের মধ্যে তলিয়ে যেতাম। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শেষ গণ্ডিটুকু অতিক্রম করি নি। নিজেকে ধ্বংস করছিলাম, কিন্তু তখনও আমি অন্য কারুর দিকে হাত বাড়াই নি। কিন্তু হঠাৎ একদিন মদের আড্ডা শেষ হওয়ার পর দাদার এক বন্ধু প্রস্তাব করল, "সেখানে যাওয়া যাক্।" অভিজাত-সমাজে যাদের বেশ আমুদে বলে সুনাম থাকে, অর্থাৎ যেসব বখাটে ছোকরা মদ, জুয়া ইত্যাদি ব্যাপারে অন্যদের তালিম দেয়, দাদার বন্ধুটি সেই জাতের। আড্ডার পর আমরা সবাই 'সেখানে' গেলাম। দাদাও সেদিন প্রথম পাপ করল। আমার বয়স তখন পনের, কি করছি না বুঝেই আমি আমার নিজের ও একটি মেয়ের শরীর অপবিত্র করলাম। বড়রা কেউ তো কখনও বলে দেয়নি যে এসব কাজ অন্যায়—আজকালকার দিনেও এ কথা কেউ বলে দেয় না। 'টেন কমাণ্ডমেণ্টস্' অবশ্য পড়েছিলাম, কিন্তু সে তো শুধু বাইবেল সোসাইটির পরীক্ষায় ধর্মযাজকের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য। তাছাড়া খুব ভালভাবেই জানতাম যে টেন কমাণ্ডমেণ্টস্ সম্পর্কে জানা, ব্যাকরণে বিভক্তি ব্যবহার জানার চাইতে অনেক কম জরুরী। গুরুজনদের মধ্যে যাঁদের মতামতের মূল্য দিতাম, তাঁরা কেউ কখনও আমাদের সাবধান করেন নি। উল্টে যে সব লোকেদের আমরা ভক্তি-শ্রদ্ধা করতাম, তাঁদের কথা শুনে মনে হোত আমরা ঠিক পথেই চলেছি। শুনে-ছিলাম মৈথুনের পর নাকি আর কোন বিক্ষোভ বা যন্ত্রণা থাকবে না। লোকের মুখে এসব কথা শুনতাম, বইতেও পড়তাম। বড়রা বলতেন স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য শারীরিক ক্ষুধার নিবৃত্তি নাকি অপরিহার্য। যাঁরা এসব ব্যাপার করতেন, আমার বন্ধু-বান্ধবরা, তাঁদের খুব বুদ্ধিমান ও আধুনিক বলে তারিফ করত। সুতরাং এসব ব্যাপারে আমার কোন পাপবোধ ছিল না। তাহলে বাকি থাকে যৌনব্যাধির ভয়। তা সে ব্যাপারেও কোনও অসুবিধা ছিল না। গভর্নমেন্ট সদয়। বেশ্যাবাড়ি পরিদর্শনের জন্য মোটা মাইনে দিয়ে

ডাক্তার রেখে তাঁরা স্কুলের ছাত্রদের নিরাপদ ব্যভিচারের পথ প্রশস্ত করে রেখেছিলেন। শুধু তাঁদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। গোটা সমাজেই অসংযম ব্যাপারটা স্বাস্থ্যপ্রদ ও স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং যৌন-রোগ নিয়ন্ত্রণই এ ব্যাপারে একমাত্র কর্তব্য বলে গণ্য হোত। এমনকি মা ছেলের এসব ব্যাপারে তদারক করছেন, এমন ঘটনার কথাও জানি। সুতরাং বিজ্ঞানের আশীর্বাদ নিয়ে অল্প বয়সী ছেলেরা দলে দলে বেশ্যাবাড়ী যেতে লাগল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিজ্ঞানের আশীর্বাদ মানে?'

'বাঃ, চিকিৎসকরা বিজ্ঞানী নন? এইসব বিজ্ঞানের উপাসকরাই তো আমাদের বুঝিয়েছেন যে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যৌন-সংসর্গ অপরিহার্য। এহেন সদুপদেশ দেওয়ার পর তাঁরা সব গম্ভীর মুখে সিফিলিসের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করেছেন।'

'তাহলে আপনি কি বলছেন, সিফিলিসের চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত?'

'সিফিলিস সারানোর জন্য যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করা হয়, ব্যভিচার বন্ধ করার জন্য তার দশ ভাগের এক ভাগ পরিশ্রম করা হলে দেশ থেকে বহুদিন আগে সিফিলিস রোগ অন্তর্হিত হোত। কিন্তু আমরা অসংযম দূর করার চেষ্টা করি না। অসংযমী জীবনযাত্রাকে নিরাপদ করে তুলি। অসংযমকে প্রশ্রয় দিয়ে যাই। কিন্তু সে কথা থাক্। আসলে যে কথাটা খুব স্পষ্টভাবে বোঝাতে চাই, তা হল এই যে বিশেষ কোন একটি মেয়ের মোহে পড়ে আমি পাপ করিনি। আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক, এমন কি কৃষকরাও পাপ করে কোনও বিশেষ স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পড়ে নয়—পাপ করে সমাজের দোষে। আমাদের চারপাশের লোকেদের ব্যভিচার সম্পর্কে কোনও ঘেন্না ছিল না। কেউ এটা যৌবনের ধর্ম, কেউ বা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলে মেনে নিয়েছিল। এ ধরনের পাপ যে শুধু ক্ষমার যোগ্য বলে গণ্য হোত তাই নয়, অল্প বয়সী ছেলেদের অসংযম সকলের কাছেই খুব স্বাভাবিক বলে মনে হোত। আমি নিজেও একে পাপ বলে জানতাম না। কতকটা ফুর্তির জন্য, কতকটা যৌবন ধর্মের (অন্ততঃ আমাদের তাই বলা হয়েছিল) বশে শরীরের ক্ষিদে মেটানোর তাগিদে আমি এই ধরনের ব্যাপার চালিয়ে যেতে লাগলাম—ঠিক যেমন

কিছু না ভেবেচিন্তে সিগারেট আর মদ ধরেছিলাম তেমন করেই। তবু প্রথম রাত্রে খুব মন খারাপ লেগেছিল। মনে আছে, সে ঘর থেকে বেরোনোর আগেই আমার কান্না পেয়েছিল। চিরদিনের মত আমার জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেল, মেয়েদের সঙ্গে সুন্দর সহজ সম্পর্কের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল আমি লম্পট বনে গেলাম। লম্পটের শারীরিক অবস্থা অনেকটা ধূমপায়ী, মাতাল বা আফিমখোরের মত! মাতাল বা আফিমখোর যেমন স্বাভাবিক মানুষ নয়, ব্যভিচারীকেও তেমন ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। মাতাল বা গাঁজাখোরের চেহারা দেখলেই যেমন ধরে ফেলা যায়, লম্পটের হাব-ভাব দেখলেও তাকে তেমনই নির্ভুলভাবে চেনা যায়। লম্পট লালসা দমন করার চেষ্টা করতে পারে, প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে—কিন্তু কোন মেয়ের সঙ্গে সরল, নিষ্পাপ, পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করা তার পক্ষে অসম্ভব। যুবতী মেয়ের দিকে তাকানোর মুহূর্তেই লম্পটের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে—তার চোখের দৃষ্টিতে স্বভাব প্রতি-ফলিত হয়ে ওঠে। সেই রাত্রের পর থেকে আমি চিরজীবনের মত পুরোদস্তুর লম্পট বনে গেলাম। আর ব্যভিচার আমার সমস্ত জীবনটাকে একেবারে তছনছ করে দিল।

৫

'এইরকম করেই দিনটিন কেটে যাচ্ছিল আর কি। আমি এক অভিজ্ঞতাকেই নতুন নতুন ভাবে চাখছিলাম। হা ঈশ্বর! সেই জন্তুর মত জীবনের কথা ভাবলেও এখন আমার ভয় হয়। মনে আছে, বন্ধুরা আমাকে নিষ্পাপ কল্পনা করে ঠাট্টা করত। বড় বড় অফিসার ভদ্দরলোক সব, পারীর সম্ভ্রান্ত যুবকের দল এবং আমি নিজেও তিরিশ বছর বয়সেই পাকা-পোক্ত বদমাইশ তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম—মেয়েদের সম্পর্কে দিনের পর দিন অজস্র অন্যায়, অজস্র অপরাধ করে যাচ্ছিলাম। অথচ বাইরের পবিত্র-সুন্দর যৌবনের প্রতিমূর্তি। আমরা সবাই সুপুরুষ, পরিষ্কার করে কামানো দাড়ি গোঁফ, ঝকঝকে চেহারা, ফর্সা ধপ্ধপে কেতাদুরস্ত পোশাক পরে আমরা ভদ্রলোকের বাড়ির বৈঠকখানায়, নাচের আসরে ঘুরে বেড়াতাম।

'পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিটা কিরকম গোলমেলে ভেবে দেখুন। ধরা যাক্,

এই ধরনের একজন ভদ্রলোক আমার বোন কিংবা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এল! আমি নিজে তো খুব ভাল করেই জানি যে এরা কি ধরনের জীবন যাপন করে! আমার তো উচিত তাকে সোজা গিয়ে বলা, "দেখ, আমি জানি তুমি কি ধরনের লোক। তুমি কি কর, কোথায় রাত কাটাও, সব আমার জানা আছে। আমার পরিবারের মেয়েরা সরল, নিষ্পাপ। এ বাড়িতে তুমি আর এসো না।"

'আমার তো এদের বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া উচিত। কিন্তু আসলে কি হয় জানেন? যদি দেখি যুবকটির বিষয়-আশয় আছে, তাহলে তাকে আমার বোন কিংবা মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে নাচতে দেখলে আমরা মনে মনে খুশি হই। মনে হয়, রিগলবুশের বেশ্যাবাড়িতে রাত কাটিয়ে আসার পরও যদি সে আমার মেয়ের দিকে নজর দেয়, তাহলেও ভাল। যুবকটি খারাপ রোগে ভুগছে জানলেও আমাদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। কারণ আজকাল তো এ সব রোগ সারানো খুবই সহজ। অনেক নামজাদা সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাবা-মা পাত্রের সিফিলিস্ আছে জেনেও তার সঙ্গে নিজেদের মেয়ের বিয়ে দেন। ভেবে দেখুন কী ঘৃণ্য কী বীভৎস! এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে যখন এইসব নোংরা, ভণ্ড প্রতারকদের মুখোশ খুলে যাবে।'

ভদ্রলোক তাঁর অভ্যাস মত সেই অদ্ভুত শব্দটা করে চা খেতে লাগলেন। চা-টা প্রচণ্ড কড়া, জল দিয়ে পাতলা করে নেওয়ার উপায়ও ছিল না। গরম জল ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি যে দু গ্লাস খেয়েছিলাম তার ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখছিলাম। ভদ্রলোক নিজেও সম্ভবতঃ কড়া চায়ের প্রভাবেই ক্রমাগত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তিনি কথা বলছিলেন একটানা সুরে অথচ গলার স্বরে তাঁর সমস্ত অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছিল। ভদ্রলোক অস্থিরভাবে অনবরত বসার জায়গা বদলাচ্ছিলেন। হঠাৎ টুপি খুলে রাখছিলেন, আবার পরমুহূর্তেই সেটা পরে ফেলছিলেন। সেই আধা-অন্ধকার কামরাতে বসেও আমি তাঁর মুখে বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছিলাম।

ভদ্রলোক আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ঐ একই রকমভাবে কাটালাম। অথচ সব সময়ই ভাবতাম, বিয়ে করব আর বিয়ের পর সুস্থ সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়ে তুলব। সেজন্য উপযুক্ত পাত্রীও

খুঁজছিলাম। আমি নিজে ব্যভিচারী কিন্তু পাঁকের মধ্যে গড়াগড়ি দিতে দিতেও চাইতাম যে একটি সরল, অপাপবিদ্ধ মেয়ে যেন আমার স্ত্রী হয়। অবশেষে আমার পছন্দসই একজনকে খুঁজে পাওয়া গেল। পেনজারের এক জমিদারের মেয়ে—অবস্থা এককালে খুবই সচ্ছল ছিল, এখন পড়ে এসেছে।

'সারাদিন নৌকা বাওয়ার পর একদিন চাঁদনি রাতে আমরা দুজন বাড়ি ফিরছিলাম। ওর পাশে বসে মুগ্ধ হয়ে ওর কোঁকড়া চুল আর আঁটসাঁট পশমী জামায় ঢাকা শরীর দেখতে দেখতে আমি ঠিক করলাম, ও-ই আমার পাত্রী হওয়ার উপযুক্ত। মনে হল ওকে ঘিরে আমার যতকিছু চিন্তা, অনুভূতি—সবই যেন বড় পবিত্র, মনে হল আজ সন্ধ্যায় ও আমার সমস্ত কথা বুঝতে পেরেছে। আসল কথা, কোঁকড়া চুল ও পশমী জামায় ওকে দারুণ দেখাচ্ছিল। আর সারাদিন ওর সান্নিধ্যে থাকার পর আমি আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইছিলাম।

'ভাবতে অবাক লাগে সুন্দর লোক দেখলে অমনি আমরা কিরকম বোকার মত ভেবে নিই যে সে নিশ্চয়ই ভাল লোক। সুন্দরী মহিলা নিছক আবোল-তাবোল বকে গেলেও আমরা ধৈর্য ধরে শুনি, মনে হয় দারুণ বুদ্ধিমতীর মত কথা বলছে। সে অন্যায় করলেও অন্যায় বলে মনে হয় না। আর দৈবক্রমে যদি কোন সুন্দরী মেয়ে একটু সাজিয়ে কথা বলতে পারে, তক্ষুণি আপনি ধরে নিতে বাধ্য যে জ্ঞানে-বুদ্ধিতে নিষ্ঠায় পবিত্রতায় সে একেবারে অনন্যা।

'একটা অদ্ভুত আবেশ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। মেয়েটি যে পরম নিষ্ঠাবতী ও আমার উপযুক্ত পাত্রী, এ সম্পর্কে একেবারে স্থিরনিশ্চিত বোধ করে পরের দিনই বিয়ের প্রস্তাব করলাম।

'পুরো ব্যাপারটা কি প্রচণ্ড ভণ্ডামি, ভেবে দেখুন। বিয়ের আগে একশ কিংবা হাজার বার ডনজুয়ানি খেলা খেলেনি এমন ছেলে আপনি হাজারে একটি পাবেন কিনা সন্দেহ (শুধু বড়লোক নয়—গরীবদের ঘরেও ঐ একই অবস্থা)। আজকাল অবশ্য দু'চারজন ভদ্রছেলেও চোখে পড়ে, বিয়েকে তাঁরা একটা পবিত্র ব্যাপার বলে মনে করেন। ভগবান তাঁদের ভাল করুন। কিন্তু আমাদের যৌবনকালে এমন লোক লাখে একটা ছিল কিনা সন্দেহ। এসব কথা জেনেও সকলে ন্যাকা সাজে। উপন্যাসে সুন্দরী নায়িকার জন্য নায়কের মহৎ প্রেমের কথা বলা হয়। তারা যে বাগানে

বসেছে, যে-সব নদীর তীরে তীরে বেড়িয়েছে, সেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়। কিন্তু এই মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত নায়কটি কি করে বেড়িয়েছে সে সম্পর্কে কোন কথা বলা থাকে না। ঝি, রাঁধুনি, বাজারের মেয়েমানুষ এবং অন্যের বউ নিয়ে সে যেসব ব্যভিচার করে বেড়িয়েছে, তার বর্ণনা দেওয়া থাকে না কোথায়ও। কোন উপন্যাসে এ-সব কথা লেখা হলে সেটিকে লোকে অশ্লীল বলে মনে করে। নিজের পরিবারের সরল, নিষ্পাপ মেয়েদের হাতে সেগুলি কেউ তুলে দেয় না। অথচ এ-সব ব্যাপারে মেয়েদেরই বেশি করে জানা উচিত, ভাল করে বোঝা উচিত।

'আমাদের সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যভিচার ছড়িয়ে আছে। অথচ গুরুজনরা মেয়েদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে এ-সব ঘটনা আদৌ ঘটে না। ক্রমশঃ তারা নিজেরাও এই ধরনের আত্মপ্রতারণায় অভ্যস্ত হয়ে যান। তারপর ইংরাজদের মত বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে সমাজটায় কোন নোংরামি নেই এবং তাঁদের নিজেদের নীতিবোধ একেবারে দারুণ উন্নত-মানের। অল্পবয়সী অনভিজ্ঞ তরুণীরাও এইসব কথা সত্যি বলে ধরে নেয়। আমার স্ত্রীরও জগৎ সম্পর্কে এই রকম ভ্রান্ত ধারণা ছিল। মনে আছে, বাক্‌দানের পর তাকে আমার ডায়েরী দেখিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল ডায়েরী পড়ে সে আমার অতীত জীবনের অন্ততঃ খানিকটা আভাস পাক। জানতাম্ এর ওর কাছ থেকে আমার সম্পর্কে নানা কথা শুনবে। তার চেয়ে আমার নিজের মুখ থেকে জানাই ভাল হবে বলে মনে হয়েছিল। ডায়েরী পড়ে ও অবাক হয়ে গেল। হতাশায়, ভয়ে দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়ল। বুঝতে পারলাম ও আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চাইছে। এখন মনে হয়, তা-ই করলেই বোধ হয় ছিল ভাল।'

ভদ্রলোক আবার সেরকম অদ্ভুত শব্দ করলেন, তারপর কথা বন্ধ করে চা খেতে লাগলেন।

৬

'কিন্তু না, আমি আক্ষেপ করব না। যা হয়েছে তা ঠিকই হয়েছে। আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে।...যাক্ যে কথা বলছিলাম, এই ধরনের বোকা, সরল, অল্পবয়সী মেয়েগুলোই শুধু ঠকে মরে। তাদের মায়েরা খুব ভাল করেই জানেন যে কিসে কি হয়—বিশেষ করে সেই সব মা যাঁর

সরাসরি তাঁদের স্বামীদের কাছ থেকে সব কথা শুনেছেন। কিন্তু তাঁরাও ভান করেন যে পুরুষদের সততায় তাঁদের আস্থা আছে। অথচ আসলে ব্যাপারটা একেবারে আলাদা। নিজের বা মেয়ের জন্য একজন শাঁসালো ভদ্রলোক গাঁথতে হলে কি ধরনের টোপ ফেলতে হবে, তা তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন। জানি না শুধু আমরা, মানে পুরুষরা। কারণ আমরা জানতে চাই না অভিজ্ঞ মহিলারা ভাল করেই বোঝেন যে কোন মেয়ের নৈতিক গুণাবলী দেখে কোন পুরুষের মনে তথাকথিত উন্নত ও কাব্যিক প্রেমের জন্ম হয় না। প্রেম গজায় শারীরিক সান্নিধ্য থেকে, চুলের ছাঁট আর ফ্রকের মাপজোখ দেখে। ধরুন, কোন ঝানু বেশ্যার সামনে আপনি দুটি বিকল্প প্রস্তাব রাখলেন—যে ভদ্রলোককে সে পাকড়াতে চায়, হয় তাঁর সামনে মেয়েটিকে কেউ নিষ্ঠুরতা, প্রতারণা ও নৈতিক বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত করবে, নয় তাকে একটা বদখত বেঠিক মাপের গাউন পরে সেই ভদ্রলোকের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। বাজি রেখে বলতে পারি মেয়েটি সব সময় প্রথম ঝুঁকিটা নিতে রাজী হবে। সে জানে, আমরা, ভদ্রলোকেরা যতই বড় বড় কথা বলি না কেন, আমরা আসলে শরীর চাই। নৈতিক অপরাধ আমরা ক্ষমা করতে পারি কিন্তু বেঠিক মাপের গাউন প'রে এসে দাঁড়ালে সর্বনাশ। বেশ্যারা এটা বোঝে বুদ্ধি খাটিয়ে, সচেতনভাবে, আর ভদ্রবাড়ির সরল মেয়েরা বোঝে জন্তুর মত করে, সহজাত সংস্কার দিয়ে।

'আঁটসাঁট জার্সি কিংবা হাত-কাঁধ খোলা বুক আর নিতম্বের গড়ন দেখানো পোশাক পরার এ-ই হল আসল কারণ। মেয়েরা, বিশেষ করে যে সব মেয়েদের পুরুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে,তাঁরা জানে যে উন্নত ধরনের কথাবার্তা শুধু কথা-ই। পুরুষ আসলে চায় শরীর এবং যৌন-আকর্ষণ। সুতরাং তারা সেই রকম করেই পুরুষদের কাছে নিজেদের মেলে ধরে প্রচলিত ধারণা ও অভ্যাস যা প্রায় আমাদের স্বভাবের অন্তর্গত হয়ে গেছে, তার থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে, চোখের ঘোর কাটলেই দেখবেন, পুরো সমাজটা একটা বিরাট বেশ্যাবাড়ি। কি, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাব।' এই বলে ভদ্রলোক একটু থামলেন। তারপর আমাকে কোন মন্তব্য করার সুযোগ না দিয়েই আবার বলে উঠলেন, 'আপনার ধারণা আমাদের সমাজের মেয়েরা বেশ্যাদের মত নয়? তাদের অন্য অনেক ধরনের আগ্রহ আছে? ভুল, একেবারে ভুল।

সত্যিই যদি তাদের ভিতরের জীবনটা আলাদা ধরনের হোত, সত্যিই যদি তাদের পুরুষ-ধরা ছাড়া অন্য আরও অনেক ব্যাপারে উৎসাহ থাকত, তাহলে তো তাদের বাইরের চেহারাটাও আলাদা হোত। কিন্তু যে সব হতভাগ্য মেয়েদের আমরা বেশ্যা বলে ঘেন্না করি, তাদের আর আমাদের অভিজাত সমাজের যুবতী মেয়েদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখুন। সেই এক প্রসাধন, এক ফ্যাশান, এই ধরনের সুগন্ধ, সেই দামী চকচকে পাথরের গয়না, হাত-কাঁধ বুক-খোলা জামা, পিছন দিকটা অস্বাভাবিকভাবে উঁচু করে রাখা। সেই একভাবে নাচ-গান-বাজনা নিয়ে সময় কাটানো সব এক। পুরুষদের লোভ দেখানোর জন্য সব মেয়েই এক অস্ত্র ব্যবহার করে। খুব খুঁটিয়ে দেখলে এই দু'দলের মধ্যে শুধু একটা তফাত—যারা অল্প সময়ের জন্য বেশ্যাবৃত্তি করে তাদের আমরা ঘেন্না করি আর যারা বিয়ে করে দীর্ঘদিনের জন্য করে, তাদের সম্মান দেখাই।

৭

'কাজেকাজেই আমি কোঁকড়া চুল, জার্সি আর শরীরের চড়াই-উৎরাই দেখে পটকে গেলাম। তাছাড়া আমাকে গাঁথা এক হিসেবে খুব সহজ ছিল —আমি এমন একটা পরিবেশে মানুষ হয়েছিলাম, যেখানে অল্পবয়সী ছেলে-দের প্রেমে পড়ার ঝোঁকটাকে খুব তাতিয়ে রাখা হয়। গাদাগাদা উত্তেজক খাবার, মদ আর সারাদিন ধরে নিটোল আলস্য—এর মধ্যে থাকলে শরীরের লালসা যে বাড়বে তার আর আশ্চর্য কি? আপনার খুব অবাক লাগছে জানি কিন্তু কথাটা সত্যি। এই সেদিন পর্যন্ত আমিও এই সহজ কথাটা বুঝতে পারতাম না। সেইজন্যই যখন দেখি লোকে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না কিংবা ঐ মহিলার মত কতকগুলো সস্তা, বাজার-চলতি কথা আউড়ে যাচ্ছে, তখন এত উত্তেজিত বোধ করি। এ বছর বসন্তের শুরুতে আমার বাড়ির কাছেই কয়েকজন চাষী রেল লাইনে কাজ করছিল সাধারণতঃ চাষীঘরের অল্পবয়সী ছেলেদের দৈনিক খাদ্য হ'ল রুটি, পেঁয়াজ আর বীয়ার। এই খেয়েই তারা বেশ সুস্থ সবল থাকে, খুশি মনে ক্ষেতে কাজ করে। রেল লাইনে কাজ করতে এলে তখন তারা পরিজ আর এক পাউণ্ডমত মাংস খায়। দিন ষোল ঘণ্টা গায়ে খেটে, ভারি ওজন তুলে সে মাংস তার আপসে হজম হয়ে যায়। এক্ষেত্রে খাটুনির পক্ষে খাবারটা ঠিকই

আছে। কিন্তু আমরা দু'পাউণ্ড মাংস, ডিম, এছাড়া অন্যান্য বেশি ক্যালোরির খাবার এবং মদ খেয়ে খেয়ে যে শক্তি সঞ্চয় করি সেটা খরচ করি কিসে? ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আতিশয্যে। সত্যিই যদি তাতে পুরোটা খরচ হয়ে যেত তাহলে কোন ঝামেলা ছিল না। সেফটি ভাল্‌ভের মত কাজ করত। কিন্তু সব সময় তো তা ঠিক হয় না। মাঝে মাঝে তো সেফ্‌টিভাল্‌ভ বন্ধ হয়ে যায়। যেমন আমারও গিয়েছিল। তখন ঐ পুরো জমানো শক্তিটা যৌন উত্তেজনার রূপ নেয়। আমাদের কৃত্রিম জীবনযাত্রার ভ্যাপ্‌সা আবহাওয়ার মধ্যে থেকে ঐ যৌন উত্তেজনা এক ধরনের অতি সূক্ষ্ম প্রেমের চেহারা নেয়—কখনও কখনও এমন কি প্লেটোনিক প্রেমেও পরিণত হয়। আমিও আর পাঁচজনের মত ঠিক এই কারণেই প্রেমে পড়েছিলাম। সে প্রেমে সব রকমের রোমান্টিক উপাদান ছিল—আবেগ, কাব্য, দেবীপূজার মত গদগদ ভাব। অথচ আসল ব্যাপারটা এই যে একপক্ষে মেয়েব মা আর দর্জি এবং অপর পক্ষে রাশি রাশি অপ্রয়োজনীয় খাবার এবং আলস্য—এই কটি উপাদান একসঙ্গে জোটার ফলে আমার প্রেমের জন্ম হল। অর্থাৎ একদিকে আমরা যদি সেদিন সারাদিন নৌকায় না বেড়াতাম, দর্জি যদি মেয়েটিব কোমব ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গের খাঁজগুলি অমন তীক্ষ্ণ করে ফুটিয়ে না তুলত, আমার হবু স্ত্রী যদি একটা ঝলমলে আলখাল্লার মত গাউন পরে বাড়িতে বসে থাকত, এবং অন্যদিকে আমি আমাব খাটুনিমত খাবাব খেতুম এবং আমার ইন্দ্রিয় তৃপ্তিব অন্য পথ তখন খোলা থাকত (ঠিক ঐ সময় সেটা কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল) তাহলে আমি প্রেমেও পড়তাম না, আমার জীবনে কোন বিপর্যয়ও হোত না।

৮

'কিন্তু প্রেমে পড়ার উপযোগী সমস্ত উপাদানই একসঙ্গে জুটে গেল—আমাব তখনকার শরীরের অবস্থা, মেয়েটির প্রসাধন আর নৌকা-বিহারের সান্নিধ্য। আগে বহুবার যোগাযোগ হয়েও ফস্‌কে গেছে, এবার ঠিক লেগে গেল। আমি ফাঁদে পড়লাম। ঠাট্টা করছি না। আমাদের যুগে বিয়েটা ফাঁদ ফেলার মতই পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার ছিল। ব্যাপারটা কি রকম হলে স্বাভাবিক হোত বলুন তো? বয়স হলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। মেয়েটি যদি ভয়ঙ্কর রকমের কুৎসিত না হয়, আর হাতের

কাছে যদি পাত্র থাকে তাহলে তো ব্যাপারটা খুবই সাদাসিধে। আগেকার দিনে সেই রকমই হোত। মেয়ের বিয়ের বয়স হলে বাবা-মা পাত্র খুঁজে দিতেন। অন্য বহু দেশে যেমন ধরুন চীনে, ভারতবর্ষে, কিংবা মুসলমানদের মধ্যে, এমন কি আমাদের দেশের চাষীদের ঘরেও এখনও এইভাবেই মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়। পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বই ভাগ লোকই এমনি করে বিয়ে করে। কেবল শতকরা একভাগ লোক, আমাদের মত যত অসংযমী লোকেরা হঠাৎ স্থির করলাম যে এটা ভাল নয়। একটা নতুন পদ্ধতি ভেবে বার করলাম। কি পদ্ধতি? না, মেয়েরা সব বসে থাকবে আর ভদ্রলোকরা তাদের সামনে দিয়ে দেখতে দেখতে যাবে—মেলায় জিনিস কেনার মত করে পরখ করবে। মেয়েরা অপেক্ষা করতে করতে বলে—চেঁচিয়ে বলার সাহস নেই বলে মনে মনেই বলে, 'আমাকে নাও, ওকে নয়, আমাকে নাও। দেখ আমার কী সুন্দর কাঁধ, সুন্দর সুন্দর···আরও অনেক কিছু আছে আমার।' আমরা দেখি, আমাদের জন্য এমন একখানা হাট বসানো হয়েছে ভেবে খুশি হয়েই দেখি। তারপর একটু অসাবধান হলেই ব্যস. ফাঁদে পড়ে যাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এছাড়া আর উপায় কি আছে? আপনি কি চান মেয়েরাই আগ বাড়িয়ে আসবে?'

'অন্য ঠিক কি উপায় আছে বলতে পারি না। তবে সমান অধিকারের কথা যদি বলেন, তাহলে দু'পক্ষেরই সত্যিকারের সমান অধিকার থাকা উচিত। বাবা-মা সম্বন্ধ করে বিয়ে দেওয়া যদি অপমানজনক বলে ধরা হয় তাহলে এইরকম হাট সাজিয়ে বসে থাকাটা মেয়েদের পক্ষে হাজার গুণ বেশি অপমানজনক। বাবা-মা দেখে শুনে বিয়ে দিলে অন্ততঃ দু'পক্ষেরই অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি প্রায় সমান সমান থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে মেয়েদের অবস্থা দাঁড়ায়, হয় বঁড়সিতে গাঁথা টোপের মত, নয় বাজারে বিক্রির জন্য আনা দাসের মত। এসব ক্ষেত্রে আপনি যদি সাহস করে মেয়েকে বা তার মাকে বলেনযে তাদের আসল উদ্দেশ্য পাত্র যোগাড় করা, ওরে সাবাশ্! সব একেবারে রেগে টং হয়ে যাবে। অথচ আসলে মেয়েটি কিন্তু স্বামী-শিকারই করছে—এছাড়া তার আর কিছু করার নেই। দেখলে মায়া লাগে, অল্পবয়সী সরল মেয়েরা কি করে শুধু এই নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকে। এসব কিন্তু কেউ খোলাখুলিভাবে করবে না—পুরো ব্যাপারটাই হবে লুকিয়ে-

চুরিয়ে, ঢেকেঢুকে। সত্যি অরিজিন অফ্ দ্য স্পিসিস্ বইটা কি দারুণ! লিজ্জা তো ছবি আঁকার নামে একেবারে পাগল। আপনিও অমুকের ছবির প্রদর্শনীতে যেতে চান? ওসবে সত্যি কিন্তু খুব জ্ঞান বাড়ে! স্লেজে চড়ে বেড়াবেন? নাটক দেখবেন? গানের আসরে যাবেন? দারুণ ব্যাপার, সত্যি! লিজ্জা তো গান বলতে একেবারে অজ্ঞান। আপনার সঙ্গে ওর মতের মিল না হওয়াটাই আশ্চর্য! আর নৌকাচড়া, সে তো একটা অপূর্ব ব্যাপার।' এত সব বক্‌বক্ করে যাচ্ছে তো? কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল আমাকে নাও। নয়তো আমার মেয়েকে নাও। না, না, আমাকে। একবার দেখই না চেষ্টা করে। 'ওফ্, ভগবান এত মিথ্যে! এমন জঘন্য ব্যাপার!'

কথা শেষ করে ভদ্রলোক তলানি চাটুকু খেলেন, তারপর গ্লাসগুলো সরিয়ে রাখতে লাগলেন।

৯

ভদ্রলোক থলির মধ্যে চা, চিনি ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'আপনি বোধ হয় বোঝেন যে এ সবেরই মূল হল মেয়েদের ওপর পুরুষদের আধিপত্য। এই একটা ব্যাপার যে পৃথিবীতে কত অশান্তি সৃষ্টি করছে তা বলে শেষ করা যায় না।

'মেয়েদের ওপর আধিপত্য মানে? আইন পুরুষদের বেশি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে—এই কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, তাই'। ঠিক এই কারণেই মেয়েরা অবমাননার নিম্নতম স্তরে গিয়েও উল্‌টে পুরুষদের ওপর আধিপত্য করতে চায়, একদিকের অধিকারহীনতা অন্যদিক দিয়ে পুষিয়ে নিতে চায়। ইহুদিদের ওপর যত অত্যাচার করা হয়, সে সবের ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য তারা টাকার জোর খাটায়। তারা ভাবে, 'ঠিক আছে, মহাজন হওয়া ছাড়া যখন আমাদের আর কোন গতি নেই, তখন মহাজন হয়েই আমরা তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করব।' মেয়েরাও তেমনি ভাবে, 'পুরুষরা তো চায় যে আমরা শুধু তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যন্ত্র হয়ে থাকি। ঠিক আছে তাই হবে, পুরুষের শরীরে ক্ষিদে মেটানোর যন্ত্র হয়েই আমরা তাদের চাকর বানাবো। মেয়েরা যে ভোট দিতে পারে না কিংবা বিচারক হতে পারে না, এগুলো কোন বড় ব্যাপার নয়। আসল সমস্যা হল

এই যে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে তারা পুরুষদের সমান অধিকার পায় না। পুরুষদের কাছে নিজেকে দেওয়ার ব্যাপারেও মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছামত হ্যাঁ বা না বলতে পারে না। পুরুষরা কখন মনোনীত করবে, এ অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজের ইচ্ছামত পুরুষ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও তাদের নেই। আপনি বলবেন মেয়েরা পুরুষদের বেছে নেবে, পুরুষদের পক্ষে এটা একটা অত্যন্ত অবমাননার ব্যাপার। বেশ, তাহলে পুরুষদেরও এই রকম কোন অন্যায় অধিকার থাকা উচিত নয়। বর্তমানে পুরুষরা যে স্বাধীনতা পায়, মেয়েরা তা থেকে বঞ্চিত। সেইজন্যই সমান অধিকার নেই বলেই বাঁকাপথে পুরুষদের যৌন লালসা খুঁচিয়ে তুলে মেয়েরা তাদের সম্পূর্ণ বশে রেখে দেয়। তাই বাইরে থেকে দেখতে গেলে যদিও মনে হয় যে নির্বাচনটা পুরুষরাই করছে, আসলে কিন্তু তুরুপের তাস মেয়েদেরই হাতে। নিজেদের শক্তির উৎসটা একবার বুঝে গেলেই মেয়েরা সব লোকের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য সেই শক্তির সুযোগ নিতে আরম্ভ করে।'

'শক্তির প্রকাশটা আপনি দেখেছেন কোথায়?'

'কোথায় নয়? সব জায়গায়। বড় বড় শহরে নাম করা দোকানগুলোয় গিয়ে দেখুন—রাশি রাশি জিনিস। লক্ষ লক্ষ লোক পরিশ্রম করে সেই সব জিনিস তৈরী করছে। এর মধ্যে কটা জিনিস পুরুষদের ব্যবহারের জন্য তৈরি? যাবতীয় বিলাসের উপকরণ তৈরী হয় মেয়েদের ভোগের জন্য। অজস্র লোক সারা জীবন ধরে অনর্থক পরিশ্রম করে আসবাবপত্র, গাড়ী, গয়না এবং আরও নানা টুকিটাকি তৈরি করে যাচ্ছে। মেয়েদের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য লাখে লাখে লোক ফ্যাক্টরিতে দিবারাত্র দাসের মত খেটে চলেছে। মহিলারা রানীদের মত পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোককে দাস বানিয়ে রেখেছে। নিজেরা অপমানিত ও বঞ্চিত বলেই মেয়েরা অন্যদের ওপর এত অত্যাচার করে। আমাদের ফাঁদে ফেলে, আমাদের অনুভূতি নিয়ে খেলা করে মেয়েরা তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেয়। আমাদের অনুভূতির রাজ্যে প্রভুত্ব করার জন্য মেয়েরা নিজেদের এমন শানিত অস্ত্রের মত করে ব্যবহার করতে পারে যে তারা কাছে থাকলে কোন পুরুষ মানুষের পক্ষে মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখা কঠিন। কোন মহিলার সঙ্গে একা থাকলে অধিকাংশ পুরুষমানুষেরই কেমন যেন একটা নেশাগ্রস্তের মত অবস্থা হয়। আগে আগে বলনাচের পোশাক পরা কোন মহিলাকে দেখলে

আমি কিরকম যেন কুঁকড়ে যেতাম, অস্বস্তি বোধ করতাম। এখন ঐ ধরনের মহিলা দেখলে আমার ভয় করে। কেমন বিপজ্জনক বলে মনে হয়—মনে হয় পুলিশ ডেকে বলি, এদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান, ঘরে বন্ধ করে রাখুন।'

আমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক চীৎকার করে বলে উঠলেন, আপনি হাসছেন? ব্যাপারটা আদৌ হাসির নয়। আমার ধারণা অল্পদিনের মধ্যেই লোকে বুঝতে পারবে যে পুরুষদের প্রলোভন দেখানোর জন্য মেয়েদের সাজ-সজ্জা করার ব্যাপারটা কী সাংঘাতিক। এমন একটা বিপজ্জনক ব্যাপার যে কি করে এতদিন সমাজের প্রশ্রয় পেয়ে এল, এই ভেবে তারা অবাক হয়ে যাবে। এটা তো প্রায় ইচ্ছা করে পুরুষদের পথে পথে ফাঁদ পেতে রাখার মত। আইন করে জুয়াখেলা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু পুরুষদের লালসা জাগিয়ে তোলার জন্য মেয়েরা যে বেশ্যার মত সাজপোশাক করে ঘুরে বেড়ায় সেটা বন্ধ করা হয় না কেন? জুয়ার থেকে সে ব্যাপারটা তো হাজারগুণে বেশী বিপজ্জনক।'

১০

'আগেই বলেছি আমি ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলাম। এই অবস্থাকেই লোকে প্রেমে পড়ে যাওয়া আখ্যা দিয়ে থাকে আর কি। প্রেমে পড়ার পর আমার মেয়েটিকে অপরূপ মনে হত। নিজেকেও এই সময়টা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে কল্পনা করতাম। সব কাপুরুষই তো তার নিজের থেকেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব খুঁজে বার করার চেষ্টা করে থাকে এবং সেই রকম একটি জীবের দেখা পেলে তার সঙ্গে নিজের তুলনা করে গর্ববোধ করে। আমার ব্যাপারটাও সেই রকমই হয়েছিল। আমার চেনাজানা অধিকাংশ লোকই টাকা-পয়সা অথবা সামাজিক সম্মানের লোভে বিয়ে করছিল। কিন্তু আমার যে সে ধরনের কোন লোভ নেই, আমি টাকার জন্য বিয়ে করছি না—এই সব ভেবে নিজেকে আমার বেশ উঁচুদরের মানুষ বলে মনে হত। আমি নিজে ধনী কিন্তু যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি সে গরীব। তাছাড়া অন্যরা বিয়ের পরও অসংযমী জীবন যাপন করবে স্থির করেই বিয়ে করত। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম বিয়ের পর খুব সংযমী ও নিষ্ঠাবান হয়ে যাব। এই মহৎ সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করার পর নিজের সম্পর্কে আমার দারুণ গর্ব হত। এক

কথায় বলতে গেলে জঘন্য পাপী হয়েও নিজেকে আমি ঋষিতুল্য লোক বলে কল্পনা করতাম। আমার প্রেমে পড়া আর বিয়ের মধ্যের সময়টা খুব দীর্ঘ ছিল না। সেই সময়ের কথা মনে করলে আজও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। আমাদের দুজনেরই ধারণা ছিল যে আমাদের প্রেম শারীরিক বাসনা কামনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি—আমাদের সম্পর্ক খুব পবিত্র। কিন্তু তাই যদি সত্যি হবে তাহলে তো আমাদের কথাবার্তা, চাহনি, অর্থাৎ আমাদের আবেগের সব রকম বহিরঙ্গ প্রকাশও সেইরকম পবিত্র, নির্মল হওয়ার কথা। কিন্তু দুজনে একা পড়ে গেলেই আমরা আর কোন কথাবার্তা বলতে পারতাম না। অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ভেবে একটা কথা খুঁজে বার করতাম—সে কথাটা বলা হয়ে গেলেই আবার চুপ করে যেতাম। আবার একটা বলার মত কথা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতাম। আসলে আমাদের আর কোন কথা ছিল না। ভবিষ্যতে কি করব না করব, সে সম্পর্কে সব কথাই বলা হয়ে গিয়েছিল। আর কি-ই বা বলব? আমরা জন্তু হলে কথা বলার কোন প্রশ্নই উঠতো না। কিন্তু যেহেতু আমরা মানুষ তাই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা হবে বা হওয়া উচিত—এই রকম একটা ধরে নেওয়া ছিল। অথচ আমরা সারাক্ষণ যা ভাবতাম, যা অনুভব করতাম, তা নিয়ে কথা বলা চলে না। তাছাড়া বিয়ের আগে সেই বিরক্তিকর উদ্যোগপর্ব—গাদাগাদা মিষ্টি ও চকোলেট খাওয়া, ড্রেসিং গাউন, ঘর সাজানোর জিনিস; জামাকাপড় বিছানার চাদর ইত্যাদি কেনা, আলমারি সাজানো, শোবার ঘর ঠিক করা—ইত্যাদি ব্যাপার ছিল। ঐ বুড়ো ভদ্রলোক যেরকম পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলছিলেন, তাতে বিছানা, বালিশ, যৌতুক ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে তবু এক ধরনের রহস্যের আভাস ছিল। আজকাল দশজন লোকের মধ্যে একজনের মনেও বিয়ে সম্পর্কে কোন রহস্য আছে কিনা সন্দেহ, এমনকি বিয়ের সঙ্গে যে একটা নৈতিক কর্তব্যের ব্যাপার আছে তা পর্যন্ত আজকালকার অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। বেশির ভাগ লোকেরই বিয়ের আগে অসংখ্যবার যৌন-অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। বিয়ের পরও তারা সুযোগ পেলেই স্ত্রীকে ঠকায়। এই সব লোকের কাছে গীর্জার অনুষ্ঠানটা শুধু একজন স্ত্রীলোকের মালিকানা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় একটা শর্ত। তার বেশি কিছু নয়। তাই আজকালকার দিনে বিয়ের আগে ঐ জিনিসপত্র কেনকাটার আর কোন গভীর মানে নেই। পুরো ব্যাপারটা

একেবারে বিক্রিবাটার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সরল বোকা মেয়েকে একটা লম্পটের হাতে বেচে দেওয়া হবে, এতসব আয়োজন সেই বিক্রির প্রস্তুতিপর্ব মাত্র।'

১১

'এইভাবেই সবাই বিয়ে-থা করে থাকে। আমিও তাই করলাম এবং তারপর বহুশ্রুত মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গেলাম। "মধুচন্দ্রিমা" নামটাই কি রকম অশ্লীল।'

এই কথাগুলো বলার সময় ভদ্রলোকের মুখ ঘেন্নায় বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে উঠেছিল।

'পারীতে একবার আমি কতকগুলো কিম্ভূতকিমাকার বস্তুর প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম—সেখানে একটি দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোক এবং একটি অর্ধেক কুকুর, অর্ধেক মাছ গোছের জন্তু দেখলাম। পরে জানা গেল দাড়িওয়ালা স্ত্রীলোকটি আসলে একজন পুরুষ মানুষ—মহিলাদের পোশাক পরে মহিলা সেজেছে। আর কুকুরটিকে এক তিমি মাছের চামড়া দিয়ে ঢেকে স্নানের টবের ভিতর সাঁতার কাটানো হয়েছিল। দেখে সত্যিসত্যি ইনটারেস্টিং লাগতে পারে, এমন কিছুই সেখানে ছিল না। অথচ আমি বেরোবার সময় একজন দালাল-গোছের লোক আমাকে দেখিয়ে চারপাশের লোকেদের বলতে লাগল, "এ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, কি রকম মজাদার ব্যাপার হচ্ছে ভিতরে। আসুন, আসুন, টিকিট কিনে ঢুকে পড়ুন। মাত্র এক ফ্রাঙ্ক দাম।" আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না যে প্রদর্শনীটি অতি বাজে। আমার বাজে লেগে থাকলেও যে আমি সবাইকার সামনে তা বলতে পারব না—এ কথা দালালটি জানত এবং জানত বলেই সে সেই সুযোগটি নিল। আমার মনে হয় হানিমুনের সময় যাদের বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা হয়, তাদের অবস্থাও অনেকটা এই রকম। তারাও অন্যদের আশাভঙ্গ করতে লজ্জা পায়। কিন্তু আজকাল আমার মনে হয় সত্য গোপন করার কোন মানে হয় না। আমাদের মধুচন্দ্রিমা অত্যন্ত অস্বস্তিকর, করুণ এবং লজ্জাজনকভাবে কেটেছিল—সবচেয়ে বড় কথা পুরো ব্যাপারটা ছিল অত্যন্ত ক্লান্তিকর, একঘেয়ে।

প্রথম সিগারেট ধরার সময় যেমন আমার মুখ দিয়ে থুতু গড়াত, বমি

পেত, তাও থুতু গিলতে গিলতে টান দিয়ে যেতাম—মধুচন্দ্রিমার ব্যাপারটাও ঠিক তেমন হল। সিগারেট খাওয়ায় যদি আদৌ কোন মজা থাকে, তাহলে তা পরে বেশ পাকাপোক্ত নেশাখোর হলে তবে টের পাওয়া যায়। বিবাহিত সম্পর্কেও তেমনি বেশ কিছুটা সময় গেলে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নোংরামিতে অভ্যস্ত হয়ে এলে, তবেই স্ফূর্তি পাওয়া যায়!'

'নোংরামি বলছেন কেন? যৌন সম্পর্ক তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।'

'স্বাভাবিক? না, মানতে পারলাম না। আমার ধারণা একেবারে উল্‌টো। পুরো ব্যাপারটা আমার খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। বাচ্চাদের কিংবা অল্পবয়সী সরল মেয়েদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আমার বোনের বয়স যখন খুব অল্প, তখন সে তার দুগুণ বয়সী একজন চরিত্রহীন লোককে বিয়ে করেছিল। মনে আছে বিয়ের রাত্রে সে যখন ফ্যাকাশে মুখে কাঁদতে কাঁদতে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন আমরা খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমার বোন কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, "আমি পারব না, আমি মরে গেলেও পারব না।" স্বামী তার কাছে কি চায় সে কথাটা পর্যন্ত বলার ভাষা ছিল না তার!

'এরকম একটা ব্যাপারকে আপনি স্বাভাবিক বলতে চান? স্বাভাবিক ব্যাপার পৃথিবীতে অনেক আছে—যাতে কোনরকম লজ্জা নেই—যা প্রথম থেকেই স্নিগ্ধমধুর—তাকেই স্বাভাবিক বলতে পারি। কিন্তু এ ব্যাপারটা কষ্টকর, লজ্জাজনক, জঘন্য। সরল, অপাপবিদ্ধ মেয়েদের পক্ষে এটা একটা নিদারুণ অভিজ্ঞতা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু তাহলে মানুষ জাতটা বাঁচবে কি করে? নতুন মানুষ জন্মাবে কি করে?'

ভদ্রলোক যেন এই রকম একটা প্রশ্ন শোনার জন্য তৈরী হয়েই ছিলেন। ব্যঙ্গের সুরে আমার কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'মানুষ জাতটা বাঁচবে কি করে? ইংল্যাণ্ডে জমিদার-তনয়দের লাম্পট্যের সুযোগ দেওয়ার জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়া হয়। কোনরকম ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে, দায়িত্ব না নিয়ে সব লোকই যাতে অবাধে ফুর্তি করে যেতে পারে সেজন্যও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু নৈতিক কারণে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা বললেই লোকে একেবারে হাঁ হাঁ করে ওঠে। দু' একজন লোক শুয়োরের জীবন ছেড়েযদি ভদ্র হতে চায়তাহলেই একেবারে সৃষ্টিলোপ

পেয়ে যাবে এরকম অদ্ভুত কথা ভাবছেন কেন? মাপ করবেন। আলোটা চোখে লাগছে, নিভিয়ে দিলে আপত্তি আছে?'

আমি আপত্তি নেই বলায় ভদ্রলোক উঠে গিয়ে আলোটা ঢেকে দিলেন।

আমি বললাম, 'দু'একজন সংযম অভ্যাস করলে হয়ত কিছু আসবে যাবে না ঠিকই। কিন্তু পৃথিবীর সব লোক যদি আপনার কথামত চলে তাহলে তো সত্যিসত্যিই সৃষ্টি লোপ পেয়ে যাবে।'

ভদ্রলোক পা ছড়িয়ে আমার উল্‌টোদিকের আসনে বসে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তক্ষুণি বলে উঠলেন, 'মানুষ জাতির অস্তিত্ব নিয়ে আপনি খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন? এ পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকাটা এত জরুরী কিসে!'

'কি বলছেন আপনি? মানুষ না থাকলে তো আপনি আমিও থাকব না।'

'না-ই বা থাকলাম। থাকব কেন?'

'বাঁচার জন্য।'

'বাঁচব কেন? কিসের জন্য? জীবনে যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকে, শুধু টিকে থাকাটাই যদি একমাত্র ব্যাপার হয়, তাহলে বাঁচার কোন মানে হয় না। তাহলে শোপেনহাওয়ার, হার্টম্যান এবং বৌদ্ধদের কথাই ঠিক। আর যদি জীবনের কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে করেন, তাহলে স্বীকার করুন যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখলে আমরা এইরকম একটা সিদ্ধান্তেই আসতে বাধ্য।'

ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠে খুব জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, 'দয়া, ভালবাসা ও পবিত্রতা ইত্যাদিকে যদি জীবনের আদর্শ বলে মানেন, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যদি বিশ্বাস করেন যে এমন দিন আসবে যখন পৃথিবীতে আর কোন নিষ্ঠুরতা থাকবে না, সবাই সবাইকে ভালবাসবে, তাহলে ভেবে দেখেছেন কি যে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছি না কেন? পারছি না আমরা প্রবৃত্তির দাস বলে। এবং আমাদের যাবতীয় প্রবৃত্তির মধ্যে যৌন স্পৃহাই হল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী, প্রবল ও ক্ষতিকর। এই যৌন লালসা দমন করতে পারলে মানুষ জীবনের আসল লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে, অন্য মানুষের সঙ্গে মিলতে পারবে, বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে উঠবে।

একবার সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলে তখন আর মানুষের বাঁচার কোন প্রয়োজন থাকবে না। মানুষ যতদিন বাঁচবে, ততদিন এই সমস্ত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বাঁচবে। জন্তু-জানোয়ারের মত ক্রমাগত বংশ বৃদ্ধি করে যাওয়া কিংবা পাপীর লম্পটদের মত চেখে চেখে শরীরের সুখ উপভোগ করা—এর কোনটাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়। সংযত, পবিত্র এবং সৎ হয়ে ওঠাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য। মানুষ চিরকাল সেই চেষ্টাই করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে ভেবে দেখুন। শারীরিক কামনা বাসনা থেকে যে প্রেমের জন্ম সেটা একটা সেফ্‌টি ভাল্‌ভের মত কাজ করে থাকে। এ যুগের লোকেরা যে মানুষের অন্বিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারল না তার কারণই হল তাদের কামনা বাসনা—বিশেষ করে যৌন কামনা। কিন্তু যৌন কামনা আছে বলেই আবার নতুন একদল মানুষের সৃষ্টি হবে। তাদের জীবনেও আবার একটি পবিত্র মানবিক আদর্শে পৌঁছোবার সুযোগ আসবে। কিন্তু তারাও সে লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারবে না—তারাও আবার তাদের উত্তরপুরুষের হাতে সে দায়িত্ব অর্পণ করে চলে যাবে। এইভাবে যতদিন না মানুষ তার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারে, যতদিন না পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একসঙ্গে মিলতে পারে, ততদিন সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থেকে যাবে। এ ব্যাপারে এছাড়া আর কি কি বিকল্প হতে পারত ভেবে দেখা যাক্। ধরা যাক্ ঈশ্বর একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এখন ঈশ্বরের সৃষ্ট এই মানুষ যদি অমর হত কিংবা মরণশীল অথচ যৌন তাড়না থেকে মুক্ত হত তাহলে পুরো ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াত?

'এর মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্পটি হলে অর্থাৎ মানুষ মরণশীল কিন্তু যৌন-অনুভূতিহীন হলে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু হত (কারণ মানুষের যা স্বাভাবিক আয়ু সেই সময়টুকুর মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়) এবং জীবনের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ঈশ্বরকে আবার নতুন করে মানুষ সৃষ্টি করতে হত। অমর হলে অবশ্য হাজার হাজার বছর বাঁচার পর মানুষ হয়ত তাদের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারত। একই লোকের পক্ষে অবশ্য নিজের ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়া খুব কঠিন কাজ। নতুন যুগের নতুন মানুষের পক্ষে বরঞ্চ তাদের বাপ-পিতামহের ভুলত্রুটি দেখে শিক্ষালাভ করা সম্ভব। কিন্তু একবার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবার পর সেইসব অমর প্রাণীদের

জীবনের আর কি মূল্য থাকত? তাদের নিয়ে তখন কি করা হত? না, তার চেয়ে মানুষের বর্তমান অবস্থাই ভাল। আপনি যদি বিবর্তনবাদের সমর্থক হন, তবে হয়ত স্থিতাবস্থার স্বপক্ষে কথা বলছি বলে আপত্তি করবেন। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে বিবর্তনবাদের সিদ্ধান্ত ওই একই রকম। পশুদের সঙ্গে ল'ড়ে বাঁচবার জন্য প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ যে মানুষ তাকে মৌমাছির মত দলবদ্ধ হতে হবে। আমাদের সমাজে যেরকম যৌন-যথেচ্ছাচার চালু আছে তা বাদ দিয়ে সংযত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।' একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বললেন, 'মানুষ নামক প্রজাতিটির লোপ পেয়ে যাওয়ার কথা যদি বলেন, সে তো অনিবার্য। প্রায় মৃত্যুর মতই নিশ্চিত, অবধারিত। ধর্মগ্রন্থ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গ্রন্থ—এই দুয়েই তো ভবিষ্যদ্বাণী করা আছে যে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। নৈতিক দিক থেকে যদি কেউ সেই একই ধরনের পরিণতির কথা বলে, তাতে অবাক হওয়ার কি আছে?

ভদ্রলোক এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। চা খেলেন, সিগারেট খেলেন, তারপর তাঁর থলি থেকে নতুন সিগারেট বার করে পুরানো দাগধরা সিগারেটের বাক্সটিতে রাখলেন।

আমি বললাম, 'আপনি কি বলতে চান তা আমি বুঝতে পারছি। শেকাবদের মতও অনেকটা এই ধরনের।' ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'তারা ঠিকই বলে। আসলে যৌন স্পৃহা, তা যে কোন ধরনেরই হোক না কেন, পৃথিবীতে অসংখ্য অনর্থ ঘটায়। একে প্রশ্রয় না দিয়ে জয় করা উচিত। বাইবেলে যে বলা আছে কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকালেই মানুষ ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হয়, সেটা পরস্ত্রীর ক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি আমাদের নিজেদের স্ত্রী সম্পর্কেও প্রযোজ্য।'

১২

'আমাদের জগৎ কিন্তু চলে ঠিক উলটো নিয়মে। অবিবাহিত থাকার সময় যদি-ই বা কোন লোক সংযত হয়ে থাকে, বিয়ে হয়ে গেলে সে-ও মনে করে যে তার আর সংযমের দরকার নেই। আসলে বিয়ের পর এই যে এত বাইরে যাওয়ার ধুম পড়ে যায়, মা-বাবার সম্মতি নিয়ে যুবক-যুবতীরা অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু পরস্পরের সঙ্গেই সময় কাটায়, এ সবের মধ্যেই অসংযম সম্পর্কে একটা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় আছে। কিন্তু নৈতিক নিয়ম-কানুন

অগ্রাহ্য করলে তার শাস্তি পেতেই হবে। আমি ও আমার স্ত্রী হানিমুনের সময়টা উপভোগ্য করে তোলার হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে গেল। আগাগোড়া কেমন একটা অস্বস্তি, বিরক্তি ও একঘেয়েমির মধ্যে সময় কাটতে লাগল। কয়েক দিনের মধ্যেই ব্যাপারটা আরও খারাপ দিকে মোড় নিল। বিয়ের দিন তিন চার পরেই একদিন স্ত্রীকে মনমরা দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর আদর করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে আদর করতে যেতেই ও ঠেলে আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে শুরু করল। কেন কাঁদছে জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর পেলাম না। কিন্তু ওকে দেখেই বুঝতে পারলাম যে ওর খুব খারাপ লাগছে। এখন মনে হয় নিজের শরীর মনের ক্লান্তি দিয়ে ও বুঝতে পারছিল যে আমাদের সম্পর্ক কী ভীষণ নোংরা! কিন্তু সে কথা প্রকাশ করতে পারছিল না। আমি খুব পীড়াপীড়ি করায় মার জন্য মন কেমন করছে বলল। বুঝতে পারলাম সেটা আসল কারণ নয়। তাই মার জন্য মন কেমন করার ব্যাপারটায় তেমন আমল না দিয়ে আবার ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতে লাগলাম। আসলে আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে পুরো ব্যাপারটাতেই ওর মেজাজ বিগড়ে আছে—মার জন্য মন কেমন করাটা একটা ছুতো মাত্র। ওর মার ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ায়, ওর কথায় অবিশ্বাস করছি ভেবে আমার স্ত্রী রেগে উঠল। হঠাৎ বলে বসল, আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস না। তারপর আমি ওর খামখেয়ালিপনা নিয়ে একটু অভিযোগ করতেই ওর মুখের ভাব পাল্টে গেল। কষ্টের বদলে প্রচণ্ড বিরক্তি ফুটে উঠল। খুব রূঢ়ভাবে আমাকে স্বার্থপর, নিষ্ঠুর ইত্যাদি বলে অভিযোগ করতে আরম্ভ করল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একেবারে কঠিন ঘেন্না ও বিদ্বেষে থম্‌থম্ করছে। আমার মাথায় একেবারে আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। আমাদের কত সাধের প্রেম, আত্মার আত্মীয়তা ইত্যাদি কত কিছু স্বপ্ন দেখেছি—তার বদলে এ কি?

'ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যে তখন একটা ঠাণ্ডা, কঠিন শত্রুতার দেওয়াল উঠে গেছে। নিজের অজ্ঞান্তে আমিও হঠাৎ রেগে উঠলাম। তারপর দুজনেই দুজনকে নানা নোংরা কথা বলে আঘাত করতে লাগলাম। প্রথম ঝগড়ার অভিজ্ঞতাটা বড় ভয়াবহ মনে হয়েছিল আমার। ঝগড়া বলছি বটে, আসলে আমাদের দুজনের মধ্যে

একটা বিরাট ফাঁক ছিল, এটা তারই বহিঃপ্রকাশ। শারীরিক খিদে মিটে যাওয়ায় আমাদের প্রেমও শেষ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মুখোশ খুলে গিয়ে আমাদের সম্পর্কের যে আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ল তা বড় বীভৎস এখন বুঝি আমরা দুটি স্বার্থপর লোক, পরস্পরকে কিছুই না চিনে, না জেনে, পরস্পরের কাছ থেকে সুখ নিংড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম।

'আবার বলছি এ ঘটনাটিকে ঠিক ঝগড়া বলা চলে না সাময়িকভাবে যৌন সম্পর্ক বন্ধ থাকায় আমাদের দুজনের ভিতরের গোঁজামিলটা ধরা পড়ে গেল। তখনও বুঝিনি যে এই নিরুত্তাপ শত্রুতাই আমাদের সত্যিকারের সম্পর্ক—বুঝিনি কারণ একটু পরেই আবার আমাদের যৌনক্ষুধা জেগে উঠল। ফলে শত্রুতা চাপা পড়ে গিয়ে আবার প্রেমে পড়ার অনুভূতিটি ফিরে এল।

'মনে করলাম ঝগড়া মিটে গেছে। আর কখনও এমন ঘটনা ঘটতে দেব না ঠিক করলাম। কিন্তু হানিমুনের মধ্যেই আবার এমন একটা সময় এল যখন সাময়িকভাবে মৈথুনে ক্লান্তি আসায় আবার দুজনে দুজনের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লাম। সেই সময় আবার একবার ঝগড়া হল। দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার বেশি কষ্টকর লেগেছিল। মনে হয়েছিল, তাহলে আমাদের প্রথম ঝগড়াটা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। এরকম ঘটনা তাহলে আবার ঘটবে। দ্বিতীয় ঝগড়াটা হল একটা সামান্য উপলক্ষ্য নিয়ে। টাকার ব্যাপারে এমনিতেই আমার হাত দরাজ। তাছাড়া নিজের স্ত্রী টাকা খরচ করলে বিরক্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। তবু আশ্চর্যের কথা, দ্বিতীয় ঝগড়াটা হল টাকা নিয়েই। আমার কি একটা কথার ও বাঁকা মানে বার করল—ধরে নিল আমি নাকি ওকে বলেছি যে টাকাটা যেহেতু আমার, তাই আমি নিজের খুশিমত সেটা খরচ করব। টাকার জোরে ওর ওপর জোর খাটাব ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরো ব্যাপারটা এমন বোকার মতন, এমন নোংরা হয়ে দাঁড়াল। আমি রেগে গিয়ে ওর ওপর চোটপাট করলাম, ও-ও মুখে মুখে জবাব দিতে লাগল, আবার দুজনে দূরে সরে গেলাম। ওর কথায়, চোখে মুখে আবার সেই ঠাণ্ডা শত্রুতার ভাব দেখতে পেলাম—যা দেখে প্রথম বার খুব আহত হয়েছিলাম। বাবা, দাদা, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি অনেকের সঙ্গেই অনেকবার ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু এর আগে কখনও কারুর মুখে এরকম অদ্ভুত বিষাক্ত, বিদ্বিষ্ট ভাব দেখিনি।

'কিছু সময় পার হবার পর অবশ্য আবার আমাদের প্রেম অর্থাৎ যৌন-কামনা ফিরে এল। পারস্পরিক যেন্নাটা আবার সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেল। এই দুটো ঘটনা ভুল করে ঘটিয়ে ফেলেছি। পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে—এই ভেবে তখন নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম।

'কিন্তু এর পরেও বার তিনেক এরকম ঘটনা ঘটার পর আমি বুঝে ফেললাম যে এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। এরকম ঘটনা তখনও এড়ানো যায়নি, পরেও যাবে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার ভয় করতে লাগল। কেবল আমারই স্বপ্ন কল্পনা সব এরকম মিথ্যে হয়ে গেল, কেবল আমার বিয়েটাই ব্যর্থ হল—এই কথা ভেবে আরও কষ্ট হতে লাগল। তখন আমার ধারণা ছিল অন্য বিবাহিত লোকেরা বেশ সুখেই আছে। তখনও জানতাম না যে অন্য সকলেরও ঐ একই অবস্থা। প্রত্যেকেই ভাবে যে অন্যদের ব্যাপারটা ঠিক আছে, শুধু তার নিজের বিয়েটাই গোলমাল হয়ে গেছে। এরকম ভাবে নিজের দুর্ভাগ্যটা একটা ব্যতিক্রম—একটা লজ্জার ব্যাপার, ভেবে নিয়ে সকলেই আর পাঁচজনের কাছে কথাটা চেপে যায়—এমন কি নিজের কাছেও স্বীকার করে না।

'বিয়ের পর থেকে ক্রমশঃই আমাদের পারস্পরিক শত্রুতা বাড়তে লাগল। আমরা পরস্পরের প্রতি আরও বেশি নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে লাগলাম। প্রথম সপ্তাহ থেকেই আমার মনে হত যেন কি রকম একটা ফাঁদে পড়ে গেছি। মনে হত বিয়ে মানুষের জীবনে সুখ আনে না—আনে দুর্ভোগ। কিন্তু অন্যদের মত আমিও তখন এই সত্যি কথাটা স্বীকার করতে চাইতাম না—শেষের ঐ বীভৎস ঘটনাটা ঘটে না গেলে কোনদিনই হয়তো স্বীকার করতাম না। শুধু অন্যদের কাছেই নয়, নিজের কাছেও সত্যি কথাটা লুকিয়ে রাখতাম। এখন ভাবলে অবাক লাগে কি করে অতদিন ধরে সত্যি কথাটা এড়িয়ে যেতে পেরেছিলাম। আমাদের ঝগড়াগুলো যে নিতান্ত তুচ্ছ কারণে হত—আমরা নিজেরা যে পরে ঝগড়ার উপলক্ষ্যগুলো মনেও করতে পারতাম না—তাই থেকেই তো আমার পুরো ব্যাপারের ফাঁকিটা ধরে ফেলা উচিত ছিল। পারস্পরিক শত্রুতার ভাবটা জিইয়ে রাখার জন্য একটা জোরদার কারণ ঠিক করতে হলে যেটুকু বুদ্ধি খাটাতে হয়—তাও আমরা করতাম না। আর ঝগড়া মেটানোর জন্য যে-সব মিথ্যে ফিকির খুঁজে বার করতাম, সেগুলোর কথা ভাবলে এখন লজ্জা বোধ হয়। মাঝে মাঝে কথাবার্তা বলে বুঝিয়ে

সুজিয়ে মিটমাট করে ফেলতাম। কখনও বা কান্নাকাটি হত। আবার অনেক সময় এমনও হত যে পরস্পরকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করার পর আমরা আবার তক্ষুণি লাজুক লাজুক ভাব করতাম, হাসতাম, চুমু খেতাম, দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরতাম। উফ্, ভগবান, পুরো ব্যাপারটা যে কী বীভৎস। কি করে যে অতদিন ধরে এই প্রচণ্ড নোংরামি আমার চোখে এড়িয়ে গেল।

১৩

এই সময় দুজন যাত্রী ঢুকে কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে বসল। ওরা বেশ গুছিয়ে না বসা পর্যন্ত ভদ্রলোক কথা বন্ধ রাখলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন। এতটা সময় থেমে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভদ্রলোক কথার খেই হারান নি।

'প্রেম সম্পর্কে ভণ্ডামিটাই সবচেয়ে কুৎসিত। প্রেম বলতে তো বেশ একটা মহৎ, উন্নত ধরনের অনুভূতির কথা মনে হয়? আসলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা এত নোংরা, এত পাশবিক যে সে সম্পর্কে কথা বলতেই লজ্জা করে। প্রকৃতির বিধানেই অবশ্য প্রেম এমন নোংরা এবং লজ্জাকর। একবার যখন বুঝতে পারা যায় যে ব্যাপারটা নোংরা তখন তো সেই সত্যি কথাটাই মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু তখনও লোকে ভান করে যায় যেন এরকম একটি মহান ও পবিত্র অনুভূতি আর পৃথিবীতে নেই। আমাদের প্রেমের প্রথম নিদর্শন কি ছিল জানেন! নির্লজ্জভাবে পাশবিক প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে পারাটাই তখন আমার কাছে প্রেমের প্রমাণ বলে মনে হত। এ ব্যাপারে যে শুধু কোন লজ্জাবোধ ছিল না তা-ই নয়। যৌন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করার ক্ষমতা রাখি ভেবে নিজের সম্বন্ধে বেশ একটা গর্ব অনুভব করতাম। স্ত্রীর শরীর মনের ভালো-মন্দ নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না।

'কেন যে আমরা দুজনে দুজনের সম্পর্কে এত তিতি বিরক্ত হয়ে থাকতাম, তা তখন বুঝতে পারি নি। কারণটা এখন আমার কাছে খুব স্পষ্ট। আমাদের মনুষ্যত্ব জান্তব আতিশয্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে উঠত—পরস্পরের সম্পর্কে বিরক্তি সেই বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ।

'ভাবলে অবাক লাগত দুজনে দুজনকে কী ভীষণ ঘেন্না করতাম। আমরা যেরকমভাবে দিন কাটাতাম, তাতে এই পারস্পরিক ঘেন্না ছাড়া

আর কিছু আশাও করা যায় না। কারণ আমরা দুজনেই তো দুজনকে পাপের পথে ঠেলে দিচ্ছিলাম। আমার স্ত্রী বেচারী বিয়ের প্রথম মাসেই গর্ভবতী হয়ে পড়েছিল। তখনও, তার সেই অবস্থাতেও মৈথুন করে যাওয়াটা কি একটা পাপ নয়? আপনার বোধ হয় মনে হচ্ছে যে আসল গল্পের সঙ্গে এ-সব কথার কোন সম্পর্ক নেই, এ-সব অপ্রাসঙ্গিক? আপনি ভুল করছেন। আমার স্ত্রীকে আমি কি করে খুন করেছিলাম, সেই ঘটনার কথা বলতে গেলে, তার অপরিহার্য অংশ হিসেবে এ-সব কথা আসবেই। বিচারের সময় আমাকে ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল আমি কি করে কি দিয়ে ওকে খুন করেছি। বোকা, বোকার দল সব। ওদের ধারণা আমি পাঁচই অক্টোবর রাত্রে ওকে ছুরি মেরে খুন করেছিলাম। না, না, তখন নয়, তার অনেক আগেই ব্যাপারটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর আরও অজস্র লোক—প্রায় সব লোক যেভাবে মেয়েদের জবাই করে, আমিও সেই ভাবেই আমার স্ত্রীকে জবাই করেছিলাম।'

আমি বললাম, 'আপনি কি বলতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আশ্চর্য—কেউ এই সোজা কথাটা, সতি কথাটা স্বীকার করতে চায় না। ডাক্তাররা এসব কথা জানে, তাদের উচিত অন্য লোকেদের বোঝানো। কিন্তু তারাও চুপ করে থাকে। কতকগুলো ব্যাপারে তো জন্তুজানোয়ার আর মানুষ একেবারে একরকম। যেমন ধরুন, মৈথুন করলে মেয়েরা গর্ভবতী হয়, সন্তানের জন্ম দেয়, তারপর তাকে বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তোলে। এই সময়েও যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক চলতে থাকে, তবে তাতে প্রসূতি ও সন্তান দুজনেরই ক্ষতি হয়। পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। সুতরাং এ অবস্থায় কি করতে হবে তা বোঝার জন্য খুব একটা গভীর পাণ্ডিত্যের দরকার হয় না। জন্তুরা পর্যন্ত বুঝতে পারে যে অন্তত: এই সময়টুকুর জন্য মৈথুন বন্ধ রাখতে হবে। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা সব মহা প্রতিভাধর। নানা অপ্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কারে তাদের দারুণ উৎসাহ। লিউকোসাইটিস কি করে রক্তের মধ্যে সাঁতার দিয়ে বেড়ায়, সে সম্পর্কে তাঁরা নানা তথ্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন। কিন্তু প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সংযম দরকার, এই সহজ সত্যটা তাঁরা এখনও আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি। অন্তত আমি তো কখনও তাঁদের এ কথা মুখ ফুটে বলতে শুনি নি।

'অর্থাৎ মেয়েদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে, হয় স্বামীর ফুর্তিতে যাতে ভাঁটা না পড়ে সেজন্য মা হওয়ার রাস্তা প্রথমেই একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে, নয় একটু একটু করে নিজের নারীত্ব অর্থাৎ মাতৃত্ব ধ্বংস করতে হবে। এছাড়া অবশ্য আর একটা পথ খোলা আছে—অধিকাংশ তথাকথিত ভদ্র পরিবারে যা হয়ে থাকে তাই করা—সরাসরি প্রকৃতির নিয়মকে অস্বীকার করা। তার মানে নিজের স্বভাবের উপর অত্যাচার করে নারীকে একই সঙ্গে নিজের শরীরের মধ্যে একটি প্রাণকে লালন করতে হবে, বুকের দুধ দিয়ে সদ্যজাত শিশুকে বাঁচাতে হবে, আবার স্বামীর শরীরের খিদে মিটিয়ে রক্ষিতার দায়িত্ব পালন করতে হবে। এরকম ভয়ঙ্কর চাপ সহ্য করতে কোন জন্তুও রাজী হবে না। এতে মেয়েদের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে যায়। এই প্রচণ্ড চাপের জন্যই আমাদের সমাজের মেয়েরা নার্ভাস, হিস্টিরিয়া রুগীর মত হয়ে ওঠে। চাষীঘরের মেয়েরা তো অনেকে প্রায় পাগলের মত হয়ে যায়। লক্ষ্য করে দেখবেন অল্পবয়সী অপাপবিদ্ধ মেয়েরা প্রায় কখনই খিটখিটে কিংবা নার্ভাস হয় না। কেবল বিবাহিত মহিলারাই এ রোগে ভোগে। শুধু আমাদের দেশ নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই একই অবস্থা। প্রকৃতির নিয়ম অগ্রাহ্য করার ফলে উন্মাদ হয়ে গেছে, এমন রোগিণী আপনি যে কোন হাসপাতালে হামেশা দেখতে পাবেন। এছাড়া আরও অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা এখনও পুরোপুরি ঠিক এ অবস্থায় এসে পৌছায়নি বটে কিন্তু তারাও দেহ-মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে যাচ্ছে।

'ভ্রূণকে লালন করা এবং জন্মের পর শিশুকে নিজের বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা—মেয়েদের ওপর এ দুটি কী প্রচণ্ড দায়িত্ব রয়েছে ভেবে দেখুন। আমাদের সন্তানের জন্ম দিয়ে তারা এ পৃথিবীতে মানুষ জাতটাকে বাঁচিয়ে রাখছে। অথচ মেয়েরা যখন এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করে সেই সময়ও পুরুষরা তাদের শরীর ভোগ করতে ছাড়ে না। তারপর তারাই আবার নারী-অধিকার, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি নিয়ে বড় বড় কথা বলে। নরখাদকরা যদি, যাদের মাংস খাবে বলে ঠিক করেছে, তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিত, তাহলেও ব্যাপারটা এত বীভৎস হত না।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি তো প্রথমটা একেবারে থ হয়ে গেলাম।

তারপর একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন? আপনার কথামত চলতে গেলে তো দু'বছরে একবার স্ত্রী-সহবাস করতে হয়। পুরুষ মানুষের পক্ষে তো সেটা—'

ভদ্রলোক আমাকে শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলেন, 'পুরুষ মানুষের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। তাই না? বিজ্ঞানের উপাসকরা এই সব কথা লোকের মাথায় ঢুকিয়েছে। একই সঙ্গে সন্তানের জন্ম দেওয়া, সন্তান পালন করা এবং পুরুষের লালসা মেটানোর জন্য মেয়েদের শরীর-মনের ওপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়ে. এইসব মহাজ্ঞানী মহাজনদের যদি সেই চাপটা সহ্য করতে হত, তাহলে এঁরা কি বলতেন জানতে ইচ্ছা করে। ডাক্তাররা বলেন, পুরুষের পক্ষে স্ত্রী-সংসর্গ একেবারে অপরিহার্য। ভেবে দেখুন সাধারণ লোককে যদি আজ থেকে বোঝাতে শুরু করেন যে, ভদকা, তামাক, আফিম ইত্যাদি তাদের পক্ষে ভীষণরকম জরুরী, তাহলে দেখবেন, দু'দিন পর নেশাগুলো সত্যি সত্যিই তাদের পক্ষে জরুরী হয়ে দাঁড়াবে। ডাক্তারদের ধারণা, মানুষের পক্ষে যে কি জরুরী, আর কি জরুরী নয়, সেটা ঈশ্বর ঠিকমত বোঝেন নি। ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করবার সুযোগ পাননি তো। পুরুষরা মনে করে শরীরের খিদে মেটাতে না পারলে জীবনই বৃথা। এদিকে আমার স্ত্রীর সন্তান প্রসব, সন্তান-পালন ইত্যাদি ব্যাপার যথেচ্ছ মৈথুনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন তারা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে ছোটে। ডাক্তাররা উপায় বাতলে দেন। উঃ কবে যে এই ডাক্তারগুলোর ভণ্ডামি ধরা পড়বে! এতদিনে তো তাদের আসল চেহারাটা লোকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা। পুরো ব্যাপারটা এখন এমন একটা বীভৎস অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, লোকে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠছে, পাগলের মত করছে।'

'এর চেয়ে ভাল পরিণতি আর কি করে হবে বলুন? জন্তুরা পর্যন্ত বাচ্চা হওয়া ব্যাপারটার মূল্য বোঝে এবং সেইজন্য তারা সে সময়টা কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু মানুষ এসব কথা বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না। তারা কেবল ইচ্ছামত ফুর্তি করতে চায়। অথচ এই মানুষই নাকি আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। যে সময় বাচ্চাকাচ্চার জন্ম সম্ভব, জন্তুরা কেবল সেই সময়ই মৈথুন করে থাকে। কিন্তু মানুষ এ ব্যাপার দুটোকে আলাদা করে রাখতে চায়। শুধু মজা পাওয়ার জন্য মৈথুন করতে চায়।

এই নোংরামিকে আবার তারা প্রেম আখ্যা দিয়ে থাকে এবং এই প্রেম অর্থাৎ একটা নোংরা লোভের জন্য মেয়েদের জীবন নষ্ট করে দেয়। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক স্বাভাবিক হলে, পৃথিবীতে সত্য ও সততা প্রতিষ্ঠার সাধনায় মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু নিজেদের ফূর্তির জন্য মেয়েদের ব্যবহার যথেচ্ছ করে পুরুষরা তাদের শত্রু বানিয়ে তুলেছে। মানুষ যে আরও উন্নত হয়ে উঠতে পারছে না, এর জন্য দায়ী মেয়েরা। আবার মেয়েরা যে মানুষের আত্মিক উন্নতির পথে এরকম একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কারণই হল পুরুষের লালসা।'

ভদ্রলোক বারবার জোর দিয়ে এই শেষ কথাটা বলতে লাগলেন। তারপর খুঁজে পেতে একটা সিগারেট বার করে, সেটা ধরিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

১৪

"আমি নিজেও এরকম পাশবিক জীবন যাপন করেছি। অথচ মজা এই যে স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম এবং অন্য কোন মেয়ের দিকে নজর দিতাম না বলে আমার নিজেকে খুব চরিত্রবান বলে মনে হত। তাই আমাদের মধ্যে ঝগড়া হলেই ভাবতাম যে আমার স্ত্রীর দোষেই এমনটা হচ্ছে।

'এখন বুঝি, ওকে দোষ দেওয়ার কোন মানে হয় না। সংসারে আর পাঁচটা মেয়ের থেকে ও কিছু আলাদা ছিল না। মেয়েদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে বড়লোকের বাড়ির মেয়েদের যেভাবে মানুষ করা হয়, ও-ও সেইভাবেই মানুষ হয়েছিল। মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আজকাল অনেক ভাল ভাল কথা শুনতে পাই। সব ছেঁদো কথা। আমরা পুরুষরা মেয়েদের কাছে যা চাই, সেই মতই মেয়েদের শিক্ষা পদ্ধতি তৈরী হয়।

'নারী সম্পর্কে পুরুষের মনোভাবের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পুরুষরা যে মেয়েদের কি চোখে দেখে তা আমরা সবাই জানি। কবিরা, "সুরা, সাকী এবং সঙ্গীতে"র প্রশস্তি গান করেন। এই সব প্রেমের কবিতা, নগ্ন ভেনাসের মূর্তি ইত্যাদি থেকে শুরু করে দেখুন, কবিতায়, ছবিতে, ভাস্কর্যে, বলনাচের আসরে, বেশ্যাপাড়ায়, সর্বত্র, মেয়েদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির যন্ত্র বলে মনে করা হয়। শয়তানির বহরটা একবার দেখুন। স্পষ্ট

করে লোকে বলে যে মেয়েদের নিয়ে তারা ফুর্তি করতে চায়, ভোগ্যবস্তুর মত ব্যবহার করতে চায়, তাহলে অন্ততঃ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে থাকে, ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তা নয়। মধ্যযুগের নাইটরা সব নারীপূজায় সূত্রপাত করলেন (মেয়েদের পূজাও করতে লাগলেন আবার শরীরের ক্ষিদে মেটানোর যন্ত্র হিসেবে ব্যবহারও করতে থাকলেন।) 'আজকাল অনেক লোক মেয়েদের সম্মান করার ভান করে। তাদের জন্য কেউ কেউ চেয়ার ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, কেউ তাদের রুমাল পড়ে গেলে কুড়িয়ে দেয়। কেউ বা বলে, সব রকম চাকুরীতেই মেয়েদের যোগ দেবার অধিকার থাকা উচিত। মুখে এসব বড় বড় কথা বলে বটে কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব একই রকম থেকে যায়। পুরুষের কাছে মেয়েদের দাম এখনও ভোগ্যবস্তু হিসেবেই। মেয়েরা নিজেরাও সে-কথা ভাল করেই জানে। মেয়েদের পক্ষে পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের দাসত্ব। একজন লোককে দিয়ে জোর করে খাটিয়ে নিয়ে অন্যে তার পরিশ্রমের ফল ভোগ করবে—এর নামই দাসত্ব। লোকে যখন অন্যের পরিশ্রমের ফল কেড়ে নিয়ে ভোগ করাকে একটা জঘন্য পাপ বলে মনে করবে, তখনই দাসপ্রথার অবসান হবে' আইনের সাহায্যে মানুষ কেনা-বেচা বন্ধ করে শুধু দাসপ্রথার বাইরের চেহারাটা পালটানো যায়। ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা একই রকম থেকে যায়। অথচ দাসপ্রথা বন্ধ করার জন্যে আইন পাস হয়েছে শুনেই লোকে খুশি হয়ে ভাবে দেশ থেকে বুঝি দাসপ্রথা সত্যিসত্যিই একেবারে উঠে গেছে। তারা বুঝতে চায় না যে. দাসপ্রথা সমাজে এখনও আছে। কারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কোন বদল হয়নি, এখনও লোকে অন্যের পরিশ্রমের ফলভোগ করাকে অন্যায় বা পাপ বলে মনে করে না। যতদিন পর্যন্ত মানুষ এ ব্যাপারকে অন্যায় বলে মনে না করবে, ততদিন যাদের বুদ্ধি বেশি কিংবা গায়ের জোর বেশি, তারা বাকি লোকের ওপর প্রভুত্ব করে যাবে, তাদের দাস বানিয়ে রাখবে।

'স্ত্রী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। পুরুষরা নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য মেয়েদের যথেচ্ছ ব্যবহার করাটাকে অন্যায় বোধ করে না বলেই মেয়েরা আজও পুরুষের দাসত্ব করে যাচ্ছে। পুরুষদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি বলেই, পুরুষরা আজও মেয়েদের ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখে বলেই হাজার সমান অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও মেয়েরা আসলে দাসীই

থেকে যায়। ছোটবেলা থেকে এই আবহাওয়ার মধ্যে বড় হতে হতে, জনমতের চাপে মেয়েরাও নিজেদের দাসী ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

'মেয়েরা যে পুরুষের লালসা জাগিয়ে তুলে তাদের সেবা-দাসী হয়ে থাকে এবং পুরুষরা যে তাদের সঙ্গে লম্পট দাস প্রভুর মত ব্যবহার করে যায়—তার কারণই হল মেয়েদের সম্পর্কে পুরুষের মনোভাব। কিছু লোক স্কুল-কলেজে ও কোর্ট-কাছারিতে মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী বটে, কিন্তু তারাও মনে করে যে মেয়েরা পুরুষের শরীরের খিদে মেটানোর যন্ত্র। যতদিন মেয়েদের শেখানো হবে (এ শিক্ষা পুরুষরাই দিয়ে থাকে) যে তারা কেবল পুরুষের ভোগের সামগ্রী ততদিন মেয়েরা নিম্নশ্রেণীর জীবই থেকে যাবে। হয় তারা কতকগুলো বজ্জাত ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে জন্মনিরোধ করে বেশ্যার জীবন যাপন করবে—অর্থাৎ জন্তুদের থেকেও নীচু স্তরে নেমে গিয়ে নিজেদের পুরোপুরি ভোগ্যপণ্যে পরিণত করবে, নয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে, তাই হবে, অর্থাৎ তারা দুঃখকষ্টে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে হিস্টিরিয়া রোগীর মত ব্যবহার করতে থাকবে। তাদের আত্মিক উন্নতির আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। শুধু স্কুল-কলেজের শিক্ষায় এ সমস্যার সমাধান হবে না। নারী সম্পর্কে পুরুষদের মনোভাব বদলাতে হবে—মেয়েদেরও নিজেদের সম্পর্কে ধারণা পালটাতে হবে। অবিবাহিত থাকাটা মেয়েরা এখন একটা লজ্জা ও অপমানের ব্যাপার বলে মনে করে। অপাপবিদ্ধ কৌমার্যকে যদি মেয়েরা নিজেরা আদর্শ বলে মানতে না পারে, তাহলে পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো অসম্ভব। যতদিন তা না হবে ততদিন শিক্ষা-দীক্ষা যা-ই হোক না কেন, মেয়েরা সর্বদাই যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক পুরুষকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করে যাবে। কারণ স্তাবকের সংখ্যা বেশি হলে স্বামী-নির্বাচনের স্বাধীনতা বেশি।

'মেয়েদের অঙ্ক শেখা বা গানবাজনা শেখায় এ ব্যাপারের বদল হয় না। পুরুষ পাকড়াতে পারাটাই এখন পর্যন্ত নারীজীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা বলে মনে করা হয়। মেয়েরা নিজেরাও তাতেই সুখ পায়। অতীতে বরাবর তাই হয়ে এসেছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে। বিবাহিত ও অবিবাহিত এই দুই দলের মেয়েরই জীবনে এই একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা। অবিবাহিত মেয়েরা স্বামী নির্বাচনের জন্য পুরুষদের প্রলোভিত করার চেষ্টা করে। আর বিবাহিত মেয়েরা করে স্বামীকে বশে রাখার জন্য।

'শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় মেয়েদের এই পুরুষ পাকড়ানোর চেষ্টাটা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। তাও যেসব মেয়েদের নারীত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি, অর্থাৎ যারা সন্তানকে বুকের দুধ দিয়ে পালন করে, শুধু তাদের সম্পর্কেই কথাটা খাটে। কিন্তু এখানেও ডাক্তাররা ঝামেলা পাকায়। আমার স্ত্রী বাচ্চাদের তার নিজের দুধ দিতে চাইত। পাঁচটি বাচ্চাকে সে নিজের বুকের দুধ খাইয়েই বড় করেছে। কিন্তু আমাদের প্রথম সন্তানের জন্মের সময় ওর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না। ডাক্তাররা ওকে উলঙ্গ করে ওর সর্বাঙ্গ পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে দেখল (সেজন্য আমাকে আবার তাদের টাকাও দিতে হল) এবং পরীক্ষার পর ফতোয়া জারী করল যে ওর শরীরের যা অবস্থা, তাতে বাচ্চাকে দুধ দেওয়া চলবে না। আমার স্ত্রী স্বভাবতঃই চটুল প্রকৃতির ছিল। বাচ্চাকে দুধ দিলে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও সেই চটুলতা থেকে মুক্তি পেতে পারত। কিন্তু ডাক্তাররা সে-পথ বন্ধ করল। বাচ্চাকে বুকের দুধ দেওয়ার জন্য আমরা একজন ধাই-মা ঠিক করলাম। অর্থাৎ একজন অপরিচিত স্ত্রীলোকের অভাব ও মূর্খামির সুযোগ নিলাম। তার নিজের বাচ্চার কাছ থেকে তাকে সরিয়ে এনে ধোপ-দুরস্ত পোশাক-পত্তর পরিয়ে আমাদের বাচ্চার কাছে রেখে দিলাম। কিন্তু সে-কথা যাক্। আমার স্ত্রীর কথা বলি। বাচ্চার জন্মের আগে ও পরে কিছুদিন তার পুরুষ শিকারের ঝোঁকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাকে দুধ দেওয়া বন্ধ করার পর সেটা আবার দ্বিগুণ তীব্র হয়ে উঠল। আমি আবার ঈর্ষায় অস্থির হয়ে উঠলাম। বিয়ের প্রথম দিন থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত এই সন্দেহ ও ঈর্ষা আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও সুস্থির থাকতে দেয়নি। যে-সব স্বামীরা স্ত্রীর সঙ্গে আমার মত অসংযত জীবন যাপন করে, তাদের সকলকেই এই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হয়।

১৫

বিবাহিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি এইরকম ঈর্ষার আগুনে জ্বলেছি। এক এক সময় যন্ত্রণাটা তীব্র হয়ে উঠত। বিশেষ করে আমাদের প্রথম বাচ্চার জন্মের পর ডাক্তাররা যখন ওকে বুকের দুধ দিতে বারণ করল, সেই সময়টা আমার বড় কষ্টে কেটেছে! প্রথমতঃ বাচ্চাকে দুধ দেওয়ার মত

একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হঠাৎ অকারণে বন্ধ করতে হলে আর পাঁচটা মা যেমন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, আমার স্ত্রীও তাই হয়েছিল। সেজন্য আমার খুব খারাপ লাগত। তাছাড়া ডাক্তাররা মানা করা সত্ত্বেও ও অন্য বাচ্চাদের বুকের দুধ দিয়েই বড় করেছিল। আর প্রথম বাচ্চাটা জন্মানোর পর ওর শরীর এমন সাংঘাতিক কিছু একটা খারাপ ছিল না। তবু ডাক্তাররা বলা মাত্রই ও আমাদের প্রথম সন্তানকে দুধ দেওয়া বন্ধ করল। এত সহজে মায়ের দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলল দেখে আমার কেমন ভয় হল। মনে হল, ও ঠিক এইরকম অবলীলাক্রমে স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্বও ঝেড়ে ফেলতে পারে। আমি সন্দেহ ও ঈর্ষায় অস্থির হয়ে উঠলাম।'

এই ডাক্তারদের কথা যতবার বলছেন, ভদ্রলোকের মুখে ততবারই একটা ঘেন্নার ভাব ফুটে উঠছে দেখে আমি বললাম, 'আপনি ডাক্তারদের একদম পছন্দ করেন না, না?'

'পছন্দ অপছন্দের কথা নয়। ডাক্তারদের জন্য আমার মত হাজার হাজার লোকের জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নিজের যন্ত্রণার কথা বলতে গেলে কারণগুলোর কথাও মনে পড়ে যায়—এই আর কি। উকিলদের মত তারাও তাদের খদ্দেরদের কাছ থেকে টাকা দুইতে চায়। ব্যাপারটা শুধু টাকার ওপর দিয়ে গেলে, বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি রক্ষার জন্য আমি হাসিমুখে তাদের আমার অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দিতাম (ডাক্তাররা যে কী সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তা ঠিকমত বুঝতে পারলে, সব লোকই তা-ই করত)। স্ট্যাটিস্টিক্স্ দিতে পারব না। কিন্তু এমন বহু ঘটনার কথা জানি যেখানে ডাক্তাররা মায়ের স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে ভ্রূণহত্যা করেছে (পরে দেখছি সেইসব মহিলারা বহু সন্তানের জননী হয়েছেন, তাতে তাদের স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয়নি)। অনেক ক্ষেত্রে আবার মায়েরা নিজেরাই অপারেশন করিয়ে বাচ্চা নষ্ট করে। মধ্যযুগে যেমন ধর্মযাজকরা ধর্মের নামে মানুষকে মেরে ফেললেও তাকে খুন করা বলত না, তেমনি এসব ব্যাপারকেও কেউ খুন বলে মনে করে না। কারণ এই দুই ধরনের ব্যাপারই মানুষের মঙ্গলের জন্য করা হয়—এমন একটা ভড়ং থাকে তো! ডাক্তাররা যে কত অজস্র পাপ করে যায়, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা এই যে এরাই পৃথিবীতে জড়বাদের কুৎসিত তত্ত্ব প্রচার করে বেড়ায়। এদের কাছ থেকেই আমরা আত্মাকে অবহেলা করে শরীরের

পরিচর্যা করতে শিখি। তারপর ধরুন, ডাক্তারা তো বলেন যে, পৃথিবীর সব জায়গায় সব জিনিসে সংক্রামক রোগের জীবাণু কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুতরাং তাদের কথামত চলতে গেলে ছোঁয়াচ লাগার ভয়ে অন্য সকলের থেকে নিজেকে একেবারে আলাদা করে রাখতে হবে, পৃথিবীর সব মানুষের কাছাকাছি আসার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করতে হবে। সারাদিন মুখ ভর্তি কার্বলিক অ্যাসিড পুরে নিয়ে একা একা চুপচাপ বসে থাকাই তখন মানুষের একমাত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। সম্প্রতি আবার অনেকে বলছেন যে কার্বলিক অ্যাসিডও নাকি জীবাণু ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী নয়। এসব উদ্ভট ব্যাপারও না-হয় বাদ দিলাম। কিন্তু সমস্ত মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের নৈতিক বোধ যে তারা একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে—এই ভয়ংকর পাপের কথা কি করে ভুলে থাকি বলুন ?

'আজকাল কোন লোককে বলার উপায় নেই যে, তার চালচলন ভাল নয়, সেগুলো বদলানো উচিত। আমরা নিজেরাও নিজেদের চরিত্র সম্পর্কে কোন সমালোচনা করতে পারি না। লোকের ধারণা হয়ে গেছে যে, আমাদের যাবতীয় অন্যায় অপরাধের জন্য আমরা নিজেরা দায়ী নই, দায়ী আমাদের স্নায়বিক গণ্ডগোল, ডাক্তারদের কাছে গেলেই নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র সে আপনাকে কোন একটা দামী ওষুধ খেতে বলবে। খেয়ে আপনার অবস্থা আরও খারাপ হবে, আবার আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন, আবার তারা ওষুধ দেবে। এই ভাবেই পুরো ব্যাপারটা চলতে থাকবে—আচ্ছা ফন্দি বার করেছে যাহোক।

'আসল কথাটায় ফিরে আসি—আমার স্ত্রী প্রথম বাচ্চাটি ছাড়া আর সব ক'টি বাচ্চাকে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করেছিল এবং ও যখন সন্তানসম্ভবা থাকত কিংবা সদ্যজাত বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকত—সেই সময়টাই কেবল আমাকে ঈর্ষার যন্ত্রণা সহ্য করতে হোত না। আমাদের অতগুলি সন্তান না জন্মালে আরো অনেক আগেই আমি সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলতাম। বাচ্চাদের জন্য আমি আর আমার স্ত্রী অন্ততঃ কিছুদিনের মত বেঁচে গিয়েছিলাম। আট বছরে আমাদের পাঁচটি সন্তান জন্মায় এবং তাদের সবাইকে ও বুকের দুধ দিয়ে বড় করে তুলেছিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার ছেলেমেয়েরা এখন কোথায় আছে ?'

ভদ্রলোক যেন প্রায় ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, 'আমার ছেলেমেয়েরা ?'

'মাপ করবেন, ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করে বোধহয় আপনাকে কষ্ট দিয়ে ফেললাম।'

'না, না, কষ্টের জন্য কিছু নয়। আমার শালা আর তার স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ওরা এখন মামার-বাড়িতেই থাকে। আমার সব সম্পত্তি ওদের নামে লিখে দিয়েছি তবু ওরা বাচ্চাদের আমার কাছে থাকতে দিল না। ওদের ধারণা আমার মাথা খারাপ। এখন আমি ওদের সঙ্গে দেখা করে ফিরছি। অনেক করে বোঝালাম, কিছুতেই বাচ্চাগুলোকে দিতে রাজী হল না। আমার হাতে থাকলে আমি ওদের অন্যভাবে মানুষ করতাম—ওদের বাবা-মার থেকে ওরা একেবারে আলাদা ধরনের লোক হত। কিন্তু তা তারা হতে দিল না। কি আর করব বলুন? আমার হাতে ছেলেমেয়ে ছেড়ে দিতে ওরা ভরসা পায় না। বাচ্চাদের মানুষ করে তোলার মত চরিত্রবল আমার আর আছে কিনা—নিজেও তা ঠিক বুঝতে পারি না। আমার পক্ষে বোধহয় নতুন করে কিছু করা আর সম্ভবই নয়। আমি শেষ হয়ে গেছি। শুধু একটা জিনিস আমার আছে—অভিজ্ঞতা, জ্ঞান। অন্য লোকের যে-সব কথা বুঝতে অনেক সময় লেগে যাবে, সে-সব আমার জানা হয়ে গেছে। জীবনের সমস্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার বিনিময়ে আমি সে-সব কথা বুঝতে শিখেছি।

'সেই ঘটনার পর থেকে ছেলেমেয়েদের মাত্র তিনবার দেখেছি। জানি, ওরাও বড় হয়ে উঠে আর পাঁচজন চরিত্রহীন, অসংযত মানুষের ভিড়ে মিশে যাবে। কিন্তু আর কিছু করার নেই; আমি কিছুই করতে পারব না। দক্ষিণে আমার একটা ছোট বাড়ি আর একটুকরো বাগান আছে—সেখানেই চলে যাচ্ছি।

'জীবন সম্পর্কে আমি যা জেনেছি, তা জানতে হলে অন্যদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, অনেক সময় লাগবে। কোন্ গ্রহে কতটা লোহা কিংবা অন্য ধরনের কোন্ ধাতু আছে, তা আবিষ্কার করতে মানুষের বেশি সময় যাবে না, কিন্তু নিজেকে চেনা, নিজের বীভৎস পাশবিকতা সম্পর্কে জানতে পারা বড় কঠিন—বড় ভয়ঙ্কর কঠিন।

'আপনি যে ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।'

'আপনি আমার সন্তানদের কথা জানতে চাইছিলেন। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন, সন্তান সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কিরকম অদ্ভুত! লোকে মুখে বলে সন্তান জন্মের মত আনন্দ আর কিছুতেই নেই—সন্তান ঈশ্বরের আশীর্বাদ ইত্যাদি, ইত্যাদি। সব মিথ্যে কথা। হয়তো কোনদিন সত্যি-সত্যিই মানুষের এরকম মনে হত, কিন্তু এখন আর নয়। এখন সন্তানের জন্ম মানেই দুর্ভোগ, আর কিছু নয়। অধিকাংশ মায়েরা তাই মনে করে, অসাবধান মুহূর্তে সে-কথা তারা বলেও ফেলে। বড়লোকের বাড়ির মহিলাদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন, সবাই বলবে যে তারা আর বাচ্চা চায় না। বাচ্চা হলেই সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়—কখন অসুখ করে, কখন কি বিপদ ঘটে, কখন মারা যায়। বাচ্চাকে দুধ দেওয়ার ব্যাপারেও তাদের দ্বিধা আছে। নিজের বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করলে, বাচ্চার ওপর বেশি মায়া পড়ে যাবে, পরে ভীষণ কষ্ট পেতে হবে—ইত্যাদি নানা আশঙ্কার কথা শুনবেন। বাচ্চারা ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটবে, মিষ্টি মিষ্টি, আধো আধো করে কথা বলবে—এ সবে আনন্দ আছে। কিন্তু এই আনন্দের চেয়েও বড় হল ভয়। সত্যি সত্যিই যদি বাচ্চাদের অসুখ করে বা তারা মারা যায় তাহলে তো আগের আনন্দের চেয়ে পরের কষ্ট বেশি মনে হবেই। কিন্তু এ ছাড়াও তাদের অসুখ করতে পারে বা মৃত্যু হতে পারে কল্পনা করতেই যে রকম কষ্ট হয়, ভয় হয়, তার তুলনায় সন্তান জন্মের আনন্দ এই সব মহিলার কাছে অনেক কম।

'এক কথায় অধিকাংশ মেয়েই মনে করে যে সন্তানের জন্ম দেওয়ায় যে সুবিধা, যে আনন্দ, তার চেয়ে অসুবিধা অনেক বেশি। তা-ই তারা আর সন্তান চায় না। মহিলারা খুব সহজে, নির্লজ্জভাবে এইসব কথা বলে, মনে করে বাচ্চা ভালবাসে বলেই বুঝি তারা এইরকম ভাবে। তারা বুঝতে চায় না যে আসলে তারা স্বার্থপরের মত কথা বলছে। স্নেহের দায়দায়িত্ব অস্বীকার করছে। তাদের কাছে সন্তান জন্মের আনন্দের চেয়ে সন্তানের জন্য কষ্ট পাওয়ার ভয়টা বড়। সেইজন্য তারা সন্তান চায় না। স্নেহের পাত্রের জন্য তারা নিজেরা ত্যাগ স্বীকার করে না। নিজেদের সুবিধার জন্য স্নেহের পাত্র হয়ে উঠতে পারত' এমন একটি প্রাণের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। একে

ভালবাসা বলে না, এটা নিছক স্বার্থপরতা। কিন্তু শুধু মায়েদের দোষ দেওয়া যায় না। বনেদী পরিবারে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মায়েদের যে কি ভীষণ ঝামেলা পোয়াতে হয়, সে-কথা ভেবে দেখলে তাদের ওপর রাগ করা চলে না। এর জন্যও ডাক্তাররা দায়ী।

'ছেলেমেয়েরা বড হয়ে না ওঠা পর্যন্ত, আমার স্ত্রী সারাক্ষণ তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সে-সময় আমার স্ত্রীর শরীর-মনের যে কী ভীষণ অবস্থা হয়েছিল, সে-কথা ভাবলে এখনও আমার ভয় করে। আমাব জন্য তখন ওর একটা মিনিট সময় ছিল না। আমাদের দুজনেরই তখন মনে হত সর্বক্ষণ যেন একটা ডুবন্ত জাহাজের মধ্যে বাস করছি। সারাদিন শুধু বাচ্চাদের কি কি বিপদ হতে পারে, কি করে সে-সব কল্পিত বিপদ ঠেকাব, ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তা করতাম। মাঝে মাঝে মনে হত আমার স্ত্রী বোধহয় ইচ্ছে করে বাড়িতে সারাক্ষণ এরকম একটা অদ্ভুত আবহাওয়া সৃষ্টি করে রেখেছে—বাচ্চাদের সম্পর্কে উৎকণ্ঠার ভান করে আমার ওপর জোর খাটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু তা নয়। ও সত্যি সত্যিই বাচ্চাদের অসুখবিসুখ নিয়ে দুশ্চিন্তা করত—সারাক্ষণ উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকত। এ ব্যাপারে যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা ভোগ করা ছাডা ওর আর কোন উপায় ছিল না। অধিকাংশ স্ত্রীলোকের মত ও-ও বাচ্চাদের খাওয়া পরা, অসুখ-বিসুখ, বিপদ-আপদ সম্পর্কে সর্বদা সজাগ হয়ে থাকত। জন্তুদের মায়েদেরও এই বোধটা আছে কিন্তু জন্তুদের একটা দারুণ সুবিধা এই যে তাদের বুদ্ধি নেই। ধরুন একটা মুরগী—তার বাচ্চাদের কি কি অসুখ করতে পারে বা সে-সব রোগের কি কি ওষুধ আছে—এসব নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই। কেন-না তার এত কল্পনা করার ক্ষমতা নেই। উৎকণ্ঠা নেই বলেই বাচ্চা নিয়ে তার যন্ত্রণাও নেই। ছানাদের জন্য যেটুকু করা দরকার, মুরগীরা সেটা করে—বেশ খুশি হয়েই করে। তাই মা-মুরগী তার ছানা নিয়ে বেশ সুখেই থাকে। ছানাদের অসুখ করলে তাদের ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে একটু গরমে রাখতে হবে—এইটুকুই তার জানা আছে এবং এইটুকু করতে পারলেই সে মনে করে যে, যা করা দরকার তা করা হয়েছে। ছানা মরে গেলে, কেন মরল, কোথায় গেল—এসব অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়ে সে আর মাথা ঘামায় না। একটু ডাকাডাকি করে। তারপর মনমরা ভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার আগের মত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের মায়েদের তো

এইটুকু হলে চলে না। আমার স্ত্রীর তো আদপেই চলত না। শিশুদের রোগ, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে ও অজস্র বই পড়েছিল—নানা মতের নানা ধরনের বই। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। প্রথম বইতে হয়ত লেখা আছে এটা করতে হবে। দ্বিতীয় বই পড়লে দেখবেন, প্রথম বইতে যা লেখা আছে তা করলেই সর্বনাশ ; অন্য একটা কিছু করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তৃতীয় কোন বইতে আবার তৃতীয় একটা কোন কথা বলা আছে। প্রতি সপ্তাহে আমরা (বিশেষ করে আমার স্ত্রী) নানা বই ঘেঁটে-ঘুঁটে বাচ্চাদের খাওয়া, শোওয়া, বেড়ানো, চান করা ইত্যাদি ব্যাপারে কোনো না কোন একটা নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করতাম। বাচ্চা জন্মানোটা যেন একটা অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য ঘটনা—পৃথিবীতে সবে ঘটতে আরম্ভ করেছে, এমন একটা ভাব আর কি।

'বাচ্চাদের অসুখ করলেই মনে হত নিশ্চয়ই কোথাও কোন একটা ত্রুটি হয়ে গেছে, হয় ঠিকমত সময়ে চান করানো হয়নি, নয় ঠিকমত খাওয়ানো হয় নি। মোটমাট ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যেন বাচ্চার অসুখ করলেই বুঝতে হবে যে আমার স্ত্রীর দোষ, সে ঠিকমত কর্তব্য করতে পারেনি।

'বাচ্চারা বেশ সুস্থ থাকলেও কিছু না কিছু ঝামেলা লেগেই থাকত। আর অসুস্থ হয়ে পড়লে তো বাড়িতে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে যেত। আমার স্ত্রীর ধারণা ছিল যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সব রকম রোগ সারাবার উপায় বাতলে দেওয়া আছে এবং ডাক্তাররা সব রোগ সারাতে পারে। সব ডাক্তার পারে না, শুধু কয়েকজন বিশেষ ডাক্তারই নাকি সেরকম ক্ষমতা রাখে। সুতরাং ছেলেমেয়েদের কারুর একটু অসুখ করলেই সেই রকম একজন সর্বজ্ঞ, বিশিষ্ট চিকিৎসকের খোঁজ করতে হত। আমার স্ত্রী মনে করত, ঠিক সেই বিশেষ ডাক্তারটিকে যদি খুঁজে বার করতে না পারি কিংবা সে যদি আমাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে, অন্য কোন জায়গায় থাকে, তাহলে বাচ্চাটিকে আর বাঁচানো যাবে না। শুধু আমার স্ত্রীরই যে এরকম অদ্ভুত ধারণা ছিল, তা-ই নয়। আমাদের সমাজের সব মেয়েই এ-সব কথা বিশ্বাস করত। "ইভান জ্যাখারিচকে সময়মত ডাকে নি বলে ইকাতেরিনা সেমিওনোভনার বাচ্চাদুটি মারা গেল, ইভান জ্যাখারিচ, মারিয়া ইভানোভনার বড় মেয়েটিকে খুব জোর বাঁচিয়ে দিয়েছেন।" "ভাগ্যিস ডাক্তারদের

কথামত পেত্রভন্না ওদের পুরোন হোটেল ছেড়ে অন্য একটা হোটেলে উঠে গেল, তাই ওদের ছেলেমেয়েগুলি বাঁচল, তা না করলে বাচ্চাদের আর বাঁচানো যেত না।" "অমুক বাবুর বাচ্চারা ভীষণ দুর্বল ছিল"—ডাক্তারের কথায় ওরা দক্ষিণের কোন একটা জায়গায় চেঞ্জে গেল। তাইতেই বাচ্চাটা বাঁচল।" আমাদের আশেপাশে হামেশা এই ধরনের কথা শোনা যেত। আগেই বলেছি বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমার স্ত্রী খুব খুঁত-খুঁতে ছিল। তার ওপর যদি তার মাথায় ঢুকে যায় যে ইভান জ্যাখারিচ বা ঐ রকম বিশেষ কোন একটি ডাক্তারের উপদেশ না নিলে তার বাচ্চারা মারা যেতে পারে, তাহলে যে সে সারাদিন উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে তার আর আশ্চর্য কি। কিন্তু ইভান জ্যাখারিচ যে কি উপদেশ দেবেন তা কেউ জানত না—তিনি নিজেও নয়। লোকটা নিজে নিশ্চয়ই বুঝত যে সে কিছুই জানে না। সে শুধু তাক বুঝে একটা কিছু ওষুধ যাতে লেগে যায়, তাই চেষ্টা করত। পশার জমাতে গেলে লোকের বিশ্বাস আনতে হবে তো। আমার স্ত্রী যদি পুরোপুরি জন্তুর মত হত, তাহলে তার এত কষ্ট হত না। আর পুরোপুরি মানবিক হলে সে ভগবানে বিশ্বাস রাখত, ভাবত, "ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া তো পৃথিবীতে কিছুই ঘটতে পারে না। তাঁর দয়াতেই সন্তান পেয়েছি। রাখতে হলে তিনি-ই রাখবেন, আর যদি নিজের কাছে টেনে নিতে চান, তবে তা-ই হবে।" ঈশ্বরে আস্থা থাকলে ও বুঝতে পারত লোকের জীবনমৃত্যু সব তাঁরই হাতে, এ ব্যাপারে মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। এ-কথা বিশ্বাস করতে পারলে বাচ্চাদের অসুস্থতা বা মৃত্যু আটকানোর জন্য অমন অস্থির হয়ে উঠত না, বৃথা চেষ্টায় নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত না। কিন্তু ওর মনোভাব ছিল একেবারে অন্যরকম। ও ভাবত আমাদের ছেলেমেয়েরা সবাই খুব দুর্বল, খুব অসহায়। যে-কোন মুহূর্তে তাদের অসুখ করতে পারে। আর তাদের যাবতীয় রোগ-শোক, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার সমস্ত দায়িত্ব ওর নিজের। সন্তানের জন্য যে-কোন মায়ের-ই যে নিছক জৈবিক ভালবাসা থাকে, তা ওর-ও খুব তীব্র ভাবেই ছিল।

'তাছাড়া ওর ধারণা ছিল যে বাচ্চাদের কি করে সুস্থ-সবল রাখতে হবে সেটা কেবল কয়েকজন মহাজ্ঞানী ডাক্তার ছাড়া আর কেউ জানে না। সেইসব ডাক্তারকে ডাকতে গেলে বহু টাকা খরচ করতে হবে। আবার

টাকা দিলেও যে ঠিক সময়মত তাদের পাওয়া যাবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এইসব সাতপাঁচ নানা জটিলতার ফলে বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের আনন্দের চেয়ে যন্ত্রণাই বেশি হত। আমার স্ত্রী সব সময় একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকত।

'আমি নিজে ঈর্ষাতাড়িত হয়ে একটা নাটকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করে ফেলার পর কিম্বা সাধারণ ঝগড়াঝাঁটির পর বাড়ির আবহাওয়া যখন একটু থমথমে চুপচাপ মত হয়ে আসত তখন এক একদিন একটু শান্তিতে থাকার ইচ্ছা হত। মনে হত একটা কিছু পড়ি, কি একটু চিন্তা করি। কিন্তু সেই একটা কিছু মন দিয়ে করতে যাব, অমনি খবর আসত ভাসিয়া বমি করেছে কিম্বা মাশার রক্ত-আমাশা হয়েছে, না-হয় আন্দ্রেই-এর গায়ে ফুসকুড়ি মত কিসব বেরিয়েছে। ব্যস্, আমার পড়াশুনা ভাবনা-চিন্তা সব চুলোয় গেল। কোথায় যাব? কি করব? কোন্ ডাক্তারের বাড়ি ছুটব? অসুস্থ বাচ্চাটাকে অন্য বাচ্চাদের কাছ থেকে কি করে আলাদা করে রাখব? এইসব নানা দুশ্চিন্তা শুরু হয়ে যেত। তারপর ওষুধ, ডাক্তার, থার্মোমিটার, মলদ্বারের ভিতর দিয়ে পিচকারি দেওয়া। এইরকম একটা ঝামেলা চুকতে না চুকতেই, আরেকটা আরম্ভ হয়ে যেত। শান্ত, স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন বলতে আমাদের কিছু ছিল না। আমরা কেবল সারাক্ষণ ধরে নানা ধরনের বিপদ ঠেকানোর উপায় খুঁজতাম। সেগুলোর মধ্যে কোনটা সত্যি, কোনটা বা বানিয়ে তোলা, কষ্টকল্পিত। অধিকাংশ পরিবারেই এই ধরনের ব্যাপার হয়ে থাকে। আমাদের বাড়িতে চব্বিশঘন্টা হত। কারণ আমার স্ত্রী একে বাচ্চাদের ভীষণ ভালবাসত, তার ওপর, যে-যা বলত, নির্বিচারে তাই বিশ্বাস করত।

'সুতরাং সন্তানের জন্ম আমাদের দাম্পত্যজীবনে সুখ আনা দূরের কথা, সবকিছু আরও বিষিয়ে দিল। বাচ্চাদের জন্মের পর থেকেই ওদের নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি শুরু হয়ে গিয়েছিল, তারপর যত বড় হতে লাগল, ওদের নিয়ে আমাদের দুজনের মধ্যে তত বেশি মতের অমিল হতে লাগল। শুধু যে ওদের জন্য ঝগড়া হত তা নয়, নিজেদের ঝগড়ায় আমরা ওদের অস্ত্রের মত করে ব্যবহার করতাম। ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমি যাকে বেশি ভালবাসতাম, ঝগড়ার সময় তাকে কাজে লাগাতাম। আমার স্ত্রীও ঠিক তাই করত। আমি আমাদের বড় ছেলে ভাসিয়াকে দেখতে পারতাম না,

সুযোগ পেলেই ধমকাতাম। আমার স্ত্রী লিজার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত। যুদ্ধের সময় লোকে যেমন দল ভারি করার চেষ্টা করে, বাচ্চারা একটু বড় হয়ে উঠলে, আমরাও তেমনি ঝগড়ার সময় তাদের নিজের নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করতাম। বাবা-মার ঝগড়ার মধ্যে পড়ে বাচ্চাগুলোর একেবারে প্রাণান্তকর অবস্থা হত। কিন্তু নিজেদের ঝগড়ায় আমরা এত মত্ত থাকতাম যে বাচ্চাদের কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর অবস্থা ছিল না। আমাদের মেয়েটি সব সময় আমার পক্ষ নিত আর বড় ছেলে ভাসিয়া (তাকে আমার স্ত্রীর মত দেখতে ছিল এবং আমার স্ত্রী তাকে বাচ্চাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসত) যেত তার মার দলে। ছেলেটাকে তখন আমার দেখলে রাগ হত।

১৭

এইভাবে ক্রমে দিনের পর দিন আমাদের পারস্পরিক শত্রুতা বাড়তে লাগল। শেষের দিকে আর মতের অমিলের জন্য ঝগড় হত না। ঝগড়া করার জন্যই আমরা মতের অমিল বানিয়ে নিতাম। ও কোন একটা কথা শেষ করার আগেই আমি প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করতাম। ও-ও ঠিক সেই রকম করত।

বিয়ের চতুর্থ বছরে আমরা দুজনেই যে যার নিজের মত ঠিক করে ফেললাম যে আমাদের মধ্যে আর কেন রকম বোঝাপড়া বা সহযোগিতা সম্ভব নয়। পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম। নিতান্ত সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও আমরা জেদা-জেদি করতাম। বিশেষ করে বাচ্চাদের নিয়ে যদি কোনরকম মতের অমিল হত, তাহলে আমরা দুজনেই একেবারে শক্ত হয়ে থাকতাম। নিজেদের মত ছেড়ে এক ইঞ্চি নড়তাম না। এখন মনে পড়ে, যে সব মতামতের জন্য অত ফাটাফাটি করতাম, সেগুলো যে আমার নিজের কাছে খুব একটা দারুণ মূল্যবান ছিল, তা নয়। খুব সহজেই সেগুলো ছাড়তে পারতাম। কিন্তু যেহেতু আমার স্ত্রীর মতামত অন্যরকম ছিল, সেহেতু নিজের মত ছেড়ে দেওয়ার মানেই হত ওর কথা মেনে নেওয়া। আর অন্যের মত মেনে নেওয়া আমাদের দুজনের পক্ষেই একেবারে অসম্ভব ছিল। ওর ধারণা ছিল, ও যা ভাবছে তা-ই একেবারে অভ্রান্ত। আমিও ভাবতাম আমার ভাবনাচিন্তায় কোন ভুল থাকতে

পারে না। দুজনে একসঙ্গে থাকলে হয় একেবারে চুপ হয়ে যেতাম নয় নেহাত কতকগুলো আজে বাজে অর্থহীন কথা বলে সময় কাটাতে হত: "কটা বাজে? এবার শুতে যেতে হবে, কাগজে আজ নতুন খবরটবর কি আছে? ডাক্তারকে খবর দিতে হবে, মাশার গলায় ব্যথা হয়েছে"—এর বেশি আর কথাবার্তা এগোত না। এই ধরনের বিষয় ছেড়ে আর এক চুল বেশি এগোবার চেষ্টা করলে আমাদের দুজনেরই মাথা গরম হয়ে যেত। কফি, টেবিল-ক্লথ, ঘোড়ার গাড়ি, তাস খেলার কোন একটা দান—ইত্যাদি যে-কোন একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি, গালাগালি শুরু হয়ে যেত। নিজের কথা বলতে পারি, মাঝে মাঝে ওর ওপর ঘেন্নায়, রাগে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম। এক এক সময় ওর চা ঢালা, কি চা খাওয়া, কিংবা পা দোলানো দেখে আমি এমন চটে উঠতাম, যেন ও একটা ভীষণ অপরাধ করছে। তখন লক্ষ্য করতাম না যে, ওর সম্পর্কে বেশ প্রেম বোধ করার ঠিক পরে-পরেই এইসব গণ্ডগোল, রাগারাগির ঘটনাগুলো ঘটত। কিছুক্ষণের প্রেম, ঠিক তারপরেই কিছুক্ষণ ঘেন্না। প্রেমানুভূতি যদি এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়, তাহলে তার ঠিক পরের সপ্তাহে ঝগড়াঝাঁটি হবেই। আবার প্রেমানুভূতি খুব তীব্র হয়ে থাকলে, তার পরের ঘেন্নার ভাবটাও দীর্ঘদিন ধরে চলত। সে রকম সময় আমরা বুঝতে পারতাম না যে, এই তথাকথিত প্রেম আর ঘেন্না আসলে একই অনুভূতির দুটো দিক। দুটোরই জন্ম আমাদের পাশবিকতা থেকে।

'এ সত্যি কথাটা তখন পরিষ্কার হয়ে গেলে আমাদের জীবন একটা বীভৎস দুঃস্বপ্নের মত হয়ে উঠত। ভাগ্য ভাল, আমরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারতাম না। বুঝতে না পারাটা একটা অভিশাপও বটে, আবার আশীর্বাদ বটে। অধিকাংশ লোকেরই তো আত্মপ্রতারণার ক্ষমতা খুব বেশি। যে যতই পাপ করুক না কেন, সকলেই সেটা নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। আমরা দুজনেও তাই করতাম। ও কিরকম একটা হন্যে মত হয়ে বাড়ির কাজ করে যেত, পড়ত, ঘর গোছাত, নিজে সাজগোজ করত, বাচ্চাদের সাজাত, তাদের স্বাস্থ্য, লেখাপড়া ইত্যাদি নিয়ে দুশ্চিন্তা করত—এই রকম নানা ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখত। আর আমি নিজেকে ভোলাতাম কাজ, শিকার, তাসখেলা ইত্যাদি দিয়ে। দুজনেই এইভাবে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করতাম।

দুজনেই ভাবতাম যেহেতু আমরা এত খাটাখাটুনি করি, সেইহেতু আমাদের অন্যের ওপর চোটপাট করার অধিকার আছে। আমি মনে মনে ওকে বলতাম, 'তোমার আর কি? সারারাত চেঁচামেচি করে আমাকে ঘুমোতে দিলে না, এখন আবার আমাকে মিটিং-এ যেতে হবে।' ও মনের কথা মনে মনে না রেখে, একেবারে মুখ ফুটেই বলে উঠত, 'তোমার আর কি? সারারাত তো বাচ্চাটাকে নিয়ে আমাকেই জেগে থাকতে হল।'

'নানা কাজে অকাজে ব্যস্ত থাকার ফলে নিজেদের সম্পর্কের আসল চেহারাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। ঐ দুর্ঘটনাটা না ঘটে গেলে আমি বুড়ো বয়স অবধি বেশ একটা নির্বোধ আনন্দে কাটিয়ে দিতাম —ভাবতাম, 'আমি লোকটা মন্দ কি? ভালোই তো, বেশ। হয়ত যতটা সৎ হওয়া উচিত, ততটা নই কিন্তু চলে যায়, আমি আর পাঁচটা লোকের থেকে কিছু আলাদা নই, এমন কিছু একটা বেশি খারাপ নই। কোনদিন বুঝতেই পারতাম না যে, কি ভীষণ মিথ্যে আর নোংরামির মধ্যে জীবন কাটিয়েছি।

একই শিকলে দুটো হিংস্র জন্তু বাঁধা থাকলে, যেমন তারা পরস্পরকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, তেমনি আমরা দুজনে পরস্পরের জীবন একেবারে বিষিয়ে দিতে লাগলাম। অথচ এই সত্যি কথাটা কখনও স্বীকার করতে চাইতাম না। আমি তখনও বুঝিনি যে শতকরা নিরানব্বই জন স্বামী-স্ত্রীর জীবনই এই রকম দুর্বিষহ। সে সময় নিজের বা অন্য কারও বিবাহিত জীবন সম্পর্কে আমার সত্যিকারের গভীর জ্ঞান ছিল না।

'প্রায় সব লোকের জীবনেই (তা সে লোকটি সৎ-ই হোক, আর অসৎ-ই হোক) কতকগুলো মজার যোগাযোগ ঘটে যায়। যেমন ধরুন, স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যখন অশান্তি চরমে ওঠে, ঠিক তখনই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য শহরে গিয়ে থাকাটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। আমাদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেই রকম হল।"

এই কথাটা বলে ভদ্রলোক একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বার দুয়েক একটা চাপা কান্নার মত শব্দ করলেন। ইতিমধ্যে আমরা একটা স্টেশনের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। ভদ্রলোক কটা বাজে জানতে চাইলেন।

ঘড়িতে দেখলাম রাত দুটো।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার ক্লান্ত লাগছে না?"

"না, কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই লাগছে।"

"না, ক্লান্তি নয়। কেমন যেন দম আটকে আসছে বলে মনে হচ্ছে। দাঁড়ান, একটু জল খাই, আর প্লাটফর্মে নেমে একটু হেঁটে আসি।"

ভদ্রলোক টলতে টলতে করিডোর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি একা চুপ করে বসে ওঁর কথাগুলো ভাবতে লাগলাম। ভাবতে ভাবতে এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, ভদ্রলোক কখন আবার উলটো দিকের দরজা দিয়ে ফিরে এসেছেন তা পর্যন্ত লক্ষ্য করিনি।

১৮

ভদ্রলোক আবার বলতে শুরু করলেন, 'প্রেম, বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে গেলে আমি শান্ত থাকতে পারি না। বহুদিন ধরে এ-সব নিয়ে চিন্তা করার পর আমার ধারণা একেবারে পালটে গেছে। আমি অন্যদের আমার অভিজ্ঞতার কথা জানাতে চাই। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, আমরা গ্রাম ছেড়ে, শহরে এলাম। অসুখী লোকেদের পক্ষে শহরে বাস করা অনেক সহজ। শহরে বছরের পর বছর ধরে লোকে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে। নিজের মনটা যে কখন শুকিয়ে, মরে ধুলোর মত হয়ে গেছে শহরে, হাজার মানুষের ভিড়ে সে কথাটা টেরই পাওয়া যায় না। লোকে সর্বদাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত থাকে। নিজেকে জানার সময় পাওয়া যায় না। চাকরি, ব্যবসা, নিজের স্বাস্থ্য, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, তাদের পড়াশুনা, লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, সংস্কৃতি-চর্চা, তারপর ধরুন, আজ অমুক বাবুকে চায়ে ডাকতে হবে। কাল তমুক বাবুর বাড়ি যেতে হবে। এটা দেখতে হবে, সেটা শুনতে হবে। এছাড়া রোজই কোন না কোন হোমরাচোমড়া লোকের আগমন হচ্ছে, তাঁদের অবহেলা করা চলবে না। বাচ্চাদের কারুর না কারুর অসুখ লেগেই আছে, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে, বাচ্চাদের জন্য টিউটর ঠিক করতে হবে, গর্ভনেস যোগাড় করতে হবে। এইসব নানা অর্থহীন ব্যাপার নিয়ে সময় কাটাতে কাটাতে জীবনটা একেবারে অন্তঃসারশূন্য, ফোঁপরা হয়ে যায়। আমরাও এইরকম নানা ব্যাপারে ব্যস্ত থেকে একত্র-বাসের যন্ত্রণা ভুলে থাকতাম।

প্রথম মাসটা তো গ্রাম থেকে জিনিসপত্র এনে নতুন শহরে, নতুন ফ্ল্যাটে গুছিয়ে বসতে বসতেই কেটে গেল। একটা শীত কাটল। পরের বছর শীতে একটা ব্যাপার হল। এমনিতে দেখতে গেলে খুবই একটা তুচ্ছ নগণ্য ঘটনা অথচ আমার জীবনে যে প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তার জন্য এই ব্যাপারটাই দায়ী। সে সময়টা আমার স্ত্রীর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। শয়তান ডাক্তারগুলো বলল, ওর আর বাচ্চা হওয়া উচিত নয়। জন্ম নিরোধের জন্য কি কৌশল করতে হবে সেটাও তারা ওকে শেখাল। ব্যাপারটা আমার একেবারে বিশ্রী লেগেছিল। প্রথমটা খুব আপত্তি করলাম। তারপর আমার স্ত্রী ক্রমাগত জেদ করতে থাকায় শেষে হাল ছেড়ে দিলাম।

'সন্তানেব জন্ম দিতাম বলে এতদিন তবু আমাদের শরীরের খিদে মেটানোর একটা অজুহাত ছিল। এবার সেই অজুহাতটুকুও গেল। জীবন একেবাবে বিস্বাদ হয়ে উঠল। চাষীদেব ঘরে বা অন্যান্য খেটে-খাওয়া মানুষদের ঘরে বাচ্চার দরকার আছে। বাচ্চাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তোলা তাদের পক্ষে খুব শক্ত, কিন্তু তবু তাবা বাচ্চা চায়। তাই তাদেব ঘবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শরীরের সম্পর্ক থাকার একটা মানে আছে। কিন্তু আমাদের মত পযসাওযালা লোকের ঘরে সন্তান জন্মায় বিনা প্রযোজনে। তাদের জন্য অনর্থক টাকা খরচ হয়, আর ঝামেলা বাড়ে। বডলোকের ঘবে ছেলেমেযে হলে শুধু সম্পত্তিব দাবিদাবের সংখ্যা বাডানো ছাডা আর কোন কাজে আসে না।

'সন্তান জন্মের ব্যাপারটা আমাদের কাছে অনাবশ্যক বলে, নিছক পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাডা আমাদের যৌন সম্পর্কের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। হয় আমরা কৃত্রিম ব্যবস্থা নিযে জন্ম নিরোধ করি, নয় বাচ্চা হয়ে পডলে নিজেদের ভুল ও অসাবধানতার জন্য হায় হায় করি। এমন ভাব করি যেন সন্তানের জন্ম একটা দারুণ দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটা একেবারে নক্কারজনক। সন্তানের জন্ম কাম্য না হলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের এতদূর নৈতিক অধঃপতন হয়েছে যে আমরা আর উচিত অনুচিতের ধার ধারি না। শারীরিক খিদে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের আর কোন অজুহাত খুঁজে বার করার দরকার হয় না। বেশির ভাগ শিক্ষিত লোকই

লম্পটের মত জীবনযাপন করে কিন্তু সেজন্য কোন রকম বিবেক দংশন অনুভব করে না।

'বিবেকই নেই, তার আবার দংশন। যদি জনমতের চাপ কিংবা আদালতের দণ্ডবিধিকে বিবেক বলতে চান, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু জনমত এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না। মারিয়া পাভলোভ্না, ইভান জ্যাখারিচের মত হোমরা-চোমরা লোক থেকে শুরু করে সবাই তো এই এক অপরাধ করে যাচ্ছে। কে কার সমালোচনা করবে বলুন? কিছু বলতে গেলেই প্রশ্ন উঠবে, "তাহলে কি আপনি বলতে চান যে, এক পাল বাচ্চার জন্ম দিয়ে সবাইকে ভিখারি বানিয়ে রাখব? না, কি, সমাজে চলা-ফেরা বন্ধ করে দেব? আর আইনের কথা যদি তোলেন, তো সে পথও বন্ধ। যে সব মেয়ে গরীব, কিংবা যারা বোকার মত সৈন্যদের দেহ দান করে, তারাই শুধু ডোবায় বা কুয়োয় আঁতুড়ে-বাচ্চা ফেলে দেয় এবং সেজন্য জেল খেটে মরে। কিন্তু আমাদের ভদ্রঘরের মেয়েদের কথা আলাদা। তারা সময় হাতে রেখে, বেশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভ্রূণহত্যা করে। আমরা আরও দুবছর এইভাবেই চালিয়ে গেলাম। হারামজাদা ডাক্তারগুলো ফন্দিটা বাতলে ছিল ভালই। আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হল, গায়ের জোর বাড়ল, ও দিন দিন শেষ বসন্তের ফুলের মত সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল। আবার সুন্দর হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে, ও নতুন করে নিজের চেহারা ও সাজ-পোশাকের চর্চায় মন দিল। ওর সৌন্দর্যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তিকর চ্যালেঞ্জের মত ব্যাপার ছিল। ত্রিশ বছরের যুবতী—ভরন্ত গড়ন, ভাল খায়-দায়, সন্তান-জন্মের ধকল নেই, তার ওপর প্রাণশক্তিতে সারাক্ষণ একেবারে উচ্ছল হয়ে থাকে। সুতরাং ওকে দেখে যে বহু লোকের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটবে, তার আর আশ্চর্য কি? পুরুষদের সামনে দিয়ে হাঁটাচলা করলে তারা সব হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকত। একটা হৃষ্টপুষ্ট নিষ্কর্মা ঘোড়া হঠাৎ লাগাম থেকে ছাড়া পেয়ে গেলে ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়ায়, আমার স্ত্রীর অবস্থাও ঠিক সেইরকম হয়েছিল। আমাদের সমাজে শতকরা নিরানব্বই ভাগ স্ত্রীলোকের ওপরেই কোন রাশ নেই, শাসন নেই। আমার স্ত্রীর ওপরেও ছিল না। পুরো অবস্থাটা বুঝে আমি ভয় পেয়ে গেলাম।'

'কিছু মনে করবেন না' বলে ভদ্রলোক হঠাৎ নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে জানলার ধারে গিয়ে বসলেন। মিনিট তিনেক বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার আমার পাশে এসে বসলেন। ইতিমধ্যে তাঁর মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ছিল কিন্তু চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল ওঁর যেন খুব কষ্ট হচ্ছে।

ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'একটু ক্লান্ত লাগছে, কিন্তু তা হোক, কথাগুলো বলেই ফেলি। এখনও ভোর হয়নি। অনেক সময় আছে—হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বাচ্চাকাচ্চা হওয়া বন্ধ হওয়ার পর আমার স্ত্রীর চেহারা ফিরে গেল। বাচ্চাদের নিয়ে আগে যে রকম দিনরাত দুশ্চিন্তা করত, সেটা পুরো বন্ধ না হলেও, অনেক কমে গেল। মাতাল যেমন নেশার ঘোর কেটে গেলে হঠাৎ চারপাশের জগতটা দেখে একেবারে অবাক হয়ে যায়, মুগ্ধ হয়ে যায়, ওর-ও সেইরকম অবস্থা হল। সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়ে হঠাৎ বাইরের জগৎটাকে মনে পড়ল। মনে হল পৃথিবীতে যে এত আনন্দ আছে, সুখ আছে, তার কিছুই জানা হয়নি, উপভোগ করা হয়নি। কিন্তু এইবার সব সুদে আসলে পুষিয়ে নিতে হবে। সময় চলে যাচ্ছে। এ বয়স আর কখনও ফিরে আসবে না। আমার ধারণা সন্তানের জন্ম বন্ধ হওয়ার পর ও এই ধরনেরই কিছু একটা ভেবেছিল বা অনুভব করেছিল। এ-ছাড়া আর কিই বা ভাববে বলুন? ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিল, তাতে প্রেমকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে ধরে নিয়েছিল। বিয়ের পর প্রেমের স্বাদ কিছুটা পেয়েছিল বটে কিন্তু ওর স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে অনেকখানি ফাঁক থেকে গিয়েছিল। তার ওপর বিবাহিত জীবনে ওর অনেক আশাভঙ্গ হয়েছে, অনেক দুঃখকষ্ট এসেছে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক অপ্রত্যাশিত যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বাচ্চাদের জন্য ঝামেলা পোয়াতে পোয়াতে ও একেবারে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে দয়ালু ডাক্তারদের অনুগ্রহে ও জন্ম নিরোধের কৌশল শিখে ফেলল। ওর জীবনে নতুন করে আনন্দ ফিরে এল, ও আবার প্রেমের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল। কিন্তু অতি-

পরিচয়ে একঘেয়ে হয়ে যাওয়া, বদরাগী, সন্দেহপ্রবণ স্বামীর সঙ্গে আর কি নতুন করে প্রেম হবে? সুতরাং ও অন্য ধরনের প্রেমের স্বপ্ন দেখতে লাগল —নতুন, সতেজ, পবিত্র প্রেম। অন্ততঃ ওকে দেখে আমার এই কথাই মনে হত। নতুন কোন প্রেমিকের আশায় ও আশপাশের জগতের দিকে তাকাচ্ছে বুঝতে পেরে আমার দুশ্চিন্তা হতে লাগল। অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় ও বার বার নির্লজ্জভাবে আমার দিকে কতকগুলো কথা ছুঁড়ে দিত। আধা পরিহাসের সুরে, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, 'সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহ আসলে একটা লোক-ঠকানো ব্যাপার। অল্প বয়সে বাচ্চাকাচ্চার ঝামেলা পুইয়ে জীবনটা মাটি করার কোন মানেই হয় না। (এই কথাগুলো বলার সময় ওর বোধহয় মনে পড়ত না যে, একঘণ্টা আগেই ও সম্পূর্ণ আলাদা কথা বলেছে)। এরপর বাচ্চাদের দিকে ও কম নজর দিতে লাগল, তাদের নিয়ে আগে যে-রকম পাগলের মত উদ্বিগ্ন থাকত, সে ভাবটাও আস্তে আস্তে কমে এল। ও নিজের চেহারা ও সাজ-পোশাক নিয়েই সময় কাটাতে লাগল। নিজের চেহারা নিয়ে মেতে ওঠার ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে আবার হৈ-হৈ করে বেড়াত কিম্বা কিছু একটা শেখার চেষ্টা করত। বিয়ের পর পিয়ানো ছেড়ে দিয়েছিল, আবার শুরু করল। আর সেই পিয়ানো বাজানো থেকে-ই গণ্ডগোলটা আরম্ভ হল।

ভদ্রলোক ক্লান্তচোখে একবার জানলার দিকে তাকিয়েই আবার চোখ সরিয়ে নিলেন, তারপর খানিকটা যেন নিজের ওপর জোর করে বলতে শুরু করলেন।

'তারপর সেই লোকটা এল।' কথাটা বলে ফেলেই ভদ্রলোক থামলেন, তারপর খানিকটা চাপা কান্না, আর খানিকটা চাপা হাসির মত সেই অদ্ভুত শব্দটা করলেন। বুঝতে পারছিলাম যে এই লোকটির কথা বলতে ওঁর কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আবার ভদ্রলোক জোর করে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে বলতে লাগলেন। 'আমি জানতাম লোকটা একেবারে নোংরা স্বভাবের।' আমার জীবনে একটা প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে বলে একথা বলছি না, সত্যি সত্যিই লোকটা একেবারে বাজে। লোকটা বাজে ছিল বলেই এখন আরও বুঝতে পারি যে আমার স্ত্রী কি পরিমাণ দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিল। লোকটা আসলে একটা উপলক্ষ মাত্র। সে না এলে আমার স্ত্রী অন্য যে-কোন লোককে নিয়ে মেতে উঠত।

ভদ্রলোক একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন, লোকটা বেহালা বাজাত। পেশাদার বাজিয়ে নয়। এমনিতে আড্ডাবাজ-গোছের লোক; পার্টি, ক্লাব ইত্যাদি করে বেড়াত আর মাঝে মাঝে বাজনা বাজাত। ওর বাবা ছিলেন একজন জোতদার, আমার বাবার প্রতিবেশী। ভদ্রলোক নিজের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করেন। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দুজন কি যেন কাজকর্ম জুটিয়ে নেয়, আর ছোটটিকে পারীতে তার ধর্ম-মায়ের কাছে পাঠানো হয়। ছোটটির গানবাজনার ঝোঁক ছিল। তাকে পারীর একটি বাজনার স্কুলে ভর্তি করা হল, সেখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে নানা আসরে বেহালা বাজাত। মানুষ হিসেবে লোকটা একেবারে অতি--' ভদ্রলোক সম্ভবতঃ খুব খারাপ কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'পারীতে লোকটা কি করত না করত জানি না। তবে আমাদের বাড়িতে যে বছর এল, সেই বছরেই ও রাশ্যায় ফিরেছিল। বাদামী রঙের চোখ, চোখে বেশ একটা ছলছল ভাব, লাল ঠোঁটে সর্বদাই হাসি লেগে আছে, মোম লাগানো গোঁফ, হালফ্যাসানের চুল ছাঁটা, সব মিলিয়ে দেখতে সুন্দর কিন্তু চেহারায় কোথায় যেন একটা অশ্লীল ভাব—মেয়েরা যেরকম চেহারা দেখলে 'মন্দ নয়' বলে সেই রকম আর কি! শরীরের গড়ন একটু দুর্বল গোছের, কিন্তু কুৎসিত নয়, মেয়েদের মত উঁচু পাছা হটেনটটদের মতও বলতে পারেন। লোকে বলে, হটেনটট্‌দের পাছা বেশ উঁচু হয়। আর শুনেছি তারাও নাকি খুব গানবাজনার ভক্ত। লোকটার স্বভাব এমন ছিল যে একটু লাই পেলেই মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করত। আবার এদিকে লাজুক-স্পর্শকাতর গোছের ছিল, তাড়া খেলেই গুটিয়ে যেত। চালচলনে বেশ গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করত। পারীর ফ্যাশান অনুযায়ী বোতাম লাগানো বুট, বেশ চড়া রঙের নেকটাই ইত্যাদি পরত। বিদেশী লোকেরা পারীতে গেলে যে ধরনের পোশক-পত্তর পরা অভ্যাস করে, এ লোকটিও মোটামুটি সেইরকম সাজ-পোশাক করত। এই ধরনের বেশভূষায় তো বেশ একটা নতুনত্ব আছে, তাই মেয়েরা এ-সব বেশ পছন্দ করে। লোকটা সব সময় ওপর ওপর একটা নকল হাসিখুশি ভাব রেখে চলত। আর কখনও কোন কথা পুরোটা শেষ করত না। খানিকটা বলে বাকিটা আভাস-ইঙ্গিতে সারত। ভাবখানা এই যেন ও কি বলতে চায় তা সকলেই বুঝতে পারছে। এই লোকটা আর এর

বাজনাই আমার কাল হল। আমার বিচারের সময় ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়ে গেল যেন দুর্ঘটনাটা ঘটেছে ঈর্ষার জন্য। আসলে কিন্তু তা নয়—অন্ততঃ পুরোটা তাই নয়। বিচারে স্থির হয়েছিল যে আমার স্ত্রী আমাকে ঠকিয়ে যাচ্ছিল বলে নিজের সম্মান (ওঁরা ঠিক এই কথাটাই ব্যবহার করেছিলেন) রক্ষার জন্য আমি তাকে খুন করেছি। বিচারকেরা সেই ভেবেই আমাকে বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। আমি ওঁদের আসল ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওঁরা ভাবলেন, আমি আমার স্ত্রীর সুনাম ও সম্মান বাঁচানোর জন্য মিথ্যে কথা বলছি।

আসলে সেই বাজনদারের সঙ্গে আমার স্ত্রীর কি রকম সম্পর্ক ছিল না ছিল, সে ব্যাপারটা আমার কাছে, এমন কি আমার স্ত্রীর কাছেও খুব কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, শেষে যে বীভৎস ব্যাপারটা ঘটল, তার আসল কারণ আমার পাশবিকতা।

আমাদের দুজনের মধ্যে যে বিরাট ফাঁক ছিল, তার জন্যই এমন একটা বীভৎস ব্যাপার ঘটে গেল। আমরা পরস্পরকে এত বেশি ঘেন্না করতাম যে, যে-কোন সামান্য ব্যাপারকে উপলক্ষ করেই একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যেতে পারত। আমাদের প্রচণ্ড ঝগড়াঝাঁটি হত। দুজনে দুজনের শরীর নিয়ে জন্তুর মত মাতামাতি করার পরেই এই ঝগড়াগুলো হত বলে সেগুলো আরও বীভৎস বলে মনে হত। আমাদের জীবনে ঐ লোকটা এসে হাজির না হলে অন্য কেউ আসত। ঈর্ষার ব্যাপারটা না থাকলে, অন্য যে-কোন একটা ব্যাপার নিয়ে খুনোখুনি হয়ে যেত। আমার বিশ্বাস, আমার মত যে সব লোক স্ত্রীর সঙ্গে জন্তুর জীবন কাটায়, তারা হয় পুরাপুরি লম্পট বনে যায়, নয় স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যায় আর নয়তো স্ত্রীকে কিংবা নিজেকে খুন করে। যারা এসব বিপর্যয় এড়াতে পারে, তাদের, ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে হবে। স্ত্রীকে খুন করার আগে আমি নিজে বহুবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছি, আমার স্ত্রীও বিষ খেয়ে মরার চেষ্টা করেছে।'

২০

'হ্যাঁ, শেষের দিকে অবস্থাটা এই রকম বীভৎস হয়ে উঠেছিল। মাঝে একবার আমাদের দুজনের মধ্যে একটা সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি গোছের ব্যাপার

হয়েছিল। সেটাই চালিয়ে যেতে পারা উচিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ আমি একদিন বলে ফেললাম, যে একটা কুকুর ডগ-শোতে মেডেল পেয়েছে।

আমার স্ত্রী তক্ষুণি বলে উঠল, 'মেডেল নয়, সার্টিফিকেট।'

'ব্যস্, তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। আমরা ঐ বিষয়টা ছেড়ে অন্য একটা বিষয় নিয়ে পড়লাম। তারপর দেখতে না দেখতে, দুজনের দোষ ধরতে আরম্ভ করে দিলাম।

'আহা এটা তো সবাই জানে, সব সময়ই এই রকম হয়। তুমি নিজেও সেদিন বলেছিলে...'

'না, আমি ওরকম কিছুই বলিনি।'

'তার মানে তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী বলছ?'

'বুঝতে পারলাম এবার একটা প্রচণ্ড ঝগড়া হবে। ঐরকম এক একটা ঝগড়ার মুহূর্তে আমার, হয় নিজেকে, নয় ওকে খুন করতে ইচ্ছে করত। উত্তেজনার মুহূর্তে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারে ভেবে, ভয়ে আমি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু রাগে আমার সর্বাঙ্গ একেবারে জ্বলে যাচ্ছিল। ও-ও আমার মতই, কিংবা তার চেয়েও বেশি উত্তেজিত ছিল। ও ইচ্ছে করে আমার কথাগুলোর বাঁকা মানে করতে লাগল। ঠিক কোন্ কথাটা বললে আমি সবচেয়ে বেশি আঘাত পাব, সেটা ওর পরিষ্কার জানা ছিল। বিষাক্ত তীরের মত তীক্ষ্ণ কথা বিঁধে বিঁধে ও আমাকে একেবারে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর আমি আর সহ্য করতে না পেরে চীৎকার করে উঠলাম।

'এক্ষুণি চুপ কর।'

'ও লাফিয়ে ওঠে বাচ্চাদের ঘরের দিকে ছুটে গেল। ওকে থামিয়ে আমার শেষ কথাটা জোর করে শোনাব বলে ওর হাতটা চেপে ধরতেই, ও যেন খুব ব্যথা পেয়েছে, এমন একটা ভাব করে চীৎকার করে উঠল, 'ওরে তোরা এদিকে আয়। তোদের বাবা আমাকে মারছে।

'আমি চীৎকার করে বললাম, 'মিথ্যে কথা বল না।'

'ও-ও চীৎকার করে বলল, 'এই প্রথম মারছ না কি?'

'বাচ্চারা ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। ও তাদের শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল।

'আমি বললাম, 'ঢং কোর না।'

'তোমার কাছে তো সবই ঢং। তুমি লোককে খুন করে ফেলার পরও বলতে পার যে সেই মরা লোকটা ঢং করছে। সব বুঝতে পেরেছি আমি, তুমি আমাকে মেরে ফেলতে চাও।'

আমি দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, 'আমি তোর মরামুখ দেখতে চাই।'

এরকম ভয়ংকর একটা কথা বলে ফেলে আমি নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম। আমি যে কাউকে এত কঠিন, নিষ্ঠুর কথা বলতে পারি তা ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। চেঁচামেচি করার পর আমার নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলাম। ওখান থেকেই বুঝতে পারলাম, ও সামনের বড ঘরটায় গেল, জিনিসপত্তর গোছানোর শব্দও কানে আসতে লাগল। উঠে গিয়ে, কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞাসা ক'রে কোন জবাব পেলাম না। বিরক্ত হয়ে ভাবলাম, "চুলোয় যাক্, যা করছে করুক।" আবার নিজের ঘরে ফিরে, শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলাম।

'মাথার মধ্যে নানা ভাবনা কিলবিল করছিল। ওকে জব্দ করার জন্য হাজারটা প্ল্যান করতে লাগলাম। একবার ভাবলাম ওকে ত্যাগ করব। আবার মনে হল যাক্ গে, যা হয়েছে—হয়েছে, একটা মিটমাট করে ফেলে আগের মতই জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে যাব। এমনি করে সিগারেট ধ্বংস করতে করতে, আর ভাবতে ভাবতে বহুক্ষণ কাটল। বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব, আমেরিকায় পালিয়ে যাব, ওকে ত্যাগ করে একটি দারুণ ভাল মেয়েকে আবার বিয়ে করব, সুন্দর সুখী জীবন গড়ে তুলব ইত্যাদি নানা উদ্ভট পরিকল্পনা মাথায় আসতে লাগল। ভাবলাম, হয় ওর নামে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনব, নয়, ওকে খুন করে আমার সুখের পথ পরিষ্কার করব। তারপর হঠাৎ এক সময় মনে হল এইসব নোংরা কথা ভাবা অন্যায়। আমি যে অন্যায় করছি, এই উপলব্ধিটা সরিয়ে রাখার জন্যই আসলে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে নিজেকে অন্যমনস্ক করে রাখার চেষ্টা করছিলাম।

সংসার যেমন চলছিল, তেমন ভাবেই চলতে লাগল। গভর্নেস এসে, গৃহিণী কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করল। চাকর চা দেবে কিনা জিজ্ঞাসা করল। আমি খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম। বাচ্চাদের মধ্যে যে কটার তবু একটু বোঝার বয়স হয়েছে, তারা, বিশেষ করে লিজা, গম্ভীর মুখ করে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সন্ধ্যের পরও আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরল না। আমার দু ধরনের অনুভূতি হতে লাগল। আমাকে এবং বাচ্চাদের এরকম অনর্থক দুশ্চিন্তায় ফেলার জন্য এক একবার আমার স্ত্রীর ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। আবার হঠাৎ হঠাৎ ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল, 'ও যদি আর কখনও না ফিরে আসে, যদি আত্মহত্যা করে বসে!' ভাবলাম, 'খুঁজতে বেরোই। কিন্তু কোথায় খুঁজব? ওর বোনের বাড়ি? না, হঠাৎ ওর বোনের বাড়ি গিয়ে ওর কথা জিজ্ঞাসা করলে, কি রকম বোকা বোকা ব্যাপার হয়ে যাবে। চুলোয় যাক্। থাক্ না বসে বোনের বাড়ি। আমাকে এত যন্ত্রণা ভোগ করাচ্ছে, ও নিজেও একটু কষ্ট পাক্। আমি নিজে থেকে গিয়ে সাধলে, পরের ঝগড়াটার সময় ও বড বেশি সুবিধা পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি বোনের বাড়ি না গিয়ে থাকে? যদি আত্মহত্যা করে থাকে'—ভাবতে ভাবতে ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে গেল রাত এগারটা বাজল, বারটা বাজল। একা একা শোবার ঘরে গিয়ে জেগে বসে থেকে কোন লাভ নেই ভেবে আমি আর শুতে গেলাম না। পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই মন বসল না। একা একা নিজের ঘরে কান খাড়া করে বসে রইলাম। প্রচণ্ড রাগ, দুঃখ, যন্ত্রণা হতে লাগল। রাত তিনটে বাজল—চারটে বাজল। তখনও ও ফিরল না। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে দেখলাম, তখনও ও ফেরেনি।

'বাড়িতে সবই নিয়ম-মাফিক চলতে লাগল। কিন্তু সবাই কেমন যেন একটা হতভম্ভ হয়ে রইল। মাঝে মাঝে আমার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন, পুরো ব্যাপারটা আমার দোষেই ঘটেছে। আমার নিজের মনে ওর জন্য দুশ্চিন্তা আর রাগ—এই দুটো অনুভূতির টানাপোড়েন চলতে লাগল। এগারটা নাগাদ ওর বোন এল, ওর হয়ে দৌত্য করতে। এ-সব অবস্থায় যেমন হয়ে থাকে, সে এসেই বলল; 'কি হয়েছিল কি? ওর তো দেখলাম একেবারে সাংঘাতিক অবস্থা!

আমি বললাম, 'হবে আবার কি? আমি কিছুই করিনি। ও নিজেই অশান্তি করছে।'

ওর বোন বলল, 'কিন্তু একটা কিছু তো করতে হবে। ব্যাপারটা তো আর এই অবস্থায় ফেলে রাখা যায় না।'

'যা করতে হয়, ও করুক। আমি কিছু করতে পারব না। যদি আলাদা থাকতে চায়, তবে তাও থাকতে পারে।'

ওর বোন কোন সমাধান করতে না পেরে চলে গেল। ওর সামনে খুব তড়পে বলেছিলাম বটে যে আমি নিজে কিছু করতে পারব না। কিন্তু ও চলে যাবার পর বাচ্চাগুলোর করুণ, ভয়ার্ত মুখ দেখে মায়া হতে লাগল। মনে হল মিটমাটের জন্য না হয় আমিই এগিয়ে যাই। কিন্তু ঠিক কি যে করব তা কিছু বুঝে উঠতে পারছিল'ম না। আবার সারা ঘর পায়চারি করে আর সিগারেট খেয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। সকাল থেকে শুধু ভদ্‌কা আর মদ খেয়ে খেয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন মত লাগছিল। নেশার ঘোরে নিজের মূর্খামি আর নীচতার কথা ভুলে গেলাম। নেশা করার আসল উদ্দেশ্য তাই—আমি নিজের দোষের কথা ভুলতে চাইছিলাম।

দুপুর তিনটে নাগাদ আমার স্ত্রী বাড়ি ফিরল। আমাকে দেখে কোন কথা বলল না। ও নিজের দোষের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে ভেবে, আমি ওকে বোঝাতে গেলাম। বললাম যে ও অত চোটপাট করছিল বলেই আমি ঐরকম একটা রূঢ় কথা বলে ফেলেছিলাম। ও কঠিন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কৈফিয়ত শুনতে আসিনি, বাচ্চাদের নিয়ে যেতে এসেছি।' আমাদের পক্ষে আর এক বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়।' আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমার কোন দোষ নেই, ওর কথাতেই আমি ওরকম পাগলের মত ক্ষেপে গিয়েছিলাম। মুখে একটা কঠিন বিদ্বেষ নিয়ে এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'আর বেশি কিছু বল না। পরে আক্ষেপ করতে হবে।'

আমি বললাম, 'ন্যাকামি ভাল লাগে না, কি বলতে চাও, পরিষ্কার করে বল।' ও চীৎকার করে উঠে কি যেন একটা বলল। তারপর ছুটে নিজের ঘরে চলে গিয়ে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। ডেকে কোন সাড়া পেলাম না। আধঘন্টাটাক বাদে লিজা কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে ছুটে এল। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় বলল, 'মার ঘর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!'

আমি গিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিতে দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। ওর বিছানার পাশে গিয়ে দেখি ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। পায়ে জুতো, পরণের জামাকাপড় এলোমেলো। টেবিলে আফিমের খালি বোতল। বহু চেষ্টার পর ওর জ্ঞান ফিরল। কান্নাকাটি ইত্যাদি হওয়ার পর একটা মিটমাট হল। অবশ্য সত্যিকারের মিটমাট নয়।

দুজনেই মনে মনে পুরনো শত্রুতা জিইয়ে রাখলাম। তার ওপর এই ঝগড়াটার সময় দুজনেরই যে ভীষণ কষ্ট হয়েছে, তার জন্য পরস্পরকে মনে মনে দোষারোপ করতে লাগলাম। কিন্তু অনন্তকাল ধরে তো আর রাগ পুষে রাখা যায় না। সুতরাং এক সময় জীবন আবার আগের মত হয়ে এল। আরও অজস্রবার এই রকম কি এর চেয়েও আরও কুৎসিত ঝগড়া হল। একবার দুদিন ধরে প্রচণ্ড ঝগড়া চলার পর, আমি বিদেশে চলে যাব ঠিক করে পাসপোর্টের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু আবার একটা আধাখেচড়া মিটমাট হল! আমি বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা ছেড়ে দিলাম।

২১

'এই অবস্থায় ঐ লোকটা এসে জুটল। লোকটার নাম ত্রাখাচেভ্স্কি। পারী থেকে মস্কোয় ফিরেই ও একদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। এক সময় লোকটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। ও সেই পুরানো অন্তরঙ্গতা আবার জিইয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমার দিক থেকে যে সেরকম কোন ইচ্ছা নেই এটা ওকে বুঝিয়ে দেবার পর ও ব্যাপারটা মেনে নিল। লোকটাকে আমার প্রথম দিন থেকেই বাজে লেগেছিল। তবু কেন জানি না ওকে আমি এড়াতে পারলাম না, বাড়িতে আসতে বারণ করতে পারলাম না। এমন কি একটু প্রশ্রয় দিয়ে ফেললাম। ওর সঙ্গে আমার স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। সরাসরি ওকে বিদেয় করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু কি-যে দুর্মতি হল, ওর গানবাজনা নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। আমি যেন কার কাছে শুনেছিলাম ও বাজনা ছেড়ে দিয়েছে। কন্তু ও বলল, কথাটা ঠিক নয়, আজকাল ও বরং অনেক বেশি করে বাজনায় মন দিয়েছে। আমি যে এককালে বেহালা বাজাতাম ও সে কথাটাও উল্লেখ করল। আমি তার উত্তরে বললাম, 'এখন আর বাজাই না, তবে আমার স্ত্রী খুব ভাল পিয়ানো বাজান।'

আশ্চর্য, প্রথম দিন থেকেই আমার আর এই লোকটার মধ্যে একটা অদ্ভুত টেনশন্ ছিল—পরে যে ওর জন্য আমার জীবনে কী প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে, সেটা আগে থাকতে জানা থাকলে যে রকম টেনশন হওয়ার কথা

প্রায় সেই রকম। আমার কেমন যেন মনে হত—আমাদের দুজনের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভাবভঙ্গির অন্য একটা বিশেষ মানে আছে।

'আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিলাম। আলাপ হওয়া মাত্রই ওরা গানবাজনা নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করল। ও একদিন এসে আমার স্ত্রীকে বাজনা শোনাবে বলল। তখন আমার স্ত্রী সব সময়ই খুব সেজেগুজে থাকত। ট্রাখাচেভ্স্কির সঙ্গে আলাপ হওয়ার দিনও লোকের চোখে বেশ রঙ ধরিয়ে দেওযার মত করে সেজে ছিল। দেখাচ্ছিল খুব সুন্দর। প্রথম থেকেই আমার স্ত্রীর ঐ লোকটাকে ভাল লেগে গেল। তাছাড়া ওর বেহালার সঙ্গে জুটিতে পিয়ানো বাজাতে পারবে ভেবে খুব খুশি হয়ে উঠল। ও বরাবরই বেহালা আর পিয়ানোর ডুয়েট্ পছন্দ করত। আগে মাঝে মাঝে থিয়েটার থেকে একজন বেহালা বাজিয়েকে ভাডা ক'রে এনে তার সঙ্গে ডুয়েট্ বাজাত। স্ত্রীর মুখ দেখে বুঝলাম, ও খুব খুশি হয়েছে। আমার মুখ দেখেও ও তক্ষুণি বুঝে ফেলল, যে ব্যাপারটা আমার আদৌ পছন্দ নয়। বুঝেই নিজের মুখের ভাব পালটে ফেলল। তারপর দুজনেই দুজনকে ঠকানোর পালা শুরু করলাম। আমি খুশি হওয়ার ভান করতে লাগলাম —খুব ভদ্রতা করে হাসলাম।

সব লম্পটই মেয়েছেলে দেখলে যেভাবে তাকায়, এই লোকটাও সেই-ভাবে আমার স্ত্রার দিকে তাকাচ্ছিল। অথচ এমন একটা ভাব করছিল যেন ও খুব মন দিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। আসলে কিন্তু আমরা কি বলছি না বলছি তাতে ওর কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। আমার স্ত্রী খুব সহজ স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিল। আসলে কিন্তু একদিকে ঈর্ষাকাতর স্বামীর কৃত্রিম হাসি (এ রকম সাজানো হাসি তো অনেকবারই দেখেছে), আর অন্যদিকে সদ্য পরিচিত লোকটির লালায়িত দৃষ্টি দেখে ভিতরে ভিতরে খুব বিব্রত বোধ করছিল। আমার স্ত্রী প্রথম যখন ঐ লোকটির দিকে তাকায়, তখন হঠাৎ চোখের দৃষ্টি একটু বিশেষ রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। তারপর বোধহয় আমার ঈর্ষার জন্যই দুজনের মধ্যে যেন একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ হয়ে গেল, দুজনের মুখের ভাব, হাসি সব একেবারে একরকম হয়ে উঠল। আমার স্ত্রী লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে তো লোকটাও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। আমার স্ত্রী হাসে তো লোকটাও হাসতে থাকে। লোকটা যাওয়ার সময় টুপিটা হাতে

নিয়ে আমাদের দুজনের দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে রইল। ওর হাঁটুগুলো উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল। মনে হল, আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করছে যে এবার আমরা কি করব। সেই যাওয়ার মুহূর্তটা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে। কারণ সেই মুহূর্ত পর্যন্ত পুরো ব্যাপারটা আমার হাতে ছিল। তখন যদি ওকে আমাদের বাড়িতে আসতে নিমন্ত্রণ না করতাম তাহলে হয়তো আর কিছুই ঘটত না। কিন্তু আমি একবার সেই লোকটার আর একবার আমার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মনে মনে আমার স্ত্রীকে বললাম, 'ভেবো না যে আমি ঈর্ষায় সন্দেহে একেবারে নীচ হয়ে গেছি।' লোকটাকেও মনে মনেই বললাম, 'ভেবো না আমি তোমাকে ভয় পাই।' তারপর লোকটাকে একদিন সন্ধ্যায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে বেহালা বাজানোর আমন্ত্রণ জানালাম। আমার স্ত্রী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল, লজ্জা পেল। তারপর একটু যেন ভয় পেয়েই বলল যে ও নিজে এত খারাপ বাজায়, যে কারও সঙ্গে ডুয়েট্ বাজানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। আমার স্ত্রী বাজাতে পারবে না বলায় আমি আরও বিরক্ত হয়ে উঠে ঐ লোকটাকে আবার আসার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। এখনও মনে আছে লোকটা হালকা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় পিছন দিক থেকে ওর কালো কালো চুল আর সাদা ঘাড়টা দেখে আমার কি রকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। ঐ লোকটার উপস্থিতি যে আমার কাছে কী ভীষণ যন্ত্রণাকর সেটা নিজের কাছে স্বীকার না করে আর কোন উপায় ছিল না। ভাবলাম, লোকটাকে আর আসতে দেব কি দেব না সেটা তো আমার নিজের ওপরেই নির্ভর করছে। কিন্তু ওকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করলে তো তার মানে দাঁড়াবে যে আমি ভয় পেয়েছি। না, না, আমি ওকে ভয় পাই না।' ঐ লোকটার জন্য ভয় পাচ্ছি ভাবলে নিজেই নিজের কাছে কিরকম ছোট হয়ে যেতাম। তাই আমার স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওকে সেদিন সন্ধ্যাতেই বেহালা নিয়ে আসতে বললাম। লোকটা রাজি হল। সন্ধ্যেবেলা লোকটা বেহালা নিয়ে এল, ওরা দুজন বাজাল। সেদিন বিশেষ কিছু হল না। যে গৎগুলো ওরা বাজাতে চায় সেগুলো ওদের কাছে ছিল না। আর যে গৎগুলো সঙ্গে ছিল, আগে থেকে রেওয়াজ করা না থাকলে সেগুলো আমার স্ত্রীর পক্ষে বাজানো সম্ভব ছিল না। আমি নিজে গানবাজনা বেশ

ভালবাসতাম। লোকটার বসার জন্য একটা স্টাণ্ড খাড়া করে দেওয়া, স্বরলিপির পাতা উলটে দেওয়া ইত্যাদি ছোটখাট ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করবারও চেষ্টা করেছিলাম। ওরা কয়েকটা গান আর মোৎসার্টের একটা সোনাটা বাজাল। বাজিয়ে হিসেবে লোকটা দারুণ। কিন্তু বাজনার ব্যাপারে যেরকম সূক্ষ্ম রুচিবোধ দেখলাম, তার সঙ্গে ওর আসল চরিত্রের আদৌ কোন মিল ছিল না।

'স্বভাবতই লোকটা আমার স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি ভাল বাজাল। আমার স্ত্রীকে সাহায্য করতে করতে সে মাঝে মাঝে ওর বাজনার প্রশংসা করছিল। লোকটার আচার ব্যবহার খুবই ভাল। আমার স্ত্রীও খুব সহজ স্বাভাবিক ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সত্যিসত্যিই ও শুধু বাজনায় উৎসাহী। আমি নিজেও খুব মুগ্ধ শ্রোতার মত ভাব করছিলাম বটে, আসলে কিন্তু সারাটা সন্ধ্যা ঈর্ষায় একেবারে জ্বলে পুড়ে মরছিলাম। ওদের দুজনের চোখাচোখি হতেই দেখলাম ভিতরের জন্তু দুটো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। সমস্ত সামাজিক বাধানিষেধ ভাসিয়ে দিয়ে ওরা একজন আরেক-জনকে চোখেচোখে প্রশ্ন করল, 'আর একটু এগোতে পারি,' অন্যজনও চোখের ইশারায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' লোকটার ধারণা ছিল না যে মস্কোর মেয়েরা আকর্ষণীয় হতে পারে। সুতরাং আমার স্ত্রীর মত একজন আকর্ষণীয় মহিলা পেয়ে একেবারে দারুণ খুশি হয়ে উঠল। তাছাড়া প্রথম থেকেই লোকটা বুঝতে পেরেছিল যে আমার স্ত্রী তার সঙ্গে শুতে রাজি হবে। এখন স্বামী ব্যাটাকে সরানোটাই হল একমাত্র সমস্যা। আমি নিজে ভালমানুষ হলে এত কথা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু বিয়ের আগে আর পাঁচটা লোকের মত আমি নিজেও তো স্ত্রী-লোকদের এই চোখেই দেখেছি। কাজেই ঐ লোকটার মনের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে পলকের মধ্যে বুঝতে পেরে গেলাম। শারীরিক সুখের মুহূর্তগুলো বাদ দিলে আমার সম্পর্কে আমার স্ত্রীর যে বিরক্তি ছাড়া আর কোন অনুভূতি ছিল না, সে কথাটা খুব ভাল করে জানতাম। জানতাম বলেই লোকটাকে দেখে আরও বেশি কষ্ট হতে লাগল। এই লোকটার সবচেয়ে বড় সুবিধা ছিল তার নতুনত্বের চমক। তার ওপর সুন্দর চেহারা, অসাধারণ ভাল বেহালা বাজায়। ডুয়েট বাজাতে বাজাতে ওরা নিশ্চয়ই পরস্পরের কাছাকাছি আসবে, আর স্পর্শকাতর

স্বভাবের লোকেরা বেহালা শুনলে যে কী প্রচণ্ড অভিভূত হয়ে পড়ে, তাও বহুবার দেখেছি। সব মিলিয়ে বেশ বুঝতে পারলাম, আমার স্ত্রীর লোকটাকে দারুণ ভাল লাগবে। শুধু তাই নয়, লোকটা ওর চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, ওকে একেবারে অধিকার করে ফেলবে, ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবে।

'পুরো ব্যাপারটা প্রথম থেকেই একেবারে পরিষ্কার বুঝে ফেলেছিলুম বলে আমার অসম্ভব কষ্ট হয়েছিল। তা সত্ত্বেও, কিম্বা হয়তো সেই কষ্টের জন্যই কি যেন একটা শক্তি আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে জোর করে অনেক কিছু করিয়ে নিচ্ছিল। আমাকে ঐ লোকটার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে বাধ্য করছিল। স্ত্রীর কাছে 'কুছ পরোয়া নেই' গোছের ভাব দেখিয়ে বাহাদুরী নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, নাকি নিজেকেই নিজে ঠকাচ্ছিলাম বলতে পারি না। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই লোকটার সঙ্গে সাদাসিধে ব্যবহার করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তক্ষুণি, সেই হলঘরেই আমার লোকটাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। সেই ইচ্ছেটা চাপা দেওয়ার জন্য ওর সঙ্গে আরও বেশি বেশি করে ভদ্রতা করতে লাগলাম। লোকটার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললাম, তার বাজনার প্রশংসা করলাম, রাত্রে তাকে দামী মদ খাওয়ালাম, তারপর আবার পরের রবিবার এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাজানোর জন্য অনুরোধ করে বসলাম। বললাম, 'আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যারা গানবাজনা ভাল বাসে, তাদেরও সেদিন নেমন্তন্ন করব।' সে সন্ধ্যেটা এইভাবেই কাটল। এই পর্যন্ত বলে পঝ্‌নূশেভ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে সেই অদ্ভুত শব্দটা করলেন।

তারপর একটু সামলে নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'আশ্চর্য! লোকটাকে দেখলে আমার যে কী অদ্ভুত একটা অনুভূতি হত! সেই সন্ধ্যের পর তিন চার দিন বাদে একটা এক্‌জিবিশন দেখে বাড়ি ফিরতেই হঠাৎ কেন জানি না মনটা কেমন ভারী হয়ে গেল। বাইরের বারান্দা দিয়ে বাড়ির ভেতরের প্রথম বড় ঘরটায় ঢোকার সময় কি যেন একটা দেখে আমার সেই লোকটার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আমার পড়ার ঘর পর্যন্ত চলে এসেছি, তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম জিনিসটা কি। একেবারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার ফিরে বারান্দায় গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি যা সন্দেহ করে-ছিলাম, ঠিক তাই। বারান্দায় সেই লোকটার কোট ঝুলছে (কখন যে

লোকটার হাবভাব, পোশাক পরিচ্ছদ সব কিছু এত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি তা আমি নিজেই জানতাম না)। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সেই লোকটাই এসেছে। সোজাসুজি ড্রয়িংরুম দিয়ে না গিয়ে ইচ্ছে করে বাচ্চাদের পড়ার ঘরের ভিতর দিয়ে ঘুরে রিসেপশন্ রুমের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি বাচ্চাদের ঘরে আমার বড় মেয়ে লিজা একমনে বই পড়ছে, আর বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য যে দাসীটিকে রাখা হয়েছিল সে ছোট বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে একটা চাকামত কি ঘোরাচ্ছে। রিসেপশন রুমের দরজাটা বন্ধ। ভিতর থেকে খুব চড়া সুরের বাজনা আর ওদের দুজনের কথার শব্দ ভেসে আসছিল। বুঝতেই পারলাম, নিজেদের কথাবার্তার শব্দ অথবা চুম্বনের শব্দ চাপা দেওয়ার জন্যই ওরা পিয়ানো বাজাচ্ছে! ওঃ! ভগবান সেই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে যে কী ভীষণ একটা ব্যাপার হতে লাগল! আমার ভিতরকার জন্তুটা তখন হঠাৎ কিরকম খেপে উঠেছিল, ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়। একমুহূর্ত আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস সব বন্ধ হয়ে গেল, তারপরই বুকের ভিতরটা তোলপাড করে ঠিক যেন হাতুড়ি পেটার মত জোরে শব্দ হতে লাগল! নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হল। বাচ্চাদের সামনে, ঝি-চাকরদের সামনে আমার স্ত্রী কি করে এই কেলেঙ্কারী করছে ভেবে রাগে অস্থির হয়ে উঠলাম। সে সময় আমার মুখচোখের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব বীভৎস হয়ে উঠেছিল। লিজা ভয়ে কাঠ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলাম না। একবার ভাবলাম ভিতরে যাই। কিন্তু ওদের সামনে গিয়ে পড়লে সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে পারি ভেবে নিজেরই ভয় করতে লাগল। অথচ সেখানে চলে যেতেও পারছিলাম না। বাচ্চা দেখার ঝিটা আমার মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিল যেন ও আমার সব কথা টের পেয়ে গেছে। হঠাৎ ঠিক করে ফেললাম, ভিতরে যাব।

ঝট্ করে দরজাটা খুলে ফেলে দেখলাম লোকটা বসে পিয়ানো বাজাচ্ছে। আর আমার স্ত্রী পিয়ানোর ডালাটার কাছে দাঁড়িয়ে স্বরলিপি দেখছে। আমার স্ত্রীই প্রথম আমাকে দেখতে পেল। আমাকে হঠাৎ ওভাবে ঢুকতে দেখে ও বোধ হয় মনে মনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল—কিন্তু মুখে এমন একটা ভাব দেখাল যেন কিছুই হয় নি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে ও আদৌ ভয় পায়নি। যাই হোক, ও একটুও চমকাল না, নিজের জায়গা থেকে সরেও

গেল না। শুধু বারবার লজ্জায় লাল হয়ে যেতে থাকল। তারপর খুব মধু-ঢালা গলায় বলল, 'যাক্, ভাল হয়েছে, তুমি এসে গেছ। রবিবার কি বাজাব কিছু ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না।' আমরা দুজন আলাদা থাকলে আমার স্ত্রী কখনও এরকমভাবে আমার সঙ্গে কথা বলত না। তাছাড়া ঐ লোকটার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে যে ভাবে 'আমরা' শব্দটি উচ্চারণ করল, তাতে আমার আরও খারাপ লাগল। কোন কথা না বলে লোকটার দিকে তাকিয়ে একটু কাষ্ঠ হাসি হাসলাম। লোকটা আমার করমর্দন করে এমন ভাবে হাসল যে আমার মনে হল যেন ঠাট্টা করছে। তারপর কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত করে বলল যে আগামী রবিবারের জন্য ও কতকগুলো স্বরলিপি নিয়ে এসেছে। কিন্তু বিঠোফেনের সোনাটা বা ঐরকম কোন ক্ল্যাসিকাল গৎ বাজাবে, না, হাল্কা সুরের কতকগুলো ছোট ছোট গৎ বাজাবে তা ঠিক করে উঠতে পারছে না। কথাগুলো এত সহজ স্বাভাবিক ভাবে বলছিল যে তার মধ্যে আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। কিন্তু আমার মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলছে। আসলে এতক্ষণ ওরা দুজনে আমাকে ঠকানোর জন্য গোপন পরামর্শ করছিল।

ঈর্ষাপরায়ণ লোকেদের (আমাদের যা সমাজ-ব্যবস্থা, তাতে প্রায় সব লোকেই ঈর্ষাপরায়ণ) মানষিক যন্ত্রণার একটা বড় কারণ হল এই যে, আমাদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের শারীরিক সান্নিধ্যের ব্যাপারটা খুবই চলতি। ডাক্তার এবং রোগিণীর মধ্যের শারীরিক সান্নিধ্য, কিম্বা যে-সব নারীপুরুষ একসঙ্গে আঁকা শেখে, গানবাজনা শেখে বা বল্‌নাচের আসরে যায়, তাদের শারীরিক সান্নিধ্য নিয়ে কেউ আপত্তি করলে লোকে তাকে উপহাস করবে। আমার স্ত্রী ও ঐ লোকটাও একসঙ্গে বাজনা বাজাচ্ছিল—এবং সঙ্গীতের মত মহৎ শিল্প আর কি আছে বলুন? বাজনা বাজাতে গেলে তাদের পরস্পরের শরীরের কাছাকাছি আসতেই হবে এতে আপত্তিকর কিছুই নেই। নিতান্ত গাধা না হলে বা ঈর্ষায় একেবারে পাগল হয়ে না গেলে কোন স্বামীই এরকম একটা ব্যাপারে আপত্তি করতে পারে না। অথচ সকলেই জানে যে, স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে মিলে শিল্পচর্চা, বিশেষ করে সঙ্গীতচর্চা করতে যায় বলেই আমাদের সমাজে ব্যভিচার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ওরা দুজনেই আমার খারাপ লাগাটা টের পাচ্ছিল। আমার সমস্ত মন এত বিক্ষুব্ধ ছিল যে, কিছুক্ষণ আমি একটা কথাও বলতে পারলাম না।

লোকটাকে প্রচণ্ড গালাগালি দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে। অগত্যা ভদ্র হয়েই রইলাম। এমন একটা ভান করতে লাগলাম যেন এ-সব আমার বেশ ভালই লাগছে। মনের রাগ চেপে ভদ্রতার ভান করতে হচ্ছিল বলে লোকটাকে আমার আরোও অসহ্য লাগছিল। আমি বললাম, বাজনার ব্যাপারে ব্রাখাচেভ্‌স্কির বিচারবুদ্ধির ওপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে। রবিবারের ব্যাপারে ও যা ঠিক করবে, আমি তাতেই রাজী, আমার স্ত্রীকেও তাতেই রাজী হয়ে যেতে বললাম। আমি হঠাৎ ঢুকে পড়ায় এবং অতক্ষণ চুপ করে বসে থাকায় যে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত লোকটা বসে রইল। তারপর রবিবার কি কি গৎ বাজাবে, সেগুলো যেন ঠিক করা হয়ে গেছে এমন একটা ভাব দেখিয়ে উঠে চলে গেল। আমি নিশ্চিত জানতাম যে ওরা দুজনে অন্য ব্যাপারে মত্ত -কি গৎ বাজাবে না বাজাবে, তা নিয়ে ওদের কারুরই মাথা ব্যথা নেই। লোকটাকে বিদায় দেওয়ার সময় খুব ভদ্রতা করলাম, (যে লোক আমার পারিবারিক সুখশান্তি নষ্ট করার জন্য আমার বাড়িতে ঢুকেছে তাকে আর অন্য কিভাবে বিদায় দেওয়া যায় বলুন?) যাওয়ার সময় পরম বন্ধুর মত লোকটার নরম সাদা হাতে হাত রাখলাম।

২২

'সেদিন বাকি সময়টা আর স্ত্রীর সঙ্গে কোন কথা বলিনি। বলতে পারি নি। ওকে দেখলেই ভিতর থেকে এমন প্রচণ্ড ঘেন্না হচ্ছিল যে সব সময় ভয় পাচ্ছিলাম পাছে ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে বসি। তার পরের সপ্তাহে আঞ্চলিক কমিটির একটা মিটিং-এর জন্য আমার কদিন একটু বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। রাত্রে খাওয়ার সময় আমার স্ত্রী, আমি কবে বাইরে যাব, কি কি জিনিস গুছিয়ে দিতে হবে ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। আমি কোন উত্তর দিলাম না। খানিকক্ষণ চুপ করে খাবার টেবিলে বসে থেকে এক সময় উঠে নিজের ঘরে গিয়ে রাগে ফুঁসতে লাগলাম। ইদানীং ও আমার ঘরে বিশেষ আসত না। এত বেশি রাত্তিরে তো কখনই না। কিন্তু সেদিন রাগ করে নিজের ঘরে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল ওর পায়ের শব্দ পেলাম। আমার একটা

ভয়ঙ্কর কথা মনে পড়ল—মনে হল ইউরিয়ার স্ত্রীর মত ও-ও নিজের পাপ ঢাকবার জন্য এতরাত্রে আমার কাছে আসছে। ওর পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে ভাবলাম, ও কি আমার সঙ্গে কথা বলতে আসছে? যদি তাই হয়, তাহলে আমি যা ভাবছি সেটাই ঠিক। ওর মনে কোন অপরাধ বোধ আছে। কথাটা ভাবতেই ঘেন্নায় আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল। পায়ের শব্দ ক্রমশ আমার ঘরের কাছে আসতে লাগল। একবার মনে হল ও নিশ্চয়ই এ ঘরের সামনে দিয়ে রিসেপশান রুমে চলে যাবে। কিন্তু না, দরজা খোলার শব্দ হল—দেখলাম চৌকাঠের ওপর ও দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ সুন্দর দেহ। চোখের দৃষ্টিতে ভয় আর মিনতি। ও নিজের ভীতু ভীতু ভাবটা লুকোবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ব্যাপারটা আমার নজর এড়ায় নি। আর ওর ঐ দৃষ্টির মানে কি তাও আমি জানতাম। উত্তেজনায় আমার প্রায় দম আটকে আসছিল। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরালাম। ও কাছে এসে সোফায় বসে আমার দিকে একটু ঝুঁকে বলল, "আমি একটু কথা বলতে এসেছি অমনি তোমায় সিগারেট ধরাতে হবে, না?'

ও যাতে আমাকে ছুঁতে না পারে সেজন্য একটু সরে বসলাম।

ও বলল, 'জানি রবিবার আমি ঐ লোকটার সঙ্গে পিয়ানো বাজাব বলে রেগে গেছ।

'মোটেই না।'

'আহা! আমি যেন বুঝতে পারি না?'

'যে রকম ছেনালি শুরু করেছ তাতে তোমার······'

'ওরকম ছোটলোকের মত কথা বললে আমি এখান থেকে চলে যাব।'

'যা ইচ্ছা কর। কিন্তু মনে রেখো, বাড়ির সম্মান বলে একটা কথা আছে। সে নিয়ে তুমি মাথা ঘামাতে না পার কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা খুব মূল্যবান। তুমি উচ্ছন্নে গেলে আমার কিছু যাবে আসবে না, কিন্তু পরিবারের সুনাম আমি নষ্ট হতে দেব না।'

'কি বলছ কি তুমি?'

'বেরিয়ে যাও। এক্ষুণি এখান থেকে দূর হয়ে যাও।'

ও এমন অবাক হয়ে তাকাল যেন কিছুই বুঝতে পারছে না (কিম্বা এমনও হতে পারে যে ও সত্যিসত্যিই কিছু বুঝতে পারছিল না)। তারপর খুব ক্রুদ্ধ

আহত মুখ করে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু একেবারে চলে গেল না, ঘরের ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে রইল।

বলল, 'তোমার যে রকম মেজাজ হয়েছে তাতে হাজার ভাল মানুষ হলেও কেউ তোমার সঙ্গে থাকতে পারবে না।' চিরদিন যেমন করে এসেছে তেমনি সেদিনও আমার খুব একটা দুর্বল জায়গায় আঘাত দিয়ে কথা বলল। একবার প্রচণ্ড রাগের মুহূর্তে আমার বোনকে আমি নানা কটু কথা বলেছিলাম। পরে সেজন্য খুব দুঃখ হয়েছিল। সেই ঘটনার স্মৃতি যে আমার কাছে কী ভীষণ বেদনাদায়ক, তা ও জানত এবং জানত বলেই সেই মুহূর্তে সেই ব্যাপারটার উল্লেখ করে খোঁচা দিল। বলল, 'নিজের বোনের সঙ্গে যে ওরকম দুর্ব্যবহার করতে পারে, তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।' মনে মনে ভাবলাম ও নিজেই আমাকে খোঁচায়, অপমান করে, তারপর এমন একটা ভাব দেখায় যেন সব দোষ আমার। প্রচণ্ড ঘেন্নায়, রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল—এর আগে কখনও ওকে এত বেশি ঘেন্না করিনি। ইচ্ছা করল আমার রাগের কোন একটা শারীরিক প্রকাশ হোক। লাফিয়ে উঠে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবার আমার জ্ঞান ফিরে এল। নিজেকে প্রশ্ন করলাম এভাবে রাগ দেখানো উচিত কিনা। মনে হল হ্যাঁ উচিত, কেননা রাগ দেখালে আমার স্ত্রী ভয় পেয়ে নিজেকে সামলে নিতে পারে। তাই রাগটা আর চাপলাম না। নিজের বীভৎস প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে মনে মনে খুশি হয়ে উঠলাম। ওর হাতটা জোরে চেপে ধরে চীৎকার করে বললাম, 'এক্ষুণি এঘর থেকে যাও, নয়তো তোমাকে খুন করে ফেলব।' কথার ভঙ্গিতে প্রচণ্ড ঘেন্না ফুটিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে এমন ভয়ঙ্করভাবে কথাগুলো বললাম যে ভয়ে ও একেবারে কাঠ হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ভাসিয়া, তোমার কি হয়েছে?'

প্রচণ্ড চীৎকার করে উত্তর দিলাম, 'তোমাকে দেখলে রাগে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। এক্ষুণি দূর হয়ে যাও। নইলে একটা যা তা কাণ্ড করে ফেলব।'

ক্রমশ রাগ বাড়তে লাগল। মনে হল, এমন একটা সাংঘাতিক কিছু করি যাতে ও বুঝতে পারে, আমি কী প্রচণ্ড রেগে গেছি। দারুণ ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে মারি, মারতে মারতে একেবারে খুন করে ফেলি। কিন্তু সেটা

যে অন্যায় হবে এ বোধটুকু তখনও পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। তাই অন্নের ওপর দিয়ে রাগের ঝাল ঝাড়ার জন্য ওর ঠিক পাশেই একটা পেপার ওয়েট ছুঁড়ে মেরে চীৎকার করে উঠলাম, 'বেরিয়ে যাও।' টিপ্‌টা ভালই করেছিলাম। ওর গায়ে লাগল না। একেবারে কান ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। ও ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার কাছটায় গিয়ে দাঁড়াল। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে ঘরের মধ্যে আমি কি করছি না করছি তা স্পষ্ট দেখা যাবে বুঝে, ইচ্ছা করেই লেখার টেবিলের ওপর যা যা ছিল, বাতিদান দোয়াত সব একে একে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলতে লাগলাম।

চীৎকার করে বললাম, 'বেরিযে যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও। নইলে আমি সাংঘাতিক কাণ্ড করব।'

'ও বেরিয়ে গেল। আমিও তক্ষুণি শান্ত হয়ে গেলাম।'

'একঘন্টা পরে বাচ্চাদের ধাই এসে বলল যে আমার স্ত্রী হিস্টিরিয়া রোগীর মত ছটফট করছে। কাছে গিয়ে দেখলাম ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। ও একবাব হাসছে, একবার কাঁদছে, স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছে না। ভান নয়, ও সত্যিসত্যিই অসুস্থ হযে পড়েছিল?

'সকালের দিকে ওর অবস্থা অনেকটা ভাল হয়ে এল। আবার আমাদের 'ভালবাসা' ফিরে এল। একটা মিটমাট হল। মিটমাটের পর আমি স্বীকার করলাম যে আমি ত্রাখাচেভ্‌স্কির ব্যাপারে ঈর্ষা বোধ করছিলাম। কথাটা শুনে কিন্তু আমার স্ত্রী আদৌ অস্বস্তিবোধ করল না। খুব সহজ সবলভাবে হেসে বলল যে একদম একটা বাজে লোককে ওর ভাল লাগতে পারে একথা মনে হওয়াটাই হাস্যকর।

বলল, 'কোন রুচিসম্পন্ন মহিলার পক্ষে ঐ লোকটা সম্পর্কে কোনরকম অনুভূতি থাকা সম্ভব নয়। আমি শুধু ওব বাজনা ভালবাসি। লোকজনকে আসতে বলা হয়ে গেছে অবশ্য, কিন্তু তা হোক, তুমি যদি চাও, তাহলে রবিবারের বাপারটা বাদ দিয়ে দেব। আর ওর সঙ্গে দেখা করব না। ওকে একটা চিঠিতে জানিয়ে দাও যে আমি অসুস্থ। তাহলেই সব চুকে যাবে। শুধু একটা ব্যাপার আমার খারাপ লাগছে—লোকটাকে আসতে মানা করে দিলে ও হয়তো ভেবে বসবে যে আমরা ওর ভয়ে একেবারে কাঁটা হয়ে আছি। ঐ লোকটা নিজেকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে ভাবতে আমার কি রকম আত্মসম্মানে বাধছে।'

'আমার স্ত্রী মিথ্যাকথা বলেনি। যা বলছিল তা বিশ্বাস করেই বলছিল। এই সব কথা বলে ও লোকটাকে দূরে সরানোর এবং নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু তখনকার পুরো অবস্থাটা, বিশেষ করে ঐ সঙ্গীত-চর্চার ব্যাপারটা পরে সব গোলমাল করে দিল। আমরা দুজন সেদিন এ ব্যাপার নিয়ে আর কোন কথা বললাম না। রবিবার নিমন্ত্রিতরা সবাই এলেন, আমার স্ত্রী এবং ঐ লোকটা তাঁদের বাজনা শোনাল।'

২৩

'আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে আমি খুব আত্মাভিমানী ছিলাম। আমাদের সমাজে অধিকাংশ লোকই নানা মিথ্যা আত্মাভিমান নিয়ে বাঁচে। তাই সেই রবিবারের খাওয়া-দাওয়া, গানবাজনা ইত্যাদি সব কিছুরই খুব ভাল ব্যবস্থা করলাম। নিজে গিয়ে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে এলাম, খাবার-দাবারও সব নিজেই কিনলাম।

'ছ'টা নাগাদ নিমন্ত্রিতরা এসে পৌঁছালেন। ত্রাখাচেভস্কি হীরের বোতাম-বসানো সান্ধ্যবাস পরে ফোতো কাপ্তেনের মত সেজেগুজে এল। আর সব সময়ই এমন ভাব করতে লাগল যেন ও একটা দারুণ উঁচুস্তরের লোক, যেন লোকেরা কি করবে বা বলবে সবই ওর জানা আছে। ওর আচার-ব্যবহার চালচলনে রুচিবোধের অভাব লক্ষ্য করে আমি বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগলাম। মনে হল আমার স্ত্রী সত্যি কথাই বলেছে। এই রকম একটা বাজে লোককে নিয়ে মেতে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেকে যে আর সন্দেহে, ঈর্ষায় জর্জরিত হতে দিলাম না, তার একটা কারণ এই যে ইতিমধ্যেই ঈর্ষা নিয়ে কষ্ট পেয়ে পেয়ে একেবারে হয়রাণ হয়ে গিয়েছিলাম, একটু শান্তিতে থাকার দরকার ছিল। তাছাড়া আমার স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করতে চাইছিলাম, বিশ্বাস করেও ছিলাম। কিন্তু এসব সত্ত্বেও খাওয়ার সময় এবং বাজনা আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত সারা সন্ধ্যা কেমন যেন অস্থির লাগতে লাগল। আমার স্ত্রী এবং ত্রাখাচেভস্কির সঙ্গে সহজ হতে পারলাম না, সমানে ওদের কথাবার্তা, চাউনি সব লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম।

'এই ধরনের ভোজ সাধারণতঃ যে রকম একঘেয়ে ভদ্র ব্যাপার হয়ে থাকে, আমাদেরটাও সেই রকমই হল। তারপর একটু রাত হতেই বাজনা শুরু হল। সেই সন্ধ্যার সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার আমার মনে একেবারে

গেঁথে গিয়েছিল। ব্রাখাচেভ্স্কি কি রকম ভাবে এমব্রয়ডারী করা ঢাকুনি খুলে (নিশ্চয়ই ওর কোন বান্ধবী এমব্রয়ডারীটা করে দিয়েছিল !) বেহালাটা বার করল, কি ভাবে সুর বাঁধল সব আমার মনে আছে। মনে আছে আমার স্ত্রী লজ্জা (লজ্জাটা মূলত বাজানোর ব্যাপারেই) ঢাকার জন্য জোর করে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে করতে মুখে একটা কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব নিয়ে বাজাতে বসল। মিড্ল্ 'সি' তে ঘা দেওয়া, তারগুলো ঠিক করা, সুর বাঁধা ইত্যাদির পালা চুকল। ওরা দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর অতিথিদের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে, দুজনে দুজনকে ফিস্ফিস্ করে কি যেন বলল। তারপর বাজনা শুরু হল। আমার স্ত্রীই প্রথম পিয়ানোর কর্ড্টা টিপ্ল। তারপর ব্রাখাচেভ্স্কি তার নিজের যন্ত্রের সুরটা ঠিক মিলছে কিনা শোনার জন্য গম্ভীর, ঈষৎ উত্তেজিত মুখে সাবধানে বেহালার তারে ঘা দিল। দ্বৈত বাজনা শুরু হল।'

ভদ্রলোক এই পর্যন্ত বলে থামলেন। পরপর কয়েকবার সেই আধা-হাসি, আধা-কান্নার মত অদ্ভুত শব্দটা করলেন। তারপর আবার যখন কথা আরম্ভ করলেন, তখন কান্নায় ওঁর গলা প্রায় বুজে এসেছে। একটু অপেক্ষা করে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

'ওরা দুজনে বিঠোভেনের ক্রুৎজার সোনাটা বাজিয়েছিল। প্রথম প্রেসটোটা আপনার মনে আছে ?'

ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলেন, 'উঃ! কী ভয়ঙ্কর সুর। সঙ্গীত-মাত্রই আমার কাছে খুব ভয়াবহ বলে মনে হয়। সঙ্গীত মানে কি ? মানুষের জীবনে সঙ্গীতের ভূমিকা কি ? সঙ্গীতের সেই ভূমিকার পিছনে কি কি কারণ কাজ করে ?—এ সব প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর আমার জানা নেই। লোকে বলে সঙ্গীত মানুষকে আত্মিক উন্নতির পথ দেখায়। একেবারে বাজে কথা। ডাহা মিথ্যে। নিজেকে দিয়ে জানি মানুষের মনের ওপর সঙ্গীতের প্রভাব কী প্রচণ্ড ! কিন্তু সে প্রভাব আত্মিক উন্নতি আনে না। সঙ্গীতের সঙ্গে মানুষের আত্মিক উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই ! সঙ্গীত শুধু মানুষকে প্রবল-ভাবে উত্তেজিত করে। সঙ্গীত মানুষকে ভোলায়, তার নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তাকে সজাগ থাকতে দেয় না। সঙ্গীত আমাকে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে দেয়, যার সঙ্গে আমার আসল বাস্তব অবস্থার কোন মিল নেই। সুরের ইন্দ্রজালে আমি এমন সব অনুভূতির আভাস পাই, যা আমার

সত্যিকারের অনুভূতি নয়, এমন সব উপলব্ধি আসে, যা আমার নিজস্ব উপলব্ধি নয়, এমন অনেক কাজ করে ফেলি, যা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে কখনও করতে পারতাম না। সঙ্গীত ব্যাপারটা অনেক হাসি বা হাইতোলার মত সংক্রামক। নিজের ঘুম না পেলেও যেমন অন্য কাউকে হাই তুলতে দেখলে আমরা হাই তুলি, অন্য কাউকে হাসতে দেখলে যেমন আমাদের হাসি পায়, গানের ব্যাপারটাও তেমনি। বাজনা বাজাতে বাজাতে কিম্বা শুনতে শুনতে আমরা সুরকারের প্রভাবে পড়ে যাই। কোন একটি বিশেষ সুর রচনা করার সময় সুরকারের মনে যে অনুভূতি হয়েছিল তা শ্রোতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। শ্রোতার সমস্ত সত্তা সুরকারের সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। তাঁর অনুভূতির পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনুভূতিও বদলায়। কিন্তু এই অনুভূতি তো আমার নিজের নয়। এমন কি এই অনুভূতির আলোড়ন যে কেন হচ্ছে, সেই কারণটা পর্যন্ত আমার অজানা। সুরকার নিজে জানেন তাঁর কোন্ অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিচ্ছে কোন্ সুরের তরঙ্গ। বিঠোভেন জানতেন, তাঁর মানসলোকের কোন্ অভিজ্ঞতার ফলে ক্রুৎজার সোনাটার জন্ম হয়েছে। সেই বিশেষ অভিজ্ঞতাটি তিনি ক্রুৎজার সোনাটার সুরে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কাছে তো সে অভিজ্ঞতার একটা অর্থ আছে। কিন্তু আমার কাছে তো সে অভিজ্ঞতার কোন অর্থ নেই। অথচ সেই অভিজ্ঞতা যে সঙ্গীতের জন্ম দিয়েছে, তা শুনে আমি অকারণে উত্তেজিত হয়ে উঠি। যুদ্ধের বাজনার তালে তালে যদি সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করতে করতে যুদ্ধে যায়, তবেই সে সঙ্গীতের একটা অর্থ দাঁড়ায়। নাচের বাজনার সঙ্গে কেউ নাচতে শুরু করলে, সেই বাজনাটার একটা মানে পাওয়া যায়। ভজন শুনতে শুনতে যখন আমার মন ঈশ্বর উপাসনায় তন্ময় হয়ে যায়, তখনই সে ভজন সার্থক হয়ে ওঠে। এইরকম কয়েকটা ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গীত শুধু আমাদের উত্তেজিত করে। অথচ কোন একটা নির্দিষ্ট কাজের মধ্য দিয়ে যে সেই উত্তেজনাটা বেরিয়ে যাবে, সে-পথ বহু সময়ই বন্ধ থাকে। মানুষকে বিনা কারণে এরকম নিরুদ্ধ উত্তেজনার চাপে রেখে দেয় বলেই, সঙ্গীতের প্রভাব এত ভয়ঙ্কর, এত মারাত্মক হয়ে উঠে। চীনদেশে শুনেছি নাকি সঙ্গীতচর্চার ব্যাপারটা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। আমার মনে হয় তাই হওয়া উচিত। নইলে তো যে-কেউ সঙ্গীতের সাহায্যে অন্য আর একজন লোককে

(হয়তো বা বহুলোককে) মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলবে, তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাবে। সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে গাইয়ে বাজিয়ে লোকেদের অধিকাংশরই কোন নীতিজ্ঞানের বালাই নেই।

'একবার যদি তারা সঙ্গীতবিদ্যাকে অস্ত্রের মত ব্যবহার করে অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে, তবে আর রক্ষে নেই। ক্রুৎজার সোনাটার প্রথম মুভমেন্টের কথাই ধরুন না কেন। লোকের বাড়ির বৈঠকখানায়, যেখানে মেয়েরা গলা-বুক খোলা শরীর দেখানো জামা পরে সেজেগুজে বসে আছে, বাজনা শোনার পরে যেখানে কেউ আইসক্রীম খাচ্ছে, কেউ রসাল গল্প করছে, সেখানে যে কি করে লোকের ক্রুৎজার সোনাটার প্রেস্টো (দ্রুতগৎ) বাজানোর সাহস হয়, ভেবে পাই না। এসব বাজনার একটা বিশিষ্ট পরিবেশ থাকা উচিত। সুর মানুষের মনে যখন যে ভাব, যে ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে সেই ভাব ও ইচ্ছা যেখানে মানুষের কাজের মধ্যে প্রকাশিত হতে পারে, কেবল সেই পরিবেশেই এইসব বাজনা বাজানো উচিত। বাজানোর পর এই সুরের অভিঘাতে যে অনুভূতির জন্ম হবে, সেই সেই অনুভূতি প্রকাশ করার অবকাশ থাকা উচিত। স্থানকালের সঙ্গে যদি সঙ্গীতের সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে তো সেই সঙ্গীত শুনে যে উত্তেজনার জন্ম হবে, তা লোককে একেবারে অস্থির করে তুলবে। ঐ ড্রয়িংরুমে, ঐ পরিবেশে বসে ক্রুৎজার সোনাটা শুনে তো আমার একেবারে পাগল হওয়ার জোগাড় হয়েছিল। এই সঙ্গীত আমাকে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত, নতুন অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হল, আগে যা অনুভব করতাম, ভাবতাম, সব ভুল, এই নতুন অনুভূতিই একমাত্র সত্য। এই নতুন অনুভূতিটি যে ঠিক কি তা আমি নিজেও স্পষ্ট বুঝিনি। কিন্তু সব মিলিয়ে দারুণ আনন্দ হতে লাগল। আশপাশের লোকেদের এমন কি আমার স্ত্রী ও ত্রাখাচেভ্স্কিকেও আমি যেন একটা নতুন আলোয় দেখতে পেলাম।

'প্রেসটোর পর ওরা একটা হাল্কা মিষ্টি সুরের 'আন্দান্তে' বাজাল। গৎটাতে সস্তা চমক ছিল, কিন্তু শেষের দিকটা খুবই দুর্বল। অতিথিরা বার বার অনুরোধ করতে থাকায় ওরা আরনেস্টের লেখা একটি বিয়োগ সঙ্গীত এবং আরও যেন কি কি গৎ বাজাল। সব কটাই বেশ শুনতে ভাল। কিন্তু বিঠোভেনের প্রথম গৎটা আমাকে যে রকম দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল, অন্যগুলো তার ধারে-কাছেও লাগে না। অন্য গৎগুলো বাজানোর সময়ও

আমার কানে প্রথম গৎটির সুর লেগে রইল। বাকী সন্ধ্যেটা আমার বেশ হাল্‌কা খুশির মধ্যে কাটল। আমার স্ত্রীকে সেদিন সন্ধ্যায় যেরকম প্রাণোচ্ছল দেখেছিলাম, সেরকম আর কখনও দেখি নি। ওর নমনীয় শরীর চোখের উজ্জ্বল চাহনি, মুখের গাম্ভীর্য ও ভাবের দ্যোতনা, আর বাজনা শেষ করার সময় ওর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা করুণ অথচ শান্ত সুখের ক্ষীণ একটুকরো হাসি—সব মিলিয়ে আশ্চর্য লাগছে। ভেবেছিলাম সুরের প্রভাবে আমার মত ওর মনের মধ্যেও বহু অপরিচিত অজানা অনুভূতি স্মৃতির অতল থেকে উঠে এসে ওকে প্লাবিত করে দিচ্ছে, তাই এই ভাবান্তর।

'সন্ধ্যেটা ভালই কাটল। অতিথি-অভ্যাগতরা একে একে বিদায় নিলেন।

'ত্রাখাচেভ্‌স্কি জানত, দু'দিন পরে আমি মিটিং-এর জন্য বাইরে চলে যাব। তাই বিদায় নেওয়ার সময় বলল, 'আপনাদের শহরে যখন আবার আসব তখন আজকের সন্ধ্যার মত আবার গানবাজনার অনুষ্ঠান হবে আশা করছি।' আমি ভাবলাম, যাক বাঁচা গেল, আমি বাইরে থাকার সময় ও তাহলে আমার বাড়িতে আসার কথা ভাবছে না। মিটিং থেকে আমি যখন বাড়ি ফিরব তার আগেই ত্রাখাচেভস্কির আমাদের শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল। সুতরাং ধরেই নিলাম, ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

'সেই প্রথম বেশ ভাল মনে ওর সঙ্গে করমর্দন করলাম। বাজানোর জন্য ওকে ধন্যবাদ দিলাম। আমার স্ত্রীর কাছেও ও এমনভাবে বিদায় নিল যেন বহুদিন আর ওদের দেখা হবে না। আমার মনে হল ওদের দুজনের ব্যবহার খুব সহজ, স্বাভাবিক ভদ্রতার বেশি আর কিছু নয়। সব মিলিয়ে সারা সন্ধ্যাটা খুব ভাল কাটল। আমার স্ত্রী ও আমি খুব খুশি হয়ে রইলাম।

২৪

'এর দুদিন পরে আমি গ্রামে গেলাম। যাবার সময় খুব সহজমনে খোশমেজাজে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

'গ্রামে গেলে যে কতরকম ব্যাপার দেখাশোনা করার থাকে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। গ্রাম ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত, যেন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। প্রত্যেকটি গ্রামের জীবনযাত্রার ধরনধারণে একটা বিশিষ্টতা থাকবেই। প্রথম দুদিন রোজ ঝাড়া দশঘন্টা ধরে মিটিং করলাম। তৃতীয়

দিনে আমার স্ত্রীর কাছ থেকে একটা চিঠি এল। চিঠিটা তক্ষুণি পড়লাম। আমাদের ছেলেমেয়ে, ওর কাকা, বাচ্চাদের ধাই, জিনিসপত্র কেনাকাটা ইত্যাদি নানা কথার মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় লিখেছে যে ব্রাখাচেভস্কির কতকগুলো স্বরলিপি দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সে সেগুলো, দিতে এসেছিল। ব্রাখাচেভ্স্কি নিজে বেহালা বাজানোর কথাও বলেছিল কিন্তু ও রাজী হয় নি। ব্রাখাচেভ্স্কির কথাটা এমনভাবে লিখেছে যেন খুব একটা সাধারণ ব্যাপারের কথা জানাচ্ছে। ব্রাখাচেভ্স্কি যে আমার স্ত্রীকে স্বরলিপি দিয়ে যাবে বলেছিল, সে কথা আমি এই প্রথম জানলাম। আমার ধারণা ছিল ওর সঙ্গে আমার স্ত্রীর আর দেখা হবে না। সুতরাং চিঠিটা পড়ে অবাক হলাম। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সারাদিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে, সন্ধ্যেবেলা কাজ থেকে ফিরে চিঠিটা দ্বিতীয়বার না পড়া পর্যন্ত এ নিয়ে আর ভাববার সময় পাই নি। দ্বিতীয়বার পড়ার পর মনে হল আমার অনুপস্থিতে ব্রাখাচেভ্স্কির আসার খবরটা তো খারাপ বটেই এ ছাড়া সারা চিঠিতে কেমন যেন একটা চাপা উত্তেজনার ছাপ আছে। আমার ভিতরের জন্তুটা ঈর্ষার তাড়নায় গর্জন করে উঠল, প্রচণ্ড বেগে গুহার বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এই প্রচণ্ড জান্তব শক্তিকে আমি বড় ভয় পেতাম বলে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ঈর্ষা মানুষকে বড় নীচ করে দেয়। আমার স্ত্রীর চিঠির সুর তো বেশ সহজ, স্বাভাবিক। এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে?

'বিছানায় শুয়ে পরের দিনের কাজকর্মের কথা ভাবতে লাগলাম। সাধারণতঃ নতুন জায়গায় আমার ঘুম আসতে দেরি হয়। কিন্তু সেদিন রাতে বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝ রাতে হঠাৎ যেন ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। আমার স্ত্রী, আমাদের দুজনের শারীরিক সম্পর্ক, ব্রাখাচেভ্স্কি, ইত্যাদি নানা কথা ভাবতে লাগলাম। মনে হল, এতক্ষণে ঐ লোকটা আমার স্ত্রীর কাছে যা চায়, তা পেয়ে গেছে। রাগে, ভয়ে আমার সমস্ত শরীর একেবারে শক্ত হয়ে গেল। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, 'এসব দুশ্চিন্তা করার কোন মানেই হয় না। ওদের দুজনের মধ্যে কোন গোপন ব্যাপার নেই। বাজে কথা ভেবে আমি নিজেকে ও আমার স্ত্রীকে ছোট করছি। একটা ভাড়া করা বাজনাদার, তার ওপর আবার লোকটার নামে নানা দুর্নাম আছে। আমার স্ত্রী ভদ্রঘরের মেয়ে, বাচ্চাকাচ্চার মা।

ঐরকম একটা লোকের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এ অসম্ভব।' একদিকে এইসব কথা মনে হচ্ছিল অন্যদিকে আবার ভাবছিলাম, 'ওদের দুজনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তো হবেই। শরীরের ব্যাপারটা তো খুব সহজ স্বাভাবিক। শরীরের জন্যই তো আমি নিজে বিয়ে করেছিলাম। এখনও যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করি সেও তো দেহের খিদের তাগিদেই। আমার স্ত্রীর কাছে তো আমি এই একটা ব্যাপারই চাই। এই বাজনাদার ও অন্যান্য পুরুষরাও তো মেয়ে বলতে এই একটা ব্যাপারই বোঝে। লোকটা অবিবাহিত, স্বাস্থ্য ভাল (ও কিরকম কড়মড় করে মাংসের হাড় ভাঙছিল, লাল ঠোঁট দিয়ে লোভীর মত মদ চাটছিল—সে-সব ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠল), ছিমছাম চেহারা, ভাল খায় দায়, কোনরকম নীতিবোধের বালাই নেই। যখন যা সুযোগ আসে তা চুটিয়ে ভোগ করে নেওয়াই ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাছাড়া আমার স্ত্রী আর ঐ লোকটার মধ্যে একটা মস্ত বড় যোগসূত্র হল সঙ্গীত। আর সঙ্গীত যে কী দারুণ সূক্ষ্মভাবে মানুষের যৌনকামনা জাগিয়ে তুলতে পারে, তা তো আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি। তাহলে লোকটাকে ঠেকানোর মত আর কি রইল? কিছুই না। বরং পুরো অবস্থাটা ওর অনুকূলে। তাহলে কার ওপর ভরসা করব? আমার স্ত্রী? তাকে কতটুকু জানি? সে-তো চিরকালই আমার কাছে ধাঁধা হয়ে রইল। তার শরীর ছাড়া, জান্তব কামনা-বাসনা ছাড়া আমি তো আর কিছুই জানি না। আর জন্তুরা তো সংযম ব্যাপারটা কি তাই জানে না, জানার কথাও নয়।'

'এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল ক্রুৎজার সোনাটা বাজাবার পর ওরা দুজন রক্তে আগুন ছুটিয়ে দেওয়ার মত একটা গৎ বাজিয়েছিল। সেই আদিরসাত্মক সুরটা বাজানোর সময় ওদের দুজনের মুখের ভাব কি রকম হয়েছিল সে কথাও মনে পড়ল। ভাবলাম, 'আমি কেন চলে এলাম? সেই সন্ধ্যাতেই তো ওদের মধ্যে যা হবার হয়ে গিয়েছিল। দুজনের মধ্যে আর কোন বাধা ছিল না।' মনে হল, ওরা দুজনেই, বিশেষ করে আমার স্ত্রী সে-রাত্রে নিজের পাপের কথা ভেবে লজ্জিত, সঙ্কুচিত হয়েছিল। আমি পিয়ানোর কাছে এসে দাঁড়ানোর সময় ও বারবার লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিল, রুমাল দিয়ে ঘাম মুছছিল। ওর ঠোঁটের কোণে অল্প একটু ক্ষীণ করুণ হাসি আর সারা মুখে সুখের আবেশ মাখানো ছিল। তখনও পর্যন্ত ওরা

পরস্পরের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। খাওয়া দাওয়ার পর লোকটা যখন গ্লাসে সোডা ওয়াটার ঢালছিল তখনই কেবল ওরা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসেছিল। ওদের দুজনের চোখের দৃষ্টি, হাসি, সেই সন্ধ্যার নানা খুঁটিনাটি কথা মনে পড়ে আমার ভয় করতে লাগল। এক একবার ভাবছিলাম, 'এখন আর আমার কিছু করার নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।' পরমুহূর্তেই আবার মনে হচ্ছিল, 'আমি এসব বাজে কথা ভাবছি। এ সত্যি হতে পারে না।' কোন সমস্যার সমাধান করতে না পেরে শুধু ঘুরে ফিরে একই কথা ভাবতে বাধ্য হলে আমি বরাবর একের পর এক সিগারেট খেয়ে যাই। সে রাত্রেও তেমনি সেই হলদে ওয়ালপেপার-মোড়া ছোট ঘরে বসে সিগারেট খেয়ে যেতে লাগলাম। সিগারেট খেয়ে খেয়ে অনুভূতিগুলোকে ভোঁতা করে ফেলে সমস্যার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম।

'বেশি রাতে আর ঘুম হল না। ভোর পাঁচটা নাগাদ মনে হল আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। ঠিক করলাম, বাড়ি ফিরে যাব, দারোয়ানকে ডেকে ঘোড়া-গাড়ি ঠিক করতে বললাম। সহকর্মীদের কাছে চিঠি লিখে জানালাম যে হঠাৎ একটা জরুরী কাজের জন্য আমাকে মস্কো যেতে হচ্ছে। আমার জায়গায় ওরা যেন অন্য লোক নিয়ে নেয়।

'সকাল আটটা নাগাদ টারান্টাসে চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।'

২৫

ভদ্রলোক এতদূর অবধি বলেছেন, এমন সময় ট্রেনের কনডাকটার এল। আমাদের কামরার বাতিটা প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছে দেখে সেটা একেবারে নিভিয়ে দিল। কিন্তু আর নতুন বাতি এনে দিল না। বাইরে তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। পজ্‌দনীশেভ একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন কিন্তু কন্‌ডাকটার যতক্ষণ আমাদের কামরায় রইল ততক্ষণ কোন কথা বললেন না। কনডাকটার চলে যাওয়ার পর আধা অন্ধকার কামরাটায় চলন্ত ট্রেনের জানলাগুলোর কিচমিচ শব্দ আর দোকান কর্মচারীটির নাক ডাকার শব্দ ছাড়া যখন আর কোন শব্দ রইল না, তখন ভদ্রলোক আবার কথা বলতে শুরু করলেন। ভোরের অস্পষ্ট আলোয়

তাঁকে আর দেখা যাচ্ছিল না। শুধু একটা উত্তেজিত, যন্ত্রণাবিকৃত স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। পঝ্ দর্নীশেভ বলতে লাগলেন।

'যে গ্রামে ছিলাম সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে হলে আমাকে পঁয়ত্রিশ ভার্স্ট ঘোড়ারগাড়িতে আর আটঘন্টা ট্রেনে করে যেতে হবে। টারান্টাসে চড়ে যেতে আমার ভালই লাগছিল। শরতের সকাল, ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ, চারিদিকে শিশির জমে ছিল বলে ভিজে রাস্তার ওপর গাড়ির চাকার দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। মসৃণ পথ। উজ্জ্বল সূর্যোলোক। শরীর মন সতেজ করে তোলার মত ঝরঝরে আবহাওয়া। সব মিলিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে যেতে দারুণ ভাল লাগছিল। সকালে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত্তিরের ক্লান্তি ও গ্লানি অনেকটা কেটে গেল। গাড়ি, ঘোড়া, মাঠঘাট, চারপাশের লোকজন দেখতে দেখতে প্রায় ভুলেই গেলাম আমি কোথায় যাচ্ছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল আমি যেন এমনিই বেড়াতে বেরিয়েছি। দুশ্চিন্তা-টুশ্চিন্তা সব নিছক কল্পনার ফল। সব কিছু ভুলে থাকতে বড় ভাল লাগছিল। কোথায় যাচ্ছি এবং কেন যাচ্ছি মনে পড়ে গেলেই নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম, 'এত ভাবনা-চিন্তার কি আছে? সময়মত সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে।' মধ্যে একবার টারা-ন্টাসটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেটা সারানোর জন্য খানিকটা অপেক্ষা করতে হল, আমার মনটাও আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এই গাড়ির হাঙ্গামার জন্য আমি এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরতে পারলাম না। পরের ট্রেনটায় যেত হল। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মস্কো পৌঁছানোর কথা ছিল, তার জায়গায় রাত বারোটায় এসে পৌঁছালাম।

'টারান্টাস সারানো, হিসেবপত্র চোকানো, পথের ধারে একটা সরাই-খানায় খাওয়া-দাওয়া, সেখানকার একজন দারওয়ানের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি নানা ব্যাপার নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকলাম। তারপর সন্ধ্যে নাগাদ গাড়ি ঠিক হলে আবার যাত্রা শুরু হল। সন্ধ্যে রাত্তিরে টারান্টাসে চড়ে যেতে দিনের বেলার চেয়েও বেশি ভাল লাগছিল। চারিদিকে অল্প অল্প তুষার, চাঁদের আলো, তেজী ঘোড়া, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, গাড়োয়ানটিও বেশ হাসিখুশি, আড্ডাবাজ ধরনের। বাড়িতে গিয়ে কি দেখতে হবে না হবে তা প্রায় ভুলেই গেলাম। বেশ ফুর্তি হতে লাগল। কিম্বা হয়তো এমনও হয়ে থাকতে পারে যে বাড়ি ফিরলে কি হবে তা খুব ভালভাবেই

জানা ছিল বলে শেষবারের মত বেঁচে থাকার সুখ উপভোগ করে নিতে চাইছিলাম। 'টারান্টাসের রাস্তা শেষ হতেই কিন্তু সুস্থির ভাবটা চলে গেল। নিজের অনুভূতিগুলোকে বশে রাখার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল। ট্রেনের কামরায় ঢুকতেই আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। আধঘণ্টা ধরে রেলের কামরায় বসে বসে যে কী প্রচণ্ড কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম, তা আমার চিরজীবন মনে থাকবে। ট্রেনে যেতে হলে বরাবরই আমার মেজাজ বিগড়ে যায় সেইজন্যই হোক কিম্বা ট্রেনে উঠতেই বাড়ির কাছে এসে যাচ্ছি এরকম একটা বোধ হল বলেই হোক, ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। কারণ যাই হোক, ট্রেনের কামরায় ঢুকতেই আমার কল্পনা একেবারে বাঁধনছাড়া হয়ে উঠল। আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রী কিভাবে আমায় ঠকাচ্ছে, ঐ লোকটার সঙ্গে কি করছে না করছে, সে সম্পর্কে নানা অশ্লীল, অশোভন ছবি ভেসে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। আমার সন্দেহ, ঈর্ষা ক্রমশ বাড়তে লাগল। রাগে, ঘেন্নায় সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগল। নিজের অপমানের কথা ভাবতে ভাবতে এক ধরনের বিকৃত উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলাম। হাজার চেষ্টা করেও মন থেকে সেই অশ্লীল, বীভৎস ছবিগুলোকে তাড়াতে পারলাম না। ছবিগুলো বারে বারে ঘুরে ফিরে আসতে লাগল। ভাবতে ভাবতে শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে মনে হতে লাগল, ঘটনাগুলো সত্যিসত্যি আমার চোখের সামনে ঘটছে। ছবিগুলো আমার কাছে এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ হয়ে আসছিল যে, সেগুলোকে আমার সন্দেহের বাস্তব প্রমাণ বলে মনে হতে লাগল। কি একটা রাক্ষুসে শক্তি যেন আমার কানে কানে আমার স্ত্রী আর ঐ লোকটার সম্পর্কে নানা বীভৎস কথা বলে যেতে লাগল। অনেকদিন আগে ত্রাখাচেভ্স্কির ভাই আমাকে একটা কথা বলেছিল। সেই কথাগুলো ত্রাখাচেভ্স্কি আর আমার স্ত্রীর সম্পর্কের বেলাতেও খাটে—এ কথা ভেবে নিয়ে আমি নিজেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কষ্ট দিতে লাগলাম। একটা বিকৃত যন্ত্রণাময় উল্লাসের মধ্যে তলিয়ে গেলাম।

'ত্রাখাচেভ্স্কির ভাই-এর সঙ্গে কথাটা হয়েছিল বহুবছর আগে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কথাগুলো আমার পরিষ্কার মনে ছিল। বেশ্যাবাড়ি যায় কিনা জিজ্ঞাসা করায় ত্রাখাচেভ্স্কির ভাই উত্তর দিয়েছিল, 'কেন, আমার কি কোন রুচিবোধ নেই? নাকি দেশে ভদ্রঘরের মেয়েদের আকাল পড়েছে যে ওরকম নোংরা বাজে জায়গায় গিয়ে রোগ বাধাব?' ধাঁ করে মনে হল

আমার স্ত্রীও ভদ্রবাড়ির মেয়ে। ত্রাখাচেভ্স্কি সুযোগ পেলে তাকে ছেড়ে দেবে না। ত্রাখাচেভ্স্কি মনে মনে কি ভেবেছে তাও কল্পনা করে নিলাম। আমার স্ত্রী সম্পর্কেও নিশ্চয় এই ধরনের কথা ভেবেছে। 'এই মেয়েছেলেটা খুব একটা কচিকাঁচা অবশ্য নয়। গায়েগতরে বেশ চর্বি লেগে' গেছে। বাঁদিকের একটা দাঁতও পড়ে গেছে। যাক্‌গে, কি আর করা যাবে, লাগিয়ে দিই, সব কিছুতো আর মনের মত হয় না। যাহ'ক একটা ব্যাপারে তো অন্তত: বাঁচোয়া, এর সঙ্গে শুলে তো আর রোগটোগ হওয়ার ঝুঁকি নেই।'

'মনে হল এক হিসেবে দেখতে গেলে আমার স্ত্রীর শরীর ভোগ করে ত্রাখাচেভস্কি আমার স্ত্রীকেই ধন্য করে দিচ্ছে। একথা মনে হওয়ার পরের মুহূর্তেই আবার আমার চিন্তার মোড় ফিরে গেল। মনে হল, 'এ অসম্ভব, এ হতে পারে না। এরকম ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আমার স্ত্রী তো নিজেই বলেছে যে এরকম একটা লোককে নিয়ে ঈর্ষা করা আমার পক্ষে নিছক পাগলামি।' কিন্তু এসব কথা ভেবেও নিজেকে শান্ত করতে পারলাম না। কেবলি মনে হতে লাগল 'আমার স্ত্রী মিথ্যে কথা বলেছে, মিথ্যে, সব মিথ্যে। আবার সেই সন্দেহ, ঈর্ষা, যন্ত্রণা শুরু হল।

'আমাদের কামরায় আর শুধু দুজন যাত্রী ছিল—এক বৃদ্ধা মহিলা আর তার স্বামী, দুজনেই খুব চুপচাপ। ওরা নেমে যাওয়ার পর একেবারে একা পড়ে গিয়ে আমি খাঁচায় বদ্ধ জন্তুর মত অস্থির হয়ে উঠলাম। একবার লাফিয়ে জানালার ধারে যাই, একবার পড়ি কি মরি করে পায়চারি করতে থাকি—অস্থির হয়ে উঠলেই যেন ট্রেনের গতি বেড়ে যাবে এই রকম একটা ভাব আর কি। ট্রেন অবশ্য তার নিজের গতি মতই দুলে দুলে চলতে লাগল—ঠিক যেমন এখন এই ট্রেনটা যাচ্ছে।'

এই পর্যন্ত বলে পজ্‌দ্নীশেভ লাফিয়ে উঠে, দু'চারবার ঘুরপাক খেয়ে আবার নিজের জায়গায় এসে বসলেন।

'ট্রেনে চড়লে আমার সব সময় ভয় করে, দারুণ ভয় করে। সেদিনও ভয় করেছিল। প্রাণপণে অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করছিলাম। সরাইখানায় দুপুরে কি কি খেয়েছি, আরও ঐরকম সব আজেবাজে কথা। ভাবতে ভাবতে সরাইখানার দাড়িওয়ালা দরওয়ান আর তার নাতির কথা মনে পড়ল। [illegible]টা আমার ছেলে ভাসিয়ার বয়সী। হঠাৎ মনে হল, 'ভাসিয়া

একদিন না একদিন তার মার সঙ্গে ঐ বাজনাদারটার কুৎসিত সম্পর্কের কথা জানতে পারবে। হয়তো বা কোনদিন ওদের দুজনকে চুমু খেতে দেখবে। আহা, ছেলেটা এসব ব্যাপার জানতে পারলে বড় কষ্ট পাবে। ওর মা অবশ্য প্রেমে মত্ত, ছেলের কষ্টে তার কিছুই আসবে যাবে না।' আবার সেই ঈর্ষা আর সন্দেহের বিষ আমার মনে ঢুকে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আমি অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। যে গ্রামে কাজ করতে গিয়েছিলাম সেখানকার হাসপাতাল, ডাক্তার, রুগীদের অভাব-অভিযোগের কথা ভেবে মনটাকে অন্যদিকে ব্যস্ত করে রাখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ডাক্তারের কথা ভাবতেই মনে হল ডাক্তারটার গোঁফটা ত্রাখাচেভ্স্কির মত। 'ওঃ কি প্রচণ্ড দুঃসাহস ওদের দুজনের! আমাদের শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে এরকম ভাব দেখিয়ে ত্রাখাচেভ্স্কি আমাকে কী ভীষণ বোকা বানাল! এমন কি আমার নিজের স্ত্রী পর্যন্ত আমাকে ঠকাল!' এই সব ভাবতে ভাবতে আবার সেই ঈর্ষার অনুভূতি ফিরে এল। অন্য যে ব্যাপার নিয়েই ভাবতে যাই না কেন, ঘুরে ফিরে কেবল ওদের দুজনের কথাই মনে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড কষ্ট হতে লাগল। নিজের মূর্খামি, দ্বিধা, সন্দেহ, স্ত্রীর জন্য ভালবাসা, ঘেন্না সব মিলিয়ে আমাকে অস্থির করে তুলল। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, মনে হল কামরা থেকে লাফিয়ে পড়ে রেল লাইনে মাথা দিয়ে জীবনটা শেষ করে দিই। তাহলে অন্ততঃ আর এই সন্দেহ আর অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। কিন্তু নিজের জন্য করুণাবোধ এবং ঠিক তার পরে পরেই স্ত্রীর ওপর প্রচণ্ড ঘেন্না—এই দুটো অনুভূতি মিলে আমাকে বাঁচিয়ে দিল। ভাবলাম 'না, আত্মহত্যা করব না। আত্মহত্যা করলে তো ও রেহাই পেয়ে যাবে। আমি নিজে যে যন্ত্রণা পাচ্ছি, তার অন্ততঃ কিছুটা ওকেও টের পাওয়াব।' প্রতিটি স্টেশনে গাড়ি থামলেই প্ল্যাটফর্মে নেমে নিজেকে একটু অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করছিলাম। একটা স্টেশনের রেস্তোরাঁয় কয়েকজন লোককে মদ খেতে দেখে আমিও ভদ্কার অর্ডার দিলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে এক ইহুদি ভদ্রলোক মদ খেতে খেতে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। নিজের কামরায় একা একা থাকতে হওয়ার ভয়ে আমি তাঁর সঙ্গে নোংরা, ধোঁয়াভর্তি, মেঝেময় সান ফ্লাওয়ার বীজ ছড়ানো একটা থার্ডক্লাস কম্পার্টমেন্টে গিয়ে বসলাম। ভদ্রলোক আমার পাশে বসে বক্‌বক্‌ করে যেতে লাগলেন। আমি তাঁর কথাবার্তা

শুনছিলাম বটে কিন্তু নিজের চিন্তায় এত মগ্ন ছিলাম যে মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। ভদ্রলোকটি সে কথা বুঝতে পেরে বললেন, 'মন দিয়ে শুনুন।' বেগতিক দেখে আমি সে কামরা ছেড়ে নিজের কামরায় চলে এলাম। ভাবলাম, পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে ভেবে একটা নিষ্পত্তি করে ফেলব। যে ব্যাপার নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করছি, এত কষ্ট পাচ্ছি, সেটা আদৌ সত্যি কিনা, তার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা সেটা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করতে গিয়েও শান্ত থাকতে পারলাম না। আবার অস্থির উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। যুক্তির বদলে মনে কেবল নানা উদ্ভট কল্পনা, নানা ছবি ভেসে বেড়াতে লাগল। এক একবার মনে হচ্ছিল, 'অতীতে বহুবারই তো আমি এরকম ঈর্ষা নিয়ে কষ্ট পেয়েছি। অথচ প্রতিবারই পরে দেখা গেছে যে আমার সন্দেহ অমূলক। এবারও নিশ্চয় তাই হবে। বাড়ি গিয়ে দেখব, আমার স্ত্রী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ আমাকে দেখলে ও নিশ্চয়ই খুশি হয়ে উঠবে। ওর মুখচোখের ভাব দেখলেই বুঝতে পারব যে ওদের দুজনের মধ্যে কোন বাজে ব্যাপার ঘটে নি। সব আমার অলীক কল্পনা। ওঃ! ব্যাপারটা সত্যি এরকম হলে কী ভালই যে লাগবে! পরমুহূর্তেই আবার মনে হচ্ছিল, 'না তা হবার নয়। আগে বহুবার ভুল করেছি ঠিকই। কিন্তু এবার সত্যি সত্যি ঘটনাটা ঘটে গেছে। আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই আমাকে ঠকিয়েছে।' এ সব কথা মনে হতেই আমার ঈর্ষার যন্ত্রণা শুরু হল। হ্যাঁ, এই যন্ত্রণাই আমার পাপের শাস্তি। অল্প বয়সী যুবকদের সংযম শেখানোর জন্য সিফিলিসের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। অশান্তি, অস্থিরতা যে তখন কিভাবে আমার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল সেটা তাদের জানাতে পারলে তারা নিজে থেকেই সাবধান হয়ে যাবে। অশান্তির সব চেয়ে বড় কারণ হল এই যে, আমি মনে করতাম আমার স্ত্রীর শরীরের ওপর আমার পরিপূর্ণ অধিকার, সে শরীর শুধু আমার, শুধুই আমার। আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানলাম যে ওর শরীরের ওপর আমার অধিকার নেই। ও নিজের শরীর নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে। আমার প্রচণ্ড আপত্তি থাকলেও ও ওর নিজের যা ইচ্ছে হবে, তাই করবে। আমি যাই করি না কেন আমার স্ত্রী বা ত্রাখাচেভ্স্কিকে কিছুতেই আটকাতে পারব না। ভ্যাঙ্কা-দ্য-ওয়ার্ডারের মত ত্রাখাচেভ্স্কিও

কাশিকাঠের দিকে এগোতে এগোতে প্রেম আলিঙ্গনের গান গেয়ে যেতে পারে।

'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে আমাকে হারিয়ে দিতে পারে। আমার স্ত্রী যে ঐ লোকটির সঙ্গে শুতে চেয়েছিল, তাতো আমি জানিই। ও যদি সেই ইচ্ছেটা দমন করে থাকে, এখনও ব্যভিচার না করে থাকে তাতেই বা কি? তাহলে তো আরও খারাপ। তার চেয়ে বরং যদি ও ইতিমধ্যেই ব্যভিচার করে থাকে, আর আমার যদি সব জানা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেই ভাল—আমার আর কোনও সন্দেহ বা দ্বিধার অবকাশ থাকবে না। ঠিক কি যে চাইছিলাম, তা বলতে পারব না। বোধহয় আমার ইচ্ছা ছিল, আমার স্ত্রী যা করতে চাইছে, তা যেন কখনও করতে না চায়। কিন্তু অন্যের ওপর জোর খাটাতে যাওয়াটা তো নিছক পাগলামি।

২৬

'পরের স্টেশনে অর্থাৎ আমার বাড়ির স্টেশনে, কনডাকটার এসে আমাদের টিকিটগুলো নিয়ে নেওয়ার পর আমি আমার ব্যাগটা নিয়ে প্লাট-ফর্মে নেমে পড়লাম। বাড়িতে প্রায় পৌঁছে গেছি, নাটকের শেষ অঙ্ক প্রায় আরম্ভ হয়ে গেছে ভেবে প্রচণ্ড উত্তেজিত বোধ করছিলাম। হাত-পা হিম হয়ে যাচ্ছিল, দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। প্রায় যন্ত্রচালিতের মত অন্য লোকেদের পিছু পিছু স্টেশনের বাইরে এসে একটা ইজ্‌ভোজ্‌চিকে চড়ে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। পথে, রেলওয়ে ইয়ার্ডের দরওয়ান, অন্যান্য কিছু লোকজন, আমার বাড়ির আগে পরে ল্যাম্পপোস্টের কিরকম ছায়া পড়েছে ইত্যাদি দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। মাথায় আর অন্য কোন ভাবনা ছিল না; প্রায় আধ ভার্স্ট মত চলে আসার পর খেয়াল হল যে পা'টা ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাচ্ছে। ট্রেনে পশমী মোজা জোড়া খুলে কীটব্যাগে রেখে দিয়েছিলাম। ব্যাগটা কোথায় রেখেছিলাম ঠিক মনে করতে পারলাম না। তারপর দেখলাম সেটা সঙ্গেই আছে। কিন্তু ধারে কাছে কোথাও আমার বাস্কেটটা দেখতে পেলাম না। মালপত্রের কথা এতক্ষণ মনেই ছিল না। এখন হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় খুঁজে দেখলাম মালপত্রের রসিদটা সঙ্গেই রয়েছে। কিন্তু আবার যে ফিরে গিয়ে রসিদ দেখিয়ে মালপত্র নিয়ে আসব, সে আর ইচ্ছা করল না। গাড়ি না থামিয়ে বাড়ির দিকেই এগোতে লাগলাম।

সে-সময় আমার মনের অবস্থা যে ঠিক কি রকম ছিল, চেষ্টা করলেও সে কথা আর মনে করতে পারি না। তখন কি ভেবেছিলাম, কি করতে চাইছিলাম, সে-সব কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে যে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে বলে আশঙ্কা করেছিলাম। নিজে ইচ্ছা করেই ঘটনাটা ঘটালাম, না কি ঘটনাটা ঘটতই—আমি শুধু তার একটা পূর্বাভাস পাচ্ছিলাম মাত্র—তা ঠিক পরিষ্কার বলতে পারব না। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো তখন কিছুই ভাবিনি। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে কল্পনা করে নিয়েছিলাম যে তার আগে নিশ্চয়ই অনেক ভাবনা চিন্তা করেছিলাম।'

'রাত একটা নাগাদ বাড়ির গেটের কাছে এসে পৌঁছালাম। বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে সওয়ারী মেলবার আশায় কয়েকজন ঘোড়াগাড়ির গাড়োয়ান বাড়ির সামনে গাড়ি নিয়ে বসেছিল। আলোগুলো জ্বলছিল আমার ফ্ল্যাটেই। রিসেপশান রুম আর ড্রইংরুমের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। এত রাতে কেন বসবার ঘরে আলো জ্বলছে, সে-কথা না ভেবেচিন্তেই আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গিয়ে কলিং বেলটা টিপলাম। সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। দরজা খুলল আমার চাপরাশি ইগর। ইগর বোকা বটে কিন্তু মনটা খুব ভাল আর খাটতেও পারে প্রচণ্ড। দরজা খুলতেই দেখলাম সেই 'লোকটার' কোট ঝুলছে। দেখে আমার অবাক হওয়ার কথা, কিন্তু কি আশ্চর্য! অবাক হলাম না। মনে হল এমনটা যে হবে তা আমার আগে থাকতেই জানা ছিল। মনে মনে বললাম, 'তাহলে ধরেছি ঠিকই।' আমার প্রশ্নের উত্তরে ইগর জানালো যে ত্রাখাচেভস্কি এসেছে। আর অন্য কেউ এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'না'।

অন্য কেউ এলে আমি বিরক্ত হব কল্পনা করে নিয়ে, ইগর বেশ খুশি খুশি মুখে বলল, 'না, আর কেউ নেই।' আমি মনে মনে ভাবলাম, হ্যাঁ, তাহলে আর লীলাখেলা জমবে কি করে?' মুখে বললাম, 'বাচ্চাদের খবর কি?'

'আজ্ঞে, ভগবানের ইচ্ছেয় তেনারা সব ভালই আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন এতক্ষণে।'

'উত্তেজনায় আমার ঠোঁট থর থর করে কাঁপছিল, নিশ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। ভাবলাম, 'তাহলে ব্যাপারটা এবার সত্যিসত্যিই ঘটল।' অন্য

অন্যবার দুর্ঘটনা ঘটবে বলে ভয় পেয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই ঘটেনি; সব ঠিকঠাক চলেছে। কিন্তু এবার ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে……'

'কষ্টে দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়লাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে কি যেন একটা অশুভ শক্তি কাঁধে ভর করল। আমার কানে কানে বলতে লাগল, 'তুমি যে সময়টা এখানে বসে বোকার মত কান্নাকাটি করবে, ততক্ষণে ওরা দুজন যা করার করে কেটে পড়বে। ওদের পাপের কোন প্রমাণ থাকবে না। তুমি কি সারাজীবন ধরে সন্দেহ আর ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলতে চাও না কি?' তক্ষুণি সমস্ত দুঃখ আক্ষেপ চলে গেল—তার জায়গায় অন্য একটা অনুভূতি হতে লাগল। আমার মনে তখন যে কি অনুভূতি হয়েছিল তা বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না—আমার তখন হঠাৎ প্রচণ্ড আনন্দ হল, মনে হল, এইবার আমার স্ত্রীকে শাস্তি দিতে পারব, তার হাত থেকে অব্যাহতি পাব, আমার সমস্ত বিদ্বেষ, ঘেন্না রাগ প্রকাশ করতে পারব, সব যন্ত্রণার অবসান হবে।' সে রাত্রে নিজেকে নিজের বীভৎস, জান্তব প্রবৃত্তি-গুলোর হাতে ছেড়ে দিলাম—একটা ধূর্ত, হিংস্র জন্তুর মত ভয়ানক হয়ে উঠলাম।

'ইগর বসবার ঘরের দিকে এগোতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'গেটের কাছে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এই রসিদটা নিয়ে সেই গাড়িটা করে স্টেশনে যাও। আমার মালপত্রগুলো নিয়ে এস।'

'ইগর ওর কোটটা পরে বেরোনোর জন্য বড় ঘরে গেল। পাছে ও আমার স্ত্রীকে আর ঐ লোকটাকে সাবধান করে দেয় বলে আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে সে-ঘরে গেলাম, ও কোট পরে তৈরী হয়ে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। আমাদের রিসেপশান রুমে যেতে হলে ড্রইংরুম পেরিয়ে যেতে হয়। শুনতে পেলাম রিসেপশান রুম থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ছুরি-কাঁটার শব্দ ভেসে আসছে। ইগর আস্ত্রাখান কলারের কোট পরে বেরিয়ে গেল। আমি ওকে এগিয়ে দিয়ে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। একেবারে একলা হয়ে যেতেই কেমন যেন ভয় করে উঠল। এবার আমাকে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করতে হবে—ভেবে ভয়ে, দুশ্চিন্তায় সারা শরীর অবশ হয়ে এল। কি যে করব তা তখনও অবধি ঠিক করি নি। শুধু মনে হচ্ছিল যা হবার হয়ে গেছে, আমার স্ত্রীর সতীত্বে বিশ্বাস করার মত

আর কোন কারণ নেই। ওকে শাস্তি দেওয়ার, ওর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার সময় এসে গেছে।

'আগে আগে এরকম ক্ষেত্রে ইতস্ততঃ করেছি। ভেবেছি, 'আমার বোধহয় ভুল হচ্ছে, এরকম ব্যাপার সত্যি হতে পারে না। সেদিন আমার স্ত্রীর অপরাধ সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম। আমার অনুপস্থিতিতে একা ঐ লোকটার সঙ্গে বসে আছে! লজ্জা-সঙ্কোচ, বিচার-বিবেচনার ধার ধারছে না। মনে হল, এই রকম দুঃসাহস দেখিয়ে ও নির্দোষ সাজার চেষ্টা করছে—এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন পুরো ব্যাপারটা কিছুই নয়। আর কোন সন্দেহ রইল না। তখন শুধু একটা ব্যাপারে ভয় হতে লাগল—মনে হল, এখনও ওরা পার পেয়ে যেতে পারে, কায়দা করে নিজেদের পাপের প্রমাণ লুকিয়ে ফেলতে পারে। ওরা দুজন রিসেপ্‌শান রুমে বসে ছিল। তাই আচমকা গিয়ে ওদের ধরে ফেলব ঠিক করে সরাসরি ড্রইংরুম দিয়ে রিসেপ্‌শান রুমে না গিয়ে, বড় ঘর আর বাচ্চাদের ঘর দিয়ে ঘুরে পা টিপে টিপে সেই ঘরের কাছে গেলাম।

'বাচ্চাদের ঘরে ছেলেরা ঘুমোচ্ছিল। আমার পায়ের শব্দে বাচ্চাদের ধাই ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠল—মনে হল সে জেগে উঠবে। পুরো ব্যাপারটা জানতে পারলে সে কী ভাববে কল্পনা করে প্রচণ্ড দুঃখে অপমানে আমার কান্না পেয়ে গেল। কান্নার শব্দে বাচ্চারা জেগে উঠবে ভয় পেয়ে আবার পা টিপে টিপে নিজের ঘরে চলে এলাম। কাঁদতে কাঁদতে সোফার উপর লুটিয়ে পড়লাম। মনে হল 'আমি নিজে' ভাল বংশে জন্মেছি, সৎভাবে জীবন কাটাচ্ছি। চিরজীবন একটা শান্ত, সুখী, পরিবারিক জীবন গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছি। কখনও স্ত্রীকে ঠকাই নি। আর, পাঁচটি সন্তানের মা হয়েও আমার স্ত্রী একটি বাজনাদারের লাল ঠোঁট দেখে গলে গিয়ে তার সঙ্গে প্রেম করছে! অমানুষ! চৈতী কুত্তী একটা! বরাবর আমার স্ত্রী এমন একটা ভাব দেখিয়ে এসেছে যেন বাচ্চাদের খুব ভালবাসে। অথচ এখন বাচ্চারা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে জেনেও ঐ লোকটার সঙ্গে ঢলাঢলি করতে ওর কিছুমাত্র বাধছে না। আমাকে ঐরকম একটা চিঠি লেখা, একটা বাজে লোককে নিয়ে মেতে ওঠা—বেহায়াপনার একেবারে চূড়ান্ত। এতদিন ধরে ও কি করে এসেছে না এসেছে তাই বা কে জানে? হয়তো চিরকালই চাকরবাকরদের সঙ্গে ধেলেল্লাপনা করে গেছে আর তারপর বাচ্চা

পয়দা হলে সেগুলোকে আমার বাচ্চা বলে চালিয়ে দিয়েছে। আমি যদি আগামী কাল বাড়ি ফিরতাম, তাহলে নিশ্চয়ই ও খুব ভাল করে চুলটুল বেঁধে, সেজেগুজে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসত। ওর সরু কোমর, সুন্দর অঙ্গভঙ্গি দেখে আমি ভুলে যেতাম, (মুহূর্তে চোখের ওপর ওর মুখটা ভেসে উঠল—সুন্দর অথচ ঘেন্নায় সারা মন বিষিয়ে দেওয়ার মত বীভৎস বলে মনে হল মুখটা)। আজ না ফিরে যদি আগামীকাল ফিরতাম, তাহলে আমার হাতে কোন স্পষ্ট প্রমাণ থাকত না। স্ত্রীর চাতুরীতে ভুলে সাময়িকভাবে আমার সন্দেহ দূর হত। তারপর আবার পরে ঈর্ষায়, সন্দেহে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলতাম। হঠাৎ মনে হল এসব জানতে পারলে ইগর, বাচ্চাদের ধাই, অন্যান্য ঝি-চাকররা কি ভাববে? লিজাটা এত ছোট, সেই-বা কি ভাববে? হয়তো ইতিমধ্যেই ও অনেক কথা বুঝতে পেরে গেছে! ওঃ কী প্রচণ্ড নির্লজ্জতা! কী প্রচণ্ড ভণ্ডামি! কী বীভৎস লালসা!

'সোফা থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। এত জোরে বুক ধড়ফড় করছিল যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। প্রায় হার্টস্ট্রোক হওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল তখন। মনে হচ্ছিল এরকম করে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে আমার স্ত্রী আমাকে মেরে ফেলবে। হ্যাঁ, ও তাই চায়। এখন আমি কি করি? ওকে মেরে ফেলব? তাহলে তো ও বড় সহজে রেহাই পেয়ে যাবে। না, এত সহজে ওকে ছেড়ে দেব না। ভাবলাম 'এই মুহূর্তে আমি এখানে বোকার মত বসে আছি, কষ্ট পাচ্ছি, আর ওরা দুজন খাচ্ছে, হাসছে, ফুর্তি করছে। হয়তো বা ঐ লোকটা এখন আমার স্ত্রীর শরীর ভোগ করছে।'

'আমার স্ত্রী বয়স হয়েছে বটে। কিন্তু তাহলেও আমার স্ত্রীর সঙ্গে শুতে লোকটার আপত্তি হওয়ার কথা নয়। এখনও তো ও খুবই সুন্দর। তাছাড়া ঐ লোকটার দিক থেকে সবচেয়ে বড় কথা এই যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে শুলে কোন রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আগের সপ্তাহে ঝগড়ার সময় যখন জিনিসপত্র ছুঁড়ে, ভয় দেখিয়ে আমার স্ত্রীকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলাম, তখন যে ওকে কেন একেবারে শেষ করে ফেলি নি, ভেবে আক্ষেপ হতে লাগল। সেদিনের সমস্ত ঘটনা একে একে মনে পড়তে লাগল। আবার সেই রকম সব কিছু ফেলে ছড়িয়ে ভেঙে ফেলার, নষ্ট করার ইচ্ছা হতে লাগল। ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে আমার রাগটা প্রকাশ করার জন্য

একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। রাগটা প্রকাশ করার জন্য কি করব সেটা ছাড়া মাথায় আর কোন ভাবনা ছিল না। আমার শরীর মনের অবস্থা তখন একটা ক্ষ্যাপা জন্তুর মত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপদে পড়লে যেমন লোকের ইন্দ্রিয়গুলো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, তারা একটা বিশেষ লক্ষ্য মাথায় রেখে অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে, একটি মুহূর্ত পর্যন্ত নষ্ট না করে আস্তে খুব সাবধানে নিখুঁতভাবে কাজ করে যায়, আমিও সেই রকম ভাবেই কাজ করতে শুরু করলাম।

২৭

'আমার ঘরের সোফার ওপরের দেওয়ালটাতে নানা ধরনের অস্ত্র ঝোলান থাকত। জুতো খুলে ফেলে, শুধু মোজা পায়ে দিয়ে আস্তে আস্তে সেখানে গেলাম। দামাস্কাসে তৈরী একটা বাঁকানো ছুরি বেছে নিয়ে সেটা খাপ থেকে বার করে ফেললাম। ছুরিটা খুব ধারালো, আগে কখনও ব্যবহার করা হয় নি। ছুরির খাপটা আমার হাত থেকে সোফার পেছনে পড়ে গেল দেখে মনে হল যে পরে এক সময় খাপটা তুলে রাখতে হবে, নয়তো ওটা হারিয়ে যাবে। ছুরিটা নিয়ে কোট খুলে রেখে, নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম :

'রিসেপশান্ রুমের দরজা পর্যন্ত পা টিপে টিপে এসে ঝট্ করে দরজাটা খুলে ফেললাম। আমাকে হঠাৎ দেখে ওদের দুজনের মুখের ভাব কিরকম বদলে গিয়েছিল আর সেই ভাবান্তর দেখে আমি কিরকম তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ও উল্লাস বোধ করেছিলাম, সে-সবই আমার এখনও মনে আছে। আমি যা চেয়েছিলাম, ঠিক তাই হল। আমি ঘরে ঢোকামাত্র প্রচণ্ড ভয়ে ওদের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। আমাকে দেখে দুজনের মুখে যে কী প্রচণ্ড হতাশা আর ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল, তা আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে। লোকটা বোধহয় আগে টেবিলের ওপর বসেছিল। হঠাৎ আমাকে দেখে কিম্বা হয়তো আমার পায়ের শব্দ পেয়ে লাফিয়ে উঠে বুক-কেসটার দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে গেল। মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, লোকটা দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। আমার স্ত্রীর মুখেও ভয়ের ভাব ছিল কিন্তু তার সঙ্গে যেন আর একটা কি অনুভূতি মিশেছিল। ওর মুখে যদি অন্য আর কিছু না থাকত, যদি শুধু ভয়ের ভাব থাকত, তাহলে হয়তো

পরে যে বীভৎস ঘটনাটা ঘটল, তা ঘটত না। কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলাম এমন প্রেম ও সুখের মুহূর্তটা মাটি হয়ে গেল বলে আমার স্ত্রীর মুখে বিরক্তি ও হতাশা ফুটে উঠল। অন্তত সে সময় আমার তাই মনে হয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যেই আবার ওদের দুজনের মুখের ভাব পালটে গেল। আমার স্ত্রীকে দেখে মনে হল ও এই মুহূর্তের সুখ ছাড়া আর কিছু চায় না। লোকটার মুখেও আর ভয়ের ভাব রইল না। ও মনে মনে পুরো অবস্থাটা গুছিয়ে ভাবতে শুরু করল। 'স্বামী ব্যাটাকে মিথ্যা বলে ভড়কি দেওয়া যাবে কি? যদি যায়, তবে এক্ষুণি একটা কিছু বানিয়ে বল্‌তে হবে। আর যদি ও ইতিমধ্যেই সব বুঝে ফেলে থাকে, তাহলে আজ একটা কাণ্ড হবে, কিন্তু ঠিক কি করবে লোকটা? এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ত্রাখাচেভ্স্কি আমার স্ত্রীর দিকে তাকাল। আর তক্ষুণি আমার স্ত্রীর মুখের হতাশা আর বিরক্তির ভাব কেটে গেল—ঐ লোকটার জন্য দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল সারা মুখে।

'ছুরিটা পিছন দিকে লুকিয়ে আমি কয়েক মুহূর্ত দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। লোকটা অল্প হেসে খুব সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'আমরা এই একটু বাজনা নিয়ে বসেছিলাম।'

এমন সহজভাবে কথাটা বলল যে আমার কানে প্রায় হাস্যকর শোনাল, আমার স্ত্রীও লোকটার সুরে সুর মিলিয়ে বলল, 'ওমা, ভাবতেই পারিনি তুমি এমন হঠাৎ এসে পড়বে।'

ওরা কেউ-ই কথা শেষ করার সুযোগ পেল না। আগের সপ্তাহে যেমন হয়েছিল, এখনও তেমনি প্রচণ্ড রাগে আমার সর্বাঙ্গ রী-রী করতে লাগল—সবকিছু ভেঙে চুরে তছনছ করে ফেলবার ইচ্ছা হতে লাগল। রাগের চোটে একেবারে পাগলের মত হয়ে গেলাম।

'একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে ওরা দুজনেই একেবারে চুপ করে গেল। লোকটা যাতে দেখতে পেয়ে গিয়ে আমাকে বাধা না দিতে পারে সেজন্য ছুরিটা পিছন দিকে লুকিয়ে রেখে আমি আমার স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রথম থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম, ওর বুকের বাঁদিকের ঠিক নীচেই ছুরিটা বিঁধিয়ে দেব। কিন্তু আমি স্ত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই লোকটা আমার হাতটা ধরে ফেলে চীৎকার করে উঠল, 'একবার ভেবে দেখুন কি করছেন?' ভাবতেই পারি নি লোকটার এতটা সাহস হবে?

'হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি এবার লোকটার ওপর লাফিয়ে পড়লাম। লোকটা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে গেল—ওর চোখগুলো চক্‌চক্‌ করে উঠল। তারপর কোনমতে পিয়ানোর তলা দিয়ে দরজার দিকে ছুটে পালাল। এসব কোন ঘটনাই আমি আগে থেকে আন্দাজ করতে পারিনি। ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরতে যাব কিন্তু হঠাৎ আমার বাঁ হাতে কি যেন একটা ভার চেপে রয়েছে বলে মনে হল। পাশ ফিরে দেখি আমার স্ত্রী আমার হাতটা ধরে ঝুলছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও খুব জোরে আমার হাতটা চেপে ধরে রইল। আমার স্ত্রী আমাকে ছুঁতেই প্রচণ্ড ঘেন্নায় আমার গা গুলিয়ে উঠল। হঠাৎ এরকম অপ্রত্যাশিত বাধা পেয়ে একেবারে ক্ষেপে উঠলাম। আমাকে নিশ্চয়ই ভয়ানক বীভৎস দেখাচ্ছে ভেবে মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলাম। আবার জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে যেতেই আমার স্ত্রীর মুখে আমার কনুই-এর ধাক্কা লাগল। চীৎকার করে উঠে হাতটা ছেড়ে দিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটাকে তাড়া করতে যাব এমন সময় হঠাৎ মনে হল বাইরের লোক যদি জানতে পারে যে আমি মোজা পায়ে স্ত্রীর গোপন প্রেমিকের পিছু পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছি, তাহলে তারা আমাকে একটা ভাঁড় ভেবে মনে মনে হাসবে। লোকটাকে পালিয়ে যেতে দিলাম। নিজেকে হাস্যকর করে তোলাটা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে চাইছিলাম। বললে খুব অদ্ভুত শোনাবে কিন্তু প্রচণ্ড রাগের মুহূর্তেও ওরা দুজন আমাকে দেখে কি ভাববে না ভাববে সে ব্যাপারটা আমার ঠিক খেয়াল ছিল। যা করছিলাম তার অনেকটাই ওদের ভয় দেখানোর জন্য করছিলাম। আমার স্ত্রীর দিকে ফিরে দেখলাম তার চোখে চোট লেগেছে। সে একহাতে সেই চোটলাগা চোখটা ঢেকে, ঘেন্নায়, রাগে মুখটা বিকৃত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ইঁদুর ধরা কলের ঢাকনিটা কেউ হঠাৎ খুলে ফেললে কলে বন্ধ ইঁদুরটা যেমন-ভাবে তাকায়, ওর চোখের দৃষ্টি অবিকল সেইরকম। মুখে শুধু ঘেন্না আর ভয়—স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, আমার সম্পর্কে এই ঘেন্না আর ভয় থেকেই ওর মনে অন্যের জন্য ভালবাসার জন্ম হয়েছে। তখনও যদি চুপ করে থাকত তাহলে হয়ত নিজেকে সামলে নিতে পারতাম। কিন্তু আমি যে হাতে ছুরিটা ধরেছিলাম, সেই হাতটা জড়িয়ে ধরে সে চীৎকার করে উঠল।

'কি করতে যাচ্ছ একবার ভেবে দেখ। কি হয়েছে তোমার, কেন এরকম করছ? আমাদের দুজনের মধ্যে খারাপ কিছু নেই—কিছু না, কিছু না—দিব্যি গেলে বলছি আমি কোন দোষ করি নি।'

'কথাগুলো শুনেই মনে হল ও একেবারে ডাহা মিথ্যে বলছে। উত্তেজনাটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছিল যে একটা চূড়ান্ত কিছু ঘটিয়ে না ফেলা পর্যন্ত আমার আর নিস্তার ছিল না। উত্তেজনা কমা-বাড়ারও তো একটা নিজস্ব নিয়ম আছে।

'খানকী মাগা, মিথ্যে কথা বলে আর আমাকে ভোলাতে পারবি না, বলে আমি বাঁহাত দিয়ে ওকে চেপে ধরতেই ও প্রথমটা পিছলে গেল। পরের মুহূর্তেই আমি ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বাঁ হাত দিয়ে ওর গলা টিপে ধরলাম। ছুরিটা আমার ডান হাতে ধরা ছিল। আমার স্ত্রী গলাটা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। আমি যেন ঠিক এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম—সোজা ওর বুকের বাঁদিকে, পাঁজরার ঠিক নীচেই ছুরিটা বসিয়ে দিলাম।

'অনেকে বলে উত্তেজনার বলে কি করেছি না করেছি সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। ও-সব একেবারে ছেঁদো কথা, নেহাৎ মিথ্যে। আমি নিজে তো সেই প্রচণ্ড উত্তেজনার মুহূর্তে সব পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। রাগ যত বাড়ছিল, আমার যুক্তিবুদ্ধিও যেন ততই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। কাজেই কি করছি না করছি—তা বুঝতে না পারার কোন কারণ ছিল না। ভবিষ্যতে কি করব সেটা জানা না থাকলেও সেই মুহূর্তে কি করছি বা ঠিক তার পরের মুহূর্তে কি করতে হবে, সে সম্পর্কে বেশ টনটনে জ্ঞান ছিল। ঘটনাটা ঘটানোর সময়ও বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে, আমি আমার স্ত্রীর পাঁজরার নীচে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে যাচ্ছি, বুঝতে পারছিলাম এক্ষুণি সেই জায়গাটাতে ছুরিটা সমূলে বিঁধে যাবে।

'আমি যে কী সাংঘাতিক কাণ্ড করতে যাচ্ছি এবং এ ঘটনার পরিণাম যে কী নিদারুণ হবে তাও আমার অজানা ছিল না। কিন্তু এই বোধটা এক ঝলক বিদ্যুতের মত হঠাৎ জেগে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। কি করতে যাচ্ছি তা বুঝতে পারার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেললাম। পুরো ব্যাপারটা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে। ওর করসেট বা ঐরকম একটা কিছুতে লেগে ছুরিটা প্রথমটা একটু বাধা পেল। তারপর অনুভব

করলাম ছুরির ফলাটা ওর নরম শরীরের মধ্যে গিঁথে যাচ্ছে। ও হাত দিয়ে ছুরিটা ধরে ফেলার চেষ্টা করতে যাওয়ায় হাতটা কেটে গেল, কিন্তু ছুরি থামল না। পরে, আমার নৈতিক পরিবর্তন হওয়ার পর জেলে বসে বসে বহুদিন এই মুহূর্তটির কথা ভেবেছি—এই প্রচণ্ড হিংস্রতার কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি। মনে আছে, ঘটনাটা ঘটার ঠিক আগের মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি একজন অসহায় নিরস্ত্র স্ত্রীলোককে মেরে ফেলছি, আমার নিজের স্ত্রীকে খুন করছি। তাই ছুরিটা ওর শরীরের মধ্যে ঢুকিয়েই আবার তক্ষুণি বার করে নিয়েছিলাম। যা করে ফেলেছি, কোনমতে সেটা ঠিক করে নিতে পারলে আমি বেঁচে যেতাম। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। এরপর আর কি ঘটবে দেখার জন্য এক মুহূর্ত একেবারে পাথরের মত শক্ত-ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল, 'যা করে ফেলেছি তা কি আর কিছুতেই ফেরানো যায় না।' আমার স্ত্রী কোনমতে টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকরে করে উঠল, 'কে কোথায় আছ শিগ্‌গির এস, আমাকে খুন করে ফেলছে।'

চেঁচামেচির শব্দ পেয়ে বাচ্চাদের ধাই দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, আমি চুপ করে ঘরের মধ্যেই রইলাম—মনে হল ভুল দেখছি, এ সব সত্যি নয়। তারপর হঠাৎ ওর করসেটের ভিতর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতো লাগল। রক্ত দেখামাত্রই বুঝতে পারলাম আর কিছু করার নেই। মনে হল, আমি এই-ই চেয়েছিলাম। যা করেছি, ঠিকই করেছি। এখন আর কিছু করার নেই, করা উচিতও নয়। যা হওয়া উচিত ছিল, তাই হয়েছে।' আমার স্ত্রী মেঝেতে লুটিয়ে পড়তেই ধাইটা 'হা ভগবান' বলে চিৎকার করে তার দিকে ছুটে গেল। আমি ছুরি ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেলাম।

আর আমার স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালাম না। মনে হল উত্তেজিত হওয়া চলবে না। কি করছি না করছি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে। ধাইটা কাঁদতে কাঁদতে ঝিকে ডাকতে লাগল। আমি বড়ঘরে গিয়ে ঝিকে ডেকে ধাই-এর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলাম। কি করব চিন্তা করতে করতে ঠিক করে ফেললাম আত্মহত্যা করব। আমার পড়বার ঘরে গিয়ে রিভলবারটা বার করলাম—গুলি ভরাই ছিল। লেখার টেবিলের ওপর সেটা রেখে, ছুরির খাপটা সোফার নীচ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

'ঐ একভাবে বসে বসেই বহুক্ষণ কেটে গেল। মাথায় কোন চিন্তা ছিল না। কোন কথা স্পষ্ট করে মনে করতে পারছিলাম না। অন্য ঘরগুলো থেকে নানা রকম শব্দ আসছিল। মনে হল বাড়ির দরজায় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল, কে যেন বাড়িতে ঢুকল। তারপর আবার একজন এল। চেয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে মালপত্র নিয়ে ইগর দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসপত্র নিয়ে মাথা-ঘামানোর সময় বটে!

'ইতিমধ্যে কি ঘটে গেছে ইগর তা জানে কিনা জিজ্ঞাসা করে তাকে পুলিশে খবর দিতে বললাম।

'কোন কথা না বলে ইগর চলে গেল। আমি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সিগারেট ধরালাম। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছিল। এরপর বোধহয় প্রায় ঘন্টা দুই ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল হয়ে গেছে। ঝগড়াঝাঁটির পর আমরা আবার মিটমাট করে ফেলেছি। দুজনেই একটু উত্তেজিত আছি বটে, কিন্তু কী শান্তি! পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে গেছি আমরা।' এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। জেগে উঠে ভাবলাম, পুলিশ এসেছে। মনে পড়ল, 'স্ত্রীকে খুন করে ফেলেছি।' পরের মুহূর্তেই আবার মনে হল, 'বোধহয় সব ঠিক আছে, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। আমার স্ত্রী-ই বোধহয় আমাকে ডাকতে এসেছে।' আবার কড়া নাড়ার শব্দ হল। কিন্তু আমি উত্তর দিলাম না। দুর্ঘটনাটা সত্যিসত্যি ঘটে গেছে কিনা ভাবতে ভাবতে একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম, 'হ্যাঁ দুর্ঘটনাটা ঘটিয়েই ফেলেছি। চোখের ওপর আমার স্ত্রীর রক্তমাখা করসেট্‌টা ভাসতে লাগল। নরম মাংসের মধ্যে ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়ার অনুভূতি পেলাম নিজের হাতে। মেরুদণ্ডের ভিতরটা একেবারে শিরশির করে উঠল। মনে হল, 'এইবার নিজেকে শেষ করার সময় এসেছে।' আত্মহত্যা করতে পারব না জেনেও রিভলবারটা হাতে তুলে নিলাম। আশ্চর্য হঠাৎ মনে পড়ল এর আগেও কতবার আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছি। সেদিন ট্রেনে বসে বসেও সেইকথা ভেবেছি। তখন আত্মহত্যা করাটা খুব সহজ বলে মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, আত্মহত্যা করে আমার স্ত্রীকে প্রচণ্ড শাস্তি দিয়ে যাব। কিন্তু এখন সত্যিসত্যি আত্মহত্যা করা দূরে থাক, আত্মহত্যা করার কথাটা পর্যন্ত ভাবতে পারলাম না। মনে হল, 'কেন করব আত্মহত্যা?' দরজায় আবার

ঘা পড়ল। ভাবলাম, আগে দেখি কে ডাকছে। তারপর যা করার করব। রিভলভারটা একটা খবরের কাগজে ঢেকে রেখে দরজা খুলে দিলাম। দেখি, বাইরে আমার স্ত্রীর বোকা ভালমানুষ বিধবা বোনটা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করল—'কি হয়েছে, ভাসিয়া ?'

'ঐ মহিলার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার কোন মানে হয় না জেনেও নিজেকে সামলাতে পারলাম না। রূঢ়ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি, চাই কি তোমার ?'

'ভাসিয়া, ও মারা যাচ্ছে, ইভান ফিয়োদোরোভিচ্ বলেছেন ও আর বাঁচবে না।'

'ইভান ফিয়োদোরোভিচ্ আমার স্ত্রীর ডাক্তার, তার পরামর্শদাতা। ডাক্তারটার নাম শুনেই আবার আমার মেজাজ চড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ও: ! লোকটা আবার এসেছে ? তা আমি কি করব ?'

'আমার শালী কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'হা ভগবান, কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড। কী ভয়ঙ্কর !......ভাসিয়া, ওর কাছে একটু যাও।' 'ওর কাছে যাও', কথাটা কানে বাজতে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, 'হ্যাঁ, তাই যাব।'

স্ত্রীকে খুন করে ফেলার পর তার কাছে গিয়ে বসে থাকাটাই যদি রীতি হয়, তবে তাই করব। মরার সময় পরে ঢের পাওয়া যাবে। আত্মহত্যা করার ইচ্ছাটা তখনও মাথায় ছিল। একবার মনে হল, 'লোকে হয়ত মুখ বেঁকাবে নানা কটুকথা বলবে। তারপরই আবার মনে হল, 'মরুক গে যাক্, আমাকে এখন আর কোন ব্যাপারই ছুঁতে পারবে না।

'আমার শালীকে বললাম, 'দাঁড়াও যাচ্ছি। চটিটা অন্তত গলিয়ে নিতে দাও। শুধু মোজা পায় দিয়ে গেলে লোকে হাসবে।'

২৮

'ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তখনও, সেই অতি পরিচিত ঘরগুলো পার হয়ে, মুমূর্ষু স্ত্রীর ঘরের দিকে যেতে যেতেও আমার মনে হচ্ছিল, যেন কিছুই হয় নি। তারপর হঠাৎ আয়োডোফর্ম আর কারবলিক অ্যাসিডের কটু গন্ধ নাকে যেতেই বুঝলাম, 'না, আর কোন আশা নেই, সব চুকেবুকে গেছে।' বড় ঘর পেরিয়ে বাচ্চাদের পড়ার ঘর দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, লিজা

বসে আছে। আমাকে দেখে ভয়ার্ত চোখে একবার তাকাল। হঠাৎ মনে হল, আমার পাঁচটি ছেলেমেয়ে যেন পাশাপাশি বসে ঐরকম ভয়ার্ত চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার স্ত্রীর ঘরের কাছে যেতে ঝিটা দরজা খুলে দিয়ে বাইরে চলে গেল। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই দেখলাম, আমার স্ত্রীর রক্তমাখা জামাটা চেয়ারের ওপর পড়ে আছে। আর আমাদের জোড়াখাটের যে দিকটায় আমি নিজে শুতাম, সেখানে হাঁটুদুটো জড় করে আমার স্ত্রীর শুয়ে রয়েছে। অনেকগুলো বালিশ দিয়ে মাথাটা উঁচু করে রাখা, ব্লাউজের বোতামগুলো খোলা। আঘাতের জায়গাটায় কি যেন বাঁধা রয়েছে। সারা ঘরে আয়োডোফর্মের গন্ধ।

'আমার স্ত্রীর কালশিরা পড়া ফুলে-ওঠা গাল, নাক আর চোখের ওপর পাতাটা দেখে আমার সবচেয়ে বেশি বীভৎস লাগল। ও আমাকে বাধা দিতে চেষ্টা করার সময় ঐ জায়গাগুলোতে আমার কনুই-এর ধাক্কা লেগেছিল। ওর মুখে আর কোন সৌন্দর্য ছিল না। ওকে দেখে আমার প্রায় ঘেন্না হল। দরজার কাছটায় থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

'নার্স বলল, যান, একবার কাছে গিয়ে দাঁড়ান।'

'মনে হল বোধ হয় আমার স্ত্রী ক্ষমা চাইবে। খুব সহৃদয় হয়ে উঠব ঠিক করে মনে মনে ভাবলাম ও তো আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই মরে যাবে। এখন ওকে ক্ষমা করা চলে। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ও বহুকষ্টে ফোলা ফোলা চোখদুটো খুলে থেকে থেকে বলল, 'আমাকে খুন করেছ। এবার তোমার তৃপ্তি হয়েছে তো?' প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণা, আসন্ন মৃত্যুর জন্য ভয় সব কিছু ছাপিয়ে আবার সেই পুরনো ঠাণ্ডা জান্তব ঘৃণা ফুটে উঠল ওর মুখে। ও হাঁফাতে হাঁফাতে বলতে লাগল, 'কিন্তু বাচ্চাগুলোকে কিছুতেই তোমার হাতে ছেড়ে দেব না। কিছুতেই নয়। ওরা......ওরা সব আমার বোনের কাছে থাকবে।' দরজার কাছে ছেলেমেয়েরা আর ওর বোন দাঁড়িয়েছিল। তাদের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'দেখ, তুমি কি ভীষণ ক্ষতি করেছ।' একবার বাচ্চাগুলোর দিকে তাকালাম। তারপর ফিরে আমার স্ত্রীর বীভৎস আহত মুখের দিকে তাকাতে জীবনে সেই প্রথম আমার সমস্ত অধিকারবোধ, সমস্ত অহঙ্কার ভুলে গেলাম। সেই প্রথম আমার স্ত্রীকে একজন মানুষ হিসেবে দেখতে পেলাম। আমার ঈর্ষা, অপমান, সব কিছু নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্ত নগণ্য

বলে মনে হল। ইচ্ছা হল, ওর পায়ে পড়ি, ওর হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলি, 'আমাকে ক্ষমা কর।' কিন্তু কিছুতেই তা করতে পারলাম না।

ওর আর কথা বলার শক্তি ছিল না আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়তে লাগল, চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একবার কাটাছেঁড়া মুখটা একটু নড়ে উঠল। দুর্বল দুটো হাত দিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, কেন তুমি একাজ করলে?'

বললাম, 'ক্ষমা কর।'

ও-উঠে বসতে চেষ্টা করল। বিকারগ্রস্ত চোখ দুটো মেলে চীৎকার করে উঠল।

'তোমাকে ক্ষমা করব? ক্ষমা করলে আমি মরেও শান্তি পাব না। ও? ভগবান! একবার যদি বেঁচে উঠি······তোমাকে আমি ঘেন্না করি······যা করতে চেয়েছিলে, তা তো করেছ, আর কেন? বিকারের ঘোরে হঠাৎ ভয়াবহ একটা কিছু দেখে ও আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল। আর আমি ভয় পাই না। সবাইকে মেরে ফেল। ওকেও মেরে ফেল। ও চলে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে—মেরে ফেল।'

একেবারে শেষ পর্যন্ত ওর বিকারের ঘোর ছিল। আমাদের কাউকে আর চিনতে পারে নি। সেই দিনই দুপুর নাগাদ ও মারা গেল। তার অনেক আগেই, সকাল আটটা নাগাদ ওরা আমাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গেল। সেখান থেকে জেলে গেলাম। এগার মাস ধরে বিচারের অপেক্ষায় জেলে থাকতে থাকতে আমি নিজের কথা, নিজের অতীতের কথা ভেবেছি। জীবনের বহু ব্যাপার বুঝতে শিখেছি। হাজত বাসের তৃতীয় দিনে ওরা আমাকে আবার সেখানে নিয়ে গিয়েছিল! সেইদিন থেকেই আমার কাছে অনেক ব্যাপার খুব পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

পঝদনীশেভ অনেক অনেক কথা বলে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড কান্নার বেগ চাপতে না পেরে খানিকক্ষণ চুপ করে গেলেন। তারপর বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমার স্ত্রীকে কফিনের মধ্যে শায়িত অবস্থায় দেখে আমার চৈতন্য হল!'

ভদ্রলোক যেন প্রায় দম আটকে রেখে দ্রুত বলে যেতে লাগলেন—

'আমার স্ত্রীর মরামুখ দেখে আমাকে বুঝতে হল আমি কী বীভৎস কাজ করেছি। মনে হল, ও তো একদিন উত্তপ্ত, জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল ছিল। আমিই ওকে খুন করেছি। আমার জন্যই আমার স্ত্রী এখন একটা ঠাণ্ডা, শক্ত, নিথর মৃতদেহ হয়ে গেছে। যা করেছি, তা আর কিছুতেই বদলানো যাবে না। আমার সেই মুহূর্তের অভিজ্ঞতা যে কী দুঃসহ তা যে নিজে না জানে তাকে বোঝানো যাবে না।" বারবার 'ওঃ ভগবান' বলে চীৎকার করে উঠতে উঠতে ভদ্রলোক এক সময় একেবারে চুপ করে গেলেন।

বহুক্ষণ আমরা পাশাপাশি কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম। কান্নার বেগে পঝ্‌দুনীশেভের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। কোনরকমে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন 'ক্ষমা করবেন।'

তারপর একটা কম্বল চাপা দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। সকাল আটটা নাগাদ ট্রেন থেকে নামার সময় আমি বিদায় নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু ভদ্রলোক ঘুমিয়ে আছেন, নাকি ঘুমের ভান করছেন, বুঝতে পারলাম না। কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি ওঁর হাতটা আল্‌তো করে ছুঁলাম। মুহূর্তে কম্বলটা খুলে গেল। দেখলাম উনি জেগেই আছেন। আমি হাতটা বাড়িয়ে বললাম, 'বিদায়।'

ভদ্রলোক অল্প একটু হাসলেন। হাসিটা এত বিষণ্ণ যে দেখে আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল।

ভদ্রলোক যে শব্দ দুটি উচ্চারণ করে নিজের কথা শেষ করেছিলেন, আবার সেই শব্দ দুটিই উচ্চারণ করে আমাকে বিদায় দিলেন—তাঁর শেষ কথা, 'ক্ষমা করবেন।'

ফাদার সার্জিয়াস্

চারের দশকে সেন্ট পিতার্সবুর্গের লোকেরা একটা ঘটনায় একেবারে তাজ্জব বনে গিয়েছিল। জনৈক সুদর্শন রাজকুমার, যিনি সম্রাটের বর্মধারী অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, যাঁর সম্পর্কে সবাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে তিনি সহকারী জঙ্গীলাটের পদ এবং অন্যান্য নানা সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হবেন, পরের মাসে যাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল সম্রাজ্ঞীর অতি প্রিয় ও অতি রূপসী এক সহচরীর সঙ্গে, তিনি কিনা হঠাৎ চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন। বিয়ে ভেঙে দিয়ে, সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বোনের নামে লেখাপড়া করে দিয়ে সন্ন্যাসী হবার জন্য মঠে চলে গেলেন! কারণটা যারা জানত না, তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, রহস্যময় বলে মনে হল। কিন্তু রাজকুমার কাসাৎস্কির কাছে এই সিদ্ধান্তটা ছিল খুবই স্বাভাবিক —অন্য কোন বিকল্পের কথা তিনি ভাবতেই পারলেন না।

স্তেপান কাসাৎস্কির বাবা ছিলেন সম্রাটের রক্ষীবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল। স্তেপান যখন বারো বছরের ছেলে, তখন তিনি মারা যান। তাঁর মায়ের ইচ্ছা ছিল না যে, ছেলে লেখাপড়া শেখার জন্য বিদেশে যায়। কিন্তু তাঁর স্বামী বলে গিয়েছিলেন যে ছেলেকে যেন ঘরে বসিয়ে না রাখা হয়, তাঁকে যেন সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। অগত্যা স্তেপানের মা তাঁকে সেনাশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে, মেয়ে ভারভারাকে নিয়ে সেন্ট-পিতার্সবুর্গে উঠে এলেন, যাতে ছেলের কাছাকাছি থাকতে পারেন এবং ছুটিছাটার সময় তাকে বাড়িতে এনে রাখতে পারেন।

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং দারুণ অহঙ্কারের জন্য ছেলেটির স্বাতন্ত্র্য অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের চোখে পড়ল। পড়াশুনোয় তিনি একেবারে ক্লাসের সেরা ছাত্র ছিলেন। বিশেষত গণিতে তাঁর একটা বিশেষ ঝোঁক ও স্বাভাবিক দক্ষতা দেখা গেল। তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া এবং অন্যান্য যুদ্ধবিদ্যাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলেন। তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন।

অস্বাভাবিক রকম লম্বা ছিলেন বটে কিন্তু দোহারা গড়ন, হাঁটাচলাও বেশ মানানসই। বদমেজাজী না হলে স্বভাবের দিক থেকেও তিনি আদর্শ সেনাশিক্ষার্থী হতে পারতেন। লাম্পট্য বা পানদোষ ছিল না, খুব সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। দোষের মধ্যে কেবল প্রচণ্ড রাগ। মাঝে মাঝে যখন তাঁর মেজাজ চড়ে যেত তখন তিনি নিজের ওপর সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেলে একেবারে খ্যাপা জন্তুর মত ব্যবহার শুরু করতেন। এক সতীর্থ তাঁর খনিজ দ্রব্য সংগ্রহের বাতিক নিয়ে ঠাট্টা করেছিল বলে তাকে একেবারে জানালা গলিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েছিলেন। আরেকবার একটা সর্বনেশে কাণ্ড করেছিলেন। কাটলেট ভর্তি একটা আস্ত রেকাব ছুঁড়ে মেরেছিলেন এক খানসামার মাথায়। লোকে বলে, মিথ্যে কথা বলা আর অবাধ্যতার জন্য তাকে নাকি খুব মারধোরও করেছিলেন। শিক্ষা-অধিকর্তা খানসামাটিকে বরখাস্ত করে পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা না দিলে কাসাৎস্কিকে অবশ্যই অনেক নীচের পদে নামিয়ে দেওয়া হত।

আঠার বছর বয়সে কাসাৎস্কি অভিজাত রক্ষীবাহিনীর কমিশন পেলেন। শিক্ষার্থী থাকার সময়ই তাঁর ওপর সম্রাট নিকোলাই পাভলোভিচের নেকনজর পড়েছিল। শিক্ষা শেষ হওয়ার পরই সম্রাট কাসাৎস্কিকে তাঁর নিজের রক্ষীবাহিনীতে ভর্তি করে নিলেন। সবাই আশা করেছিল, কিছুদিন পর তিনি সহ-জঙ্গীলাটের পদ পাবেন। তাঁর নিজেরও এই পদটির জন্য প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু তার কারণ এই নয় যে কাসাৎস্কি উচ্চাভিলাষী ছিলেন। প্রধান কারণ এই যে শিক্ষার্থী থাকার সময় থেকেই সম্রাটের প্রতি তাঁর প্রচণ্ড উত্তপ্ত আবেগময় (হ্যাঁ, উত্তপ্ত আবেগময় কথাটাই যথাযথ) ভালবাসা ছিল। সম্রাটের সামরিক পোশাক, দৃপ্ত পদক্ষেপ, দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, তীক্ষ্ণ মুখচোখ, সমরশিক্ষার্থীদের সামনে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের বক্তৃতা, সমস্ত কিছু কাসাৎস্কির মনে যেন প্রায় প্রেমিকের ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলত। প্রেমিকা সম্পর্কেও কাসাৎস্কি পরে একই ধরনের ব্যাকুলতা বোধ করেছিলেন। শুধু তফাত এই যে সম্রাট নিকোলাই পাভলোভিচ্ সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণ ছিল আরও অনেক বেশি তীব্র। এর ফলে তিনি তাঁর আনুগত্য দেখানোর জন্য, ভালোবাসার পাত্রের কাছে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বদা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। নিকোলাই পাভলোভিচ্ তাঁর এই ব্যাকুলতার কথা জানতেন এবং ইচ্ছা করেই তাতে উৎসাহ দিতেন।

তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খেলা করতেন, তাদের নিজের চারপাশে জড়ো করে কখনও ছেলেমানুষদের মত, কখনও বা বয়স্ক বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন, আবার কখনও কখনও রাজকীয় স্বাতন্ত্র্যে গম্ভীর হয়ে থাকতেন। খানসামার সঙ্গে কাসাৎস্কির গোলমাল নিয়ে তিনি কোন মন্তব্য করেন নি। কিন্তু কাসাৎস্কি যখন এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলেন, তখন তিনি তাঁকে খুব নাটকীয়ভাবে বিদায় দিলেন। তারপর কাসাৎস্কি যখন চলে আসছেন, তখন ভুরু কুঁচকে তার সামনে দুটি আঙুল নেড়ে বললেন, 'তুমি জেনে রাখ যে আমি সব জানি। কিন্তু এমন অনেক ব্যাপার আছে, সেগুলি আমি জানতে চাই না। সেগুলি এখানে জমা থাকে।' শেষ কথাটি বলে তিনি নিজের বুকের ওপর হাত রাখলেন।

পরে যখন স্নাতোকোত্তর শিক্ষার্থীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল, তখন তিনি আর ঐ ঘটনার কোন উল্লেখ করেন নি। তাঁদের তিনি বরাবর যা বলতেন, তাই বললেন। বললেন, যখনই কোন অসুবিধা হবে তখনই যেন তারা সোজা তাঁর কাছে চলে আসে। সম্রাট এবং মাতৃভূমিকে নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করাই তাদের কর্তব্য, তিনিই তাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব কথা শুনে শিক্ষার্থীরা যথারীতি খুব অভিভূত হল। কাসাৎস্কি আগের ঘটনার কথা মনে করে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন যে তাঁর প্রিয়তম জারের সেবায় নিজের শেষ শক্তিটুকু পর্যন্ত ব্যয় করবেন।

কাসাৎস্কি কমিশন পাবার পর তাঁর মা এবং বোন মস্কোতে উঠে এসেছিলেন। পরে আবার তাঁরা তাঁদের নিজেদের গ্রামে চলে যান। কাসাৎস্কি তাঁর নিজের সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বোনকে দিয়ে দিলেন। বাকি অর্ধেক দিয়ে কোনরকমে তাঁর ব্যয় নির্বাহ হত। সৈন্যবাহিনীর যে শাখাটিতে তিনি কাজ করতেন, সেখানে মোটামুটি ভদ্র মাইনে পেতেন।

বাইরে থেকে কাসাৎস্কিকে আর পাঁচজন সুদক্ষ উচ্চাভিলাষী সৈন্যাধ্যক্ষের মতই মনে হত। ভিতরে ভিতরে কিন্তু তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। সর্বদাই তিনি নানা দুরূহ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ছেলেবেলা থেকে বরাবর তিনি কঠিন কাজে উৎসাহী ছিলেন। তাঁর নানা বিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই একই প্রবণতা প্রকাশ পেত। তাঁর ইচ্ছা ছিল, জীবনে যা কিছু করবেন, তা এমনই কৃতিত্ব ও গৌরবের সঙ্গে করবেন যে সবাই একেবারে অবাক হয়ে যাবে, তারিফ করতে থাকবে। তাই যখন লেখাপড়ার ব্যাপারটা

এল, তখন তিনি একেবারে বই-এর মধ্যে ডুবে গেলেন। যতক্ষণ না সবাই তাঁর প্রশংসা করল, তাঁকে একেবারে আদর্শ ছাত্র বলে মনে করতে লাগল, ততক্ষণ পড়াশুনোয় একেবারে তন্ময় হয়ে রইলেন। একটা বিষয় পুরোপুরি রপ্ত করা হয়ে গেলেই তিনি আবার আরেকটা বিষয় নিয়ে পড়তেন। তিনি যখন শিক্ষানবীশ ছিলেন তখন ফরাসি ভাষায় কথোপকথনে তাঁর প্রথমে একটু অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু পরে ঐ ভাষাতে তাঁর মাতৃভাষার মতই দক্ষতা জন্মাল। যখন দাবাখেলায় মন গেল, তখন পাকা খেলোয়াড় তৈরী না হওয়া পর্যন্ত তিনি ব্যাপারটা একেবারে কামড়ে ধরে বসে রইলেন।

তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জার এবং মাতৃভূমির সেবা। এ দুটি ছাড়াও তাঁর প্রায় সব সময়ই কিছু না কিছু ছোট-বড় উদ্দেশ্য থাকত। সে উদ্দেশ্যগুলি যত তুচ্ছই হোক না কেন পুরোপুরি সফল না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাতে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন। সেই লক্ষ্যটি সিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কোন একটা নতুন লক্ষ্যের উদয় হত। সব কিছুতে স্বাতন্ত্র্য অর্জনের চেষ্টা এবং একটার পর একটা লক্ষ্যভেদ করা—এতেই ছিল তাঁর জীবনের পরিতৃপ্তি। সেজন্য কমিশন পাওয়ার পরেই তিনি ঠিক করলেন এই বিভাগে চূড়ান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

হলও তাই, খুব অল্পদিনের মধ্যেই লোকে তাঁকে একজন আদর্শ অফিসার বলে প্রশংসা করতে লাগল! কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর একটা গলদ থেকে গিয়েছিল—অসংযত মেজাজ! এই প্রচণ্ড রাগ এখন তাঁর উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার একটা গলদ ধরা পড়তেই তিনি সচেতন হয়ে গেলেন। ঠিক করে ফেললেন এই ত্রুটি দূর করতে হবে। অজস্র বই পড়ে পড়ে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সেই ত্রুটি কাটিয়ে উঠলেন। তারপর একবার তাঁর ইচ্ছে হল যে সমাজে বেশ একটা কেউকেটা হয়ে উঠবেন। সেই উদ্দেশ্যে এমন নিখুঁতভাবে বল্ নাচ শিখলেন সে প্রতিটি বল নাচের আসরে তাঁর ডাক পড়তে লাগল। খুব বাছাবাছা সম্ভ্রান্ত লোকেদের নাচের আসরেও তাঁর নিমন্ত্রণ হত। কিন্তু তাতেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কেননা সব ব্যাপারে একেবারে সেরা জায়গাটি দখল করা তাঁর স্বভাব; উঁচু মহলে তখনও তাঁর খুব বেশি কদর ছিল না। তখনকার দিনে উঁচুমহল বলতে বোঝাত (আমার

ধারণা সব দেশে সব সময়ই তা-ই বোঝায়) চার ধরনের মানুষ : (১) যাঁরা অবস্থাপন্ন এবং রাজ দরবারের সঙ্গে যুক্ত, (২) অবস্থাপন্ন না হলেও যাঁরা জন্ম ও শিক্ষাসূত্রে রাজদরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, (৩) অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁরা রাজ-দরবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন, (৪) যাঁদের অবস্থাও ভাল নয়, বংশমর্যাদাও নেই, অথচ যাঁরা অভিজাত ও সম্পন্ন লোকেদের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে চান। কাসাৎস্কি প্রথম দুটি শ্রেণীতে পড়েন না। কিন্তু শেষোক্ত দুটি শ্রেণীতে বেশ খাপ খেয়ে যান। উঁচু মহলে ওঠার চেষ্টা করার সময় তিনি একটি বিশেষ লক্ষ্যভেদে তৎপর হলেন—ঐ সমাজের এক মহিলার সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য একেবারে উঠে-পড়ে লাগলেন। আশাতীত কম সময়ের মধ্যে তিনি সফলও হলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখলেন যে মহলে তাঁর যাতায়াত সেটা দারুণ কিছু অভিজাত নয়, তার চেয়েও উঁচু মহল আছে এবং সেই সর্বোচ্চ মহলে মাঝেমাঝে তাঁর ঠাঁই হলেও তিনি তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে সকলেই খুব ভদ্র ব্যবহার করত বটে কিন্তু তিনি বুঝতে পারতেন যে অন্য অনেকে এই সমাজেরই লোক, আর তিনি একজন আগন্তুক মাত্র। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই সমাজেরই একজন হয়ে উঠবেন। সেই ইচ্ছাপূরণের দুটি রাস্তা ছিল। একটি হল রাজকীয় সহসৈন্যাধ্যক্ষের পদ লাভ। তাঁর সেই পদপ্রাপ্তির আশা ছিল। আরেকটি হল এই গোষ্ঠীর কাউকে বিয়ে করা। তিনি রাজদরবারের একজন রূপসীকে মনোনীত করলেন। এই মহিলা যে শুধু সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর একজন তাই নয়, অভিজাত মহলে সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রতিপত্তিশালী লোকেদের কাছেও তাঁর বন্ধুত্ব এক দুর্লভ ব্যাপার ছিল। মহিলার নাম কাউন্টেস কোরোৎকোভা। শুধু উচ্চাভিলাষের জন্য কাসাৎস্কি তাঁকে বেছে নেন নি। ভদ্রমহিলার আকর্ষণ-শক্তি ছিল অসাধারণ। কাসাৎস্কি শিগগিরই তাঁর প্রেমে পড়লেন। ভদ্র-মহিলা প্রথমটা একেবারেই নিরুত্তাপ ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ যেন কিরকম ভোজবাজির মত সব কিছু পাল্টে গেল। তিনি খুব কোমল হয়ে উঠলেন, তাঁর মা কাসাৎস্কির সঙ্গে দারুণ অমায়িক ব্যবহার করতে শুরু করলেন। কাসাৎস্কি বিয়ের প্রস্তাব করতে মেয়েটি রাজী হয়ে গেল। এত সহজে চাঁদ হাতে পেয়ে কাসাৎস্কি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মা এবং মেয়ের ব্যবহারে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিকতা ছিল। কিন্তু প্রেমে পড়লে তো লোকে অন্ধ হয়ে যায়। আর কাসাৎস্কি দারুণভাবে প্রেমে

পড়েছিলেন। তাই বুঝতেও পারতেন না যে শহরের সবাই কি নিয়ে এত কানাঘুষো করছে। আসল ব্যাপারটা হল এই যে এক বছর আগে পর্যন্ত তাঁর বাগদত্তা প্রেমিকাটি সম্রাট নিকোলাই পাভলোভিচের রক্ষিতা ছিলেন।

২

বিয়ের দু সপ্তাহ আগে কাসাৎস্কি তাঁর বাগদত্তা বধূর গ্রীষ্মাবাস জারস্কোয়ে সেলোতে গেলেন। তখন মে মাস, বেশ গরম। কিছুক্ষণ বাগানে বেড়ানোর পরে তাঁরা লেবুগাছের ছায়া-ঘেরা একটি বেঞ্চিতে বসলেন। সেদিন কাউন্টেস মেরী সাদা ভারতীয় মসলিন পরেছিলেন। তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন সারল্য ও প্রেমের প্রতিমূর্তি। তিনি মাথা নীচু করে বসেছিলেন, কেবল মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলেন তাঁর পাশের দৈত্যের মত বিরাটদেহী রূপবান পুরুষটির দিকে। কাসাৎস্কি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন অত্যন্ত মৃদুস্বরে মধুরভাবে—যাতে তাঁর কোন কথা বা ভঙ্গী মেরীর স্বর্গীয় সারল্যকে আঘাত না করে, মলিন না করে। কাসাৎস্কি হলেন চারের দশকের সেই ধরনের লোকেদের একজন, যাঁরা নিজেদের ব্যভিচারের কথা অবাধে স্বীকার করতেন, তার মধ্যে কোন দোষ দেখতে পেতেন না, কিন্তু নিজেদের স্ত্রীর কাছে দাবী করতেন আদর্শ সতীত্ব, স্বর্গীয় পবিত্রতা। তাঁরা নিজেদের সমাজের সব নারীর মধ্যেই এই স্বর্গীয় পবিত্রতা আছে ধরে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সসম্ভ্রম ব্যবহার করতেন। এই ধারণা অবশ্য ভ্রান্ত এবং পুরুষদের এ ধরনের যথেচ্ছাচারও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে তাঁদের এই উঁচু ধারণার সঙ্গে আজকালকার ছেলেদের দৃষ্টিভঙ্গির আকাশ-পাতাল তফাত। আজকালকার ছেলেরা ভাবে মেয়ে মাত্রেই পুরুষ সঙ্গীর খোঁজে একেবারে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ধারণা, মহিলা সম্পর্কে আগেকার যুগের লোকেদের ধারণা অনেক বেশি সুস্থ ও মঙ্গলকর ছিল। কেননা মেয়েদের যখন কোন কাল্পনিক মহৎ আদর্শে চিত্রিত করা হয়, তখন তারা নিজেরাও যতটা সম্ভব সেইরকম হওয়ার চেষ্টা করে। কাসাৎস্কি সেই যুগের মানুষ; সাধারণভাবে তাঁরও তখন মেয়েদের সম্পর্কে এই রকম উঁচু ধারণা ছিল। নিজের বাগদত্তা বধূটির সম্পর্কেও কল্পনা ছিল এই রকম। সেদিন তাঁর প্রেমানুভূতি এত নিবিড় ছিল যে সারাক্ষণ

মেয়েটির সঙ্গে থেকেও তাঁর বিন্দুমাত্র পাশবিক প্রবৃত্তি জাগল না, বরং কাছে থেকেও দূরে থাকার অনুভূতি তাঁর কাছে বড় মধুর বলে মনে হল।

কিছুক্ষণ বেঞ্চিতে বসে থাকার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তলওয়ারের ওপর দুটি হাত রেখে একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'জীবন যে কত সুখের হতে পারে তা তোমার কাছে এসে বুঝতে পেরেছি।'

কথাটি বলার পর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সসঙ্কোচে হাসলেন। কারণ লজ্জা না পেয়ে, খুব সহজভাবে 'তুমি' বলে ডাকার মত ঘনিষ্ঠতা তাঁদের তখনও হয় নি। তাছাড়া মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কাসাৎস্কির মনে হল এরকম একজন অপ্সরীকে এত অন্তরঙ্গভাবে সম্ভাষণ করা বড় বেশি স্পর্ধা হয়ে যাচ্ছে।

কাসাৎস্কি বলে চললেন, 'আমি নিজেকে যা ভাবি, তার চেয়ে যে আমি ভাল একথা তোমার দয়াতেই জেনেছি।'

মেরী উত্তর দিলেন, 'আমি তা বহুদিন আগে থেকেই জানি। আর সেইজন্যই তো আপনাকে আমি ভালবেসেছি।'

কাছেই কোথাও যেন নাইটিঙ্গেল গান গাইছিল। একটা দমকা বাতাসে সবুজ পাতার মর্মর ধ্বনি ভেসে এল।

কাসাৎস্কি মেরীর হাতটি ধরে তাতে আলতো করে চুমু খেলেন। তাঁর চোখে জল ভরে এল। মেরী বুঝলেন তিনি কাসাৎস্কির ভালবাসার স্বীকৃতি দিয়েছেন বলেই এই সকৃতজ্ঞ নীরব সম্ভাষণ। কাসাৎস্কি কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন, তারপর ফিরে এসে তাঁর পাশে বসে বললেন 'আমি আপনাকে······মানে তোমাকে······যাকগে ওতে কিছু যায় আসে না······তোমাকে বলতে চাই যে আমি প্রথমে খুব একটা স্বার্থপর কারণে তোমার কাছে আসতে চেয়েছিলাম। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে সমাজের ওপরতলায় উঠতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারপর······তোমাকে জানার পর ওসব খুব তুচ্ছ বলে মনে হল। কথাটা বলে ফেললাম বলে কি তুমি রেগে যাচ্ছ?'

মেরী কোন কথা না বলে তাঁর হাতে হাত রাখলেন।

কাসাৎস্কি বুঝলেন যে প্রেমিকা রাগ করেন নি।

'আর এখন যখন তোমাকে বলতে শুনি'—এই পর্যন্ত বলে কথাটা বড় বেশি বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে ভেবে কাসাৎস্কি থেমে গেলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন।

'মানে, তারপর যখন তোমার ভালবাসা পেলাম তখন, মাপ কর, ঠিক অবিশ্বাস নয়, কিন্তু কোথায় যেন তোমার একটা কি অস্বস্তি আছে। ঠিক কেন বলত ?'

মেরী ভাবলেন, কথাটা হয় এখনই বলে ফেলতে হবে, আর তা নাহলে আর কোনদিনই বলা যাবে না। কাসাৎস্কি তো একদিন না একদিন জানতেই পারবেন। তার চেয়ে এখনই……এখন তিনি নিশ্চয় আর তাকে ছেড়ে যাবেন না। আহ, তিনি যদি সত্যি তাকে ছেড়ে চলে যান, তবে বড় দুঃসহ মনে হবে সেই যন্ত্রণা।

সপ্রেম দুটি চোখ মেলে তিনি একবার কাসাৎস্কির দীর্ঘ, বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারার দিকে তাকালেন। সম্রাটকে তিনি যত ভালবাসতেন, এখন কাসাৎস্কিকে তার চেয়েও বেশি ভালবাসেন। রাজকীয় সম্মানের ব্যাপারটা না থাকলে তিনি কখনই কাসাৎস্কির চেয়ে সম্রাটকে বেশি পছন্দ করতেন না।

মেরী বলতে শুরু করলেন, 'তাহলে শুনুন। আপনার কাছে আমি মিথ্যা বলব না। আমি সব কিছু খুলে বলতে চাই। আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন আমি এত অস্বস্তি বোধ করি! কারণটা হল এই যে এর আগেও আমি একবার ভালবেসেছিলাম।' কথা বলতে বলতে মেরী ভীরু সঙ্কোচে কাসাৎস্কির হাতে হাত রাখলেন—কাসাৎস্কি চুপ করে রইলেন।

'কাকে ভালবাসতাম, সেকথা এখনই আপনাকে বলব। তিনি আমাদের সম্রাট।'

কাসাৎস্কি এবার বলে উঠলেন, সম্রাটকে তো আমরা সবাই ভালবাসি। বোধহয় তুমি যখন স্কুলে পড়তে তখন……।'

'না, না, আমি তখন স্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছি। সে একটা অদ্ভুত মোহ, এখন অবশ্য কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু আপনাকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলতে হবে……।'

'ঠিক আছে, তাতে হয়েছে কি ?'

'এটা নেহাত নিখাদ……' এই পর্যন্ত বলেই মেরী দুহাতে মুখ ঢাকলেন।

'কি বলতে চাও তুমি ? তাঁকে দেহদান করেছিলে ?'

মেরী নিরুত্তর।

'তার মানে তুমি তাঁর উপপত্নী ছিলে ?'

মেরী নিরুত্তর।

কাসাৎস্কি লাফ দিয়ে উঠে মেরীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ মৃতের মুখের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল। ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর নেভ্স্কিতে সম্রাটের সঙ্গে দেখা হলে তিনি কিরকম সস্নেহ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

'হা ভগবান, এ আমি কি করলাম!' বলে মেরী কেঁদে উঠলেন।

'আমাকে ছুঁয়ো না—আমাকে তুমি ছোঁবে না। তুমি জানো না আমাকে তুমি কী ভীষণ আঘাত দিয়েছ', একথা বলতে বলতে কাসাৎস্কি মেরীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। হল-এ মেরীর মার সঙ্গে দেখা হল।

'কী ব্যাপার রাজকুমার...আমি ভেবেছিলাম...' কাসাৎস্কির মুখের দিকে তাকিয়ে মেরীর মা আর কথা শেষ করতে পারলেন না। রাগে কাসাৎস্কির সারা মুখ একেবারে থমথম করছিল।

কাসাৎস্কি চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'আপনি তো সবই জানতেন। ভেবেছিলেন, আমাকে যেমন ইচ্ছে তেমন করে ব্যবহার করবেন। ওঃ, আপনি যদি পুরুষ হতেন তাহলে...'

কাসাৎস্কি তাঁর বিরাট বদ্ধমুষ্টি তুলে ধরেই আবার নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মেরীর প্রাক্তন প্রেমিক অন্য কেউ হলে কাসাৎস্কি তাকে মেরেই ফেলতেন। কিন্তু ইনি যে তাঁর আরাধ্য সম্রাট।

পরের দিন তিনি ছুটির দরখাস্ত করলেন। তার সঙ্গে পদত্যাগপত্রও দাখিল করলেন। লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এড়ানোর জন্য এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি অসুস্থ। কিছুদিন পরে তিনি দেশে চলে গেলেন।

পুরো গরম কালটা সম্পত্তির তদারকি করে কাটালেন। গরমের শেষে সেন্ট পিতার্সবুর্গে ফিরে না গিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য একটি মঠে চলে গেলেন।

তাঁর মা এই চরম পথ থেকে ছেলেকে নিবৃত্ত করার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় করে তাঁকে চিঠি লিখলেন। তার উত্তরে কাসাৎস্কি জানালেন, 'ভগবানের ডাক এলে সব কিছুই তুচ্ছ করতে হয়। তাঁর কাছে আজ সেই ডাক এসেছে। একমাত্র কাসাৎস্কির বোন ভারভারা, যে নাকি তাঁর মতই দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী ছিল, সেই শুধু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাঁর প্রতি

সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল। যে সব দাম্ভিক লোক সমানে তাঁর দাদাকে চেপে রাখতে চাইছিলেন, তাদের ওপর টেক্কা দেবার জন্য যে কাসাৎস্কি সন্ন্যাস নিলেন—এ কথাটা ভারভারা বুঝতে পেরেছিল। ভারভারা ধরেছিল খানিকটা ঠিকই। সন্ন্যাসী হওয়ার পর কাসাৎস্কি অন্য লোকেদের কাছে যেসব ব্যাপার খুব মূল্যবান, সেইসব ব্যাপার সম্পর্কে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে লাগলেন। অথচ কাসাৎস্কি যখন সেনাবিভাগে ছিলেন তখন তাঁর নিজের কাছেও এই সব ব্যাপার খুব মূল্যবান বলে মনে হত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিজেকে তিনি এমন একটা উচ্চমার্গে নিয়ে গেলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে একদা যাদের ঈর্ষা করেছেন, তাঁদের অবজ্ঞার চোখে দেখা যায়। ভারভারা ভেবেছিল এই একটি কারণেই তার দাদা সন্ন্যাস নিয়েছেন। তা অবশ্য সত্যি নয়। তাঁর দম্ভ, সব কিছুর পুরোভাগে থাকার জন্য তাঁর অদম্য আকাঙ্ক্ষা—এসব ছাড়াও তাঁর সন্ন্যাসী হওয়ার মূলে আরেকটি কারণ ছিল, সেটি ভারভারা ধরতে পারেন নি। সেটি হল আন্তরিক ধর্মীয় প্রেরণা। তাঁর বাগদত্তা মেরী, যাঁকে তিনি বরাবর খুব পবিত্র-নিষ্পাপ ভেবে এসেছেন তাঁর সম্পর্কে আশাভঙ্গের পর তিনি প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করে একেবারে হতাশার মধ্যে ডুবে গেলেন। হতাশা তাঁকে নিয়ে গেল সেই ঈশ্বরের কাছে, শৈশব থেকেই যিনি তাঁর নিত্যসঙ্গী, যাঁর প্রভাব তাঁর মনে চিরদিন অম্লান ছিল।

৩

কাসাৎস্কি 'পকরোভ' পার্বণের দিন মঠে প্রবেশ করলেন। এই মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন অভিজাত বংশের সন্তান, সুপণ্ডিত ও সুলেখক। তাছাড়া এই অধ্যক্ষ ছিলেন গুরু ওয়ালেচিয়া থেকে শিষ্য পরম্পরায় মনোনীত। গুরুর প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যে এই শিষ্যরা ছিলেন একেবারে অনন্য। মঠাধ্যক্ষের দীক্ষাগুরু ছিলেন আমব্রেসি, যিনি নিজে ছিলেন মাকারির শিষ্য, মাকারি আবার ছিলেন লিওনিদের শিষ্য, লিওনিদ ছিলেন স্বয়ং চারসি ভেলিচ-কোভস্কির শিষ্য। কাসাৎস্কি মঠাধ্যক্ষকে নিজের দীক্ষাগুরু রূপে বরণ করলেন।

এই মঠে ঢোকার পর কাসাৎস্কি আর পাঁচটা সংসারী লোকের চেয়ে ওপরে ওঠার আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। তাছাড়া এখানে এসে তিনি

একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সুযোগ পেলেন—নতুন এক আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্তরে-বাইরে একেবারে খাঁটি সাধক হয়ে ওঠার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি যখন সেনাবিভাগে ছিলেন তখন যেমন একজন আদর্শ অফিসারের চেয়েও বড় করে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি এখন সন্ন্যাসীরূপেও তিনি নিজেকে আদর্শের প্রতিমূর্তিরূপে গড়তে চাইলেন। কাজে ও কথায় নম্র, ভদ্র, পরিশ্রমী, মিতাচারী এবং পবিত্র হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। আনুগত্যই হয়ে উঠল তাঁর জীবনের ব্রত। এই শেষ গুণটি তাঁর জীবনযাত্রা অনেক সহজ করে তুলল। বহু দর্শনার্থীর ভিড়ে ভর্তি এই মঠের অনেক কর্তব্যই তাঁর কাছে অপ্রিয় মনে হত, অনেক প্রলোভনও আসত। কিন্তু সেগুলি তিনি কাটিয়ে উঠতেন এই আনুগত্যের জোরে। নিজেকে বোঝাতেন, তর্ক নয়, 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। সে কর্তব্য যাই হোক না কেন—মঠে সুরক্ষিত পূত স্মারকগুলির দেখাশোনা করা, কিংবা বেদীতে বসে প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া কিংবা মঠের হিসাবপত্র পরীক্ষা করা, নির্বিচারে তাই করে যাব। গুরুর প্রতি এই রকম আনুগত্যবোধের ফলে ক্রমে সব সন্দেহ, সব দ্বিধা দূর হয়ে গেল। এই আনুগত্যবোধ না থাকলে মঠের দীর্ঘ একঘেয়ে প্রার্থনা-সঙ্গীত, দর্শনপ্রার্থীদের বিরামহীন আসা-যাওয়া এবং সন্ন্যাস জীবনের অন্যান্য অপ্রিয় দিক তাঁর কাছে খুবই পীড়াদায়ক বলে মনে হত। কিন্তু এই আনুগত্যবোধের ফলে তিনি অনুভব করলেন যে এগুলি শান্তভাবে সহ্য করে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, এর মধ্যেই তিনি পরম নির্ভরতা ও সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। 'আমি জানি না কেন একই প্রার্থনা-গান দিনের মধ্যে বহুবার ধরে শুনতে হবে। শুধু জানি যে এর প্রয়োজন আছে এবং প্রয়োজন আছে জেনেই আমি এতে আনন্দ পাই।' তাঁর দীক্ষাগুরু তাঁকে বলেছিলেন, শরীরকে বাঁচানোর জন্য যেমন খাদ্য চাই, আত্মার পুষ্টির জন্যও তেমনি নিয়ত উপাসনা, ভজন-গান ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। তিনি মনেপ্রাণে এই কথা বিশ্বাস করেছিলেন। উপাসনার জন্য ভোরবেলায় উঠতে তাঁর কষ্ট হলেও এই বিশ্বাসের জোরে তিনি তার মধ্যে শান্তি ও আনন্দ পেতেন। এই বিনম্রভাবের মধ্যে, কোন প্রশ্ন না করে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই ছিল তাঁর আনন্দ, তাঁর যা কিছু কর্তব্য ঠিক করে দিতেন গুরু। কাসাৎস্কির মনে হল শুধু এই বিনয় ও বিনতি নয়, যাবতীয় খ্রীস্টীয় সদ্‌গুণাবলী অর্জনের মধ্যেই আছে জীবনের সার্থকতা।

প্রথমটা ভেবেছিলেন, এগুলি বুঝি খুব সহজেই অর্জন করা যায়। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বোনকে দান করে দিয়েছিলেন এবং সেজন্য তাঁর খেদ ছিল না। অধীনস্থ মঠবাসীদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল ব্যবহার তাঁর কাছে শুধু সহজসাধ্য নয়, আনন্দদায়ক বলেও মনে হয়েছিল। দেহের পাপ, অর্থাৎ খাদ্য সম্পর্কে লোভ ও কামনা-বাসনাও তিনি খুব সহজে জয় করেছিলেন। এই দুই পাপ সম্পর্কে তাঁর দীক্ষাগুরু তাঁকে বিশেষভাবে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে কাসাৎস্কির আর কোন ভয় ছিল না। তিনি এসব থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই মুক্তির মধ্যেই ছিল তাঁর আনন্দ।

তাঁর শুধু একটি যন্ত্রণা ছিল—তাঁর বাগদত্তা মেয়েটির স্মৃতি। শুধু স্মৃতি নয়, সন্ন্যাসী না হলে তাঁর নিজের ভবিষ্যত কি রকম হতে পারত সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ছবি ছিল। এই চিন্তা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন না। বারবার মনে পড়ে যেত সম্রাটের আরেক প্রণয়িনীর কথা। পরে সেই মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল অন্য একটি লোকের সঙ্গে। বিয়ের পর তিনি আদর্শ স্ত্রী ও মা হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী পেয়েছিলেন দায়িত্বপূর্ণ পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি আর সেই সঙ্গে সহৃদয় ও অনুতপ্ত স্ত্রী।

মন প্রফুল্ল থাকলে এইসব ভাবনা-চিন্তা কাসাৎস্কিকে বিচলিত করতে পারত না। তখন বরং এসব কথা মনে পড়লে প্রলোভন জয় করতে পেরেছেন বলে তাঁর আনন্দই হত। কিন্তু মাঝেমাঝে সন্ন্যাসজীবনের যাবতীয় ব্যাপার তাঁর কাছে বড় ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে আসত। সেইসব মুহূর্তেও তিনি এই জীবনের মহত্ত্ব সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলতেন না। কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব বোধ করতেন। আর এইসব দুর্বল মুহূর্তে স্মৃতিরা এসে ভিড় করত, কাসাৎস্কি সভয়ে আবিষ্কার করতেন সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য তাঁর আক্ষেপ হচ্ছে।

এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল আনুগত্যবোধ। নিজের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়া, দিনের প্রতিটি ঘন্টার জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া, ইত্যাদি। উপাসনান্তে আপন দীনতায় নত হয়ে তিনি প্রণিপাত করতেন। নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও বহু সময় প্রার্থনা করতেন। কিন্তু অনেক সময় এই প্রার্থনা হত শুধু বাহ্যিক—তার সঙ্গে অন্তরের যোগ থাকত না। এরকম মানসিক অবস্থা একদিন-দুদিন চলত, তারপর আবার কেটে যেত। কিন্তু সেই দুই-একদিন তাঁর কাছে ভয়াবহ মনে হত। মনে

হত অন্য কেউ যেন তাঁর ওপর এসে ভর করেছে। তাঁর নিজের ওপর আর নিজের জোর নেই, এমনকি স্বয়ং ঈশ্বরও তাঁকে সংহত করতে পারবেন না, তিনি যেন সম্পূর্ণ অন্য এক শক্তির বশীভূত। তাঁর দীক্ষাগুরু যে উপদেশ দিয়েছিলেন, কাসাৎস্কি এইসব সময়ে তাই করতেন। সব কাজকর্ম বাদ দিয়ে ধীর স্থিরভাবে বসে থাকতেন, শান্তভাবে অপেক্ষা করে যেতেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে জীবনের এই পর্বে কাসাৎস্কির জীবন নিয়ন্ত্রিত হত তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয়—গুরুর নির্দেশে। এই পরম নির্ভরতা তাঁকে দিয়েছিল আত্মিক প্রশান্তি।

এইভাবে প্রথম মঠে কাসাৎস্কি সাত বছর কাটালেন। তৃতীয় বছরের শেষদিকে তিমি হিয়েরোমোনাকের (যে সন্ন্যাসী পুরোহিতের কাজ করেন) পদ পেলেন, তাঁর দীক্ষিত নাম হল ফাদার সার্জিয়াস্। তাঁর আন্তর জীবনে এ এক বিরাট মুহূর্ত। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বরাবরই তাঁর কাছে পরম সান্ত্বনা ও আত্মিক উন্নতির উৎসস্বরূপ বলে মনে হত, এখন তিনি স্বয়ং পুরোহিত হওয়ায়, এক অপরূপ উত্তেজনায় তাঁর সমস্ত হৃদয় স্পন্দিত হয়ে উঠল। কিন্তু এই আবেগ-উত্তেজনাও ক্রমশঃ জুড়িয়ে আসতে লাগল। একদিন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করার সময় তাঁর কেমন যেন মানসিক অবসাদ এল। বুঝতে পারলেন, পুরোহিত হওয়ার পর প্রথম প্রথম যে প্রচণ্ড আবেগ অনুভব করতেন, কালে তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যাবে। হলও তাই, ধীরে ধীরে সব উত্তাপ জুড়িয় গেল, রইল শুধু অভ্যাস।

মোটের ওপর সন্ন্যাস জীবনের সপ্তম বছরে সার্জিয়াসের সবকিছু একঘেয়ে লাগতে লাগল। মঠে যা কিছু শিক্ষণীয় ছিল, তা তিনি সম্পূর্ণভাবে রপ্ত করে ফেলেছেন। নিজেকে ব্যাপৃত করে রাখার মত আর কিছু সেখানে নেই।

মানসিক অবসাদ ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। মায়ের মৃত্যু সংবাদ, তাঁর বাগদত্তা কাউন্টেস মেরীর বিবাহ—কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারল না। তাঁর জীবনের সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত প্রচেষ্টা সংহত হল আন্তরজীবনে।

পুরোহিত পদলাভের চতুর্থ বছরে বিশপ তাঁর প্রতি খুব সদয় হয়ে উঠে-ছিলেন। তাঁর দীক্ষাগুরু তাঁকে জানালেন যে-কোন উচ্চপদের প্রস্তাব এলে তিনি যেন তা প্রত্যাখ্যান না করেন। উচ্চপদ লাভের জন্য মঠের অন্যান্য

সন্ন্যাসীদের ব্যগ্রতা তাঁর কাছে বরাবর খুব ঘৃণ্য বলে মনে হয়েছে—কিন্তু এখন তাঁর নিজের মনেই উচ্চাভিলাষ জেগে উঠল। রাজধানীর নিকটবর্তী একটি মঠে তাঁকে বেশ একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হল। তিনি নিজে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে দীক্ষাগুরুর আদেশ মেনে নিয়ে পদটি গ্রহণ করলেন। দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতুন মঠের দিকে রওনা হলেন।

রাজধানীর নিকটবর্তী এই মঠে স্থানান্তর সার্জিয়াসের জীবনে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করল। বহু ধরনের প্রলোভন তাঁকে একেবারে ঘিরে ধরল। এই সবের প্রতিরোধ করতে করতে তাঁর প্রায় সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত।

প্রথম মঠে সার্জিয়াসের যৌন কামনা বেশ অবদমিতই ছিল। কিন্তু নতুন মঠে এসে সেই দুরন্ত প্রবৃত্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এমন কি একটি বিশেষ নারীর প্রতি আসক্তির রূপ নিল এই যৌন কামনা। এ মঠে একজন মহিলা সার্জিয়াসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। মহিলা সম্পর্কে বহু দুর্নাম শোনা যেত। তিনি সার্জিয়াসের সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতেন। একদিন তিনি তাঁকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। সার্জিয়াস খুব কঠিনভাবে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের কামনা-বাসনার তীব্রতা দেখে তাঁর ভয় করে উঠল। এত বেশি ভয় পেলেন যে এ সম্পর্কে তাঁর দীক্ষাগুরুর সাহায্য চেয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন। নিজেকে আরও সংযত করে রাখার জন্য সমস্ত অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে, যে ব্রহ্মচারীটি তাঁর দেখাশোনা করতেন, তাঁর কাছে অকপটে নিজের দুর্বলতার কথা খুলে বললেন। অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন সর্বদা সার্জিয়াসকে চোখে চোখে রাখেন, মঠের কাজ ছাড়া অন্য কোন কারণে যেন তাঁকে মঠের বাইরে যেতে না দেন।

সার্জিয়াসের আর একটি প্রলোভন ছিল। সেটি হল এই নতুন মঠের অধ্যক্ষের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। এই অধ্যক্ষ ছিলেন ক্রূর, বৈষয়িক এবং উচ্চাভিলাষী। হাজার চেষ্টা করেও সার্জিয়াস এঁর সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জয় করে উঠতে পারেন নি। মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করে যেতেন বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ থেকে যেত। একদিন এই ক্ষোভ, এই পাপ-অনুভূতি একেবারে অসংযত হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

ঘটনাটা ঘটল নতুন মঠে আসার দ্বিতীয় বছরে। 'পক্ রোভ' পার্বণের সময় একদিন সান্ধ্য-উপাসনা গীত হচ্ছে। অনেক লোক এসেছেন। প্রার্থনা-সঙ্গীত পরিচালনা করছেন মঠাধ্যক্ষ স্বয়ং। ফাদার সার্জিয়াস তাঁর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। অন্তর্দ্বন্দ্বে অস্থির হয়ে ছিলেন বললেই অবশ্য সঠিক বলা হয়। নিজে উপাসনা পরিচালনা না করলে ফাদার সার্জিয়াস বড় গীর্জার এইসব অনুষ্ঠানের বহু সময়ই অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে থাকতেন। অভিজাত ভদ্রমণ্ডলী, বিশেষ করে ভদ্রমহিলাদের উপস্থিতির জন্য বিরক্তি-ই ছিল এই অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কারণ। সার্জিয়াস ঠিক করেছিলেন গীর্জায় যা ঘটছে ঘটুক। তিনি সব কিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করবেন। কোনদিকে নজর দেবেন না। সৈন্যরা সাধারণ লোকদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কিভাবে গণ্যমান্য লোকেদের জন্য পথ করে দিচ্ছে, মহিলারা কিরকম আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে সন্ন্যাসীদের নিয়ে কানাকানি করছেন—কখনও তাঁকে, কখনও বা অন্য একজন সুদর্শন সন্ন্যাসীকে আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করছেন—এসব কিছুই লক্ষ্য করবেন না। স্থির করেছিলেন, কিছুতেই মনকে চঞ্চল হতে দেবেন না। তাঁর দৃষ্টি যেন শুধু খ্রীষ্টমূর্তি, মূর্তির চারপাশের মোমের আলো আর প্রার্থনামগ্ন সন্ন্যাসীদের দিকেই নিবদ্ধ থাকে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাইছিলেন যে শুধু প্রার্থনা গান আর ভাষণ ছাড়া তিনি যেন আর কিছুই না শুনতে পান—বহুবার শোনা এই প্রার্থনা গীতগুলি যে কর্তব্য-বোধে উদ্বুদ্ধ করে, সেগুলি ছাড়া তাঁর যেন আর কোন অনুভূতি না থাকে। এইভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে এবং প্রাণপণে মনঃ সহযোগ করার চেষ্টা করতে করতে ফাদার সার্জিয়াস স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু মাঝে মাঝে প্রয়োজনমত মাথা নত করছিলেন আর বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন মঠের পবিত্র আহারাদির রক্ষক এবং পরি-চালক ফাদার নিকোদিম। এই ব্যক্তিটি সম্পর্কেও সার্জিয়াসের প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা ছিল—মঠাধ্যক্ষ সম্পর্কে তাঁর স্তাবকতা ও গদগদভাব সার্জিয়াসের একেবারে অসহ্য বোধ হত। আভূমি নত হয়ে ফাদার নিকোদিম তাঁকে অধ্যক্ষের বার্তা জানালেন। অধ্যক্ষের অভিপ্রায় ফাদার সার্জিয়াস যেন বেদীতে এসে দাঁড়ান। সার্জিয়াস মাথাটা ঢাকলেন, পোশাকটা একটু ঠিকঠাক করে নিলেন। তারপর অন্য কাউকে যেন বিরক্ত করে না ফেলেন এমনভাবে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন বেদীর দিকে। শুনতে পেলেন দুটি মেয়ে

বলাবলি করছে, 'এই লিজা. ডানদিকে তাকিয়ে দেখ, ঐ যে তিনি যাচ্ছেন।'

'কোথায়, কোথায়? ওমা, কই, তেমন কিছু আহা-মরি দেখতে নয় তো।'

ফাদার সার্জিয়াস বুঝলেন তারা তাঁর বিষয়ে আলোচনা করছে। এই কথাবার্তা শুনে তিনি বারবার মনে মনে আবৃত্তি করতে লাগলেন, 'হে ঈশ্বর, আমাকে প্রলোভন থেকে মুক্ত কর।' দৃষ্টি নত করে, অবনত মস্তকে তিনি পবিত্র গ্রন্থবেদী ছাড়িয়ে, যে-সব সন্ন্যাসী গীর্জার ধর্মসঙ্গীত পরিচালনা করছিলেন, তাদের পাশ কাটিয়ে উত্তর দিকের দরজার কাছে এলেন। সংরক্ষিত পূতস্থানে এসে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন, প্রথাগত আভূমি নত হয়ে প্রণাম করলেন পবিত্র মূর্তিকে। তারপর মাথা তুলতেই, দেখলেন অধ্যক্ষ দেওয়ালের পাশটায় দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পাশে ঝকঝকে পোশাক-পরা আর একজন ব্যক্তি। এদিকে আসার আগেই তিনি আড়চোখে এই দ্বিতীয় লোকটিকে দেখেছিলেন।

অধ্যক্ষের বেঁটে মোটা হাতদুটি ভুঁড়ির ওপর বসানো। তিনি নিজের পোশাকের সোনার জলে-করা কারুকার্যগুলির ওপর আঙুল বোলাচ্ছিলেন, আর হেসে হেসে পাশের লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলেন। সে ভদ্রলোকের পেশাকের সোনালী বেল্ট এবং কাঁধের ফিতের ওপর একবার মাত্র অভিজ্ঞ মিলিটারী চোখ বুলিয়ে নিয়েই সার্জিয়াস বুঝতে পারলেন যে, তিনি একজন স্টাফ্ জেনারেল। মনে পড়ল, তিনি কাসাৎস্কির রেজিমেন্টের কমাণ্ডার ছিলেন। এখন তিনি বেশ কেউকেটা হয়েছেন। ফাদার সার্জিয়াস মুহূর্তে বুঝে গেলেন যে মঠাধ্যক্ষও ব্যাপারটা জানেন। দেখলেন অধ্যক্ষের টেকো মাথাটির নীচে থলথলে লাল মুখটা খুশিতে একেবারে চকচক করে উঠছে। অধ্যক্ষের আচরণে সার্জিয়াস খুব আহত ও ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর আরও রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে শুধুমাত্র জেনারেলের কৌতূহল নিবৃত্তির জনাই অধ্যক্ষ তাঁকে এখানে ডেকে এনেছেন। জেনারেল নাকি বলেছিলেন যে প্রাক্তন সহকর্মীকে তিনি একবার চোখের দেখা দেখতে চান।

'সন্ন্যাসীর বেশে আপনাকে দেখে ভারি আনন্দ হল। আশা করি পুরনো সহকর্মীকে একেবারে ভুলে যান নি' কথাটা বলতে বলতে জেনারেল হাত বাড়িয়ে দিলেন। জেনারেলের কথায় অধ্যক্ষের সাদা দাড়ি-ভরা লাল মুখ স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

জেনারেলের ঝকঝকে চেহারা, পরিতৃপ্ত হাসি, মুখের মদের গন্ধ, দুধারের মোচে চুরুটের গন্ধ—সব মিলিয়ে ফাদার সার্জিয়াসের পক্ষে আত্মদমন করা কঠিন হয়ে উঠল। তিনি অধ্যক্ষকে বললেন, 'প্রভু, আমাকে অনুগ্রহ করে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

কথাগুলো বলে থামতেই সার্জিয়াসের ভঙ্গিতে, তাঁর মুখে আর একটি নীরব প্রশ্ন ফুটে উঠল, 'কেন ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, এই যে, এই জেনারেল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য।'—অধ্যক্ষ উত্তর দিলেন।

রাগে সার্জিয়াসের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। তিনি বলে উঠলেন, 'প্রভু, আমি সংসার ত্যাগ করেছি প্রলোভন জয় করার জন্য। ঈশ্বরের উপাসনাগৃহে, প্রার্থনার সময় কেন আপনি আমাকে প্রলোভনের মধ্যে টেনে আনলেন?'

রাগে মুখটা আরও লাল করে, ভুরু কুঁচকে অধ্যক্ষ বললেন, 'ঠিক আছে, এবার তুমি যেতে পার।'

পরের দিন ফাদার সার্জিয়াস তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য অধ্যক্ষ এবং গুরু-ভাইদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু সারারাত প্রার্থনা করার পর তিনি স্থির করেছিলেন যে, এই মঠ তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। পুরো ব্যাপারটা তাঁর দীক্ষাগুরুকে জানিয়ে, তাঁর আশ্রমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন। পরের ডাকে দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে উত্তর এল। তিনি লিখেছেন—সব কিছু যন্ত্রণার মূলে আছে সার্জিয়াসের দম্ভ। এই ক্ষুব্ধ বিস্ফোরণের আসল কারণ এই যে, সার্জিয়াস গীর্জার সব উঁচুপদ, সব সম্মান ত্যাগ করে বিনীত হয়ে আছেন ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় নয়, তাঁর নিজের অহংবোধকে পরিতৃপ্ত করার জন্য। নিজেকে ঐহিক কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত মুক্ত পুরুষ ভেবে নিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান বলেই তাঁর কাছে অধ্যক্ষের আচরণ অসহ্য লেগেছে। মনে হয়েছে অধ্যক্ষ তাঁকে জেনারেলের সামনে একটা অদ্ভুত জন্তুর মত করে প্রদর্শন করতে চান। দীক্ষাগুরু আরও লিখেছেন, 'সত্যিই যদি ভগবানের জন্য তুমি সব কিছু ত্যাগ করতে পারতে, তাহলে এসব ব্যাপার তোমার কাছে তুচ্ছ মনে হত। পার্থিব দম্ভ এখনও তোমার মন থেকে দূর হয়নি। বৎস, তোমার জন্য আমি অনেক ভেবেছি, অনেক প্রার্থনা করেছি। আমার মনে

হয় তুমি যেমন ছিলে, সেইরকমই থাক, অনুগত হও—এই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি, এর মধ্যে খবর এল, যোগী ইলারিয়ন তাঁর নির্জন সাধন-গুহায় দেহরক্ষা করেছেন। এই সাধনাগুহায় তিনি গত আঠার-বছর ধরে বাস করতেন। ট্যাম্বিনোর অধ্যক্ষ আমাকে অনুরোধ করেছেন যে আমি যেন ওখানে থাকতে ইচ্ছুক একজন ব্রহ্মচারীর সন্ধান করি।

ট্যাম্বিনো মঠের ফাদার পয়সির সঙ্গে দেখা কর। আমি তাঁকে তোমার কথা লিখে দেব। তাঁকে বলো যে তুমি ইলারিয়নের গুহায় থাকতে চাও। তুমি যে ইলারিয়নের স্থান পূর্ণ করতে পারবে, এমন নয়। কিন্তু তোমার অহঙ্কারকে প্রশমিত করার জন্য চাই নির্জনতা। ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমাকে সর্বদা ঘিরে থাকুক—এই কামনা করি।'

সার্জিয়াস দীক্ষাগুরুর কথা মেনে নিলেন। অধ্যক্ষকে ঐ চিঠি দেখালেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে, নিজের জিনিসপত্র সব মঠে ফেলে রেখে টাম্বিনো আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন।

ওখানকার মঠাধ্যক্ষ ছিলেন এক ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান, সুদক্ষ পরিচালক। শান্ত গম্ভীরভাবে তিনি সার্জিয়াসকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁকে ইলারিয়নের গুহায় থাকার অনুমতি দিলেন। প্রথমে তদারকির জন্য একজন ব্রহ্মচারীকে তার সঙ্গে দিয়েছিলেন। পরে সার্জিয়াসের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্জনবাসের ব্যবস্থা করলেন। সেই সাধন-গৃহটি ছিল পাহাড় কেটে তৈরী করা একটি গুহা। ভিতরের একটি অংশে যোগী ইলারিয়নের সমাধি ছিল। বাইরের অংশটিতে ছিল একটি ছোট টেবিল, এক-তাক ভর্তি বই, খ্রীষ্টমূর্তি, কুলুঙ্গি আর মাদুর। গুহার দরজায় তালাচাবি লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। বাইরে আর একটি তাক ছিল। প্রতিদিন একবার করে মঠ থেকে কোন সন্ন্যাসী এসে সেখানে খাবার রেখে যেত।

সেই সাধন-গৃহের অভ্যন্তরে ফাদার সার্জিয়াস তপশ্চর্যায় মন দিলেন।

৪

শ্রোভেটাইডে সার্জিয়াসের নির্জনবাসে ষষ্ঠ বছরে একদল অবস্থাপন্ন নারীপুরুষ পাশের শহরে পিঠে-মদ খাবার জন্য এসে জড়ো হয়েছিলেন। একদিন তাঁরা স্লেজে করে বেড়াতে বেরোলেন। পুরুষদের মধ্যে ছিলেন দুজন আইন-ব্যবসায়ী, একজন জমিদার এবং একজন অফিসার। মহিলাদের

দলে ছিলেন চারজন অফিসার-পত্নী, জমিদার-গৃহিণী, তাঁর অবিবাহিত বোন এবং চতুর্থজন হলেন এক ধনী রূপসী। স্বামীর সঙ্গে এই রূপসীর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। এই ভদ্রমহিলার অদ্ভুত স্বভাব ও বিচিত্র কীর্তিকাহিনী নিয়ে শহরে কানাঘুষোর অন্ত ছিল না। তাঁর ধরন-ধারণে সবাই হাঁ হয়ে যেত। চমৎকার সন্ধ্যা ছিল সেদিন—রাস্তাও বেশ মসৃণ এবং ঝকঝকে। দশ ভার্স্ট (এক ভার্স্ট হল এক মাইলের দুই তৃতীয়াংশ) মত যাবার পর তাঁরা জল্পনা-কল্পনা শুরু করলেন, 'আর এগোব, না ফিরে যাব?'

মাকোভ্কিনা, অর্থাৎ সেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া রূপসীটি. প্রশ্ন করলেন, 'এই রাস্তাটা গেছে কোথায়?'

যে আইন-ব্যবসায়ীটি তাঁকে মজাবার চেষ্টা করছিলেন, তিনি উত্তরে বললেন, 'টাম্বিনোর দিকে। এখান থেকে টাম্বিনো আরও বারো ভার্স্ট।'

'টাম্বিনো থেকে পথটা কোথায় গেছে?'

'মঠ ছাড়িয়ে 'এল্'-এর দিকে।'

'যেখানে ফাদার সার্জিয়াস থাকেন?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কাসাৎস্কি যাঁর নাম? সেই সুপুরুষ সন্ন্যাসী?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'চলুন, তাহলে কাসাৎস্কির ওখানেই যাওয়া যাক। আমরা টাম্বিনোতে নেমে খাওয়া-দাওয়া করতে পারি, বিশ্রামও করতে পারি।'

'কিন্তু ওখানে গেলে আজ রাত্রে ফিরে আসা সম্ভব নয়।'

'তাতে কিছু এসে যায় না। আমরা কাসাৎস্কির ওখানে রাত কাটাব।'

'সেটা হতে পারে। মঠের মধ্যে যে হস্টেলটা আছে সেটা মোটেও খারাপ নয়। মাখিন্ মামলার তদারকির সময় আমি ওখানে ছিলাম।'

'আমি ওখানে থাকছি না। আমি রাত কাটাব কাসাৎস্কির সঙ্গে।'

'আজ্ঞে না, তোমার মত সর্বশক্তিময়ীর পক্ষেও সেটা সম্ভব হবে না।'

'অসম্ভব? বাজি রাখ।'

'ঠিক আছে। তুমি যদি তার সঙ্গে রাত কাটাতে পার, তাহলে যা চাইবে তাই দেব।'

'যা চাইব তাই?'

'হ্যাঁ, যদি তুমি বাজি জিততে পার, তবে যা চাইবে তাই দেব।'

'ঠিক আছে। চল যাওয়া যাক।'

গাড়ির চালকদের তাঁরা মদ দিলেন। নিজেরা ঝুড়ি থেকে বার করলেন পিঠে, মদ আর মিষ্টি। মেয়েরা তাঁদের সাদা ফারের কোট জড়িয়ে নিলেন। কে পথ দেখাবে সেই নিয়ে চালকেরা নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু করল। শেষকালে একজন অল্পবয়স্ক চালক খুব বাহাদুরি দেখিয়ে নিজের আসনে পাশ ফিরে বসে, লম্বা চাবুকটা তুলিয়ে ঘোড়াগুলোকে হাঁক দিল। গলার ঘন্টি ঠুং-ঠুং করতে করতে ঘোড়া ছুটল।

গাড়িতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি আর দোলানি হতে লাগল। ঘোড়াগুলো উৎসাহে জোর কদমে ছুটল......রাস্তাগুলো পিছনে সরে সরে যেতে লাগল। উৎসাহী চালকটি যেন বল্‌গা নিয়ে খেলা করছিল। সামনের সিটে বসে পূর্বোক্ত আইন-ব্যবসায়ী এবং অফিসার ভদ্রলোক মাকোভ্‌কিনা ও তাঁর পাশের লোকটির সঙ্গে অলস বকবকানি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মাকোভ্‌কিনা তাঁর সাদা ক্লোক জড়িয়ে অনড় হয়ে বসে ভাবছিলেন, 'সবসময়ে—সেই একই ব্যাপার। বিরক্তিকর একেবারে। চকচকে লাল মুখগুলোতে শুধু মদ আর তামাকের গন্ধ। সেই একই ধরনের আলাপ, একই চিন্তা, একই নোংরামি। আর এরা সবাই এত পরিতৃপ্ত! ভাবে যে এটাই বুঝি বাঁচার একমাত্র পথ। না মরা পর্যন্ত এরা এই একভাবেই কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আমি পারব না। আমার জঘন্য লাগে। আমার এমন একটা কিছু চাই যা প্রচণ্ডভাবে আমাকে নাড়া দেবে, সবকিছু একেবারে বদলে দেবে। সেই-যে সেবার সারাতোভের লোকেরা বেড়াতে বেরিয়ে বরফে জমে মারা গিয়েছিল, সে ঘটনাটা আমাকে খুব নাড়া দিয়েছিল। আর এই লোকগুলো কি করবে? নিশ্চয়ই খুব ঘৃণ্যভাবে জীবন কাটাবে। তা সে, যে যা করে করুক। কিন্তু আমি......আমিও হয়ত একদিন এই রকম ঘৃণ্য হয়ে উঠব। একটা বাঁচোয়া, আমাকে দেখতে সুন্দর। এরা সকলেই তা জানে। কিন্তু সেই সন্ন্যাসী কি রকম? সত্যিই কি তাঁর নারীদেহ সম্পর্কে সমস্ত আসক্তি চলে গেছে?—না, তা হতেই পারে না। একমাত্র ঐ বস্তুটিই পুরুষরা চায়। গত বছর শরৎকালে সেই সমরশিক্ষার্থী ছেলেটিও তাই চেয়েছিল। ছেলেটি অবশ্য একেবারে হাঁদামত ছিল।'

মাকোভ্‌কিনা চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'ইভান নিকোলয়েভিচ্‌।'

'বান্দা হাজির, শাহাজাদী!'

'তাঁর বয়স কত?'

'কার?'

'কাসাৎস্কির।'

'চল্লিশ পেরিয়েছে মনে হয়।'

'আমি শুনেছি তিনি সব দর্শনপ্রার্থীদের দেখা দেন।'

'সব লোককেই দেখা দেন, তবে সব সময়ে নয়।'

'কম্বলটা পায়ে ভাল করে মুড়ে দিন। ওভাবে নয়—আপনি কিরকম্‌ যেন......হ্যাঁ আরও আঁট করে। ঠিক আছে, আমার পায়ে অত করে চাপ দেবার দরকার নেই।'

অবশেষে তারা সেই গুহা যেখানে অবস্থিত, সেই অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

মাকোভ্‌কিনা স্লেজ থেকে নেমে পড়ে অন্যদের এগিয়ে যেতে বললেন। সবাই তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। ভদ্র-মহিলা তাতে শুধু চটেই উঠলেন। আবার সবাইকে গাড়ি করে এগিয়ে যাবার জন্য পীড়াপাড়ি করতে লাগলেন। অগত্যা তাঁরা চলে গেলেন এবং মাকোভ্‌কিনা সাদা ফার ক্লোক পরে একা পথে চলতে শুরু করলেন। সেই আইন-ব্যবসায়ীটি তাঁর ওপর লক্ষ্য রাখার জন্য গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন।

৫

ফাদার সার্জিয়াসের নির্জনবাসের এটা ষষ্ঠ বছর। এখন তাঁর বয়স উনপঞ্চাশ। তাঁর জীবন বেশ কঠিন। উপবাস আর প্রার্থনার জন্য জীবন কঠিন মনে হত না তাঁর। ওসব বেশ সহজ হয়ে এসেছিল। কিন্তু এমন প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি জীবনে এর আগে আর কোনদিন অনুভব করেন নি। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ ছিল দুই—সন্দেহ আর কামনা। আর দুটো চিন্তাই একসঙ্গে আসত। তিনি তাদের দুটো আলাদা রিপু বলে ভাবতেন, কিন্তু আসলে তারা এক। সেজন্য সন্দেহ দূর হয়ে গেলে, ভোগ-বাসনাও চলে যেত। কিন্তু তাঁর কাছে এই দুই 'মার'-এর অস্তিত্ব ছিল আলাদা এবং সেজন্য তিনি পৃথকভাবে এগুলো প্রতিরোধের চেষ্টা করতেন।

তিনি ভাবতেন, 'হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, কেন অবিশ্বাস আর সন্দেহ দিয়ে তুমি নিজেকে আমার কাছ থেকে আড়াল করে রাখ? কামনা আমি বুঝতে পারি। কামনা সন্ত অ্যান্টনি এবং আরও অনেককে জর্জরিত করেছিল। কিন্তু বিশ্বাস? তাঁরা তো কখনও বিশ্বাস হারান নি। কিন্তু এমন অনেক মুহূর্ত আসে, এমন অনেক প্রহর, এমন অনেক দিন, যখন আমি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। তবে পৃথিবী আছে কেন, কেনই-বা পৃথিবী এত সুন্দর, যদি তা পাপে ভরা হয়, যদি তাকে ত্যাগ করতে হয়? তবে কেন ভগবান এই প্রলোভন সৃষ্টি করেছ?—প্রলোভন? কিন্তু এই-যে আমি সংসারের তাবৎ আনন্দ ত্যাগ করে শুধু মোক্ষলাভের আশায় বসে আছি, এটাও কি একটা প্রলোভন নয়?' এইসব ভাবতে ভাবতে নিজের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণায় তিনি একেবারে শিউরে উঠলেন।

নিজেকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলে উঠলেন, 'পশু, আমি আসলে একটা পশু। অথচ নিজেকে কিনা আমি 'সন্ত' বলে চালাই!'

তিনি প্রার্থনায় বসলেন। প্রার্থনা করতে করতে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল মঠে থাকাকালীন তাঁর নিজের চেহারা, সন্ন্যাসীয় বেশ, নিজের মহিমময় মূর্তি। ছবিটা ভেসে উঠতেই তিনি মাথা নাড়লেন, 'না, সে মূর্তি মিথ্যে, সে সবই কপট। আমি অন্যদের ঠকাতে পারি, কিন্তু নিজেকে ঠকাতে পারি না, ঈশ্বরকে ঠকাতে পারি না। না, আমি মহিমান্বিত নই। আমি অনুকম্পার যোগ্য, হাস্যকর জীব।' তিনি তাঁর পাদ্রীর পোশাকের নীচের অংশ খুলে ছুঁড়ে ফেললেন, সেই অধোবাসের দিকে একবার ঘৃণাভরে তাকালেন। তারপর হাসলেন।

পাদ্রীর পোশাক মাটিতে ফেলে দিয়ে তিনি প্রার্থনা শুরু করলেন। মাটিতে নত হয়ে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন। প্রার্থনার মধ্যে এই পংক্তিটি এল—'তবে কি এই শয্যাই হবে আমার শবাধার?' হঠাৎ যেন কোন শয়তান এসে তাঁর কানে কানে বলল, 'নিঃসঙ্গ শয্যা মানেই তো শবাধার!' সব মিথ্যে, মিথ্যে। যার সঙ্গে একদা তিনি পাপে লিপ্ত হয়েছিলেন, চোখের সামনে সেই বিধবাটির অনাবৃত কাঁধ ভেসে উঠল। এসব কু-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে আবার তিনি প্রার্থনায় মন দিলেন। 'বিধান' পর্ব পাঠ শেষ করে তিনি 'টেস্টামেন্ট' অংশে এলেন, যেখানে সেখানে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। একটি বিশেষ জায়গায় এসে থামলেন, এই অনুচ্ছেদটি তাঁর বহুবার পড়া, একেবারে

মুখস্থ, 'প্রভু আমি বিশ্বাস করি। তুমি আমার অবিশ্বাস দূর কর।' তাঁর মনে যাবতীয় সন্দেহের বালাই ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন। শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে লোকে যেমন সাবধানে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, তেমনি তিনি অতি যত্নে তাঁর দোদুল্যমান বিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পাছে ঘা লেগে সব আবার ওলটপালট হয়ে যায়, এই ভয়ে খুব সাবধান হয়ে রইলেন। আবার তাঁর মনের প্রশান্তি ফিরে এল। শৈশবে যেভাবে প্রার্থনা করতেন, সেইভাবে বললেন, 'প্রভু আমাকে নাও, আমাকে গ্রহণ কর।'

প্রার্থনার পর শুধু যে চিত্তচাঞ্চল্য কেটে গেল, তাই নয়। সমস্ত হৃদয় একেবারে অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। তিনি ক্রুশ চিহ্ন আঁকলেন, তারপর সরু বেঞ্চিটিতে শুয়ে পড়লেন—বিছানা বলতে শুধু একটা ছোট মাদুর, পাদ্রীর গরমকালের পোশাকটা গুটিয়ে বালিশ করা হয়েছে। তিনি ঘুমিয়ে পডলেন। পাতলা ঘুম—ঘুমের মধ্যে তিনি স্লেজগাড়ির ঘন্টার শব্দ শুনলেন। সেটা স্বপ্ন না জাগরণ, তিনি জানেন না। তারপর দরজার কড়া নাড়ার শব্দে তাঁর ঘুম একদম ভেঙে গেল। তিনি উঠে বসলেন, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আবার কড়া নাড়ার শব্দ—হ্যা, তাঁর দরজাতেই। এবং কণ্ঠস্বর একজন নারীর।

'হে ভগবান, এ কি সত্যি?' তিনি সাধুসন্তদের জীবনীতে পড়েছিলেন যে শয়তান অনেক সময় নারীর ছদ্মবেশে আসে। হ্যাঁ, এ নিশ্চয়ই নারীকণ্ঠ। এত মৃদু, এত ভীরু, এত মিষ্টি।

তিনি থুতু ফেলে মনে মনে বললেন, 'শয়তান দূর হোক।' কিন্তু না, এ সবই বোধহয় তাঁর কল্পনা।

তিনি কোণের ছোট টেবিলের কাছে গেলেন—খুব সহজে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসলেন। এই বিশেষ শারীরিক ভঙ্গিটি তাঁর খুব ভাল লাগত। তারপর তিনি মাথাটা নীচু করলেন, চুলগুলো সব মুখের ওপর এসে পড়ল। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে মাদুরে কপাল ঠেকালেন (চুল পাতলা হয়ে যাবার দরুন তাঁর কপাল ক্রমশঃই প্রশস্ত হচ্ছিল)। মেঝেটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা।

বৃদ্ধ ফাদার পিমেন একবার একটি বিশেষ স্তোত্রের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তাতে নাকি চিত্ত-চাঞ্চল্য দূর হয়। ফাদার সার্জিয়াস এখন সেই স্তোত্রটিই পাঠ করছিলেন। শক্ত সবল পায়ের ওপর কৃশ দেহটির ভর

দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার স্তোত্র পাঠে মন দিতে যাবেন—এমন সময়ে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন, সেই কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য। কিন্তু সব কিছু শান্ত। শুধু দরজার বাইরে রেখে দেওয়া পাত্রে ছাদ থেকে বরফ-গলা জল-পড়ার টিপ্ টিপ্ শব্দ। বাইরের বিশ্ব ভিজে ঠাণ্ডা কুয়াশায় আচ্ছন্ন। সব কিছুই শান্ত, একেবারে শান্ত। হঠাৎ সেই সময়ে জানলায় আবার খশ্ খশ্ শব্দ স্পষ্ট, পরিষ্কার কণ্ঠস্বর—সেই মৃদু এবং ভীরু গলার আওয়াজ। এ রকম গলা কোন রূপসীর ছাড়া আর কারও হতে পারে না।

'খ্রীষ্টের দোহাই, আমাকে ভিতরে আসতে দিন' সেই কণ্ঠস্বরে অনুনয়।

তাঁর মনে হল শরীরের সমস্ত রক্ত এসে বুকের ভিতরটায় জমা হয়েছে, মনে হল নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে।

ফাদার সার্জিয়াস প্রার্থনা ক'রে উঠলেন।

'হে প্রভু, তুমি আবির্ভূত হও, শত্রুরা দূর হোক......'

মহিলা বললেন, 'আমি কোন দুষ্ট আত্মা নই।' গলার স্বর থেকেই সার্জিয়াস বুঝতে পারছিলেন, মহিলাটি হাসছেন।

শুনতে পেলেন মহিলা আবার বলছেন, শয়তানের চর-টরও নই, একজন সাধারণ পাপিষ্ঠা মাত্র। পথ হারিয়ে ফেলেছি, মানে আক্ষরিক অর্থে হারিয়েছি, অন্য কোন গভীর অর্থে নয়। শীতে প্রায় জমে গেছি। আপনার কাছে একটু আশ্রয় চাই।'

তিনি শার্সিতে মুখ লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু উল্টো দিকে খ্রীষ্ট-মূর্তির নীচে রাখা মোমবাতির আলো জানালার কাঁচে প্রতিফলিত হওয়ায়, কিছু দেখতে পেলেন না। পরে আঙুল দিয়ে চোখের ওপরটা আড়াল করে আবার উঁকি দিলেন। তুষারাচ্ছন্ন অন্ধকার। একটি গাছ। হ্যাঁ, ঠিক তার ডানদিকে। ঐখানে পুরু সাদা ফারের কোট পরা একটি মেয়ে, মাথায় টুপি। আশ্চর্য মোহিনী রূপ, সরল মুখে ভীত চোখে তাকিয়ে আছে। তাঁর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে—মাঝে এক ইঞ্চি কি দু' ইঞ্চির ব্যবধান। তাঁদের চোখাচোখি হল এবং তাঁরা পরস্পরকে চিনলেন। তার মানে এই নয় যে তাঁরা পূর্ব-পরিচিত, তাঁদের আগে কোনদিন দেখা হয় নি। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি বিনিময় থেকে তাঁরা (বিশেষ ভাবে সার্জিয়াস) পরস্পরকে চিনতে পারলেন, বুঝলেন। এই চাহনির পর প্রেতাত্মার কথা ওঠেই না। না, তিনি একজন নারী—সরল, সহৃদয়, সুন্দর এবং ভীরু!

'আপনি কে? আপনি কী চান?' ফাদার সার্জিয়াস প্রশ্ন করলেন।

সম্রাজ্ঞীর মত আদেশের স্বরে উত্তর এল, 'আহ্, আগে দরজাটা খুলুন তো। আমি প্রায় অর্ধেক জমে গেছি। বললাম-ই তো আমি পথ হারিয়েছি।'

'কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, এটা মঠ।'

সে ঠিক আছে, আপনি দরজা খুলুন। আপনি কি চান যে আমি ঠাণ্ডায় জ'মে মারা যাই, আর আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করে যান?'

'কিন্তু······আমি ঠিক কি করে—?'

'কি বিপদ, আমি তো আর আপনাকে খেয়ে ফেলব না। ভগবানের দোহাই, ভিতরে আসতে দিন। ঠাণ্ডায় জমে গেছি।'

এবার মহিলার ভয় পাবার পালা। তাঁর স্বরা গলায় কান্নার আভাস ছিল।

ফাদার সার্জিয়াস জানালার কাছ থেকে সরে এলেন। কাঁটার মুকুট পরা যিশুর মূর্তির দিকে তাকালেন। ক্রুশচিহ্ন এঁকে, অবনত-মস্তকে মৃদুস্বরে বললেন, 'হে প্রভু, আমাকে রক্ষা কর। হে প্রভু, আমাকে রক্ষা কর।' তারপর, দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। অন্ধকারে খিলটা খুঁজতে খুঁজতে বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। মহিলাটি জানালার কাছ থেকে সরে দরজার কাছে এগিয়ে আসছেন। দরজার কাছেই একটা খানা-মত ছিল, বোধহয় তাতেই হঠাৎ পা পড়ে গেল। তিনি 'উঃ' বলে চীৎকার করে উঠলেন। সার্জিয়াসের হাত কাঁপছিল আর খিলটাও ছিল খুব শক্ত। তিনি সেটা খুলতে পারছিলেন না।

'দয়া করে দরজাটা একটু খুলে দিন, কেন আমাকে এ ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখছেন? ভিজে একেবারে জমে গেছি। আপনি শুধু নিজের আত্মা ছাড়া আর কিছুই ভাবেন না. অথচ এদিকে আমি যে জমে গেলাম।'

ফাদার খিল খুলে দরজাটা জোরে টান দিলেন। কিন্তু দরজাটা খোলার সময় জোরে একটা ঠেলা দিতেই মহিলাটির গা'য়ে ধাক্কা লাগল। ফাদার সার্জিয়াস হঠাৎ পুরনো জীবনের বাঁধা গৎ আউড়ে ফেললেন—বললেন, 'মাফ করবেন।'

ভদ্রমহিলা তাঁর মুখে 'মাফ' শব্দটি শুনে হাসলেন। ভাবলেন, 'না, ফাদার তাহলে ততটা দুর্জয় নয়।'

'না, না, মাফ চাওয়ার কোন দরকার নেই।' মহিলা তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'বরং আমারই মাফ চাওয়া উচিত। আমি এরকম নির্লজ্জের মত আপনাকে বিরক্ত করতাম না। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্যই শুধু……'

'আপনি ভিতরে আসুন' বলতে বলতে ফাদার সার্জিয়াস ভদ্রমহিলার জন্য পথ করে দিলেন। বহুদিন ভুলে থাকা সুগন্ধির ঘ্রাণ পেলেন। মহিলা চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। সার্জিয়াস দরজাটি ভেজিয়ে দিলেন, খিল লাগালেন না।

মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'হে প্রভু যীশু. হে ঈশ্বরের পুত্র, আমার মত পাপীকে করুণা কর।'

প্রার্থনা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর ঠোঁট দুটিও নড়ছিল।

সার্জিয়াস বললেন, 'আপনি আরাম করে বসুন।'

ঘরের মাঝখানে ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে—শরীর থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। তিনি সার্জিয়াসের দিকে কৌতূহলভরে তাকিয়ে ছিলেন—চোখে কৌতুকের হাসি।

'মাফ করবেন, আপনার নির্জনতা ভঙ্গ করে ফেললাম। কিন্তু বুঝতেই পারছেন কী দুর্দশায় পড়ে এসেছি। আমরা সব গাড়ি করে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ বাজি ধরলাম ভোরোবিয়োভ্‌কা থেকে সারাটা পথ আমি একা হেঁটেই বাড়ি ফিরব। কিন্তু পথ হারিয়ে ফেললাম। হঠাৎ যদি আপনার এই গুহাটি না পেতাম তাহলে……' এই পর্যন্ত বলেই ভদ্রমহিলা থামলেন। সার্জিয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন, আর বেশিক্ষণ মিথ্যে কথা বলে যেতে পারলেন না। তিনি ঠিক এমনটি আশা করেন নি। সার্জিয়াকে যে রকম সুপুরুষ কল্পনা করেছিলেন, তিনি ঠিক সেরকম নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কোঁকড়ান পাকা চুল, দাড়ি, টিকলো নাক এবং আগুনের ভাঁটার মত উজ্জ্বল কালো চোখ—সব মিলিয়ে তাঁকে বড় অপরূপ মনে হল।

সার্জিয়াস বুঝলেন, ভদ্রমহিলা মিথ্যে কথা বলছেন। সার্জিয়াস তাঁর দিকে তাকালেন, তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন 'এখন আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব। আপনি বিশ্রাম করুন।'

তিনি বাতিদানটা নিয়ে একটা মোম জ্বালালেন, তারপর একটু ঝুঁকে মহিলাকে অভিবাদন করে পিছনের ছোট ঘরে চলে গেলেন। একটু পরেই ভদ্রমহিলা দেওয়ালের আড়াল থেকে ভারি কিছু একটা নাড়াবার শব্দ পেলেন। মনে মনে বললেন, 'আমার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বোধ হয় দরজা আটকে দিচ্ছেন।' তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তিনি তাঁর খশ্‌খশে কোটটা ছুঁড়ে ফেললেন। টুপিটা—তাঁর চুল ও শালের মধ্যে আটকে গিয়েছিল, সেটাকেও খুলে ফেললেন। জানলা দিয়ে তিনি যখন সার্জিয়াসের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আসলে তার মোটেও শীত করেনি। শুধু ঘরে ঢোকার জন্য ও-কথা বলেছিলেন। কিন্তু দরজার কাছে আসবার সময় খানায় পড়ে, তাঁর বাঁ পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। জুতো টুতো সব একেবারে জব্‌জবে। তিনি জুতো খোলার জন্য সার্জিয়াসের বিছানায় বসলেন। একটি সরু বেঞ্চি, কোন চাদর নেই, শুধু একটা মাদুর। তবু সব মিলিয়ে গুহাটি তাঁর কাছে বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হল। ছোট ঘর, তিন চার আরশিন (আটাশ ইঞ্চি থেকে তিরিশ ইঞ্চি) লম্বা হবে—পরিষ্কার ঝকঝক করছে। দেয়ালের পেরেকে একটা পাদ্রীর পোশাক আর ফারের কোট ঝোলানো। ছোট পড়ার টেবিলে কাঁটার মুকুট পরা খ্রীষ্টমূর্তি—সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের মধ্যে প্রদীপের তেল, ঘাস আর মাটি, সব কিছু মিলিয়ে একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ঘরটি তাঁর দিব্যি লাগল—এমন কি ভ্যাপসা গন্ধটিও।

ভিজে পা দুটি, বিশেষত বাঁ পায়ের জন্য বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি তাড়াতাড়ি জুতো মোজা খুলতে শুরু করলেন। খুশিতে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই প্রফুল্লতা কিন্তু বাজিতে জিতে যাবার জন্য নয়। আসলে এই অদ্ভুত আকর্ষণীয় পুরুষটির মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন, বুঝতে পেরে তাঁর দারুণ ভাল লাগছিল। পুরুষটি অবশ্য এখনও ঠিক সাড়া দেননি। কিন্তু তাতে কী?

'ফাদার সার্জিয়াস! ফাদার সার্জিয়াস? তাই তো আপনার নাম, তাই না?'

'আপনি কী চান?' নিচু গলায় উত্তর এল।

'আপনার নির্জনতাভঙ্গের জন্য ক্ষমা করবেন কিন্তু আমার উপায় ছিল না, সত্যি কোন উপায় ছিল না। না হলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তাম, এখনও

পড়তে পারি। আমি ভিজে একেবারে জাব হয়ে গেছি, পা দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা।'

নীচু গলায় আবার উত্তর এল, 'আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।'

'আমার অন্য কোন উপায় থাকলে আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস পেতাম না। আমি শুধু ভোর না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকব।'

তিনি কোন উত্তর দিলেন না—ভদ্রমহিলা শুধু একটা ফিশফিশ শব্দ শুনতে পেলেন—মনে হল তিনি প্রার্থনা করছেন। স্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই এখানে এসে পড়বেন না? কেন-না বুঝতেই পারছেন কাপড়-চোপড় শুকিয়ে নেওয়ার জন্য সেগুলি আমাকে খুলতে হবে।'

সার্জিয়াস কোন উত্তর দিলেন না। শুধু তাঁর প্রার্থনার শব্দ আসতে লাগল।

ভিজে জুতো খুলতে খুলতে মাকোভকিনা ভাবলেন, 'হ্যাঁ, একটা পুরুষের মত পুরুষ বটে। খাঁটি মানুষ।'

অনেক টানাটানি করার পরও জুতোটা কিছুতেই খুলছিল না—দেখে তাঁর মজা লাগল। হেসে উঠলেন—খুব বেশি জোরে নয়, কিন্তু সার্জিয়াস শুনতে পান এরকম জোরে। একটু পরে যখন বুঝলেন যে তাঁর হাসিতে সার্জিয়াসের মনে তিনি ঠিক যে রকমটি চান, সেই রকমই প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তখন তিনি আরও জোরে হেসে উঠলেন। মহিলার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল—তাঁর ফুর্তিতে ভরা অনাবিল হাসি সার্জিয়াসের মনকে সত্যিসত্যিই নাড়া দিল। ভদ্রমহিলা ভাবলেন, 'হ্যাঁ, এই ধরনের মানুষকেই ভালবাসা যায়। ঐ চোখ। আর সরল, সম্ভ্রান্ত, আবেগতপ্ত মুখ—হ্যাঁ, যতই প্রার্থনা করুন, ফাদারের মুখ আবেগতপ্তই।......আমাদের, মেয়েদের বোকা বানানো বড় শক্ত। যখন উনি জানালায় মুখ রেখেছিলেন, আমার সঙ্গে যখন চোখাচোখি হল, তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর চোখের গভীরে আমার অন্য ভালবাসা ছিল, কামনাও ছিল। হ্যাঁ, কামনাও। উনি নিজেও সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন সেই মুহূর্তেই।'

জুতো খোলা শেষ হল। এবার মোজা খুলতে হবে। মোজার ফিতে খোলার জন্য তাঁকে এবার ঘাগরা তুলতে হবে। লজ্জা করতে লাগল, তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'বাইরে আসবেন না কিন্তু।'

কিন্তু ও-ঘর থেকে কোন উত্তর এল না। সেই একটানা প্রার্থনার মৃদু ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল, সঙ্গে চলাফেরার শব্দ।

ভদ্রমহিলা মনে মনে ভাবলেন, 'ফাদার বোধ হয় সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে প্রার্থনা করছেন। 'কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা ভাবছেন, যেমন আমি ভাবছি তাঁর কথা। নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে আমার পায়ের কথা ভাবছেন...' ভিজে মোজা খোলা হয়ে গেলে খালি পা গরম করার জন্য মহিলা পা দুটিকে মাদুরের তলায় রাখলেন। হাঁটু জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ আবিষ্ট হয়ে রইলেন। ভাবলেন, 'এই নির্জন জায়গায়, এই গোপন গুহায় কোন ঘটনা ঘটলে কেউ জানতেও পারবে না।' উঠে দাঁড়িয়ে আগুনের চুল্লির কাছে মোজাগুলো নিয়ে গেলেন। সেগুলো সেখানে গরম পাতের ওপর রাখলেন। এই পাতটা অদ্ভুত ধরনের, তিনি যেরকম দেখতে অভ্যস্ত, সেরকম নয়। মোজাগুলো সেঁকতে দিয়ে তিনি খালি পায়ে মাদুরের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। অন্য ঘরে কোন সাড়াশব্দ নেই। নিজের গলায় ফিতে দিয়ে ঝোলান ছোট্ট ঘড়িটা দেখলেন। দুটো বাজে। তিনটে নাগাদ স্লেজ গাড়ি আসবে। আর মাত্র একঘন্টা আছে।

'এই একঘন্টা কি একা একা কাটাবেন? কোন মানে হয় না। না, না, কিছুতেই নয়।' তিনি এক্ষুনি সার্জিয়াসকে ডাকবেন।

'ফাদার সার্জিয়াস! ফাদার সার্জিয়াস! সেরগেই দিমিত্রিয়েভিচ! রাজকুমার কাসাৎস্কি!'

ও-ঘর থেকে কোন শব্দ নেই।

'আপনি কেন আমার সঙ্গে এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন? দরকার না পড়লে আমি কক্ষনো আপনাকে ডাকতাম না। আমি অসুস্থ—কি হয়েছে বুঝতে পারছি না।' তিনি যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে চীৎকার করে উঠলেন, 'উঃ মাগো'। তারপর বেঞ্চির ওপর নিজের শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন। শুনতে অদ্ভুত লাগবে, কিন্তু তখন তাঁর যেন সত্যিই মনে হল তিনি অসুস্থ—তাঁর সারা শরীরে যন্ত্রণা। আর জ্বর হলে যেমন কাঁপুনি হয়, তেমন কাঁপুনিও হতে লাগল। 'দয়া করে এসে আমাকে সাহায্য করুন। আমি বুঝতে পারছি না, কি হয়েছে।'

ভদ্রমহিলা জামাটা আলগা করলেন। তারপর স্তন দুটি বার করে, দুটি

উন্মুক্ত বাহু ছড়িয়ে দিয়ে আবার চীৎকার করে উঠলেন, 'ওঃ মাগো, মরে গেলাম।'

এই পুরোটা সময়ই সার্জিয়াস পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলেন। সান্ধ্য উপাসনার সব কটি স্তোত্র আবৃত্তি করা হয়ে গেছে, এখন তিনি নিশ্চল-ভাবে দাঁড়িয়ে, চোখ দুটি নামিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন, 'হে প্রভু যীশু, হে ঈশ্বরের সন্তান, আমাকে করুণা কর।'

প্রার্থনা করতে করতেও কিন্তু তিনি সব কিছু শুনেছিলেন—মহিলাটির পোশাক খোলবার সময় রেশমি কাপড়ের খশখশ শব্দ, মাদুরের ওপর খালি পায়ের শব্দ, ভিজে পা ঘষবার সময় হাতের শব্দ। সার্জিয়াস দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, মনে হচ্ছিল যে-কোন সময় আত্মহারা হতে পারেন। সেজন্য অবিরাম প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা হল সেই রূপকথার নায়কের মত—শুধু সামনে দৃষ্টি রেখে চললেই যার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, পিছনে তাকালেই সর্বনাশ। সেই নায়কের মত তিনিও অনুভব করলেন—একই বিপদের সঙ্কেত। মনে হল, তাঁর চতুর্দিকে সর্বনাশ। শুধু একবার তাকালেই সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁর প্রচণ্ড ইচ্ছা হল, মাত্র একটি-বার দেখবেন। আর ঠিক সেই সময়ে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, 'আপনি অ-মানুষ। আমি মরে যাচ্ছি।'

হাঁা, সার্জিয়াস যাবেন তাঁর কাছে, যেমন করে পবিত্র পিতা গিয়েছিলেন—তাঁর এক হাত ছিল ব্যভিচারিণীর মাথার ওপর, অন্য হাত জলন্ত কটাহে। কিন্তু সার্জিয়াসের কাছে তো কোন কটাহ নেই। তিনি ঘরের চারদিকে তাকালেন। ঘরে একটি প্রদীপ ছিল। সেই প্রদীপের জলন্ত শিখায় আঙুল বাড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই অনুভব করলেন না। কিন্তু তারপর হঠাৎ—তাঁর লেগেছিল কিনা অথবা লাগলে কতটা লেগেছিল জানেন না—তিনি বিরক্তিতে মুখ বিকৃতি করলেন, হাত সরিয়ে নিলেন। না, তিনি তত কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না।

'ভগবানের দোহাই, আপনি এসে সাহায্য করুন। ওহ্, আমি মরে যাচ্ছি।'

মুহূর্তে সার্জিয়াসের মনে হল তিনি কি পাপের মধ্যে তলিয়ে যাবেন? না, তা হতে পারে না।

সার্জিয়াস কপাট খুলে বললেন, 'এক্ষুনি আপনার কাছে আসছি।'

তারপর মহিলার দিকে একেবারে না তাকিয়ে দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। এই জায়গায় বসে তিনি জ্বালানি কাঠ কাটতেন। নিচু হয়ে খুঁজতে খুঁজতে কাঠ কাটার পাটাতনটা পেলেন। তারপর দেওয়ালে দাঁড় করানো কুড়ুলটা।

সার্জিয়াস বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি আসছি'। ডানহাতে কুড়ুলটা ধ'রে বাঁহাতের তর্জনীটা রাখলেন পাটাতনের ওপর। তারপর কুড়ুলটা তুলে আঙুলের দ্বিতীয় কড়ার কাছে নিয়ে এলেন। আঙুলের মত পুরু একটা কাঠের খণ্ড কাটতে যতটা সময় লাগবার কথা, তার চেয়েও কম সময়ে আঙুলটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তিনি দেখতে পেলেন সেটা ছিটকে ওপরে উঠে পাটাতনের কানায় লেগে মেঝেতে পড়ল। তখনও পর্যন্ত তিনি কোন ব্যথা অনুভব করেন নি। কিন্তু যখন তিনি করছে না বলে অবাক হচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই জ্বালা করে উঠল—তীব্র অসহ্য যন্ত্রণা। অনুভব ক'রলেন রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি তিনি আলখাল্লার পকেটের মধ্যে কাটা আঙুলটা ঢুকিয়ে দিয়ে সেটাকে একটু চেপে ধরে রাখলেন। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে মহিলার উলটো দিকে দাঁড়িয়ে অবনত দৃষ্টিতে শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন।

'আপনি কী চান?'

ভদ্রমহিলা দেখলেন ফাদারের মুখ ফ্যাকাশে—বাঁ গাল কাঁপছে। হঠাৎ তাঁর ভীষণ লজ্জা হল। তিনি লাফ দিয়ে উঠে নিজের কোটটা দিয়ে শরীরটা জড়ালেন। বললেন, 'আমি মানে···আমার যন্ত্রণা হচ্ছিল······ঠাণ্ডা লেগেছে আমার······আমি······মানে ফাদার সার্জিয়াস··· আমি......'

ফাদার সার্জিয়াস শান্ত উদ্ভাসিত চোখে, প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'বোন আমার, কেন তুমি তোমার অমর আত্মাকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছ? পৃথিবীতে প্রলোভন আসবেই—যার মাধ্যমে প্রলোভন আসে, তাকে ধিক্। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন।'

ভদ্রমহিলা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন মেঝেতে কি চুঁইয়ে পড়ছে। মহিলাটি নিচের দিকে তাকালেন, দেখলেন ফাদারের আলখাল্লার পকেট থেকে রক্ত ঝরছে।

'আপনি হাতে কী করেছেন?'

তাঁর মনে পড়ল, কি একটা শব্দ শুনেছিলেন। আলোটা নিয়ে ছুটে গেলেন দরজার কাছে। দেখলেন, মেঝেতে পড়ে আছে রক্তে রাঙা আঙুল। ফাদারের চেয়েও বেশি বিবর্ণ হয়ে গেল তাঁর মুখ। তিনি কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই সার্জিয়াস পিছনের ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

মহিলা একেবারে দিশাহারা হয়ে বলে উঠলেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন। বলে দিন, কি করলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে?'

'তুমি যাও।'

'আপনার আঙুল বেঁধে দেবার অনুমতি দিন।'

'তুমি যাও।'

মাকোভকিনা খুব দ্রুত, নীরবে পোশাক পরে নিলেন। তারপর গায়ে ক্লোক জড়িয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্লেজ গাড়ির ঘণ্টা বেজে উঠল।

'ফাদার সার্জিযাস, আমাকে ক্ষমা করুন।'

'তুমি যাও। ঈশ্বর মার্জনা করবেন।'

'ফাদাব সার্জিয়াস, আমি আমার জীবনধারা বদলে ফেলব। আমাকে ত্যাগ কববেন না।'

'তুমি যাও।'

'আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে আশীর্বাদ করুন।'

অন্য ঘর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ঈশ্বর, ঈশ্বরপুত্র আর পবিত্র আত্মার দোহাই, তুমি যাও।'

কাঁদতে কাঁদতে মহিলা গুহা ছেড়ে চলে গেলেন। আইন-ব্যবসায়ীটি তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'কপাল খারাপ। বাজিটা হেরে গেলাম। কোথায় বসবেন?'

'যেখানে হয় বসলেই হল।'

মহিলাটি স্লেজে উঠে বসলেন। পথে একটি কথাও বললেন না।

এক বছর বাদে তিনি দীক্ষা নিলেন। মহিলা-আশ্রমে গিয়ে কঠোর সন্ন্যাসজীবন যাপন করতে লাগলেন। তাঁর গুরু হলেন আরসেনি। তিনি মাঝেমাঝে মহিলাটিকে চিঠিপত্র লিখতেন।

৬

ফাদার সার্জিয়াস ঐ আশ্রমে আরও সাত বছর কাটালেন। প্রথম দিকে তাঁকে আশ্রম থেকে দুধ, চিনি, চা, সাদা রুটি, কাপড-চোপড়, আলানি কাঠ ইত্যাদি যা যা দেওয়া হত, তার সমস্তটুকুই ব্যবহার করতেন। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই কঠোর হয়ে উঠল তাঁর জীবন। তিনি ক্রমশঃ সব রকম ভোগবিলাস ত্যাগ করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর আহার্য দাঁড়াল শুধু মোটা কালো রুটি। সপ্তাহে একবার মাত্র তিনি আশ্রম থেকে সেই রুটি গ্রহণ করতেন। বাকি যা কিছু তাঁকে দেওয়া হত, সেগুলি গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতেন।

আশ্রমে দর্শনার্থীদেব সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। এদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এবং প্রার্থনা কবেই তাঁব দিন কেটে যেত। বছরে কেবল দুই কি তিনবার গীর্জায় যাওয়ার জন্যে গুহা ছেড়ে বেরোতেন। তাছাড়া মাঝে মাঝে দরকার হলে জল কিংবা কাঠ সংগ্রহে যেতেন। পাঁচ বছর এরকম জীবন কাটাবার পর মাকোভ্কিনার ঘটনাটি ঘটে। পরবর্তী জীবনে মহিলাটির পরিবর্তন, সন্ন্যাস গ্রহণ কবে তাঁব আশ্রমে চলে যাওয়া—এ সবই জানাজানি হয়ে যাওয়ায় ফাদার সার্জিযাসের খ্যাতি খুব বেড়ে যেতে লাগল। দর্শনার্থীর ভিড়ও দিন দিন বাড়তে লাগল। গুহার কাছে সন্ন্যাসীরা আশ্রম করলেন, একটি গির্জা এবং একটি হস্টেলও তৈরী হলো। এসব ব্যাপারে ফাদার সার্জিয়াসের খ্যাতি অতিরঞ্জিত হয়ে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। দূর দূরান্তর থেকে লোকজন তাঁর কাছে আসতে লাগল। শোনা গেল, তিনি নাকি অসুস্থ লোকেদের ভাল করে দিতে পারেন। সুতরাং বহু পীড়িত লোকও রোগমুক্তির আশায় তাঁর কাছে আসতে লাগল। সন্ন্যাস জীবনের অষ্টম বছরে তিনি সত্যিসত্যি একজনকে ভাল করে দিলেন। একবার একটি বছর চোদ্দর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তার মা এলেন এবং ছেলেটির গায়ে হাত বুলিয়ে দেবার জন্য ফাদার সার্জিয়াসকে অনুরোধ করলেন। এর আগে ফাদার সার্জিয়াস কোনদিন ভাবতেও পারেননি যে তাঁব পীড়িতকে সুস্থ করার ক্ষমতা আছে। তাঁর কাছে এসব ধারণাও তখন পাপ বলে মনে হত। কিন্তু ঐ ছেলেটির মা তাঁকে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে

তাঁর পায়ে পড়লেন। বললেন, 'আপনি তো সবাইকে সাহায্য করেন, তাহলে আমার ছেলের বেলাতেই বা বিমুখ হচ্ছেন কেন?' তিনি বারবার খ্রীষ্টের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করতে লাগলেন। ফাদার সার্জিয়াস যতই বোঝান যে শুধু ভগবানই মানুষকে ভাল করতে পারেন, মহিলাটি ততই তাঁকে কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন। কিন্তু ফাদার সার্জিয়াস কিছুতেই রাজী হলেন না, তাঁর নির্জন গুহায় ফিরে গেলেন। পরের দিন জল আনতে বেরিয়েছেন, (তখন হেমন্তকাল, রাতে ভীষণ ঠাণ্ডা), দেখলেন, বিবর্ণ রুগ্ন চোদ্দ বছরের ছেলেকে নিয়ে মহিলাটি তখনও তাঁর আশায় বসে আছেন। সার্জিয়াসকে দেখেই আবার অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। ফাদার সার্জিয়াসের সেই অন্যায়কারী বিচারকের গল্প মনে পড়ল। মহিলাটির অনুনয় রাখা যে উচিত নয়, সে সম্পর্কে এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এখন আর ততটা নিঃসংশয় হতে পারলেন না। এই অনিশ্চয়তা নিয়ে তিনি প্রার্থনা করতে আরম্ভ করলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না মনঃস্থির কবতে পারলেন, ততক্ষণ প্রার্থনা করে গেলেন। পরে তাঁর মনে হলো, মহিলাটি যা বলেন, তাই করা উচিত। মায়ের বিশ্বাসের জোরেই হয়ত ছেলেটি ভাল হয়ে উঠতে পারে। ভগবানের যদি তাই অভিপ্রেত হয়, তাহলে ফাদার সার্জিয়াস হবেন নিমিত্ত মাত্র।

এরপর ফাদার সার্জিয়াস আরেকবার গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মহিলাটির কথামত ছেলেটির মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করলেন।

মা-ছেলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। এ ঘটনার একমাস বাদে ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠল। দূর-দূরান্তে খবর ছড়িয়ে পড়ল—গুরু সার্জিয়াস (এখন সবাই তাঁকে গুরু বলেই ডাকে) অলৌকিক শক্তির অধিকারী, তিনি রোগ নিরাময় করতে পারেন। তারপর থেকে এমন একটি সপ্তাহও যায়নি, কোন না কোন অসুস্থ লোক রোগমুক্তির আশায় তাঁর কাছে ছুটে না এসেছে। একবার একজনের বেলায় রাজী হলে অন্যদের আর না বলা যায় না। তিনি তাদের সবার মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল হত। ফলে তাঁর খ্যাতি আরও বেড়ে গেল।

এইভাবে ন' বছর মঠে এবং তের বছর গুহায় কাটল। ফাদার সার্জিয়াস এখন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁর দাড়িগোঁফ পেকে গেছে কিন্তু চুল বিশেষ

পাকেনি। আগের চেয়ে অনেক পাতলা হয়ে এসেছে বটে কিন্তু এখনও বেশ কোঁকড়া আর সুন্দর।

৭

কয়েক সপ্তাহ ধরে একটা চিন্তা ফাদার সার্জিয়াসকে একেবারে পেয়ে বসেছিল। এই বর্তমান জীবনধারা মেনে নেওয়া কি তাঁর উচিত হচ্ছে? এই জীবন তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নেননি, আশ্রম-প্রধান এবং অধ্যক্ষের আগ্রহে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে। এ সবের শুরু সেই চোদ্দ বছরের ছেলেটিকে ভাল করে দেবার পর থেকে। তারপর যত দিন, সপ্তাহ, আর মাস কাটতে লাগল, সার্জিয়াস অনুভব করলেন, তাঁর অন্তরজীবন থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন—তার বদলে বাইরের জীবন বড় হয়ে উঠছে। তাঁর মনের ভিতরটা একেবারে ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে।

তিনি বুঝতেন যে, আশ্রমের চাঁদা যোগাড় এবং দর্শনার্থী আকর্ষণ করার জন্য তাঁকে কাজে লাগান হচ্ছে। আশ্রমের কর্তৃপক্ষ তাঁর জীবনধারা এমন-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইতেন, যাতে তাঁর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধে আদায় করা যায়। সেজন্য তাঁকে কোন কায়িক পরিশ্রম করতে দেওয়া হত না। তাঁর যখন যা প্রয়োজন, তাঁকে তাই দেওয়া হত। তাঁর ওপর শুধু একটা দাবী ছিল—দর্শনার্থীদের দেখা দেওয়া এবং তাদের আশীর্বাদ করা তাঁর সুবিধার জন্য দর্শনার্থী আগমনের বিশেষ বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। যে-সব লোক তাঁর কাছে ধর্না দিতে আসত, তাদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা হত। মহিলারা যাতে ভীড়ের মধ্যে তাঁর পা ধরে টানাটানি করে তাঁকে ফেলে না দেয় সেজন্য একটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। এই ঘেরা জায়গাটির মধ্যে থেকে তিনি তাঁদের আশীর্বাদ করতেন। লোকেরা তাঁকে চায় এই কথা বললে, তাঁর তা মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কেননা খ্রীষ্টের প্রেমের বিধান অনুযায়ী, তাঁকে কারও প্রয়োজন হলে তাঁর 'না' বলার অধিকার নেই। দর্শনার্থীদের এড়াতে চাইলে বড় নিষ্ঠুর কাজ হবে। কিন্তু যতই তিনি এই জীবনযাত্রার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে লাগলেন, ততই তাঁর মনে হতে লাগল যে তাঁর অন্তর-জীবন রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে বাহ্যিক জীবনে। তাঁর অন্তরের সঞ্জীবনী ধারাটি শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন তিনি যা কিছু করছেন, সবই মানুষের জন্য, ভগবানের জন্য নয়।

ভাষণদান, আশীর্বাদ বিতরণ, আর্তের জন্য প্রার্থনা, পথভ্রষ্টদের সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া, যে-সব লোককে তিনি নিরাময় করেছেন, তাদের ধন্যবাদ গ্রহণ ইত্যাদি করতে করতে তাঁর নিজের প্রচেষ্টার ফল এবং মানুষের ওপর তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব দেখে তিনি মনে মনে বেশ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। নিজেকে তাঁর একটি অনির্বাণ অগ্নিশিখার মত বলে মনে হত। এই ধারণা যত বদ্ধমূল হতে লাগল, তিনি ততই অনুভব করলেন যে তাঁর অন্তরে ঈশ্বর-দত্ত সত্যের আলোটি স্তিমিত হয়ে আসছে। তাঁর কর্তব্যের কতটা ভগবানের জন্য আর কতটাই-বা মানুষের জন্য?—এই প্রশ্ন তাঁকে অবিরাম যন্ত্রণা দিত। কখনই তিনি নিজের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে পর্যন্ত সাহস পেতেন না। ভিতরে ভিতরে তিনি জানতেন যে ভগবানের নির্ধারিত কাজের বদলে শয়তান আদিষ্ট মানুষের কাজে তিনি ডুবে আছেন। বুঝতে পারতেন যে আগে যেমন নির্জনতা ভঙ্গ তাঁর কাছে অসহ্য বলে মনে হত, এখন তেমনি অসহ্য বলে মনে হয় নির্জনতা। দর্শনার্থীদের ভীড়ে তিনি ক্লান্ত, বিরক্ত বোধ করতেন। তবু মনে মনে আবার খুশিও হতেন। তাঁকে ঘিরে যে স্তুতি ও প্রশংসা হত, তাতে তিনি আনন্দ পেতেন।

একবার ঠিকই করে ফেলেছিলেন যে এই ভিড় আর ভণ্ডামির জগৎ ছেড়ে পালিয়ে যাবেন। এমন কি, কিভাবে পালাবেন তাও স্থির করেছিলেন। শার্ট, ট্রাউজার, টুপি, কোট ইত্যাদি চাষীদের পোশাক জোগাড় করলেন। সবাইকে জানালেন যে দুঃস্থ লোকেদের দান করার জন্য তাঁর ঐ পোশাকগুলি দরকার। পোশাকগুলি তিনি তাঁর গুহাতে রেখে দিলেন। তারপর ঠিক করলেন যে একদিন ছোট করে চুল ছেঁটে, ঐ পোশাকগুলি পরে পালিয়ে যাবেন। প্রথমে রেলগাড়ীতে করে তিনশো ভার্স্টের মত গিয়ে তিনি হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরবেন। এক বুড়ো সৈনিককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন যে তিনি কিভাবে এসেছেন, কোথা থেকে ভিক্ষে পেয়েছেন, রাতে কোথায় ছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সৈনিকটি সব খবর দিলেন এবং কোথায় ভাল ভিক্ষে পাওয়া যায়, তাও বলে দিলেন। ফাদার সার্জয়াস ভেবেছিলেন যে তিনিও ঐ বুড়ো সৈনিকের মত করবেন। একদিন রাত্রে তিনি পালাবেন ঠিক করে চাষীদের পোশাকটা পরলেন। কিন্তু তখনও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কোন্‌টা ভাল—চলে যাওয়া, না থেকে যাওয়া। কিছুক্ষণ খুব

অস্থির হয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। আবার পুরনো জীবনের অভ্যস্ত খাঁচাটার মধ্যে ঢুকে গেলেন—শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। চাষীর পোশাকটি শুধু তাঁর এক সময়ের ভাবনা-চিন্তার স্মারক হয়ে পড়ে রইল। যতই দিন যেতে লাগল, ততই আরও বেশি করে লোকজন তাঁর কাছে আসতে লাগল। আর ক্রমশঃই তাঁর প্রার্থনার সময় এবং আধ্যাত্মিক নির্জনতা কমে এল। মাঝে মাঝে কখনও নিজেকে তাঁর একটা শুকনো পাথরের মত মনে হত—যে পাথরটার ওপর দিয়ে একদিন ঝরণার জল বয়ে যেত। 'আমার মধ্যে একটা ঝরণা ছিল। সেই স্নিগ্ধ ঝরণা থেকে উৎসারিত হত দিব্যজীবনের সঞ্জীবনী ধারা। তারপর একদিন এল সেই নারী—যার নাম এখন মাদার এগনিয়া।' (সেই রাত্রি ও সেই নারীর কথা মনে হলেই প্রচণ্ড আবেগে তাঁর সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠত) 'সে এসেছিল আমাকে প্রলুব্ধ করতে। কিন্তু আমার অন্তরের পবিত্র ধারাটির জল পান করে সে ফিরে চলে গেল। তারপর আবার নতুন করে জলধারা সঞ্চিত হওয়ার আগেই তৃষ্ণার্ত জনতা কাড়াকাড়ি করে তৃষ্ণা মেটাতে চাইছে। আকণ্ঠ পান করে করে তারা ধারাটিকে শুকিয়ে ফেলেছে। এখন পড়ে আছে শুধু কর্দমাক্ত তলানিটুকু।'

আত্মিক জাগরণের মুহূর্তে ফাদার সার্জিয়াসের এইসব কথা মনে হত। কিন্তু অন্যান্য সময়—অধিকাংশ সময়ই—তিনি অনুভব করতেন শুধু ক্লান্তি আর অবসাদজনিত আত্মস্তুতি।

তখন বসন্তকাল। 'প্রিপোলোভেনিয়ে' পার্বণের পূর্বদিন। ফাদার সার্জিয়াস তাঁর গুহার প্রার্থনাগৃহে সান্ধ্য উপাসনা পরিচালনা করছিলেন। সবসুদ্ধ জন কুড়ি লোক উপস্থিত—গুহাতে এর চেয়ে বেশি লোকের জায়গা হয় না। তাঁদের মধ্যে কেউ অভিজাত, কেউ বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক—সকলেই বেশ ধনী। ফাদার সার্জিয়াস সব শ্রেণীর দর্শনার্থীদেরই দেখা দিতেন। কিন্তু মঠের যে সন্ন্যাসীটি তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, তিনি এবং তাঁর সহকারীটি প্রত্যহ তাঁর কাছে বাছাই করে লোক পাঠাতেন। সেদিন বাইরে প্রায় আশি জন পুণ্যার্থী, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মহিলা, দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের একান্ত ইচ্ছা ফাদার সার্জিয়াস একবার দেখা দেন, তাঁদের আশীর্বাদ করেন।

উপাসনা চলছিল। স্তবগান করতে করতে ফাদার সার্জিয়াস যখন তাঁর পূর্বসূরীর সমাধির কাছে এলেন, হঠাৎ তাঁর মাথা ঘুরে গেল। পিছন থেকে একজন বণিক এবং ফাদারের সহকারী পুরোহিতটি তাঁকে ধরে না ফেললে, তিনি পড়েই যেতেন।

মেয়েরা চীৎকার করে উঠল, 'কি হয়েছে ফাদার সার্জিয়াস—আহা-হা বড় ভাল লোক। হে ভগবান রক্ষা কর। আপনি একেবারে কাগজের মত সাদা হয়ে গেছেন যে!'

ফাদার সার্জিয়াস খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন। তখনও তাঁর মুখ বেশ ফ্যাকাশে লাগছিল কিন্তু তিনি ব্যবসায়ী ভদ্রলোক এবং সহকারী পুরোহিতকে সরিয়ে দিয়ে আবার গান শুরু করলেন। সহকারী পুরোহিত, ফাদার সেরাপিয়ন, অন্যান্য পরিচারক ও সোফিয়া ইভানোভনা (মহিলা মঠের কাছেই থাকতেন এবং ফাদার সার্জিয়াসের সেবা তাঁর নিত্যকর্ম ছিল) প্রমুখ সবাই তাঁকে উপাসনা বন্ধ করে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন।

কিন্তু সর্জিয়াস স্মিত হেসে মৃদুস্বরে বললেন, 'না, না, কিছুই হয় নি, উপাসনার ব্যাঘাত করবেন না।'

মনে মনে ভাবলেন, 'এ সব ক্ষেত্রে মহাপুরুষেরা যা করে থাকেন, আমি তাই করছি।' আর ঠিক সেই মুহূর্তে—পিছন থেকে ইভানোভ্‌না এবং বণিকের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'মহাপুরুষ, দেবদূত।' অনুনয়-বিনয়ে কান না দিয়ে ফাদার প্রার্থনা গান গেয়ে চললেন। জনতা আবার সরু পথ দিয়ে ছোট গির্জেতে ফিরে এল। একটু সংক্ষেপ করে নিয়ে ফাদার সার্জিয়াস উপাসনাটা শেষ করলেন।

প্রার্থনা শেষে তিনি উপস্থিত সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বেরিয়ে এসে, গুহার মুখে এল্‌ম্ গাছের ছায়া-ঘেরা বেঞ্চিটিতে বসলেন। খোলা হাওয়ায় বসে তাঁর একটু বিশ্রাম নেবার ইচ্ছা হল। কিন্তু সেখানে বসতে না বসতেই লোকেরা তাঁর চারপাশে ভিড় করে এসে দাঁড়াল—কেউ চাইল আশীর্বাদ, কেউ উপদেশ, কেউ-বা সাহায্য। পুণ্যার্থীদের মধ্যে এমন অনেক মহিলা ছিলেন, যাঁরা গুরুর সন্ধানে সারা জীবন এক তীর্থ থেকে আরেক তীর্থে ঘুরে বেরিয়েছেন, যে-কোন সাধু-সন্ত বা পূতাস্থি দেখলেই, যাঁরা নিয়মমাফিক অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন। ফাদার সার্জিয়াস এ ধরনের লোক খুব ভাল করেই চিনতেন—এদের অধিকাংশ খুব সাধারণ, প্রকৃতপক্ষে

অধার্মিক, এমন কি হৃদয়হীন। পুরুষদের মধ্যে অনেক পদচ্যুত সৈনিক ছিল— যারা যে-কোন কারণেই হোক, সামাজিক জীবনে তাদের স্বাভাবিক জায়গাটা হারিয়ে ফেলেছে। আর ছিল কিছু দরিদ্র বৃদ্ধ যাদের অধিকাংশই মাতাল—পথে যেতে যেতে মঠে মঠে যারা ভিক্ষে করে বেড়ায়। এই তীর্থযাত্রীদের মধ্যে অনেক চাষীও ছিল—এই সব অজ্ঞ পুরুষ মহিলারা আসত তাদের স্বার্থপর পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। রোগ-সারান, ব্যবসায়ে পরামর্শ, মেয়ের বিয়ে অথবা গ্রামে দোকানঘরের ভাড়ার ব্যবস্থা; জমি-কেনা, ঘুমের ঘোরে ছেলেকে চেপে মেরে ফেলার, কিম্বা অবৈধ সন্তানের জন্ম দেবার পাপ থেকে মুক্ত হওয়া—ইত্যাদি তাদের কাম্য। তিনি জানতেন, এরা তাঁকে নতুন কিছু বলবে না, তাঁর মধ্যে কোন ধর্মীয় ভাব জাগাতে পারবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনতা যে তাঁর উপস্থিতি, বাণী এবং আশীর্বাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত, সেটা তাঁর বেশ ভালই লাগত। জনতার উপস্থিতিতে তিনি একই সঙ্গে বিরক্ত বোধ করতেন, আবার আনন্দও পেতেন। সেদিন ফাদার সেবেপিয়ন পুণ্যার্থীদের সরিয়ে দিচ্ছিলেন, বলছিলেন যে ফাদার সার্জিযাস আজ ক্লান্ত। কিন্তু ফাদার বললেন, তিনি তাদের দর্শন দেবেন। এই কথা বলতে বলতে তাঁর মনে পড়ল সুসমাচারের বাণী—'তাদের (শিশুদের) আমার কাছে আসতে দাও।' এই কথা মনে হতেই তিনি আত্মসমর্থনের জোর পেলেন।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বেড়ার কাছে গেলেন। সেখানে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি সবাইকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর এত দুর্বল ছিল যে নিজেরই খারাপ লাগছিল। তাঁর যত ইচ্ছাই থাক, সবাইকে দেখা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। আবার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে এল, তাঁর মাথা ঘুরে গেল, ভর দেবার জন্য বেড়াটাকে আঁকড়ে ধরলেন। আবার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। তাঁর মুখ প্রথমটা ফ্যাকাশে তারপর আবার রক্তাভ হয়ে উঠল।

'তোমাদের কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমি আজকে আর পারছি না।' এই বলে তিনি সবাইকে একসঙ্গে আশীর্বাদ করে বেঞ্চিতে বসে পড়লেন। সেই বণিকটি বেঞ্চিতে বসার সময় তাঁর হাত ধরে সাহায্য করলেন।

জনতা চীৎকার করতে লাগল, 'ফাদার, ফাদার! আমাদের ত্যাগ করবেন না। আপনি ছাড়া আমাদের আর গতি নেই।'

ফাদার সার্জিয়াসকে বেঞ্চিতে বসিয়ে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি এবার পুলিশের দায়িত্ব নিলেন। সোৎসাহে ভীড় পরিষ্কার করতে লাগলেন। ফাদার সার্জিয়াস যেন শুনতে না পান, সেজন্য অবশ্য তিনি খুব নিচু গলায় কথা বলছিলেন। কিন্তু কথাগুলোয় বেশ রাগের ঝাঁঝ ছিল। ঝাঁঝালো গলায় তিনি উপস্থিত লোকেদের বলতে লাগলেন, 'কেটে পড তো সবাই, কেটে পড। ফাদার তো সবাইকে আশীর্বাদ করেছেন। আর কি চাও? ভাগো এখান থেকে। নাহলে আমিই তোমাদের কাটাবার ব্যবস্থা করছি। চল চল। ওহে, ও বাপের সুপুত্তুর, পায়ে কালো ফেট্টি জড়িয়ে রেখেছ— এগোও, এগোও। এই বুড়ি, এগিয়ে চল না? ওদিকে ঠেলছ কেন? তোমাদের তো বলাই হয়েছে আজ আর নয়। কাল চেষ্টা কোর। আজ উনি আর পারছেন না।'

বুড়ি অনুনয় করে বলল, 'একবারটি শুধু তাঁর চাঁদপানা মুখটি দেখব।'

'তা আর দেখবে না? বোস, দেখাচ্ছি তোমায়। এই ওদিকে ঠেলছ কেন?'

ফাদার সার্জিয়াস লক্ষ্য করলেন যে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি বড বেশি রূঢ় ব্যবহার করছেন। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে তার পরিচারককে বললেন লোকজনদের যেন তাড়িয়ে দেওয়া না হয়। ফাদার সার্জিয়াস জানতেন ঐ বণিকটি যেন-তেন প্রকারেণ লোকদের তাড়িয়ে দেবেনই এবং নিজেও একা থাকতে চাইছিলেন বিশ্রাম নেবার জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর কথাটার কী দারুণ প্রতিক্রিয়া হবে কল্পনা করে নিয়ে পরিচারকটিকে দিয়ে ঐ কথা বলে পাঠালেন।

পরিচারকের কথা শুনে বণিকটি বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি এদের তাড়িয়ে দিচ্ছি না, শুধু একটু সহবৎ শেখাচ্ছি। এদের ওপর ছেড়ে দিলে ফাদারকে এরা ক্লান্ত করে করে একেবারে মেরেই ফেলবে। এদের হৃদয় বলে কিছু নেই—নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। এই, বলছি তোমরা এখান থেকে যাও। চলে যাও শিগগির, কাল এসখন।' অবশেষে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের এই উৎসাহের অন্যতম কারণ শৃঙ্খলা আনা, জনতাকে তাড়ানো তাদের ওপর হুকুম খাটানোর ইচ্ছা। কিন্তু প্রধান কারণ হল এই যে তাঁর

নিজের ফাদার সার্জিয়াসের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। ভদ্রলোক বিপত্নীক, একমাত্র মেয়ে রোগে ভুগছে, কিছুতেই বিয়ে দিতে পারছেন না। ফাদার সার্জিয়াস যাতে তাকে সারিয়ে তোলেন সেজন্য চোদ্দ শো ভার্স্ট দূর থেকে মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন। তাকে হস্টেলে রেখে এসে ফাদারের কাছে কথাটা পাড়ার সুযোগ খুঁজছেন। দুবছর ধরে ভুগছে মেয়েটা—অনেক ওষুধ-পথ্যি করেছেন। প্রথমে গিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহরে গুবেরনিয়া ক্লিনিকে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। তারপর সামারা গুবের-নিয়াতে এক চাষার কাছে টোটকা চিকিৎসা করিয়েছিলেন। তাতে কিছুদিন মেয়েটি ভাল ছিল। তারপর গেলেন মস্কোয় এক ডাক্তারের কাছে—কিন্তু তাতে শুধু টাকার শ্রাদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোন উপকার হয়নি। অবশেষে তাঁকে একজন ফাদার সার্জিয়াসের অলৌকিক রোগ নিরাময় ক্ষমতার কথা বলে। তাই তিনি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে সার্জিয়াসের কাছে এসেছেন। লোকজনদের সব তাড়িয়ে দিয়ে এসে তিনি ফাদার সার্জিয়াসের হাঁটুর কাছে বসে পড়লেন। তারপর কোন ভূমিকা না করেই চেঁচিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'সন্ত পিতা, আপনার আশীর্বাদ দিয়ে আমার মেয়েকে রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করুন! আজ্ঞা করুন সেই অনুগ্রহ প্রার্থিনীকে আপনার পূতচরণে হাজির করি।' বলতে বলতে অনুনয়ের ভঙ্গিতে তিনি ফাদার সার্জিয়াসের হাত ধরলেন।

এমন বাঁধা গৎ এর মত করে কথাগুলো আউরে গেলেন যেন মেয়ের রোগ উপশমের জন্য আর অন্য কোন উপায়ে প্রার্থনা জানানো যায় না। এমন বিশ্বাসের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা করলেন যে ফাদার সার্জিয়াসেরও মনে হল, এইরকম আচরণ এবং কথাবার্তা বেশ মানানসই। তা সত্ত্বেও তিনি বণিককে উঠে দাঁড়াতে বললেন এবং তাঁর সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলেন। বণিকটি বললেন, তাঁর মেয়ের বয়স বাইশ—মায়ের মৃত্যুর পর থেকে গত দু'বছর ধরে অসুখে ভুগছে। গোঁ গোঁ আওয়াজ করে এবং থেকে থেকে বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। তিনি চোদ্দ শো ভার্স্ট দূর থেকে মেয়েকে এনেছেন এবং এখন সে হস্টেলে অপেক্ষা করছে ফাদার সার্জিয়াসের জন্য। সে দিনে কোথাও বেরোয় না। দিনের আলোতে তার ভয়। সূর্যাস্তের পর সে বেরোতে পারে।

ফাদার সার্জিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েটি কি খুব দুর্বল?'

'না, ঠিক দুর্বল নয়, এমনিতে দিব্যি মোটাসোটা। কিন্তু ডাক্তাররা বলেন ও বড্ড নার্ভাসটিনিক। ফাদার সাজিয়াস, আপনি বললেই তাকে এই মুহূর্তে এখানে হাজির করতে পারি। গুরুদেব, আমি বাপ, আমার দুশ্চিন্তা দূর করুন, বংশরক্ষা করুন—আপনি আশীর্বাদ করলেই সে ভাল হয়ে যাবে।'

আবার তিনি ফাদারের পায়ে আছড়ে পড়ে তাঁর হাতের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিলেন। ফাদার সার্জিয়াস তাঁকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। কত বিনীতভাবে, কী কঠিন পরিশ্রম করে তিনি নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছেন এই ভেবে সার্জিয়াসের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'ঠিক আছে। আজকে সন্ধ্যেবেলায় এনো। আমি তার জন্য প্রার্থনা করব। কিন্তু এখন আমিই ক্লান্ত। তাঁর চোখের পাতা বুজে এল। কোন মতে বললেন, 'আমি তোমায় খবর দেব।'

বণিকটি বালির ওপর দিয়ে গোড়ালি উঁচু করে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেলেন। কিন্তু তাতে আরও বেশি জোরে জুতোর খশ্ খশ আওয়াজ হতে লাগল। ফাদার সার্জিয়াস একা রইলেন।

ফাদার সার্জিয়াসের প্রতিটি দিনই উপাসনা আর দর্শনার্থীর ভিড়ে পূর্ণ থাকে। কিন্তু আজকের দিনটি বিশেষভাবে কষ্টকর। সকালে একজন গণ্যমান্য লোক এসে তাঁর সঙ্গে অনর্গল বকে গেছেন। তারপর এক মহিলা এলেন তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ছেলেটি তরুণ অধ্যাপক এবং নাস্তিক। কিন্তু মা ভীষণ আস্তিক এবং ফাদার সার্জিয়াসের ভক্ত। তিনি ফাদার সার্জিয়াসকে অনুরোধ করলেন ছেলের সঙ্গে কথা বলার জন্য। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, ছেলেটি কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তর্ক করতে রাজী নয়। যেমনভাবে লোকে দুর্বল প্রতিপক্ষের কথা মেনে নেয়, তেমনভাবে সে ফাদার সার্জিয়াসের সকল কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিল। ফাদার সার্জিয়াস বেশ বুঝতে পারছিলেন যে ছেলেটি তাঁর একটি কথাও বিশ্বাস করছে না, কিন্তু তাহলেও তিনি খুশি হয়েছিলেন, স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন। সেই সব কথা মনে পড়ে গিয়ে এখন তাঁর বড় খারাপ লাগছিল।

'এখন কিছু খাবেন ফাদার?' পরিচারকটি জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, কিছু নিয়ে এস!'

পরিচারকটি গুহার প্রবেশপথের কয়েক হাতের মধ্যে যে নতুন ছোট্ট ঘরটি তৈরী হয়েছে সেখানে চলে গেল। আবার ফাদার সার্জিয়াস একা।

এক সময় ফাদার সার্জিয়াস প্রায় সারাক্ষণ একা থাকতেন, নিজের সব কাজ নিজে করতেন। শুকনো একটু কালো রুটি ছাড়া আর কিছুই খেতেন না। কিন্তু সে সব দিন বহুকাল হল চলে গেছে। বহুদিন হল তাঁকে বোঝানো হয়েছে যে নিজের স্বাস্থ্য অবহেলা করার অধিকার তাঁর আর নেই। তাঁকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হতে লাগল। যদিও তিনি তখনও মিতাহারী ছিলেন, তবু আগের তুলনায় অনেক বেশি খেতেন। তাছাড়া আগে অতৃপ্তি এবং অপরাধবোধের সঙ্গে খেতেন এখন কিন্তু অনেক সময়েই বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করেন। যেমন আজকে। তিনি চায়ের সঙ্গে কিছুটা পরিজ আর তাঁর জন্য আনা সাদা রুটির অর্ধেকটা খেলেন।

পরিচারকটি চলে গেল। ফাদার সার্জিয়াস এলম গাছের নীচে বেঞ্চিটার একা বসে রইলেন।

মে মাসের অপরূপ সন্ধ্যা। বার্চ, এলম, অ্যাস্পেন, বার্ড-চেরি আর ওক্ গাছগুলিতে সবে নতুন পাতা বেরোচ্ছে এলম গাছের পিছনে বার্ড-চেরির ঝোপে ফুটন্ত ফুলের শোভা—এখনও মুকুল ঝরতে শুরু করে নি। নাইটিঙ্গেলেরা গান গাইছিল—কাছে, একটি নদীর ধারে ঝোপের আড়ালে দু'-তিনটি। দূরে নদীর তীর থেকে ভেসে এল গানের কলি—সারাদিনের খাটুনির পর মজুরেরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। অরণ্যের আড়ালে অস্তমান সূর্য গাছের পাতায় পাতায় তার উজ্জ্বল তীর্যক রশ্মি ছড়াল। সূর্য যেদিকে অস্ত যাচ্ছে, বনের সেই দিকটির রঙ ফিকে সবুজ, আর সব জায়গা অন্ধকার। চারদিকে গুবরে পোকাগুলো উড়ে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই আবার মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল।

নৈশ আহারের পর ফাদার সার্জিয়াস মনে মনে প্রার্থনা করলেন, 'হে প্রভু যীশু, ঈশ্বরের সন্তান, করুণা কর।' তিনি একটি স্তোত্রও পাঠ করলেন। স্তোত্র পাঠ করার সময় কাছে কোন ঝোপ থেকে একটা চড়ুই পাখি উড়ে এল—ফুর্তিতে গান গাইতে গাইতে লাফ দিয়ে তাঁর দিকে আসছিল, হঠাৎ কিসে যেন ভয় পেয়ে উড়ে চলে গেল। ফাদার সংসার ত্যাগ বিষয়ে প্রার্থনা করছিলেন, আর ভাবছিলেন, তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করে ফেলে বণিক এবং তাঁর মেয়েটিকে ডেকে পাঠাতে হবে। মেয়েটি তাঁর জীবনে একটু

বৈচিত্র্য, একটু অভিনবত্ব এনে দেবে ভেবে তাঁর বেশ কৌতূহল হচ্ছিল।
তাছাড়া আর একটা কারণেও তাঁর আগ্রহ ছিল। পিতা-পুত্রী দুজনেই
ভেবে নিয়েছিলেন যে তিনি একজন সন্ত ও স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনায় সাড়া
দেন। যারা তাঁকে সন্ত বলত, তিনি তাদের তিরস্কার করতেন, কিন্তু অন্তরে
অন্তরে তিনি বিশ্বাস করতেন যে তাদের কথাই সত্যি। অনেক সময়ে তিনি
অবাক হয়ে ভাবতেন, তিনি, অর্থাৎ অতীতের স্তেপান কাসাৎস্কি কিনা
আজ অলৌকিক শক্তির অধিকারী এক অসাধারণ মহাপুরুষ! তাঁর যে
সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতা আছে, সে বিষয়ে তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ
করতেন না। তাঁর প্রার্থনার গুণে সেই রুগ্ন ছেলেটির ভাল হয়ে যাওয়া থেকে
আরম্ভ করে সেই অন্ধ বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া পর্যন্ত—যে-সব ঘটনা
তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তার পর আর তাঁর নিজেব দৈবী-শক্তিতে বিশ্বাস না
করে উপায় ছিল না—অদ্ভুত মনে হলেও কথাটা সত্যি। আর বণিক-কন্যা
সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কারণ, প্রথমতঃ সে নতুন লোক এবং তাঁর ওপর
মেয়েটির আস্থা আছে। তাছাড়া তাকে ভাল করে দিতে পারলে তাঁর
অলৌকিক ক্ষমতা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। আরও ছড়িয়ে পড়বে তাঁর
খ্যাতি। তিনি মনে মনে ভাবলেন, 'হাজার হাজার ভার্স্ট দূর থেকে লোকে
আমার কাছে আসে। খবরের কাগজে এ বিষয়ে লেখা হয়। মহামান্য
সম্রাটও একথা জানেন। সারা ইউরোপে—নাস্তিক ইউরোপেও এ খবর
পৌঁছে গেছে।' এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আত্ম-শ্লাঘার জন্য
অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে গেল। তিনি আবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
শুরু করলেন, 'হে প্রভু, হে সত্যস্বরূপ, স্বর্গের অধীশ্বর, সান্ত্বনাদাতা, তুমি
এস—আমাদের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হও। আমাদের পাপ থেকে মুক্ত কর,
আমাদের ত্রাণ কর, আমাদের আত্মাকে উজ্জ্বল কর।' তিনি প্রার্থনা করে
চললেন। আর ভাবতে লাগলেন কতবার তিনি এই প্রার্থনা করেছেন এবং
কতবার তা বিফল হয়েছে। অন্যদের জন্য তাঁর প্রার্থনা অলৌকিক ফল
দেয়, কিন্তু নিজেকে তিনি প্রবৃত্তির কবল থেকে মুক্ত করতে পারেন না—তাঁর
সে কামনা ঈশ্বর পূর্ণ করেন না।

তাঁর মনে পড়ল এখানে প্রথম এসে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা
করতেন পবিত্রতা, বিনয় আর প্রেমের জন্য। মনে পড়ল, তখন তাঁর
ধারণা হয়েছিল যে ভগবান হয়তো তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন। মনে পড়ল,

নারী-সংসর্গ থেকে নিজেকে মুক্ত, পবিত্র রাখার জন্য তিনি কি ভাবে আঙুল কেটে ফেলেছিলেন। তিনি হাত তুলে তাঁর কাটা আঙুলের গোড়ায় চুম্বন করলেন। তাঁর মনে হল পাপ কামনার জন্য নিজেকে ঘৃণা করলেও সত্যি সত্যিই সে সময়ে তিনি বিনীত ছিলেন। তখন তাঁর হৃদয়ে প্রেম ছিল —তাঁর মনে পড়ল কী প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে তিনি এক বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, একজন মত্ত সৈনিকের মুখোমুখি হয়েছিলেন, আর হ্যাঁ, সেই মেয়েটির কথাও মনে পড়ল। কিন্তু এখন? নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাউকে তুমি ভালবাস? তুমি কি সোফিয়া ইভানোভনা অথবা ফাদার সেরাপিয়নকে ভালবাস? যারা আজ তোমার কাছে এসেছিল, তাদের তুমি ভালবাস? সেই পণ্ডিত ছেলেটি, যে শুধু তার মানসিক ক্ষমতা ও বিদ্যে জাহির করার জন্য মুখিয়ে ছিল, যাকে তুমি অজস্র উপদেশ দিয়েছিলে, তাকে কি ভালবাস?' জনসাধারণের ভালবাসা তাঁর কাছে প্রিয়, তাতে তাঁর প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাদের ভালবাসার প্রতিদানে দেওয়ার মত ভালবাসা তাঁর আর নেই। তাঁর হৃদয়ে ভালবাসা নিঃশেষিত, তাঁর বিনয় নেই—এমন কি দৈহিক কামনার কলুষিত স্পর্শ থেকেই তিনি মুক্ত নন।'

বণিক-কন্যার বয়স মাত্র বাইশ শুনে ফাদার সার্জিয়াস খুশি হয়ে উঠেছিলেন। মেয়েটি সুশ্রী কিনা জানতে ইচ্ছা হয়েছিল। মেয়েটি দুর্বল কিনা জিজ্ঞাসা করার সময় তিনি আসলে জানতে চাইছিলেন মেয়েটির নারীসুলভ লালিত্য আছে কিনা। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'আমি কি সত্যিই এতদূর নেমে গেছি? 'হে প্রভু, হে আমার ঈশ্বর আমাকে রক্ষা কর, আমাকে উদ্ধার কর।' হাত জোড় করে তিনি প্রার্থনা শুরু করলেন। নাইটিঙ্গেলেরা তখন পুরোদমে গান গাইছে। একটি গুবরে পোকা তাঁর কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করতে করতে ঘাড়ের ওপর বসে পড়ল। সেটাকে সরিয়ে দিতে দিতে তাঁর মনে হল, 'ভগবান কি সত্যিই আছেন? নাকি, আমি বৃথাই একটা বন্ধ দরজায় ঘা দিয়ে যাচ্ছি। দরজাটা তো বাইরে থেকে বন্ধ, চোখ খুললেই তালাটা দেখতে পাওয়া যায়। নাইটিঙ্গেল, গুবরে পোকা, প্রকৃতি—এরা সবই কি সেই বন্ধ দরজা, সেই বাধার প্রতীক নয়?' হঠাৎ মনে হল হয়ত সেই তরুণটির কথাই ঠিক। তিনি সরবে প্রার্থনা শুরু করলেন। যতক্ষণ না মনের স্থৈর্য ও বিশ্বাস ফিরে এল, ততক্ষণ তিনি সমানে প্রার্থনা করে গেলেন।

তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারকটিকে ডেকে বললেন, 'সেই বণিক আর তার মেয়েকে নিয়ে এস।'

বণিকটি মেয়ের হাত ধরে তাকে সার্জিয়াসের কাছে নিয়ে এলেন।

মেয়েটিকে গুহায় পৌঁছে দিয়েই তিনি আবার চলে গেলেন। মেয়েটির চুল হালকা রঙের, গায়ের রঙ খুব ফরসা। হৃষ্টপুষ্ট শরীর, অথচ মুখচোখে কেমন একটা ফ্যাকাশে ভাব। মেয়েটি অতিমাত্রায় লাজুক। মুখের ভাব দেখলে মনে হয় যেন একটি সন্ত্রস্ত শিশু, অথচ শরীরের গড়ন বেশ ভরন্ত যুবতীর মত! ফাদার সার্জিয়াস গুহার প্রবেশপথের বেঞ্চিতে বসেছিলেন। মেয়েটি তাঁর কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে তিনি আশীর্বাদ করলেন। তারপর নিজে যেভাবে মেয়েটির শরীর খুঁটিয়ে দেখলেন, তাতে নিজেই আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। মেয়েটি তাঁকে কামনার যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। তার মুখ দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন মেয়েটি দুর্বল চরিত্র এবং কামুক প্রকৃতির। মেয়েটি ঢোকার পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। মেয়েটি তাঁর অপেক্ষায় টুলের ওপর বসেছিল।

তিনি ঢুকলে সে উঠে দাঁড়াল।

বলল, 'আমি বাড়ি যাব।'

'ভয় পেয়ো না, বল তোমার কি অসুখ?'

'আমার কোন কিছুতেই সুখ নেই।' মেয়েটি বলল।

হঠাৎ তার মুখ স্মিত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ফাদার সার্জিয়াস বললেন, 'তুমি ভাল হয়ে যাবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর।'

হাসতে হাসতে মেয়েটি বলতে লাগল, 'প্রার্থনা ক'রে কি হবে? আমি অনেক প্রার্থনা করেছি, ওতে কিছু হয় না। আপনি প্রার্থনা করুন, আমাকে একবার স্পর্শ করুন! আমি আপনাকে স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন দেখেছ?'

'আমি দেখেছি যে আপনি আমার বুকে হাত রাখছেন।' বলতে বলতে মেয়েটি তাঁর হাত নিয়ে বুকে চেপে ধরল।

'ঠিক এই জায়গায়।'

সার্জিয়াস মেয়েটিকে তাঁর ডান হাতটা ধরতে দিয়েছিলেন।

ফাদার সার্জিয়াসের সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?' বুঝতে পারছিলেন যে তিনি হেরে যাচ্ছেন। অদম্য কামনা তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে।

'মারিয়া। কেন?'

মেয়েটি তাঁর হাত ধরে চুমু খেল। তারপর দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে এল।

ফাদার সার্জিয়াস বলে উঠলেন, 'কি করছ? মারিয়া তুমি সাক্ষাৎ শয়তান।'

'আহা, বেশ তো লাগছে। এতে আর এমন কি দোষ?' বলতে বলতে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই মেয়েটি বিছানায় বসে পড়ল। তাঁকে পাশে টেনে নিল।

ভোরবেলায় তিনি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ভাবতে লাগলেন, 'সত্যিই কি এটা ঘটেছে? এক্ষুনি মেয়েটির বাবা আসছে। মেয়েটি নিশ্চয়ই বলে দেবে। মেয়েটি শয়তান।' তিনি কি করবেন? এখন তিনি কি করবেন? ঐ তো ওখানে সেই কুড়ুলটা আছে—যেটা দিয়ে তিনি একদিন আঙুল কেটে ফেলেছিলেন। তিনি কুড়ুলটা তুলে নিলেন, তারপর গুহার ভিতরে গেলেন।

তাঁর পরিচারকটি ছুটে এসে বলল, 'আপনার জ্বালানি কাঠ দরকার? দিন, আমাকে কুড়ুলটা দিন।'

কুড়ুল রেখে দিয়ে তিনি গুহায় এলেন। গুহার ভিতর মেয়েটি তখনও ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি তার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তারপর পিছনের ঘরে গেলেন। দেওয়ালে টাঙান চাষীর পোশাকটা পরে নিলেন, কাঁচি দিয়ে চুল ছাঁটলেন। তারপর বেরিয়ে এসে নদীর দিকের পথ ধরলেন। চা'র বছর পরে তিনি এপথে আসছেন।

নদীর ধার দিয়ে একটা রাস্তা ছিল। তিনি ঐ রাস্তা ধরে দুপুর পর্যন্ত চললেন। সারা দুপুর একটি যবের ক্ষেতে পড়ে থেকে সন্ধ্যেবেলায় একটি গ্রামের সীমানায় এলেন। কিন্তু গ্রামের ভিতর না ঢুকে নদীর ধারে খাড়া পথ ধরে চললেন।

উষাকাল। সূর্য উঠতে বোধ হয় তখনও আধঘণ্টা বাকি। সব কিছুই

কেমন ধূসর ও বিবর্ণ। পশ্চিম দিক থেকে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা শেষ করতে হবে। ভগবান নেই। কিন্তু কি ভাবে শেষ করবেন? জলে ঝাঁপ দেবেন? কিন্তু তিনি যে সাঁতার জানেন। তিনি ডুববেন না। গলায় দড়ি? হ্যাঁ, তাঁর বেল্টে ফাঁস দিয়ে গাছে ঝুলে পড়বেন। এত সহজে মৃত্যুর হদিশ পেয়ে, মৃত্যুর কাছাকাছি এসে তাঁর ভয়ানক আতঙ্ক হল। তিনি প্রার্থনা করতে চাইলেন—হতাশার মুহূর্তে তিনি বরাবর তাই করতেন। কিন্তু কার কাছে প্রার্থনা করবেন। কেউ নেই। ভগবান নেই। হাতে মাথা রেখে তিনি সেখানেই শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ তাঁর প্রচণ্ড ঘুম পেল। তিনি আর হাতে মাথা রেখে ঘুমোতে পারছিলেন না। হাত সরিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এল তাঁর। কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য। প্রায় তক্ষুণি আবার চট্‌কা ভেঙ্গে গেল, পুরনো স্মৃতি সব ভীড় করে এল। কিম্বা এমনও হতে পারে যে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁর মনে পড়ল, একেবারে ছেলেবেলায়, যখন তিনি প্রায় শিশু, তখন তিনি একবার কিছুদিন তাঁর মায়ের বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। একদিন একটি গাড়ি এসে থামল সেই বাড়ির কাছে। গাড়ি থেকে নামলেন তাঁর মামা নিকোলাই সেরগেইয়েভিচ। বিরাট কালো দাড়ি ছিল মামার। সঙ্গে একটি রোগা ছোট মেয়ে—শান্ত মুখ, লাজুক চোখ। মেয়েটির নাম পাশেঙ্কা। তাকে বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে আসা হল ছেলেদের সঙ্গে খেলা করার জন্য। কিন্তু মেয়েটি একেবারে হাঁদা। শেষে সবাই তাকে নিয়ে রগড় করতে আরম্ভ করল। ছেলেরা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যে পাশেঙ্কা সাঁতার জানে। কিরকম ভাবে সাঁতার কাটতে হয় দেখানোর জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করা হল। সে অমনি মেঝেতে পড়ে সাঁতার কাটা দেখাতে লাগল। এরকম নিরেট বোকামি দেখে সবাই খুব হাসাহাসি শুরু করল। মেয়েটি বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তাকে তখন এমন করুণ দেখাচ্ছিল যে সার্জিয়াসের দারুণ লজ্জা হল। কোনদিন—কোনদিনই আর তিনি সেই শান্ত, নম্র, মুখের অপ্রস্তুত হাসিটি ভুলতে পারেন নি।

তারপর তাঁর আবার পাশেঙ্কার সঙ্গে দেখা হবার স্মৃতি মনে এল। অনেক বছর বাদে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তিনি মঠে ঢোকার ঠিক আগে। তার তখন বিয়ে হয়ে গেছে একজন গ্রামের জোতদারের সঙ্গে।

ভদ্রলোক পাশেঙ্কার সর্বস্ব উড়িয়েছিলেন এবং তাকে মারধোরও করতেন। তার দুই সন্তান ছিল, একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে। ছেলেটি অল্প বয়সে মারা যায়। সার্জিয়াসের মনে পড়ল, তখন তাকে কিরকম অসুখী দেখেছিলেন। পরে মঠে আবার তার সঙ্গে দেখা হয়—তখন সে বিধবা। চিরদিন যেমন ছিল, তখনও সে সেইরকম—ঠিক হাঁদা নয় কিন্তু কেমন যেন নিষ্প্রাণ। সে তার মেয়েকে এবং মেয়ের প্রেমিককে নিয়ে এসেছিল। তাদের অবস্থা খুব খারাপ। পরে তিনি শুনেছিলেন যে তারা ছোট একটা শহরে থাকে, ভীষণ গরীব। হঠাৎ তার কথা কেন ভাবছেন? তিনি অবাক হলেন। কিন্তু তার কথা না ভেবে পারছিলেন না। সে এখন কোথায়? তার এখন কি হাল হয়েছে? সে কি এখনও সেই আগেকার মত দুঃখ-দুর্দশায় আছে, যখন তাকে মেঝেতে শুয়ে পড়ে সাঁতার কাটা দেখাতে হত? আহ্, কিন্তু তার কথা ভাবছেন কেন? তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন, সবকিছু শেষ করবার সময় এসেছে।

মৃত্যুর কথা মনে হতেই আবার তাঁর প্রচণ্ড ভয় হল। আবার তিনি ভবিতব্যকে এড়াবার জন্য পাশেঙ্কার কথা ভাবতে শুরু করলেন।

শুয়ে শুয়ে কখনও আত্মহত্যার কথা, কখনও বা পাশেঙ্কার কথা ভাবতে লাগলেন। মনে হল পাশেঙ্কার স্মৃতি যেন মুক্তির বার্তা নিয়ে এল। শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন যেন একজন দেবদূত এসে বলছেন, 'যাও, পাশেঙ্কার কাছে যাও—তার কাছ থেকে জেনে এস কী তোমার কর্তব্য। জেনে এস কি তোমার পাপ, কিসে তোমার মুক্তি।'

জেগে উঠে মনে হল স্বপ্নে যা দেখেছেন, তা আসলে ঈশ্বরেরই নির্দেশ। তাঁর খুব আনন্দ হল। স্থির করলেন, স্বপ্নে যে আদেশ পেয়েছেন, সেইমত চলবেন। তিনি জানতেন পাশেঙ্কা কোন্ শহরে থাকে। এখান থেকে তিন শো ভার্স্ট দূরে। তিনি সেই শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

৮

বহুদিন হল পাশেঙ্কা আর সেই ছোট্ট পাশেঙ্কা নেই। এখন সে শ্রীমতী প্রাসকোভিয়া মিখাইলোভনা—লোলচর্ম কৃশতনু এক বৃদ্ধা। লোকে তাকে চেনে মাভ্রিকিয়েভ নামে এক হতভাগ্য মাতাল সরকারী কেরানীর শাশুড়ি হিসেবে। তার জামাই আগে সেখানে কাজ করত, সেই ছোট্ট শহরে

মেয়ে-জামাই-এর সঙ্গে সে থাকে। মেয়ে, রুগ্ন স্নায়ুরোগগ্রস্ত জামাই এবং পাঁচপাঁচটি নাতিনাতনির ভরণ-পোষণও করে সে-ই। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মেয়েদের গান শিখিয়ে তার রোজগার হয় ঘণ্টায় পঁচিশ কোপেক। কোনদিন চারটি, কোনদিন বা পাঁচটি পাঠ দিয়ে মাসে ষাট রুবল-এর মত আয় হয়। যতদিন পর্যন্ত জামাই-এর অন্য কোন সুরাহা না হয়, ততদিন এইভাবেই চালাতে হবে। জামাই-এর একটা চাকরির জন্য প্রাসকোভিয়া মিখাইলোভনা আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত যে যেখানে আছে, সবাইকে চিঠি লিখেছিলেন। সার্জিয়াসকেও লিখেছিলেন। কিন্তু চিঠি পৌঁছাবার আগেই সার্জিয়াস মঠ ছেড়ে চলে এসেছেন।

সেদিন শনিবার। প্রাসকোভিয়া মিখাইলোভনা কিশমিশ দিয়ে মিষ্টি রুটি তৈরী করবেন বলে ময়দা মাখছিলেন। বহুদিন আগে বাপের বাড়ির রাঁধুনির কাছ থেকে তিনি এই রান্নাটা শিখেছিলেন। নাতি-নাতনিরা রবিবার দিনটা একটু খাবারদাবার খাবে বলে রুটিগুলো তৈরী করছিলেন।

তাঁর মেয়ে মাশা কোলের ছেলে সামলাতে ব্যস্ত। বড় নাতি-নাতনি দুটি ইস্কুলে। জামাই সারারাত জেগে এখন ঝিমোচ্ছে। প্রাসকোভিয়া মিখাইলোভনা রাতে প্রায় ঘুমোতেই পারেন নি। অনেক রাত অবধি মাশাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করতে হয়েছে। সে তার স্বামীর ওপর ভীষণ ক্ষেপে ছিল।

প্রাসকোভিয়া জানতেন, তাঁর জামাইটি অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির; জীবনযাত্রার পুরো কাঠামোটা পালটে ফেলা দূরে থাক, কথাবার্তার ধরনধারণ পালটানো পর্যন্ত তার পক্ষে অসম্ভব। বৌ-এর তর্জন-গর্জনে যে কোনই লাভ হবে না, তা-ও তাঁর জানা ছিল। সুতরাং তিনি শুধু মনোমালিন্য দূর করার, বকাঝকা বন্ধ করার এবং শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করে যেতেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে এত হৃদয়হীনতা দেখে তাঁর প্রায় শারীরিক যন্ত্রণার মত তীব্র কষ্ট হত। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারতেন যে ঝগড়াঝাঁটি করে কোন লাভ নেই, বরং তাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়। এসব ব্যাপার নিয়ে তিনি যে খুব একটা ভাবনা-চিন্তা করতেন তা নয়। কিন্তু কোন বদ গন্ধ পেলে, বা কর্কশ শব্দ শুনলে বা মারামারি দেখলে যেমন খারাপ লাগে, তেমনি বিদ্বেষ, হিংসে এসব দেখলেও তাঁর খুব খারাপ লাগত।

• রাঁধাবাড়ার কাজ বেশ ভালই করতে পারেন বলে প্রাসকোভিয়া খুব জাঁক করে লুকেরিয়াকে ময়দা মাখতে শেখাচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর ছ-বছরের নাতি মিশা ছুটতে ছুটতে এল—তার পরণে একটা ঢলঢলে জামা, সরু সরু দুটো পা অজস্র তালি-মারা মোজার ভিতর ঢোকানো। তার মুখ দেখে মনে হল, যেন খুব ভয় পেয়েছে। সে এসে বলল, 'ঠাকুমা, বিচ্ছিরি একটা লোক এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

লুকোরিয়া দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে বলল, 'হ্যাঁ, মা ঠাকরোন, কে একজন এসেছে। মনে হয় তীর্থযাত্রী-টাত্রী হবে।

প্রাসকোভিয়া মিখাইলোভনা কনুই থেকে ময়দা ঝেড়ে ফেলে অ্যাপ্রণে হাত মুছলেন। তীর্থযাত্রীটিকে পাঁচ কোপেক ভিক্ষে দেবেন ভেবে রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাবেন, হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর কাছে দশ কোপেকের নীচে আর কোন খুচরো পয়সা নেই। ঠিক করলেন, পয়সার বদলে রুটি দেবেন। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভিক্ষে দিতে কার্পণ্য করছেন ভেবে তাঁর লজ্জা হল। তখন লুকেরিয়াকে বড় একখণ্ড রুটি কাটতে বলে তিনি দশ কোপেকই আনতে চলে গেলেন। তাঁর কিপ্‌টেমির জন্য দ্বিগুণ ভিক্ষে দেবেন, ঠিক করলেন।

তীর্থ-যাত্রীটিকে রুটি আর পয়সা দেবার সময় তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। তীর্থযাত্রীটির চেহারায় এমন একটা দীপ্তি ছিল যে, দান করার জন্য গর্বিত হওয়া দূরে থাক, এত কম দিচ্ছেন বলে প্রাসকোভিয়ার নিজেরই কেমন সঙ্কোচ হতে লাগল।

খ্রীষ্টের নামগান করে ভিক্ষে করতে করতে তিনি তিনশ ভার্স্ট এসেছেন। রোগা, ক্লান্ত, অবসন্ন, পোড়-খাওয়া চেহারা। মাথার চুল ছোটছোট করে ছাঁটা। পরণে চাষীদের টুপি এবং জুতো। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সার্জিয়াস মাথা নীচু করে বিনীতভাবে অভিবাদন করলেন। দীনহীন বেশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে দলে দলে লোক সার্জিয়াসের কাছে ছুটে আসত, তা পুরোপুরি ঢাকা পড়েনি। প্রাসকোভিয়া মিখাইলোভনা কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না। তিরিশ বছর বাদে দেখা, চেনা সম্ভবও নয়। তিনি শুধু বললেন, 'মাপ করবেন, ফাদার, আপনার বোধহয় খিদে পেয়েছে।'

তীর্থযাত্রীটি রুটি এবং পয়সা নিলেন। কিন্তু ভিক্ষে নেওয়ার পরও তিনি চলে না গিয়ে তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে প্রাসকোভিয়া অবাক হয়ে গেলেন।

তীর্থযাত্রী বলে উঠলেন, 'পাশেঙ্কা, আমি তোমার কাছেই এসেছি। আমাকে তাড়িয়ে দিও না।'

দুটি সুন্দর, কালো অশ্রু সজল চোখ প্রাসকোভিয়ার দিকে চেয়ে রইল। সাদা গোঁফের ফাঁকে আগন্তুকের ঠোঁট দুটো কাতরভাবে কাঁপতে লাগল।

প্রাসকোভিয়ার দুটি ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল। নিজের শুষ্ক স্তনের ওপর হাত রেখে, তিনি আগন্তুকের মুখে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

'এ হতেই পারে না। তুমি কি স্তেপান? সার্জিয়াস! ফাদার সার্জিয়াস!'

সার্জিয়াস মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু সার্জিয়াস নয়। ফাদার সার্জিয়াস বলে আর আমাকে ডেকো না। আমি পাপী, দুর্বৃত্ত স্তেপান কাসাৎস্কি। আমাকে বাঁচাও। আমাকে তাড়িয়ে দিও না।'

'কি, বলছ কি? ওমা, তুমি কত বিনয়ী হয়েছ আজকাল। এস, এস, ভেতরে এস।'

প্রাসকোভিয়া তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু সার্জিয়াস হাত ধরলেন না। তাঁর পিছন পিছন বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন।

কিন্তু সার্জিয়াসকে প্রাসকোভিয়া কোথায় ঠাঁই দেবেন? তাঁদের জায়গা যে বড় অল্প। একখানা মাত্র ঘর, খুব ছোট, প্রায় একটা খুপরির মত। সেটা প্রথমে প্রাসকোভিয়ার দখলে ছিল। কিন্তু পরে সেটা মাশাকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন মাশা সেখানে বসে বাচ্চাকে দোল দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে।

রান্নাঘরে একটি বেঞ্চি দেখিয়ে দিয়ে প্রাসকোভিয়া তাঁকে সেখানে একটু বসতে বললেন। সার্জিয়াস সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন, পিঠের বেল্ট আলগা করে কাঁধ থেকে বোঁচকা-বুচকি নামাতে লাগলেন।

প্রাসকোভিয়া বললেন, 'কী আশ্চর্য, তুমি কত নম্র হয়ে গেছ। তোমার এত খ্যাতি, এত গৌরব, সব ছেড়ে হঠাৎ……।'

সার্জিয়াস কোন উত্তর দিলেন না। শান্ত হেসে বেঞ্চির ওপর পুঁটলিটি নামিয়ে রাখলেন।

'মাশা, জানিস ইনি কে ?'

প্রাসকোভিয়া মাশার কানে কানে সার্জিয়াসের পরিচয় বললেন। তারপর দুজনে মিলে ধরাধরি করে বিছানা, বাচ্চা আর বাচ্চার দোলনা সরিয়ে ছোট ঘরটা সার্জিয়াসের জন্য খালি করে ফেললেন।

প্রাসকোভিয়া তাঁকে ঘরে নিয়ে এসে বললেন, 'আমার খুব খারাপ লাগছে, ঘরটা এত ছোট যাহোক, তুমি একটু বিশ্রাম কর। আমাকে এখন একটু বেরোতে হবে।'

'কোথায় ?'

'গান শেখাতে। তোমাকে বলতেও লজ্জা করছে যে, আমি আবার গান শেখাই।'

'গান ? সেতো খুব ভাল ব্যাপার। শুধু একটা কথা, আমি খুব জরুরী কাজে তোমার কাছে এসেছি প্রাসকোভিয়া। কখন তোমার সঙ্গে কথা হতে পারে ?'

'সে তো আনন্দের কথা, আমার ভাগ্যি। ধর যদি সন্ধ্যেবেলায় কথা বলি ? হবে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আরেকটা কথা, কাউকে আমার পরিচয় দিয়ো না। আমি শুধু তোমাকেই বিশ্বাস করতে পারি। আমি কোথায় আছি, তা কেউ জানে না। এই গোপনীয়তাটা খুব দরকার।'

'ওগো, কিন্তু আমি যে আমার মেয়েকে বলে ফেলেছি।'

'তাকে বলে দাও, আর কাউকে যেন না বলে।' সার্জিয়াস জুতো খুলে শুয়ে পড়লেন।

একরাত ঘুমোন নি। তার ওপর একটানা চল্লিশ ভাস্ট´ পথ হাঁটার ক্লান্তি। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

প্রাসকোভিয়া মিখাইলোভনা যখন ফিরলেন ততক্ষণে সার্জিয়াস উঠে পড়েছেন। তিনি ছোট ঘরটিতে বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাতের খাওয়ার জন্যও বাইরে যান নি। লুকেরিয়া সামান্য একটু সূপ আর পরিজ এনে দিয়েছিল, ঘরে বসে তাই খেয়ে নিয়েছিলেন।

সার্জিয়াস বললেন, 'এটা কি রকম হল ? তুমি যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লে ? এখন কথাবার্তা হতে পারে ?'

'আমার যে এত সৌভাগ্য হবে, এরকম একজন অতিথির পায়ের ধুলো

পড়বে আমার বাড়িতে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। কি এমন পুণ্যি করেছি যার জন্য এত সুখ? আমি আজ একটু কম সময় গান শেখালাম। পরে পুষিয়ে দেব। আমি মঠে তোমার কাছে যাব ভাবছিলাম। তোমাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। এখন হঠাৎ তোমাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে!'

'পাশেঙ্কা, তোমাকে এখন যা বলব, সেটা মৃত্যুর আগে ভগবানের কাছে পবিত্র স্বীকারোক্তির মত মনে করবে। পাশেঙ্কা, আমি পুণ্যাত্মা নই—এমন কি সরল, সাধারণ মানুষও নই। আমি একজন খল, নষ্ট, অজ্ঞ, ভণ্ড, পাপী। পৃথিবীর সব মানুষের চেয়ে আমি খারাপ একথা বলছি না। কিন্তু সবচেয়ে খলচরিত্রের মা ষের চেয়েও বেশি খল।'

পাশেঙ্কা প্রথমটা বড় বড় চোখ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন—এসব কথা কি বিশ্বাস করা যায়? তারপর যখন আস্তে আস্তে বিশ্বাস হল, তখন তাঁর হাত ধরে করুণ হেসে বললেন, স্তেপান, তুমি নিশ্চয়ই অনেক বাড়িয়ে বলছ।'

'না পাশেঙ্কা। আমি কুমারী মেয়ের ধর্ম নাশ করেছি, খুন করেছি, প্রবঞ্চনা করেছি, ঈশ্বরনিন্দা করেছি।'

প্রাসকোভিয়া মিখাইলোভনা মৃদুস্বরে বলে উঠলেন, 'হায় ভগবান, এও কি সম্ভব?'

'সত্যিকারের বাঁচতে পারার মধ্যেই তো জীবনের মূল্য। আমি জীবন সম্পর্কে লোককে উপদেশ দিয়ে বেড়াতাম অথচ আসলে আমি নিজে জীবনের কিছুই জানি না। তাই তোমার কাছে শিখতে এসেছি।'

'তুমি কি ঠাট্টা করছ না কি? সবাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।'

'তোমার যদি ঠাট্টা মনে হয়, তবে তাই। কিন্তু আমি সত্যিই জানতে চাই তুমি কিভাবে জীবন কাটিয়েছ, এখনই বা কিরকম করে কাটাও?'

'আমি? আমি বড় খারাপভাবে জীবন কাটিয়েছি স্তেপান। অনেক অন্যায় করেছি। ভগবান তাই এখন আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন। এ শাস্তি আমার পাওনা। এত খারাপভাবে জীবন কাটিয়েছি······এত খারাপ······।'

'তোমার বিয়ে কিভাবে হল? বিয়ের পর কেমন ছিলে।'

'প্রথম থেকে শেষ অবধি সব একেবারে জঘন্য। কি করে বিয়ে হল? সবচেয়ে যা বিশ্রী হতে পারে, সেই রকম করে। আমি প্রেমে পড়েছিলাম।

বাবার অমত ছিল। কিন্তু আমি কারও কথা শুনলাম না। অগত্যা বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ের পর কোথায় স্বামীকে সাহায্য করব, তা নয়, সন্দেহের বশে স্বামীকে যন্ত্রণা দিতে লাগলাম। কিছুতেই মন থেকে এই সন্দেহ আর ঈর্ষা তাড়াতে পারতাম না।'

'শুনছি, তোমার স্বামী নাকি নেশা করতেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি তাঁর স্নায়বিক উত্তেজনা জুড়িয়ে দিতে শিখি নি। আমি কেবল তাঁকে বকাঝকা করতাম। কিন্তু এটা তো আসলে একটা অসুখ। তিনি চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারতেন না। এখনও মনে পড়ে তখন কত কৌশল করে ও-সব ছাইপাঁশ, নেশার জিনিস তালাচাবি দিয়ে রাখতাম। তারপর বাড়িতে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে যেত।'

পুরনো স্মৃতির যন্ত্রণায় কাতর দুটি সুন্দর চোখ মেলে প্রাসকোভিয়া কাসাৎস্কির দিকে তাকালেন।

কাসাৎস্কির মনে পড়ল যে তিনি শুনেছিলেন পাশেঙ্কার স্বামী তাকে মারধোর করে। এখন তার জরাজীর্ণ কৃশ ঘাড়, কানের পাশের উঁচু বেশি, আধাপাকা আধাবাদামী চুলের খোঁপা দেখে তিনি ব্যাপার খানিকটা আঁচ করতে পারলেন।

তারপর দুটি সন্তান নিয়ে আমি একা একেবারে জলে পড়লাম, হাতে পয়সা কড়িও ছিল না।'

'কেন, তোমার জমিজমা কি হল?'

'ভাসিয়া বেঁচে থাকতে-থাকতেই সব বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। টাকা পয়সাও সব খুইয়ে বসেছিলাম। অথচ যে করেই হোক, বেঁচে থাকতে তো হবে। আর পাঁচটা ভদ্রঘরের মেয়ের মত আমিও কি করতে হবে না হবে কিছুই জানতাম না। তার ওপর আমি আবার আরও বেশি পাজী ছিলাম, আরও বেশি অসহায়। শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত ভাঙিয়ে কিছুদিন চালালাম। ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে দিলাম. নিজেও কিছু লেখাপড়া শিখলাম। ইস্কুলে চার বছর পড়ার পর মিটিয়ার অসুখ করল। ভগবান তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। মাশা ভানিয়ার প্রেমে পড়ল।—ভানিয়া এখন আমার জামাই। ছেলেটার মন বেশ ভাল, কিন্তু সে-ও বড় অসুখী। সে-ও সুস্থ নেই।'

মেয়ের গলা ভেসে এল, 'মা, মেয়েটাকে একটু নাও। আমি আর পারছি না।'

পাশেঙ্কা তক্ষুনি তাঁর গোড়ালি ক্ষয়ে যাওয়া ছেঁড়া জুতোটি গলিয়ে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। তারপর দুবছরের বাচ্চাটিকে নিয়ে ফিরে এলেন। বাচ্চাটি উপুড় হয়ে পড়ে নিজের মাথায় বাঁধা রুমালটা ধরে টানতে লাগলো।

'কি যেন বলছিলাম, হ্যাঁ, ভানিয়া এখানে ভাল চাকরি করত। ওর ওপরওয়ালাটিও বেশ ভাল লোক ছিলেন। কিন্তু বেশিদিন টিঁকতে পারল না। ইস্তফা দিতে হল।'

'কী অসুবিধা হচ্ছিল ?'

'স্নায়ুর অসুখ—হিউরাসথেনিয়া। সাংঘাতিক রোগ। ডাক্তার বলেছেন, ওকে বাইরে চেঞ্জে পাঠানো দরকার। কিন্তু আমাদের সে সামর্থ্য নেই। একদিন রোগ সেরে যাবে এই আশায় বুক বেঁধে আছি। তার বিশেষ কোন যন্ত্রণা নেই, শুধু……'

'লুকেরিয়া,' অসুস্থ লোকটির দুর্বল খিটখিটে গলা ভেসে এল, 'দরকারের সময় তাকে কোথায় যে পাঠান হয়। মা—'

'যাই! আহা এখনও ওর রাতের খাওয়া হয়নি। আমাদের সবার সঙ্গে তো আর খেতে পারে না'—বলতে বলতে প্রাসকোভিয়া আবার গল্পের মাঝপথে উঠে গেলেন।

তিনি ঘর ছেড়ে উঠে যাবার পর সারা বাড়িতে তাঁর চলাফেরার শব্দ শোনা যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পর রোদেপোড়া, রোগা হাত দু'টো মুছতে মুছতে প্রাসকোভিয়া ফিরে এলেন। আবার বলতে শুরু করলেন, 'এই ভাবেই সংসার চলত—সব সময়ে অভাব অভিযোগ, সব সময়েই অশান্তি। তবে ভগবানের দয়া যে ছেলেমেয়েগুলো সব বেশ সুস্থ, স্বভাবও ভাল। যাহোক একরকম দাঁড়িয়েই গেছি। ওমা, কাণ্ড দেখ, শুধু নিজের কথাই সাত কাহন করে বলছি!'

'তোমার কি ভাবে চলে ?'

'কেন ? আমি নিজে সামান্য রোজগার করি। গান আগে আমার এত খারাপ লাগত, এখন সেই গানের দৌলতে করে খাচ্ছি।'

সে তার পাশের দরজাটিতে হাত রাখল। রোগা, ছোট্ট হাত। সেই

হাতের সরু আঙুল দিয়ে সে খেলা করছিল—মনে হচ্ছিল যেন কোন স্বরলিপি তৈরী করছে।

'গান শেখানোর জন্য তোমাকে এক একদিন কত করে দেয়?'

'এক রুব্‌ল কিম্বা পঞ্চাশ কোপেক। কেউ দেয় তিরিশ। আমার ওপর ওদের সবাইকার এত দয়া।'

'তারা কি সত্যিসত্যিই কিছু শেখে?' কাসাৎস্কি জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর মুখে বিবর্ণ হাসি।

প্রাসকোভিয়া মিখাইলোভনা প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে কাসাৎস্কি সত্যি সত্যিই কথাটা জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, শেখে বৈ কি। একটি ভারি মিষ্টি মেয়ে আছে—কশাইয়ের মেয়ে। খুব মায়া-মমতা আছে, বেশ ভাল। আমি যদি কাজের লোক হতাম, তাহলে আমার বাবার জানাশোনার সূত্র ধরে ভানিয়ার কিছু একটা সুবিধে করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি তো কোন কম্মের নই তাই আজ এদের এই হাল।'

কাসাৎস্কি মাথা নীচু করে মৃদুস্বরে বললেন, 'এ পর্যন্ত একরকম বুঝলাম। কিন্তু পাশেঙ্কা, ধর্ম-কর্ম কিছু কর?'

'সেকথা আর কি বলব, বল? এ ব্যাপারে আমি বড় অবহেলা করি। লেন্টের সময়টা উপোস করি, গির্জেতে যাই। কিন্তু অনেক সময় মাসের পর মাস গির্জেতে যাওয়া হয় না। বাচ্চাদের পাঠাই।'

'তুমি নিজে যাও না কেন?'

লজ্জায় মুখ লাল করে তিনি বললেন: 'সত্যি কথা বলতে কি, আস্ত নতুন কাপড় আমার একটাও নেই। এই ছেঁড়া কাপড়-চোপড় প'রে বেরোলে মেয়ে জামাই এর লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তাই আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। তাছাড়া আমি একটু আলসেও আছি।'

'তাহলে তুমি ঘরে বসে উপাসনা কর?'

'ঐ একবার যন্ত্রের মত আউড়ে যাই। তাকে প্রার্থনা বলা চলে না। ওভাবে প্রার্থনা করার কোন মানে হয় না, আমি জানি। কিন্তু কি করব? আমার কোন খাঁটি অনুভূতি নেই—কেবল নিজের অপদার্থতার কথাটা বুঝতে পারি।'

কাসাৎস্কি সায় দিয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক তাই, তুমি ঠিকই বলেছ।'

আবার জামাই ডাকল।

'এই যাচ্ছি।' বলে প্রাসকোভিয়া মাথার ওড়নাটা ঠিক করে নিয়েই আবার তক্ষুণি ছুটলেন।

এবার তাঁর ফিরে আসতে অনেক দেরি হল। ফিরে এসে দেখলেন, কাসাৎস্কি সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছেন—কনুই দুটো হাঁটুর ওপর। বোঁচকা-বুঁচকি পিঠে বাঁধা।

প্রাসকোভিয়া হাতে একটা কুপি নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। কাসাৎস্কি তাঁর নিজের সুন্দর চোখ দুটি তুলে তাঁর ক্লান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

পাশেঙ্কা খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি যে কে, তা, আমি ওদের জানাই নি। শুধু বলেছি যে তুমি একজন বনেদি ঘরের সন্তান, এক তীর্থযাত্রী। বলেছি, আমি তোমাকে এককালে চিনতাম। চা খাওয়ার জন্য একবার খাবার ঘরে আসবে না?'

'না।'

'তাহলে এখানে নিয়ে আসি?'

'না। তার দরকার নেই। পাশেঙ্কা, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন। আমাকে এখন যেতে হবে। আমার জন্য যদি তোমার কোন সহানুভূতি থাকে, তবে কাউকে বোল না যে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। ভগবানের দোহাই, কাউকে বোল না। তোমাকে ধন্যবাদ। আমি তোমাকে প্রণাম করতাম, কিন্তু আমি জানি তাতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করবে। ধন্যবাদ, খ্রীস্টের দোহাই, আমাকে ক্ষমা কোরো।'

'আমাকে আশীর্বাদ কর।'

'ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। খ্রীস্টের দোহাই, আমাকে ক্ষমা কোরো।'

তিনি তখনই চলে যেতেন, কিন্তু প্রাস্কোভিয়া তাঁকে দাঁড়াতে বলে রুটি আর মাখন এনে দিলেন। সেগুলো সঙ্গে নিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কাসাৎস্কি দুটো বাড়ি পেরোতেই প্রাস্কোভিয়া আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। শুধু প্রধান পুরোহিতের কুকুরটার ঘেউ ঘেউ ডাক শুনে বুঝলেন যে তিনি কাছেই আছেন।

কাসাৎস্কি ভাবতে লাগলেন, 'এবার আমার স্বপ্নের মানে বুঝতে পেরেছি। আমার পাশেঙ্কার মত হয়ে উঠতে পারা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা হয়ে উঠতে পারিনি। আমি মানুষের জন্য বেঁচেছিলাম, অথচ, এমন ভাব করতাম, যেন ভগবানের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি। আর পাশেঙ্কা ভাবে যে সে বেঁচে আছে মানুষের জন্য, কিন্তু আসলে সে বেঁচে আছে ভগবানের জন্য। যে কোনও ভাল কাজ—এমন কি প্রতিদানের আশা না রেখে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে জলদান করার মত তুচ্ছ একটা কাজও, আমার এতদিনকার কাজের চেয়ে পুণ্যতর। আমি যা করেছি তা কেবল লোকের কাছে বাহবা পাবার আশায় করেছি। কিন্তু……?'

তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'আমার কাজের মধ্যে ভগবানের সেবা করার বিন্দুমাত্র বাসনাও কি ছিল না?'

উত্তর পেলেন, 'হ্যাঁ, কিছু হয়ত ছিল, কিন্তু মানুষের কাছে প্রশংসা পাওয়ার লোভ সেই বাসনাকে কলুষিত করে দিয়েছে। না, আমার মত যারা মানুষের কাছে গৌরবলাভের জন্য বেঁচে থাকে, তাদের কাছে ভগবান নেই। কিন্তু আমি যাব 'ঈশ্বরের অন্বেষণে।'

পাশেঙ্কার কাছে যেরকম ঘুরতে ঘুরতে এসেছিলেন, তেমনি তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন—কখনও তীর্থযাত্রী মেয়ে-পুরুষদের সঙ্গ ধরে, কখনও বা একা! দরকার মত খ্রীষ্টের নামে আহার্য ও আশ্রয় ভিক্ষা করতেন। কখনও কখনও কোন বদমেজাজি গিন্নী হয়ত দু'চার কথা শুনিয়ে দিতেন, কিম্বা কোনও চাষী মদ খেতে খেতে মুখ খারাপ করত, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তিনি প্রয়োজনমত আহার্য ও পানীয় পেতেন। তাঁর বনেদি চেহারার জন্য অনেকে তাঁকে খুব খাতির করত। কেউ কেউ আবার বনেদি ঘরের সন্তান ভিখিরি বনে গেছে দেখে খুব খুশি হত। তিনি যাদেরই সংস্পর্শে আসতেন, তারাই তাঁর অমায়িক স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে কারো বাড়িতে তিনি খ্রীষ্টের সুসমাচার পাঠ করে শোনাতেন। সর্বত্রই লোকেরা ভীড় করে শুনত, অবাক হয়ে যেত, অভিভূত হত। এই সুসমাচার তারা আগে বহুবার শুনেছে, তবু তাঁর পাঠ শুনে তাদের মনে হত যেন নতুন কিছু একটা শুনছে। সুযোগ পেলেই তিনি লোকেদের সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। তাদের নানা ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন, নিরক্ষর লোকদের চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ লিখে দিতেন, ঝগড়াঝাঁটির মীমাংসা

ক'রে দিতেন। কাজ শেষ হলে তাদের ধন্যবাদ দেবার সুযোগ না দিয়েই আবার বেরিয়ে পড়তেন। এইভাবে আস্তে আস্তে তিনি তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পাচ্ছিলেন।

একদিন তিনি রাস্তায় হাঁটছিলেন—সঙ্গে ছিল দুজন বৃদ্ধা ও একজন পদচ্যুত সৈনিক। হঠাৎ কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁদের থামালেন। কাছেই একজন ভদ্রলোক ও একজন ভদ্রমহিলা ঘোড়ার গাড়িতে বসে ছিলেন আর দুজন তরুণ-তরুণী ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন। যে দুজন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা হলেন গাড়িতে বসে থাকা ভদ্রমহিলার মেয়ে এবং জামাই। অন্য ভদ্রলোকটি সম্ভবত ফরাসি, এখানে বেড়াতে এসেছেন।

কাসাৎস্কির দিকে আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে লোকেরা সেই পর্যটক ভদ্রলোককে বোঝাতে লাগল যে এই সব তীর্থযাত্রী হল রুশ দেশের বৈশিষ্ট্য। রাশিয়ায় বহু লোক এরকম কাজকর্ম না করে ভবঘুরের মত দেশ দেশান্তর ঘুরে বেড়ায়। বস্তুত ঐ ভদ্রলোককে দেখাবার জন্যই এঁরা তাঁদের থামিয়েছিলেন।

তাঁরা ফরাসি ভাষায় কথাবার্তা বলছিলেন। ভেবেছিলেন তীর্থযাত্রীরা বুঝতে পারবে না।

ফরাসি ভদ্রলোকটি বললেন, 'ওদের জিজ্ঞাসা করুন তো, ওরা কি ঠিক জানে যে এরকম পথে পথে তীর্থ করে বেড়ালেই ভগবান প্রসন্ন হবেন?'

তাঁদের প্রশ্ন করা হল।

বুড়িটি বলল, 'সে কথা ভগবানই জানেন, তীর্থস্থানে ঘুরে তো এসেছি। এখন তাঁর দয়া হবে কিনা তিনিই জানেন।'

সৈনিকটিকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল যে পৃথিবীতে সে একা এবং তার কোথায়ও থাকার জায়গা নেই।

তারপর তাঁরা কাসাৎস্কিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে।

'ঈশ্বরের দাস।'

'কি বলছে লোকটা? কোন উত্তর দিচ্ছে না তো।'

'ও বলছে যে ও ঈশ্বরের দাস।'

'বোধহয় পুরুত-টুরুতের ছেলে হবে। দেখে মনে হয় ভাল বংশের সন্তান। আপনার কাছে খুচরো পয়সা আছে?'

ফরাসি ভদ্রলোকের পকেটে কয়েকটা রূপোর মুদ্রা ছিল। তিনি তাদের

প্রত্যেককে কুড়ি কোপেক করে দিলেন। বললেন, 'ওদের বুঝিয়ে দিন যে মোমবাতি কেনার জন্য পয়সাগুলো দিচ্ছি না। 'চা খাবার জন্য দিচ্ছি।'

তারপর আবার মৃদু হেসে বললেন, 'চা—তোমার দাদুর জন্যে চা কিনো।' বলে দস্তানা-পরা হাত দিয়ে কাসাৎস্কির পিঠ চাপড়ে দিলেন।

কাসাৎস্কি টুপি খুলে টাক-পড়া মাথাটি নিচু করে বললেন, 'যিশু আপনার মঙ্গল করুন।'

এই সাক্ষাৎকারে কাসাৎস্কির বিশেষ আনন্দ হল। কারণ অন্যেরা তাঁর সম্পর্কে কি ভাবে না ভেবে, সে সম্পর্কে তিনি এতদিন সত্যিই উদাসীন হতে পেরেছেন। অনায়াসে, সহজ নম্রতায় তিনি কুড়ি কোপেক গ্রহণ করলেন। তারপর তাঁর একজন সহযাত্রী অন্ধ ভিখিরিকে মুদ্রা ক'টি দিয়ে দিলেন। এইভাবে যতই মানুষের মতামত তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতে থাকল, ততই তিনি ভগবানের অস্তিত্ব নিবিড়ভাবে অনুভব করতে লাগলেন। এরকম করে আট মাস কেটে গেল। নবম মাসে তিনি যখন গুবারনিয়া কেন্দ্র পেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অন্যান্য ভিখিরিদের সঙ্গে তিনি রাতে যে জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে তাঁকে জেরা করা হল। তারপর কোন পাশপোর্ট দেখাতে না পারায়, তাঁকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁকে যখন নাম ধাম, পাশপোর্ট ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি শুধু বললেন যে তাঁর কোন পাশপোর্ট নেই, তিনি ঈশ্বরের সেবক। এরপর তার বিচার হল এবং ভবঘুরে হওয়ার অভিযোগে তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হলেন।

সাইবেরিয়ায় তিনি এক ধনী কৃষকের খামারে কাজ করতে লাগলেন। এখনও তিনি সেইখানেই থাকেন। তিনি সেই কৃষকের বাগানে কাজ করেন, গ্রামের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান আর আর্তের সেবা করেন।

বল্ নাচের পর

'তাহলে আপনাদের মত, কী ভাল আর কী মন্দ এ বিষয়ে মানুষ স্বাধীন-ভাবে বিচার করতে পারে না, সবই হচ্ছে পরিবেশের ব্যাপার, মানুষ হচ্ছে পরিবেশের সৃষ্টি। কিন্তু আমি মনে করি, সবই হচ্ছে দৈব। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি......'

একথা বললেন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ইভান ভাসিলিয়েভিচ একটি আলোচনার শেষে। ব্যক্তির উন্নতি-সাধনের কথা বলবার আগে পরিবেশ বদলানো দরকার, যে অবস্থার মধ্যে লোক আছে সেই অবস্থাটা বদলানো দরকার,—এ বিষয়ে চলছিল আমাদের আলোচনা। সত্যি বলতে, ভাল বা মন্দর স্বাধীন বিচার অসম্ভব, এ কথা কেউ বলে নি। কিন্তু ইভান ভাসিলিয়েভিচের অভ্যেস ছিল আলোচনায় উদ্দীপিত নিজের নানা চিন্তার উত্তর দেওয়া এবং এ সব চিন্তা প্রসঙ্গে নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথা বলা। বহু সময় গল্পের মধ্যে তিনি এত ডুবে যেতেন যে কেন গল্পটা বলছেন তা ভুলে যেতেন, বিশেষত এই কারণে যে তিনি সর্বদা গল্প বলতেন প্রবল উৎসাহে ও আন্তরিকতায়। এ ক্ষেত্রেও ঠিক এইটেই ঘটেছিল।

'অন্ততঃ আমি নিজের সম্পর্কে এই দাবী করতে পারি। আমার নিজের জীবন গড়ে উঠেছে ঐ ভাবে, অন্যভাবে নয় —পরিবেশের প্রভাবে নয়, সম্পূর্ণ অন্য কিছুর প্রভাবে।

'কীসের প্রভাবে?' আমরা প্রশ্ন করলাম।

'সে লম্বা গল্প। সে বুঝতে গেলে অনেক কথা শুনতে হয়।'

'বলুন শুনি।'

ইভান ভাসিলিয়েভিচ এক মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে মাথা নাড়লেন।

'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'একটি রাত, বা বলা যায়, একটি সকাল আমার গোটা জীবনকে বদলে দিল।'

'কেন? কী ঘটেছিল?'

'ঘটেছিল—আমি গভীর প্রেমে পড়েছিলাম। আগেও মাঝে মাঝেই প্রেমে পড়তাম, কিন্তু কখনো এত গভীরভাবে নয়। ঘটনাটা ঘটেছিল অনেক দিন আগে—ওর মেয়েদের এতদিনে বিয়ে-থা হয়ে যাওয়ার কথা। ওর নাম ছিল ব, ভারেন্কা ব···। পঞ্চাশেও দারুণ সুন্দরী। কিন্তু যৌবনে, আঠার বছর বয়সে ও ছিল যেন একটি স্বপ্ন। লম্বা, সুঠাম রানীর মত—হ্যাঁ, রানীর মত। ও সর্বদা থাকত খাড়া, সোজা—যেন ঝুঁকতে অক্ষম। মাথাটা থাকত একটু পেছনে হেলানো। যদিও খুব পাতলা ছিল তার গড়ন, প্রায় অস্থিময় বললেও হয়, তবু ওর দীর্ঘাকৃতি ও সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে চেহারায় এমন একটা রানীর মত ভাব আসত যে লোকে সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত হত—যদি না তার হাসিটা হত এত উচ্ছল ও চিত্তজয়ী, চোখ দুটো এত অপরূপ উজ্জ্বল, যদি না তার যৌবনোচ্ছল সত্তায় থাকত এত আকর্ষণ।'

ইভান ভাসিলিয়েভিচ রং চড়াতে জানেন।

'যতই রং চড়াই, তাও তোমাদের বোঝাতে পারব না সত্যি সে দেখতে কেমন ছিল। কিন্তু ও কথা অবান্তর। যে ঘটনাটা আমি বলব, সেটা ঘটেছিল চল্লিশের দশকে।···তখন পড়ি প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাল কি মন্দ জানি না, কিন্তু সে-সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের না ছিল পাঠচক্র, না ছিল তত্ত্বকথা। আমরা ছিলাম নিছক তরুণ এবং নব্য যোয়ানদের মতই আমরা থাকতাম—পড়তাম আর ফুর্তি করতাম। খুবই ফুর্তিবাজ ও উৎসাহী ছেলে ছিলাম আমি—তারপর অবস্থাও ছিল ভাল। একটা গাড়ীর ঘোড়া—ঘোড়াটা তেজী—সেটার মালিক তখন আমি। মেয়েদের গাড়ীতে চাপিয়ে ঘোরাতাম (স্কেটিং-এর তখনো রেওয়াজ হয় নি), ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে যেতাম মদের আড্ডায় (সে সব দিনে শ্যাম্পেন ছাড়া কিছু ছুঁতাম না; পকেটে পয়সা না থাকলে কিছুই খেতাম না, আজকালকার মত ভোদকা চলত না আমাদের); কিন্তু আমার সব চেয়ে প্রিয় ছিল—পার্টি আর বল্ নাচ। ভাল নাচিয়ে ছিলাম, আর চেহারাটাও কুৎসিত ছিল না।'

'থাক, আর ব্যাখ্যান করবেন না।' একজন শ্রোতা বলল। 'আমরা আপনার ফটো দেখেছি। আপনি দেখতে খুবই সুন্দর ছিলেন।'

'হয়তো ছিলাম। কিন্তু সেটা আমি বলতে চাইছি না। আমার প্রেম যখন চরমে তখন শ্রোভটাইডের শেষ দিনে গেলাম একটা বল-নাচে।

বার্শালের ওঁখানে। বৃদ্ধটি দিলদরাজ, ধনী অতিথি আপ্যায়ন করতে ভাল-বাসতেন। তাঁর স্ত্রী ঠিক স্বামীর মত অমায়িক ভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন। পরণে মখমলের গাউন, মাথায় হীরের টায়রা, বার্ধক্যের ছাপ লাগা গোলগাল সাদা গলা আর কাঁধ খোলা, ছবিতে মহারাণী ইয়েলি-জাভেতা পেত্রভনা যেমন, অদ্ভুত বল নাচ বটে। বল নাচের ঘরটি সুন্দর, সেখানে উপস্থিত নামকরা ভূমিদাস গায়ক সব, একটি সঙ্গীতপ্রিয় জমিদারের গাইয়ে-বাজিয়েরা। খাদ্যের কোনো অভাই নেই। শ্যাম্পেনের স্রোত বয়ে গেল। শ্যাম্পেনের খুবই অনুরাগী হলেও খেলাম না—তখন আমার প্রেমের নেশা। কিন্তু নাচ থামাই নি—একেবারে পড়ে না যাওয়া পর্যন্ত নেচেছি। কোয়াড্রিল, ওয়াল্‌জ আর পলোনেজ নাচলাম। বলা বাহুল্য, যতটা পারি নাচলাম ভারেঙ্কার সঙ্গে। তার গায়ে গোলাপী ফেটি-দেওয়া সাদা পোশাক, হাতে নরম চামড়ার লম্বা দস্তানা সরু ছুঁচলো কনুই পর্যন্ত পৌঁছায়নি, পায়ে সাদা সাটিনের জুতো। আনিসিমভ নামে হতচ্ছাড়া ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাজুরকা নাচল ওর সঙ্গে। সে-জন্যে এখন পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করিনি। দস্তানা নিতে গিয়ে দেরী হয়েছিল, নাচের ঘরে ভারেঙ্কা ঢোকা মাত্র অনিসিমভ ওকে নাচতে বলল। তাই ওর সঙ্গে না নেচে মাজুরকাটা নাচতে হোলো একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে। তার ওপর এক সময় আমার একটু ঝোঁক হয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে, সে সন্ধ্যায় তার দিকে তাকাই নি পর্যন্ত। আমার চোখজোড়া পড়েছিল গোলাপী ফেটি-দেওয়া সাদা পোশাক পরা একটি দীর্ঘাঙ্গী তন্বী মেয়ের উপর যার টোল-পড়া গাল উজ্জ্বল রক্তিম, মধুর-স্নিগ্ধ যার চোখ। শুধু আমি নই, সবাই তার দিকে চেয়ে চেয়ে তারিফ করছিল—মায় মেয়েরা পর্যন্ত, যদিও ওর দীপ্তিতে সবাই হতশ্রী। প্রশংসা না করে উপায় ছিল না।

'ঠিক মত দেখলে, মাজুরকায় ওর সঙ্গে আমি নাচি নি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বেশির ভাগ সময় নাচি ওরই সঙ্গে। ঘরের অন্য দিক থেকে ও বারবার সোজা আসে আমার কাছে অসংকোচে ডাকের অপেক্ষা না করে, আমি লাফিয়ে উঠি আর ও মুচকি হেসে ধন্যবাদ জানায়, মনের কথাটি টের পেয়েছি বলে। নাচের সঙ্গী বাছাই-এর সময় আমার প্রকৃতি ওর কাছে ধরা পড়ে নি, রোগা কাঁধ একটু ঝাঁকিয়ে আমার দিকে অনুকম্পা ও সান্ত্বনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল অন্য একজনের দিকে।

'মাজুরকা থেকে আমা গেল ওয়াল্‌জে। অনেকক্ষণ ওয়াল্‌জ্ নাচলাম ওর সঙ্গে। হাঁপিয়ে উঠে মৃদু হেসে ও চুপিচুপি ফরাসী ভাষায় বলল, 'আঁকোর', অর্থাৎ—আবার। আর আমি ওর সঙ্গে ওয়াল্‌জ্ নাচছি তো নাচছি, শরীরের কোনো হুঁশ নেই।'

'হুঁশ ছিল না, বটে? ওর কোমর জড়িয়ে ধরবার পর হুঁশটা বেশ প্রখর হয়েছিল মনে হয়—শুধু নিজের শরীর সম্পর্কে হুঁশ নয়, ওর শরীর সম্পর্কেও। একজন অতিথি বলল।

'ইভান হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সেটা তোমাদের আজকালকার ছোকরাদের হতে পারে। দেহ ছাড়া তোমাদের মাথায় আর কিছু নেই। আমাদের সময়ে অন্য রকম ছিল। একটি মেয়েকে যত বেশি করে ভালবাসতাম, তত অ-দেহী মনে হোতো তাকে। আজ তোমরা মেয়েদের পা, গোড়ালি ও আরো নানা বিষয়ে বেশ সচেতন। যাদের ভালবাসো তাদের বিনা বস্ত্রে দেখে থাকো। কিন্তু আমার কথা যদি বল, আলফঁস কার যেমন বলেছিলেন—আর অত্যন্ত ভাল লেখক ছিলেন তিনি—আমার প্রেমিকাকে দেখতাম সর্বদা ব্রোঞ্জের পোশাকে। বিনাবস্ত্রে দূরের কথা, আমরা চাইতাম নগ্নতাকে ঢাকতে, যেমন চেয়েছিল নোয়াব সুসন্তান। কিন্তু তোমরা এসব বুঝবে না।'

'ওর কথা ছেড়ে দিন। গল্পটা বলুন।' একজন শ্রোতা বলল।

'হ্যাঁ, বেশিটা সময় ওর সঙ্গে নাচলাম। সময়ের হুঁশ ছিল না। বাজিয়েরা হাঁপিয়ে পড়েছে—বল্ নাচের শেষ দিকে কেমন হয় জানো তো—ওরা মাজুরকা বাজিয়ে চলেছে। রাতের খাবারের আশায় ড্রইংরুমের তাসের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েছেন বাপ-মায়েরা। চাকরেরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। তিনটে বাজতে চলেছে। মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, সেটার সদ্ব্যবহার করতে হয়। ওকে আবার ডাকলাম নাচতে। আবার এইবার নিয়ে বোধহয় শততম বার পুরো ঘরটা নেচে অতিক্রম করলাম।

'ওর বসার জায়গায় ওকে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাতের খাওয়ার পর আমার সঙ্গে কোয়াড্রিলটা নাচবেন তো'?'

'ও, হ্যাঁ অবশ্য যদি ওঁরা আমায় বাড়ি না নিয়ে যান।' একটু হেসে ও বলল।

'ওঁদের নিয়ে যেতে দেব না!' বললাম আমি।

'আমার হাতপাখাটা দিন তো।' বলল ও।

'ফেরত দিতে হচ্ছে বলে কষ্ট হচ্ছে।' ছোট সাদা পাখাটা দিতে দিতে বললাম।

'আচ্ছা, তাহলে যাতে কষ্ট না পান তাই এটা নিন।' পাখার একটা পালক ছিঁড়ে আমায় দিল ও।

'পালকটা নিলাম, উচ্ছ্বাস আর কৃতজ্ঞতা কী করে জানাই, তাকালাম ওর দিকে। শুধু যে খুশী আর তৃপ্ত আমি তাই নয়, আমি সুখী, চরম সুখের মধ্যে আছি, সবার ভাল করবার মত মন এখন আমার, আমি আর আমি নেই, আমি তখন অপার্থিব কোনো প্রাণী যে পাপ জানে না। ভাল বই মন্দ করতে পারে না।

'দস্তানায় পালকটা গুঁজে দাঁড়িয়ে আছি, ওকে ছেড়ে যাই এমন শক্তি নেই।'

'দেখছেন, ওরা বাবাকে নাচতে বলছে।' দরজার কাছে গৃহকর্ত্রী ও অন্য কয়েকজন মহিলার সঙ্গে দাঁড়ানো একজন লম্বা সুপুরুষ চেহারার ভদ্রলোককে দেখিয়ে ও বলল। ওর বাবা কর্ণেল, টিউনিকের কাঁধে রূপোর কাজ-করা।

'হীরের টায়রা-পরা গৃহকর্ত্রী, কাঁধ যার ইয়েলিজাভেতার মত, ডেকে বললেন, 'ভারেঙ্কা, এদিকে এসো তো।'

'ভারেঙ্কা দরজার দিকে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

'লক্ষীটি, বাবাকে বলে কসে ওঁর সঙ্গে নাচো তো। দয়া করে নাচুন, পিওতর ভ্লাদিস্লাভিচ।' কর্ণেলকে বললেন গৃহকর্ত্রী।

'ভারেঙ্কার বাবা লম্বা, সুন্দর ও সুপুরুষ। শরীরটা খাসা রেখেছেন। টকটকে লাল মুখে সাদা গোঁফ প্রথম নিকোলাইয়ের ধরনে পাকানো। সাদা জুলফি নেমে এসেছে গোঁফের দিকে, রগ থেকে চুল সোজা সামনে আঁচড়ানো। উজ্জ্বল চোখে আর ঠোঁটে ঠিক নিজের মেয়ের মতই হাসির দীপ্তি। সুঠাম গড়ন, বুক ফৌজী ধরনে চিতিয়ে দেওয়া। বুকে নানা সম্মান-চিহ্নের অল্প বাহার। শক্ত কাঁধ, পা-দুটো লম্বা ও সুগঠিত। নিকোলাইয়ের রেওয়াজের সামরিক চাল-চলন, সেকেলে ধরনের অফিসার।

দরজার কাছে গিয়ে শুনলাম, তিনি আপত্তি করে বলছেন যে, নাচতে ভুলে গেছেন। তবু একটু হেসে খাপসুদ্ধ তলোয়ার খুলে সেবার জন্য উন্মুখ

একটি তরুণকে দিলেন, তার হাতে সোয়েডের একটা দস্তানা পরে ('নিয়ম-মাফিক চলা চাই' মৃদু হেসে বললেন), মেয়ের হাত ধরে এক চক্কর ঘোরার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঠিক তালের অপেক্ষায় রইলেন।

মাজুরকার তাল শুরু হতেই একটা পা জোরে ঠুকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে তিনি চট করে ঘুরলেন। তারপর ঘরময় ভাসতে লাগল তার দীর্ঘ ভারী দেহ। এক পা দিয়ে অন্য পায়ে ঠুকছেন, কখনো ধীরে সুঠাম ভঙ্গীতে, কখনো তাড়াতাড়ি খুব জোরে। তার পাশে ভাসছে ভারেঙ্কার পাতলা শরীর। প্রায় বোঝা যায় না এমন ভাবে অথচ ঠিক সময়ে বাবার পায়ের সঙ্গে তাল রাখছে তার ছোট সাদা সাটিনের জুতো পরা পা, কখনো ছোট, কখনো বা বড় করে।

দুজনের প্রতিটি ভঙ্গি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল অতিথিরা, আমার ভাবটা প্রশংসার ততটা নয়, যতটা উদ্বেল আনন্দের। মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিল কর্ণেলের বুট জোড়া। বাছুরের চামড়ায় তৈরী ভাল বুট, কিন্তু গোড়ালি নেই, আর ফ্যাশনদুরস্ত ছুঁচলো মুখের বদলে ভোঁতা মুখ। নিশ্চয়ই ফৌজী মুচির তৈরী। 'আদরের মেয়েকে ভাল সাজিয়ে ভদ্র সমাজে আনার জন্য সৌখিন জুতোর বদলে উনি নিজে পরেন ঘরে তৈরী বুট' এই কথাটা ভাবলাম বলেই ওঁর ভোঁতা জুতো আমার মনকে নাড়া দিল। সবাই বুঝল, এককালে তিনি ভাল নাচতেন, কিন্তু শরীরটা এখন ভারী হয়ে গিয়েছে, পা দুটোর সেই নমনীয় তৎপরতা নেই বলে ক্ষিপ্র সুন্দর চকরগুলো চেষ্টা করেও দিয়ে উঠতে পারছেন না। কিন্তু দু'বার ঘরময় বেশ ঘুরলেন তিনি আর পা দুটো চকিতে ছড়িয়ে দিয়ে আবার খট করে জোড়া লাগিয়ে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে অবশ্য একটু ভারী কায়দায় যখন বসে পড়লেন তখন সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। আটকে যাওয়া স্কার্টটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়ে মুচকি হেসে সাবলীলভাবে ঘুরল বাপের চারদিকে। কোনোক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথা চেপে চুমু খেলেন কপালে, তারপর নিয়ে এলেন আমার কাছে, ভেবেছেন আমি ওর নাচের সঙ্গী। জানালাম তা নয়।

'কিছু এসে যায় না তাতে। ওর সঙ্গে নাচুন।' খাপসুদ্ধ তলোয়ার বাঁধতে বাঁধতে সস্নেহে হেসে বললেন।

বোতল থেকে এক ফোঁটা পড়বার পর জল যেমন হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভারেঙ্কার প্রতি ভালবাসা আমার অন্তরের সমস্ত ভালবাসার

পথ খুলে দিল। আমি সারা বিশ্বকেই প্রেমের আলিঙ্গনে বাঁধলাম। ভালবাসলাম রানী ইয়েলিজাভেতার কেতায় হীরের টায়রা পরা গৃহকর্ত্রীকে, তাঁর স্বামীকে, অতিথিদের, ভৃত্যদের, এমন কি আনিসিমভকে, যে আমার ওপর বেজায় চটেছিল। আর ঘরোয়া ভোঁতা বুট পরা ওর বাবা, হাসিটা যাঁর ঠিক মেয়ের মত—তার প্রতি তো উচ্ছ্বসিত ভালবাসা।

মাজুরকা শেষ হলে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী রাতের খাওয়ার জন্যে টেবিলে ডাকলেন আমাদের। কর্ণেল অনিচ্ছা জানিয়ে বললেন, খুব ভোরে উঠতে হবে তাঁকে। আমার ভয় হোলো, হয়ত ভারেঙ্কাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ও মায়ের সঙ্গে রয়ে গেল।

খাওয়া হয়ে গেলে প্রতিশ্রুত কোয়াড্রিল নাচলাম ওর সঙ্গে। মনে হয়েছিল, এর চেয়ে বেশি সুখ আর হতে পারে না। কিন্তু সুখ তো ক্রমেই বেড়ে চলল। দুজনের মধ্যে প্রেমের কথা কিছু হোলো না। আমাকে ভালবাসে কিনা জিজ্ঞেস করলাম না ওকে বা নিজেকে। ওকে ভালবাসি তাই যথেষ্ট। ভয় হোলো পাছে কোনো কিছুতে সুখের ব্যাঘাত ঘটে।

বাড়ি গিয়ে পোশাক ছেড়ে বিছানায় শুতে গিয়ে মনে হোলো ঘুমোনো একেবারে অসম্ভব। আমার হাতে ওর হাতপাখার পালক আর একটা দস্তানা, গাড়ীতে ওকে আর ওর মাকে তুলে দেওয়ার সময় আমাকে দিয়েছিল দস্তানাটা। অভিজ্ঞান দুটির দিকে তাকিয়ে চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম, নাচের জুড়ি বাছবার সময় সে আমার প্রকৃতি অনুমান করে মিষ্টি গলায় বলল, 'খুব গর্বিত ? তাই না।' তারপর খুশী ভাবে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কিংবা যখন খাবার টেবিলে বসে শ্যাম্পেন খেতে খেতে গেলাসের ওপর দিয়ে অনুরাগ-ভরা চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আমার দিকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে ওকে দেখলাম সেই সময় যখন ও বাবার সঙ্গে নাচছিল, পাশাপাশি ঘোরার সময় কী লাবণ্য তার গতিতে, বাপের এবং নিজের দারুণ খুশিতে আর গর্বে তাকাচ্ছিল সপ্রশংস দর্শকদের দিকে। আর আপনা থেকে ওরা দুজনে মিশে আমার মনে এক হয়ে গেল, গভীর কোমল অনুভূতিতে হৃদয় আমার ভরে গেল।

সে সময় আমি ও আমার বিগত ভাই দুজনে একটা বাড়িতে থাকতাম। সমাজে কোনো আগ্রহ ছিল না ভাইয়ের। বল নাচে কখনো যেত না। এম. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে তখন, তার জীবনযাপনের ধরনটা নিয়ম-

মাক্কিক। ঘুমিয়ে পড়েছে সে। কম্বলে আধো ঢাকা, বালিশে গোঁজা তার মুখ দেখে মায়া হোলো—আহা, বেচারী জানে না আমার কত সুখ, সে সুখের ভাগ নিতে পারবে না ও। আমাদের ভূমিদাস খাস-চাকর পেত্রশা আলো হাতে এল আমার পোশাক ছাড়িয়ে দিতে, চলে যেতে বললাম ওকে। লোকটার ঘুম-জড়ানো চোখ আর এলোমেলো মুখ দেখে মায়া হোলো। পাছে কোনো শব্দ হয়, তাই পা টিপে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার ওপরে বসলাম। এত সুখ আমার মনে, ঘুম এল না। ঘরে গরম লাগছিল, ইউনিফর্ম না খুলেই চুপিচুপি সামনের ঘরে এসে ওভারকোট চাপিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম।

বল নাচ থেকে যখন আসি তখন প্রায় পাঁচটা। বাড়ি পৌঁছে বসে থেকে তারপর প্রায় দু'ঘন্টা কেটেছে। যখন বেরোলাম তখন আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। শ্রোভটাইডের সেই বিশেষ আবহাওয়া--কুয়াশা, ভিজে বরফ গলছে রাস্তায়, ছাত থেকে টপটপ করে ঝরছে জলের ফোঁটা। শহরে উপকণ্ঠে একটা খোলা মাঠের ধারে তখন থাকত ভারেঙ্কাদের পরিবার। মাঠের এক দিকে মেয়েদের স্কুল, অন্য দিকে বেড়াবার জায়গা। আমাদের নিস্তব্ধ গলিটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় গেলাম। সেখানে রাস্তায় লোক চলেছে। কাঠ বোঝাই স্লেজ নিয়ে চলেছে চালকেরা, স্লেজের রানারগুলো রাস্তায় বরফ কেটে প্রায় পাথর ঘেঁসে চলেছে। আর সব কিছু—ভিজে চকচকে যোয়ালের নীচে তালে তালে মাথা ওঠা-নামা করা ঘোড়াগুলো, কাঁধে গাছের ছালের চাটাই দিয়ে স্লেজগুলোর পাশে পাশে বিরাট জুতোয় বরফ কাদা, ভেঙে-যাওয়া চালকেরা আবার পথের দুধারে কুয়াশায় দাঁড়িয়ে-থাকা উঁচু বাড়ি-ঘর—সব কিছু মনে হোলো বিশেষ সুন্দর, বিশেষ অর্থ আছে তাদের।

যে মাঠে ওদের বাড়ি সেখানে পৌঁছে বেড়ানোর জায়গাটায় কালো বড় কী একটা নজরে পড়ল। কানে এল ঢাক ও বাঁশির শব্দ। আমার হৃদয়ে তখনো সঙ্গীতের রেশ, মাঝে মাঝে মাজুরকার সুর যেন ভেসে আসছে। কিন্তু এটা তো অন্য ধরনের বাজনা, নিষ্ঠুর অসুন্দর।

'কী হতে পারে এটা।' বিস্মিত হয়ে ভাবলাম। মাঠের মধ্য দিয়ে গাড়ির পেছনে রাস্তা ধরে চললাম শব্দটা লক্ষ্য করে। প্রায় একশো পা যাওয়ার পরে কুয়াশার মধ্যে মানুষের একটা ভিড় ক্রমে স্পষ্ট হতে লাগল।

নিশ্চয়ই সৈন্য। 'কুচকাওয়াজ করছে,' ভেবে একজন কামারের সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চললাম, তার গায়ে তেলচিটে অ্যাপ্রোণ আর জ্যাকেট, বড় একটা বাণ্ডিল তার হাতে। কালো কোট পরে দু' সারি সৈন্য মুখোমুখি নিশ্চল দাঁড়িয়ে, বন্দুকগুলো পাশে ধরা। তাদের পেছনে বাঁশি-বাজিয়ে আর ড্রাম-বাজানো ছেলেটা তীক্ষ্ণ সুরে বাজিয়েই চলেছে।

'কী করছে ওরা?' পাশের কামারকে শুধোলাম।

'ভেগে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলে একটা তাতারকে তাড়িয়ে এনেছে।' সৈন্যদের দুটো সারির একেবারে শেষের দিকটায় তাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিল কামার।

সেদিকে তাকিয়ে দেখি একটা ভয়াবহ কিছু দু'সারির মাঝ দিয়ে আসছে আমার দিকে। খালি-গা একটা লোককে বন্দুকের সঙ্গে বেঁধে, একটি সৈন্য বন্দুকের দুই প্রান্ত ধরে নিয়ে আসছে। পাশে হাঁটছেন ফৌজী কোট ও ফৌজী টুপি পরা দীর্ঘাঙ্গ এক অফিসার। চেহারাটা তার চেনা-চেনা লাগল। বন্দীর সমস্ত শরীরটা শিটিয়ে গেছে। গলন্ত বরফে থস থস করে পা ফেলে বন্দীটি এগিয়ে আসছে। দু'ধার থেকে বৃষ্টির মত তার ওপরে পড়ছে ঘুঁষি। মাঝে মাঝে সে নিচু হয়ে পিছিয়ে পড়লে বন্দুক-ধরা সেপাই তাকে ঠেলে দিচ্ছে সামনে, কখনো বা টলে একটু বেশি এগিয়ে পড়লে সেপাইরা ঝটকা মেরে টান দিচ্ছে যাতে পড়ে না যায়। আর তার পাশে দৃঢ় পায়ে হাঁটছেন দীর্ঘাকৃতি অফিসারটি, পিছিয়ে পড়ছেন না একবারও। তিনি ভারেঙ্কার বাবা, টকটকে লাল মুখ, সাদা গোঁফ, আর জুলফি!

মার খেয়ে প্রত্যেকবার বন্দীটি যন্ত্রণা-বিকৃত মুখ ফিরিয়ে যেন অবাক হয়ে তাকাচ্ছে সেদিকে, যেদিক থেকে আঘাত আসছে। খোলা সাদা দাঁতের মধ্য দিয়ে কী একটা বলে চলেছে বারবার। কাছে না আসা পর্যন্ত কী বলছে বুঝতে পারি নি। সেটা কথা বলা নয়, কান্না। 'দয়া কর ভাইসব। দয়া কর, ভাইসব।' কিন্তু ভাইদের কোনো দয়া নেই। মিছিল যখন আমার ঠিক মুখোমুখি এসে পড়ল, দেখলাম একটি সেপাই দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে এসে এত জোরে মারল তাতারটির পিঠে যে হাওয়ায় শিস দিয়ে উঠল বেতটা। সামনের দিকে পড়ে গেল সে, সেপাইরা ঝটকা মেরে তুলল, আর অন্য পাশ থেকে বেতের আঘাত, এ পাশ থেকে আবার, আবার ওপাশ থেকে……

পাশে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে চলেছেন কর্নেল, কখনো তাকাচ্ছেন নিজের পায়ের দিকে, কখনো বা বন্দীটির দিকে, বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে গাল ফুলিয়ে চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, মিছিলটা সেখানটা পেরিয়ে যাওয়ার সময় দু সারি সেপাইর মাঝ দিয়ে চোখে পড়ল বন্দীর পিঠের খানিকটা। অকথ্য ব্যাপার: ছড়ে-যাওয়া, ভিজে, দগদগে লাল পিঠ, দেখতে বিজাতীয়। মানুষের দেহ বলে বিশ্বাস হতে চায় না।

'হে ভগবান!' পাশে কামারটি বলল বিড়বিড় করে।

মিছিলটা এগিয়ে গেল। জড়োসড়ো ধড়ফড়ানো জীবটির ওপর দু'পাশ থেকে চলছে মারের পর মার। ড্রাম বেজে চলেছে। বাঁশি বাজছে। বন্দীর পাশে দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলেছেন দীর্ঘাকৃতি মহিমান্বিত কর্নেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে, তারপর তাড়াতাড়ি তিনি গেলেন একটি সেপাইর কাছে।

'বেত ওর গায়ে পড়ছে না? দেখাচ্ছি তোকে।' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। 'দিবি ফাঁকি? এই নে, এই নে।' সোয়েডের দস্তানা-পরা বলিষ্ঠ হাতে তিনি কষে একটা চড় বসালেন ছোটখাট দুর্বল সৈনিকটির মুখে, তাতারের দগদগে লাল পিঠে যথেষ্ট জোরে সে বেত চালায় নি বলে।

'নতুন বেত নিয়ে আয়।' কর্নেল চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন। বলার সময় ঘুরে দাঁড়াতে দেখতে পেলেন আমাকে। চিনতে না পারার ভান করে ক্রুদ্ধ শাসানির ভ্রূকুটি মুখে টেনে তাড়াতাড়ি ফিরলেন অন্য দিকে। এত লজ্জা হোলো আমার যে, কোন্ দিকে তাকাব ভেবে পেলাম না, যেন ভয়ংকর জঘন্য কিছু করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি। মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি চললাম বাড়িমুখো। সারা পথ কানে বাজতে লাগল ড্রামের শব্দ, বাঁশির তীক্ষ্ণ চীৎকার, 'দয়া কর ভাইসব', কর্নেলের ক্রুদ্ধ আত্মম্ভরী হাঁক, 'ফাঁকি! এই নে, এই নে।' আর বুকের ভেতরটা এত ব্যথিয়ে উঠল যে, প্রায় শারীরিক কষ্টের মত, গা উঠল ঘিনঘিন করে, কয়েকবার দাঁড়িয়ে পড়তে হোলো রাস্তায়—যেন বমি-বমি ভাব। মনে হোলো, দৃশ্যটির সমস্ত বিভীষিকা উদ্‌গার করে ফেলতে হবে আমায়। কী করে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লাম মনে নেই, কিন্তু তন্দ্রা আসতে না আসতে আবার সব কিছু ফিরে এল চোখের সামনে, সব আবার শুনলাম কানে। আমি এক লাফে উঠে পড়লাম।

'উনি নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু জানেন যা আমার অজ্ঞাত। উনি যা জানেন আমার জানা থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম. যা দেখলাম তাতে এত ক্লেশ হোতো না,' কর্ণেল প্রসঙ্গে মনে মনে বললাম। কিন্তু শত মাথা ঘামিয়েও কর্ণেলের জানা জিনিসটি আমার মাথায় ঢুকল না। ঘুম এল না সন্ধ্যা পর্যন্ত। এক বন্ধুর কাছে গিয়ে নিজেকে মদ দিয়ে বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে তবে ঘুমোতে পারি।

দৃশ্যটি খারাপ বলে ধরে নিয়েছিলাম—আপনারা এই ভাবছেন তো? ও রকম কিছু ধরে নিই নি। যেটা দেখলাম সেটা যদি এত নিশ্চিন্তভাবে করা হয়ে থাকে, লোকে যদি সেটাকে প্রয়োজন বলে মেনে নেয়, তাহলে তার অর্থ, ওরা নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু জানে যেটা আমি জানি না।' এই ভেবে জিনিসটি কী বার করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বার করতে পারি নি কখনো। আর পারি নি বলে সামরিক কাজে যোগ দিতে পারি নি, কিন্তু ফৌজী কাজে ঢুকব এই আমার ইচ্ছে ছিল। শুধু ঐ কাজে যোগ দিতে পারি নি তাই নয়, কোন কাজেই নয়। আর দেখতেই তো পারছেন কেমন অপদার্থ বনে গিয়েছি।

'কেমন অপদার্থ বনে গেলেন ভাল করেই জানি।' একজন অতিথি বললেন। 'আপনি না থাকলে অনেক লোক অপদার্থ হয়ে যেত, সেটা বলাই ঠিক।'

'ওটা বাজে কথা।' রীতিমত বিরক্ত হয়ে বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

'আচ্ছা, আপনার প্রেমের কী হোলো?' আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

'আমার প্রেম? সেদিন থেকে আমার প্রেম উবে যেতে লাগল। বেড়াতে গিয়ে যখনি ভারেঙ্কা অভ্যেস মতো মৃদু হেসে আনমনা হয়ে যেত, তখনই মাঠে কর্ণেলের কথাটা না স্মরণ করে পারতাম না। অসুখী আর অস্বস্তিকর লাগত। ক্রমে ওদের ওখানে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। আমার প্রেম মিলিয়ে গেল।'

'দেখছেন তাহলে, এসব ঘটনাও কখনো কখনো ঘটে। আর এ ধরনের ঘটনাই মানুষের গোটা জীবনটাকে বদলে দেয়, চালিয়ে দেয়। আর আপনারা বলেন কিনা পরিবেশ—' বললেন তিনি।

১৯০৩